বাংলা কবিতার নবজন্ম

প্রথম প্রকাশ ঃ
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৯
৮ই মে, ১৯৬২

প্রকাশক ঃ
সুপ্রিয়া মৈত্র
২৯-৭, হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন,
কলিকাতা-৫০

মুদ্রক ঃ
বাদল রায়
বিদ্যাসাগর প্রেস
১৯, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

গ্রন্থন ঃ
ইস্ট এণ্ড ট্রেডার্স
২২, কেশব সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদপট :
মণীন্দ্র মিত্র

দাম :
পনেরো টাকা

উৎসর্গ

এ-যুগের কাব্য-লোকের অধীশ্বরের উদ্দেশে

লেখকের কথা

বিশ্লেষণশূন্য তথ্য নিতান্তই বিভ্রান্ত। এ-গ্রন্থ চলতি অর্থে ইতিহাসগ্রন্থ নয়। কোন বিশেষ কালের বাংলা কবিতার রূপ-বিশ্লেষণই লেখকের উদ্দেশ্য ; সেই কাব্যসৃষ্টির পিছনে যে ধরনের আন্দোলন সক্রিয় ছিল তার ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। লেখক সব সময়ই সমসাময়িক কালে প্রকাশিত বিবিধ পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছেন। একটি শুধু কৈফিয়ৎ আছে--উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র ব'লে এদেশে লিখিত ইংরেজী কাব্যসমূহের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। অবশ্য সে বক্তব্যের সঙ্গে একমত না হ'লেও ডিরোজিও বা ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন প্রভৃতির কাব্যকৃতি ও কাব্যবোধের বিস্তৃত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হ'ত না। অনুরূপ কারণে অপ্রাসঙ্গিক হয়নি সমসাময়িক দর্শন-চিন্তার ইতিবৃত্ত-উদ্ধার। বাংলা কাব্য-আলোচনার এতদিনকার সংকীর্ণ চৌহদ্দির অবসান ঘটুক, এই কামনা।

পূজনীয় অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের তাগিদ ব্যতীত এ গ্রন্থ আদৌ লিখিত হ'ত না। দীর্ঘ পঁচিশ বছর তাঁর স্নেহ পেয়েছি ; তিনি আমার ধন্যবাদার্হ নন, প্রণম্য। যাঁদের ঔৎসুক্য আমাকে সবসময় সাহায্য করেছে, তাঁদের মধ্যে আছেন শ্রীঅনিলকুমার কাঞ্জিলাল, অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শান্তি সিংহরায়, অধ্যাপক অচ্যুত গোস্বামী। এঁদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা যে-কোন লেখকের পক্ষেই সম্পদ।

আমার পিতৃদেব শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মৈত্র এ গ্রন্থের প্রেসকপি তৈরি করা থেকে প্রুফ সংশোধন প্রভৃতি বিভিন্ন কার্যে আমাকে সর্বদাই উপদেশ দিয়েছেন। অন্যান্য যাঁরা নানাভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক পীযূষ দাশগুপ্ত ও শ্রীবিমল মিত্রের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

মুদ্রণ ব্যাপারে অনভিজ্ঞ ব'লে বহু ছাপার ভুল থেকে গেল। এজন্য ত্রুটি স্বীকার ক'রে লাভ নেই, শুধু পাঠকের সহিষ্ণুতা প্রার্থনা করছি। ইতি—

২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৯ — সুরেশচন্দ্র মৈত্র

কলিকাতা

*　　　　　　*　　　　　　*

আমি নাবব মহাকাব্য-
সংরচনে
ছিল মনে—
ঠেকল কখন তোমার কাঁকন-
কিংকিণীতে,
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়।

*　　　　　　*　　　　　　*

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

কথারম্ভ — ১-৯ :

সাহিত্যের ইতিহাস ও বাংলা কাব্যের প্রকৃতি—১-৩ ; বাংলা কাব্যের গতি ও প্রকৃতি—৩-৪ ; বঙ্কিম-অভিমত ও বাংলা কাব্যের ধারা—৫-৬ ; বাঙ্গালী মানস ও বাংলা সাহিত্য—৬-৮ ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাক্-আধুনিক বাংলা কবিতার উত্তরাধিকার— ১০-৪৬ :

প্রাক্-তুর্কী যুগ—১০-১৩ ; তুর্কী-বিজয় পরবর্তী যুগ—১৪-২২ ; অষ্টাদশ শতাব্দী: সমাজ ও সাহিত্য—২২-২৪ ; সামাজিক বোধ—২৫-২৯ ; সাহিত্যের অবক্ষয়—২৯-৪৬ ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঊনবিংশ শতাব্দী : নবীন মানুষ ও নবীন পিপাসা— ৪৭-৮৬ :

পুরাতনের নব মূল্যায়ন—৪৭-৫১ ; নবীনের আবির্ভাব—৫১-৫৫ ; নবীন শিক্ষা, নবীন মানুষ—৫৫-৬১ ; নবীনের দীক্ষাগুরু—৬২-৬৬ ; পুরাতনের ভগ্নাবশেষ—৬৬-৬৮ ; রাজনীতি—মোহভঙ্গের ইতিহাস—৬৯-৭৪ ; রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্মকথা—৭৪-৭৬ ; অর্থনীতি-ভাঙ্গনের ইতিহাস—৭৬-৭৮ ; ভারতে নতুন শিল্পায়ন—৭৮-৮২ ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যুগসন্ধির কাব্য : ভাষা, বিষয় ও আদর্শের বিরোধ— ৮৭-১৩৭ :

যুগসন্ধির কাব্য—৮৭-১০১ ; দেশীয় বিষয়, দেশীয় কবি ও বিদেশী ভাষা—১০১-১০৮ ; বঙ্গভাষা, নতুন বিষয় ও পুরাতন রীতি—১০৮-১১৯ ; সমসাময়িক অন্যান্য কবি—১১৯-১২১ ; ঈশ্বর গুপ্ত ও তাঁর প্রভাবিত কবিসম্প্রদায়—১২১-১২৬ ; শিক্ষাগুরুর কাব্যাদর্শ—১২৭-১৩২ ; ইংরেজী কবিতার অনুবাদ ও বাংলা কাব্যে আধুনিকতা—১৩৩-১৩৫ ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

নবীন কবিতার সূত্রপাত— ১৪১-১৬৭ :

যুগান্তরের কাব্য ও তার পর্যায় বিভাগ—১৪১-১৪৩ ; রঙ্গলাল ও আধুনিকতা—১৪৩-১৬০ ; পদ্মিনী-পরবর্তী কাব্যধারা—১৬০-১৬৭ ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নবীন কাব্য ও মাইকেল মধুসূদন— ১৬৮-৩০৮ :

শিক্ষানবিশীর প্রথম পর্ব—১৬৮-১৭২ ; শিক্ষানবিশীর দ্বিতীয় পর্ব—১৭৩-২০৭ ; যুগমানস ও মেঘনাদবধ কাব্য—২০৭-২১২ ; মেঘনাদবধ কাব্য ও তার মৌলিকতা—২১২-২৩৩ , মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা ও ছন্দ—২৩৩-২৪৬ ; অলংকার ও মাইকেল মধুসূদন—২৪৬-২৬৩ ; মাইকেলের ছন্দ—২৬৩-২৭২ ; ব্রজাঙ্গনা কাব্য—২৭২-২৭৫ ; বীরাঙ্গনা কাব্য—২৭৫-২৮০ ; চতুর্দশপদী কবিতাবলী—২৮০-২৯০ ; বিবিধ কবিতা—২৯০-২৯১ ; নীতিগর্ভ কবিতা—২৯১-২৯৩ ; মাইকেল-মানস—২৯৩-৩০৮ ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাইকেল সমসাময়িক কবিতা— ৩০৯-৩৩০ :

দ্বারকানাথ রায়—৩০৯-৩১১ ; রসিকচন্দ্র রায়—৩১১-৩১২ ; বনওয়ারীলাল রায়—৩১২-৩১৩ ; রাধামাধব মিত্র—৩১৩ ; গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—৩১৩-৩১৪ ; হরিশচন্দ্র মিত্র—৩১৪ ; কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—৩১৪-৩১৭ ; মদনমোহন মিত্র—৩১৮ ; কাঙাল হরিনাথ মজুমদার—৩১৯-৩২১ ; যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়—৩২১ ; রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়—৩২১ ; ভুবনমোহন রায়চৌধুরী—৩২১-৩২৪ ; জগদ্বন্ধু ভদ্র—৩২৪-৩২৭ ; ব্রজনাথ মিত্র, মহেশচন্দ্র শর্মা, দীননাথ ধর—৩২৮ ; রামদাস সেন—৩২৮-৩৩০ ।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রত্যক্ষবাদ ও জঙ্গী দেশপ্রেম— ৩৩৩-৩৪০ :

জঙ্গী দেশপ্রেম—৩৩৩-৩৩৫ ; বস্তুবাদী দর্শনচর্চা—৩৩৫-৩৪০ ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহাকাব্যের বিস্তৃতি ও কাব্যের দুর্গতি— ৩৪১-৩৭৫ :

হেমচন্দ্র—৩৪১-৩৬০ ; নবীন চন্দ্র সেন—৩৬০-৩৬১ ; খণ্ড কবিতা—৩৬১-৩৬৪ ; গাথা কাব্য—৩৬৪-৩৬৮ ; মহাকাব্য—৩৬৮-৩৭৫ ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিহারীলাল ও আত্মমুখীন কবিতা— ৩৭৬-৪০৯ :

কাব্যধারা—৩৭৮-৩৮৫ ; দার্শনিক ভিত্তি—৩৮৫-৩৯০ ; কাব্য-বিচার—৩৯০-৩৯৫ ; নবীন ভাষা—৩৯৫-৪০০ ; বিহারীলালের ছন্দ—৪০০-৪০৩ ; সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার—৪০৩-৪০৯ ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জন্মান্তরের পূর্বাহ্ণে— ৪১০-৪৪৬ :

রূপকের রূপকার—৪১০-৪১৯ ; গীতি কবিতা—৪১৯-৪৩৯ ; মহাকাব্যের ব্যঙ্গ—৪৪০-৪৪২ ; মাসিক পত্র ও গীতিকাব্য—৪৪২-৪৪৬ ।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

অন্তঃধর্মের উন্মেষ ও গীতিকবিতার প্রাধান্য— ৪৪৯-৪৫৭ :

বুদ্ধিবাদী দর্শন-চর্চা বনাম ভাববাদ—৪৪৯-৪৫০ ; অন্তঃধর্মের উন্মেষ ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ—৪৫০-৪৫৫ ; গীতিকবিতা ও অন্তঃধর্ম—৪৫৫-৪৫৭ ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পুরাতনের বুকে নবীনের প্রতিধ্বনি— ৪৫৮-৪৮৩ :

রবীন্দ্র-কাব্যধারা—৪৫৮-৪৭৯ ; সমসাময়িক রবীন্দ্র-প্রবন্ধ ও রবীন্দ্র-অনুবাদ—৪৭৯-৪৮৩ ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তার্থের সমীপে— ৪৮৪-৪৯৮ :

সন্ধ্যাসঙ্গীত—৪৮৪-৪৮৫ ; প্রভাতসঙ্গীত—৪৮৫-৪৮৭ ; ছবি ও গান—৪৮৮-৪৯১ ; কড়ি ও কোমল—৪৯১-৪৯৮ ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিশ্ব তোমা-পানে চেয়ে কথা নাহি কয়— ৪৯৯-৫১১ :

সমসাময়িক কাব্য-আন্দোলন—৪৯৯-৫০২ ; মানসী—৫০৩-৫১১ ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শতরূপা মানসী— ৫১২-৫৩৯ :

মানসীর মূল চিন্তা—৫১২-৫১৪ ; প্রকৃতিবোধ—৫১৪-৫১৬ ; ইন্দ্রিয়-চেতনা—৫১৬-৫১৮ ; রূপ-জগৎ—৫১৮-৫১৯ ; দৃষ্টি-জগৎ—৫২০-৫২৪ ; ঘ্রাণ-জগৎ—৫২৭ ; স্বাদ-জগৎ—৫২৪-৫২৫ ; শ্রুতি-জগৎ—৫২৫-৫২৬ ; স্পর্শ-জগৎ—৫২৬-৫২৮ ; রবীন্দ্র-বাক্‌প্রতিমার প্রকৃতি—৫২৮-৫৩৩ ; ভাষা ও ছন্দ—৫৩৩-৫৩৭ ; বাংলা কাব্যের জন্মান্তর—৫৩৭-৫৩৯ ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নতুন যুগের কবিগোষ্ঠী— ৫৪০-৫৬৮ :

রবীন্দ্র-যুগের সূচনা—৫৪০-৫৪১ ; দেবেন্দ্রনাথ সেন—৫৪২-৫৪৮ ; অক্ষয়কুমার বড়াল—৫৪৮-৫৫২ ; গোবিন্দ দাস—৫৫৩-৫৫৫ ; প্রিয়নাথ সেন—৫৫৫ ; বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, বেনোয়ারীলাল গোস্বামী—৫৫৫ ; স্বর্ণকুমারী দেবী—৫৫৬ ; হিরন্ময়ী দেবী—৫৫৭-৫৫৮ ; সরোজকুমারী দেবী—৫৫৮-৫৫৯ ; মানকুমারী বসু, প্রমীলা নাগ, বিনয়কুমারী বসু—৫৫৯ ; কামিনী রায়—৫৫৯-৫৬২ ; নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—৫৬২-৫৬৩ ; বিজয়চন্দ্র মজুমদার—৫৬৩-৫৬৫ ; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—৫৬৫ ; রবীন্দ্র-কাব্য ধারার অনন্যতা—৫৬৫-৫৬৮ ।

পরিশিষ্ট-১—আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী—১৮৫৮-১৮৯১— ৫৬৯-৫৭০

পরিশিষ্ট-২—জাতীয় ঘটনাবলী— ঐ— ৫৭০-৫৭৩

পরিশিষ্ট-৩—বাংলা কাব্যগ্রন্থের তালিকা— ঐ— ৫৭৩-৫৭৮

নির্দেশিকা— ৫৭৮-৫৯২

প্রথম অধ্যায়

বিনে স্বদেশীয় ভাষা
পুরে কি আশা ।
—নিধুবাবু

॥ শুদ্ধিপত্র ॥

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	মুদ্রিত রূপ	সংশোধিত রূপ
২৪	২২	nybing country	the buying country
		simlies	similes
৪৯	১৬	to us—produced	to us has produced
৫০	২১	শোরবোর্ণ	শারবার্ণ
		আরাতুন পিক্রস	আরাতুন পিত্রস
৬৪	১২	হরকান্ত ঘোষ	হরচন্দ্র ঘোষ
৬৯	৯	কোর্ড	কোড
৯৭	২৭	if religiious' Hume	if religious, Hume
৯৮		৪ নং পাদটীকা	৩ নং হবে।
৯৯	৬	প্রকাশ পেয়েছে	প্রকাশ করেছেন।
	৯	fales	false
	১৬	১৮৫৩	১৮৫১
১০১	২২	dear	deer
১০৫	১৪	bitter part	better part
১১১	৯	সম্পাদকীয় মন্তব্য	সম্পাদকীয় মন্তব্যে
১৪৫	২	ইংলণ্ডীয় কাবামোদিগণ	ইংলণ্ডীয় কাব্যমোদিগণ
৫০৭	২৮	তোমারেই যে	তোমারেই যেন
৫০৮	২	মুগ্ধ হৃদয়ে	মুগ্ধ হৃদয়
৫০৮	২২	Enjament	Enjambment
৫১০	১৫	maintion	maintain

বাংলা কবিতার নবজন্ম

(আধুনিক বাংলা কবিতা, ১৮৫৮—১৮৯১)

কথারম্ভ

॥ ১ ॥

বাংলা কাব্যের ইতিহাস আলোচনা এখনও বিঘ্নসংকুল; কারণ আজও এই অঙ্গনে নানা সংস্কার দুর্মর হয়ে আছে। প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একমাত্র বাহন ছিল পদ্য। বাংলা সাহিত্যের এই পদ্য-সর্বস্বতা বা ছন্দ-নির্ভরতা বাংলা কাব্যের ইতিবৃত্তকে অযথা স্থূলকায় করেছে। বহু রচনা আদৌ কাব্য নয়, অথচ ছন্দ-নির্ভরতার পুণ্যে সেগুলি ভিন্ন মর্যাদার অধিকারী হয়ে কাব্য আলোচনার অংশীভূত হয়েছে। এগুলিকে সরাসরি বর্জন করা প্রায় অসম্ভব; কারণ অচল অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিবিধ সংস্কারের বাধা।

জাতীয় ইতিহাস সম্পর্কে দেশবাসীর অন্তরে আগ্রহ উন্মেষের দিন থেকে সাহিত্যের ইতিহাস লিখিত হতে শুরু হয়েছে। প্রাক্-বঙ্কিমযুগে নজির থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্র থেকেই সূচনা হোল ইতিহাসের যথার্থ মর্মানুসন্ধান।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে 'Literary Gazette'এ সেকালের অন্যতম প্রধান ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি কাশীপ্রসাদ ঘোষের এক ইংরেজী নিবন্ধ প্রকাশিত হয়; 'সমাচার দর্পণে' উক্ত প্রবন্ধের এক অনুবাদ বের হয়। তার কুড়ি বৎসর পরে বীটন সোসাইটির এক সভায় হরচন্দ্র দত্ত বাংলা কাব্য বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন; বলা বাহুল্য এই প্রবন্ধটিও ইংরেজী ভাষায় লিখিত। এই প্রবন্ধে দত্ত মহাশয় বিদ্যাসুন্দর কাব্যকে অগ্নিতে নিক্ষেপের উপদেশ প্রদান করেন। প্রায় সমগ্র বাংলা সাহিত্যকেই তিনি অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। সমগ্র প্রবন্ধটিতে তৎকালীন ইংরেজীশিক্ষিত মার্জিতরুচি পাঠকের নবীন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকট হয়ে দেখা দেয়। 'সংবাদ প্রভাকরে'র সহ-সম্পাদক ও উদীয়মান কবি (তখনও 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রকাশিত হয়নি) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙ্গালা

কবিতা'বিষয়ক প্রস্তাব শীর্ষক পুস্তিকা লিখে এর এক জবাব দেন; তিনি ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস থেকে নানা অশ্লীলতার প্রসঙ্গ উদাহৃত করে দেখালেন যে, ইংরেজী-সাহিত্যের দোহাই দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে এই ব্যাপারে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যুক্তিসহ নয়। তাঁর বক্তব্যে বিস্তর ফাঁক আছে; কিন্তু তিনিই এদেশে প্রথম তুলনামূলক সাহিত্য আলোচনা পত্তন করেন। রঙ্গলালের পুস্তিকায় কবিকঙ্কণ, কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস, রামচন্দ্র, রামেশ্বর, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, দুর্গাপ্রসাদ, দেওয়ান রঘুনাথ রায়, নিধুবাবু, রাম বসু, রাধামোহন সেন প্রভৃতি কবির নাম উল্লিখিত ছিল। সেকালের ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী পাঠক ইতিপূর্ব্বে এতগুলি বাঙ্গালী কবির নাম একসঙ্গে শোনেন নি। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই সময়ে 'সংবাদ প্রভাকরে' কবি-জীবনী সংগ্রহে ব্যাপৃত হন (১৮৫৩-৫৫)।

এই সমস্ত প্রয়াসকে বিশুদ্ধ ইতিহাস বলা চলে না, ইতিহাস-সচেতনতার সূত্রপাত বললেই যথার্থ হয়।

॥ ২ ॥

বাংলা সাহিত্যের প্রকৃত ইতিহাস লেখা শুরু হয়েছে ১৮৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। ১৭৮০ শকাব্দে পণ্ডিতপ্রবর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের এক প্রবন্ধ 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ ডাঃ সুকুমার সেনের মতে বাংলা সাহিত্যের যথার্থ ইতিহাস রচনার প্রথম প্রয়াস।[১] ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "বঙ্গ ভাষার ইতিহাস" প্রকাশিত হয়। ভাষার ইতিহাস এতে বিশেষ নেই, লেখক-বিশেষের পরিচিতি মাত্র আছে। অতঃপর রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭৩) রাজনারায়ণ বসুর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭৮) গ্রন্থ দুইখানি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ দুইখানির ব্যাখ্যাপ্রণালী বিভিন্ন; এবং এই বিভিন্নতা থেকে উনিশ শতকের মধ্যপাদের দুই বিপরীত-ধর্মী সাহিত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এর পর ১৭৯১ শকাব্দে হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'কবিচরিত' প্রকাশিত হয়। 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' রচনার এই হোল দ্বিতীয় প্রয়াস, প্রথম প্রয়াস করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে

গঙ্গাচরণ সরকারের 'বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থেও লেখক বিশেষের পরিচয় প্রদানের ঝোঁকই প্রবল, ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা নয়। সাহিত্য-আলোচনার এই অপরিণত রূপের অবসান ঘটল বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী-আঘাতে।

বাংলা কাব্যের গতি ও প্রকৃতি

॥ ১ ॥

১২৮০ বঙ্গাব্দে (১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে) বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'জয়দেব ও বিদ্যাপতি' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে কবিদ্বয়ের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সমগ্র বাংলা কাব্যেরই মর্ম উদঘাটিত হোল। উক্ত প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন, "গীতিকাব্যই বাঙ্গলার চরিত্রধাতুর সঙ্গে সুসংবদ্ধ।"[২] কথাটা বাংলা কাব্য আলোচনার এতদিনকার সীমাবদ্ধতার অবসান ঘটাল; তখনই বাংলা কাব্য সমালোচনার যুগ-পরিবর্তন সূচিত হোল। বঙ্কিমচন্দ্র দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখলেন, "বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে দুঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গীতি-কাব্যের অভাব নাই। বরং অন্যান্য ভাষার অপেক্ষা বাঙ্গালায় এই জাতীয় কবিতার আধিক্য। অন্যান্য কবির কথা না ধরিলেও এই বৈষ্ণব কবিগণ ইহার সমুদ্রবিশেষ। বাঙ্গালার প্রাচীন কবি জয়দেব গীতিকাব্যের প্রণেতা।"

এই প্রবন্ধেই বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে গীতিকবিতার প্রাচুর্য এবং জাতীয় জীবনের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের হেতু কি, এ বিষয়ে এক তত্ত্ব উপস্থাপিত করলেন। বক্তব্য পরিচ্ছন্নতর করতে গিয়ে তিনি লিখলেন, "সাহিত্য দেশ-ভেদে, দেশের অবস্থাভেদে অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়। * * * কোমৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে রূপ তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ তদ্রূপ করিতে পারেন নাই। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র।" সাহিত্য সম্পর্কিত এই সাধারণ সূত্রটি উপস্থাপনার পর বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গনে এর যাথার্থ্য যাচাই করলেন। সমগ্র ভারতের আর্যসংস্কৃতি বঙ্কিমচন্দ্র পর্যালোচনা করলেন; পরে বাংলাদেশের প্রসঙ্গে পৌঁছে তিনি বললেন, "এদেশে ক্রমে আর্যতেজ অন্তর্হিত হইতে লাগিল, আর্যপ্রকৃতি কোমলতাময়ী,

আলস্যের বশবর্তিনী এবং গৃহসুখাভিলাষিনী হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে আমরা বাঙ্গালার পরিচয় দিতেছি। এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখপরায়ণ। সে কাব্যপ্রণালী অতিশয় কোমলতাপূর্ণ, অতি সুমধুর, দাম্পত্যপ্রণয়ের শেষ পরিচয়। অন্য প্রকারের সাহিত্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া এই জাতিচরিত্রানুকারী গীতিকাব্য সাত আটশত বৎসর পর্যন্ত বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের পদে দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য গীতিকাব্যের এত বাহুল্য।"

অন্যত্রও বঙ্কিমচন্দ্র একই কথা বললেন, "বঙ্গীয় গীতিকাব্য বঙ্গীয় সমাজের কোমল প্রকৃতি নিশ্চেষ্টতা এবং গৃহসুখনিরতির ফল।"[৩]

॥ ২ ॥

পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিমত কখনও আংশিক কখনও সামগ্রিক-ভাবে একাধিক কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

১২৯৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় অক্ষয়চন্দ্র সরকার তৎসম্পাদিত 'নবজীবন' পত্রিকায় লিখলেন "আধুনিক বঙ্গে গান বা গীতিকাব্যের প্রভূত আধিক্য। ইহার সাহিত্য সঙ্গীতময়; ইহার আমোদ আহ্লাদ, বিলাস কৌতুক সকলই সঙ্গীত; ধ্যান ধারণা, কীর্তন, ভজন সঙ্গীতে; ক্রন্দন কলহ—তাহাও সঙ্গীতে। বঙ্গদেশ যেমন গীতিকবিতাকে আপনার সর্বাবয়বের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা করিয়াছে, গীতি-কবিতাও সেইরূপ বঙ্গদেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছে।" লেখক গান ও গীতি-কবিতার মধ্যে পার্থক্য রক্ষা করেননি; তা সত্ত্বেও গীতিকবিতার প্রাধান্য সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখলেন, "এদেশে গীতিকবিতাই উৎকৃষ্ট কবিতা।"[৪] এইভাবে নানা কণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য বাংলা-সমালোচনা-সাহিত্যে সাধারণ সত্যের অবয়ব ধারণ করল।

বঙ্কিম-অভিমত ও বাংলা কাব্যের ধারা

বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র বক্তব্যকে তিনটি অংশে ভাগ করা যেতে পারে—

* বাংলা কাব্যে গীতিকাব্যের প্রাধান্য এবং গীতিকাব্য জাতীয় সাহিত্যের আসনে অধিষ্ঠিত।

* বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে গীতিকাব্যের বিকাশের অনিবার্য সম্পর্ক।

* গীতিকাব্য উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত ও গৃহসুখপরায়ণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই তিনটি মতের মধ্যে প্রথম দুইটি মত কাব্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে গভীর মনোযোগের হেতু হতে পারে, শেষোক্ত মত তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ বাংলা গীতিকাব্যের যে দুটি শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, সে দুটির সঙ্গেই সম্পূর্ণ পরিচয় লাভের সুযোগ বঙ্কিমচন্দ্রের হয়নি। বৈষ্ণব পদাবলী ও রবীন্দ্রগীতি-কাব্য বাংলা-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, শুধুমাত্র কাব্য বা গীতিকাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ নয়। শুধু বাংলা সাহিত্যের নয়, ভারতীয় ও বিশ্বসাহিত্যের সভামঞ্চে এই দুই সাহিত্য মহত্তম সাহিত্য সৃষ্টি বলে পরিগণিত। ১২৮০ বঙ্গাব্দের পূর্বে বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের যতটুকু পরিচয় ছিল, তার পরিচয় 'মৃণালিনী' উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে। সেদিন পর্যন্ত বৈষ্ণবপদাবলীর কোন বিস্তৃত ও প্রতিনিধিস্থানীয় সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। ১২৮০ বঙ্গাব্দেই জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'মহাজন পদাবলী' প্রথমভাগ প্রকাশিত হয়েছে ; কিন্তু এই সংগ্রহপুস্তকে বৈষ্ণব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্নাবলী সংগৃহীত হয়নি। ১২৮৫ বঙ্গাব্দে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' প্রকাশিত হয়। অক্ষয়চন্দ্রই শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে চণ্ডীদাসের নাম সুপরিচিত করে দিলেন। চণ্ডীদাসের পদাবলী ও রবীন্দ্র-গীতিকাব্যের সঙ্গে পুরো পরিচয় থাকলে গীতিকবিতা যে "অলস, ভোগাসক্ত, ও গৃহসুখপরায়ণ", এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে সুকঠিন হোত। এ দুটি ছাড়া, তৃতীয় সুযোগও তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। বাউল সঙ্গীতের যে নির্মল অমৃতধারার সঙ্গে আজ আমরা পরিচিত, বঙ্কিম তার স্বাদ থেকেও ছিলেন বঞ্চিত। তাঁর অব্যবহিত পূর্বে ছিল কবিওয়ালাদের যুগ, যাত্রা ও বিবিধ নাটগানের যুগ। এবং এগুলি ছিল বিকৃত আদিরসে পরিপূরিত। এমন কি ঈশ্বরগুপ্ত, তিনি ও তাঁর কলেজীয় দোসরদের খণ্ড কবিতায় এই আদিরসেরই

ছিল একচেটিয়া প্রভুত্ব। এসব কারণ মিলিয়ে গীতিকবিতার প্রকৃতিসম্পর্কে এক প্রতিকূল ধারণা পোষণ করা তাঁর পক্ষে খুব বেশি অযৌক্তিক ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, গীতিকবিতা বাংলা-সাহিত্যেরই একান্ত ফসল। তবে মেঘনাদবধকাব্য কি? মঙ্গলকাব্য, চরিতকাব্য—এগুলি কি? আর যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে সংস্কৃত ও প্রাকৃত-পালি-অপভ্রংশ গীতিকবিতার বিস্তৃত পরিচয় সংগৃহীত হয়নি, সংগ্রহ চলছে, সেই কারণে পুরাতন গীতি-কবিতার প্রসঙ্গ তাঁর ব্যাখ্যাকে প্রভাবিত করেনি। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সেখানেও যুগ-বিশেষে গীতিকবিতা প্রাধান্য অর্জন করেছে।[৫] কোন জাতিবিশেষের সাহিত্য-ফসল গীতি-কাব্য নয়, তেমনি গীতিকাব্য সর্বদা "অলস, ভোগাসক্ত, ও গৃহসুখপরায়ণ" নয়। তবে গীতিকবিতায় ব্যক্তিগত ভূমিকা প্রধান; অন্যবিধ কবিতা রাজসভা, বা সমাজের অন্যতর প্রতিষ্ঠানের (Institution) নির্দেশে বা অভিপ্রায়ে রচিত হয়; কিন্তু গীতিকাব্য তেমন নয়। গীতিকাব্য ব্যক্তি-নির্ভর ও আত্মনিষ্ঠ। তাই সমাজে যখন সমষ্টির শাসন শিথিল হয়ে পড়ে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য মাথা তুলে দাঁড়ায়, তখন গীতিকবিতার আবির্ভাব ঘটে। অবশ্য মধ্যযুগীয় সমাজে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের একটা সীমা আছে। কাজেই সে যুগেও গীতিকবিতাই একমাত্র কাব্য-রূপ হতে পারে না, তবে প্রধান। যে যুগে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের সুযোগ অবারিত, সে সমাজে গীতি-কবিতা প্রধান ও অনন্য 'ফর্ম'-রূপে দেখা দেয়!

বাঙ্গালী মানস ও বাংলা সাহিত্য

বঙ্কিমচন্দ্র ভৌগোলিক পটভূমিকায় সাহিত্যকে উপস্থাপিত করে তার চরিত্র ব্যাখ্যার প্রয়াসী হয়েছেন। 'কোমৎ-অনুসারী' সাহিত্যতত্ত্বের অভাবে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি যে সাহিত্যতত্ত্ব উপস্থাপিত তা করেছেন, কোমৎ-ভাবশিষ্য বাক্‌ল-এর 'সভ্যতার ইতিহাস' গ্রন্থের আদর্শে ব্যাখ্যাত। বাক্‌ল তাঁর গ্রন্থে সভ্যতার ইতিহাস প্রধানতঃ ইংলণ্ডের ভৌগোলিক পরিবেশের উপর বিন্যস্ত করে বর্ণনা করেছেন। এক সময় এই ব্যাখ্যা আলোচনার তুফান তুলেছিল। বাক্‌ল-ভাবিত

ইতিহাসতত্ত্ব যান্ত্রিক, এখানে পরিবেশ-প্রভাব মাত্রাতিরিক্ত মর্যাদা পেয়েছে; মুখ্যভূমিকাই তার; মানুষ গৌণ হয়ে পড়েছে। পরবর্তীকালের সমাজ-তত্ত্ববিদরা এ ব্যাখ্যা মানেন নি। আধুনিক সমাজবিজ্ঞান মানুষ ও পরিবেশ উভয়ের ভূমিকা সম্পর্কে এক সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্র লিখেছেন, "কিন্তু বাস্তবিক বাঙ্গালীরা কি চিরকাল দুর্বল, অসার, গৌরবশূন্য, তাহা হইলে গণেশের রাজ্যাধিকার, চৈতন্যের ধর্ম, রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশের ন্যায়, জয়দেব বিদ্যাপতি মুকুন্দদেবের কাব্য কোথা হইতে আসিল? দুর্বল অসার গৌরবশূন্য আরও জাতি পৃথিবীতে অনেক আছে। কোন দুর্বল অসার গৌরবশূন্য জাতি কথিতরূপ অবিনশ্বর কীর্তি জগতে স্থাপন করিয়াছে? বোধ হয় নাকি যে বাঙ্গলার ইতিহাসে কিছু সার কথা আছে।"[৬] অন্যত্র প্রকাশিত "বাংলার কলঙ্ক" নামক নিবন্ধে এই অভিমতই স্পষ্টতর হয়ে উঠল—"সকলেরই বিশ্বাস বাঙ্গালী চিরকাল দুর্বল, ভীরু, চিরকাল স্ত্রীস্বভাব, চিরকাল ঘুসি দেখিলেই পলাইয়া যায়। * * * বাঙ্গালীর চিরদুর্বলতা, এবং চিরভীরুতার আমরা কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু বাঙ্গালী যে পূর্বকালে বাহুবলশালী তেজস্বী, বিজয়ী ছিল তাহারও অনেক প্রমাণ পাই।"[৭] এখানে লক্ষণীয়, লেখকের বক্তব্য দুটি বিপরীত কোটিকে স্পর্শ করেছে। বঙ্কিম দুটি মতেরই যথার্থতায় বিশ্বাসী ছিলেন, এ ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিহীন। বঙ্কিম স্থানভেদে ব্যাখ্যা পরিবর্তন করতেন, এ সিদ্ধান্ত আমরা মনেতে রাজী নই। বরং কালক্রমে বঙ্কিম স্বীয় অভিমত পরিবর্জন করেছেন বা পরিবর্ধন করেছেন, এ সিদ্ধান্তই যুক্তিসহ। লেখক 'জয়দেব ও বিদ্যাপতি' থেকে কালক্রমে অনেক দূর সরে গেছেন। বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে অরোপিত এতদিনকার ভীরুতার অপবাদ একবার যখন অপসারিত হোল, তখন থেকে বাঙ্গালীকে নিয়ে শুরু হোল বন্দনাসূচক আলোচনা—শুরু হোল idealisation, এবং অনন্যতার প্রসঙ্গ। বিপিনচন্দ্র পাল হলেন এক্ষেত্রে প্রধান প্রবক্তা। তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপ:

"বাংলা চিরদিন—কি সমাজের কি ধর্মের—সকল প্রকারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্তভাবে আপনার সার্থকতার অন্বেষণ করিয়াছে; প্রাচীন শাস্ত্র মানিয়াও তাহার অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া সেই শাস্ত্রবন্ধনকে সর্বদা শিথিল

করিয়া আসিয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুগণ যে কালে পুরাতন স্মৃতির শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়াছিলেন, তখনও স্মার্তশিরোমণি রঘুনন্দন নূতন স্মৃতি রচনা করিয়া বাংলার হিন্দুসমাজকে প্রাচীনের নিগড় হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ভারতের হিন্দুসমাজের আর কোথাও এরূপভাবে এতবড় একটা বিপ্লব ঘটিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। * * *

বাংলার সনাতন সাধনার আর একটা বিশেষত্ব মানবতা। বাংলায় দেববাদ আছে সত্য, কিন্তু বাংলায় যে সকল দেবদেবীর পূজা প্রচলিত আছে তাহাদের সকলের মধ্যেই একটা অদ্ভুত মানবতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কালী, দুর্গা, সরস্বতী ইঁহাদের কাহারও বা দশ, কাহারও বা চারিহাত আছে বটে; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এসকল যে অপূর্ব মাতৃমূর্তি ইহা আশ্চর্যরূপে প্রত্যক্ষ হয়।"[৮] বাঙ্গালী মানসের এই চিত্র সৌন্দর্যে হৃদয়গ্রাহী হতে পারে, কিন্তু যাথার্থ্যে তর্কাতীত নয়। বিশেষতঃ লেখকের এই বক্তব্য থেকে অতি বাঙ্গালীয়ানার তত্ত্ব উদ্ভূত হতে পারে। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের রচনায়, মোহিতলাল মজুমদারের সাহিত্য-ব্যাখ্যায়, এবং গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরীর ধর্মনেতার চরিত-ব্যাখ্যায় এই অতি বঙ্গ-প্রীতির পরিচয় আছে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি ব্যাখ্যায় দেশানুরাগ প্রয়োজন, কিন্তু তার আতিশয্য সম্পর্কেও সতর্ক থাকতে হবে।

॥ ২ ॥

বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গালী মানসের বিশিষ্টতা সর্বযুগে অবিকৃত থাকেনি। অনেকেই বলেছেন, মানববাদ বাঙ্গালী সংস্কৃতির মৌলিক প্রতিজ্ঞা। বাংলা কাব্য এই মানববাদের প্রসঙ্গে মুখর। যুগভেদে এই মানববাদ বিভিন্ন মূর্তি পরিগ্রহ করেছে, কাব্যেও তার রূপ-নির্মিতি বিভিন্ন।

গীতিকাব্য, খণ্ডকাব্য বা মঙ্গলকাব্য বা পুরাণ জাতীয় 'মহাকাব্য' রচনার ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, বিশেষ জাতীয় কাব্যসৃষ্টি যুগ-বিশেষের তাগিদেই আবির্ভূত। বক্তব্যের মত কাব্য-আঙ্গিকও এক এক যুগের তাগিদে এক এক রকম। আবার বিভিন্ন আঙ্গিক একই যুগে ব্যবহৃত হলেও যুগের মুখ্য জীবনাদর্শের প্রভাবে একটি বিশেষ আঙ্গিক প্রাধান্য লাভ করে।

পাদটীকা

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড—ডাঃ সুকুমার সেন, ২য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা—১৬৩।

২। বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড—সংসদ সংস্করণ ১৩৬৬, পৃষ্ঠা—১৮৯।

৩। কৃষ্ণচরিত্র—বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সংসদ সংস্করণ—পৃষ্ঠা ৯০২।

৪। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন, ৭ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা—৩০৪।

৫। A History of Sanskrit Literature. A. Berriedale Keith Oxford University Press. পৃষ্ঠা—১৭৫—২৭৫।
হরপ্রসাদ রচনাবলী, ১ম খণ্ড—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅনিলকুমার কাঞ্জিলাল সম্পাদিত। ১৯৫৬, পৃষ্ঠা—২৭৭।

৬। বঙ্গদর্শন—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১২৮৭, অগ্রহায়ণ।

৭। প্রচার—১২৯১, শ্রাবণ।

৮। নবযুগের বাংলা—বিপিনচন্দ্র পাল, যুগযাত্রী প্রকাশক লিঃ পৃষ্ঠা—১১—১৫।

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাক্-আধুনিক বাংলা কবিতার উত্তরাধিকার

বাংলা কাব্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, যুগ-ভেদে কাব্য-দেহ ও আত্মা বিভিন্ন মূর্তি গ্রহণ করেছে। কোন যুগে হয়ত গীতিকাব্য প্রধান, কোন যুগে আখ্যায়িকাধর্মী কাব্য প্রধান। আবার সব যুগেই উভয় জাতীয় রচনা—গীতিধর্মী ও আখ্যায়িকাধর্মী কবিতা যুগপৎ রচিত হয়েছে।

প্রাক্-তুর্কী যুগ

বাংলা কাব্যের আদিতম নিদর্শন চর্যাগীতিকা; নামেই এদের চরিত্র নির্ধারিত হচ্ছে। পালযুগে এই সাহিত্য বিরচিত হয় বলে পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেছেন। এই যুগের হিন্দু ও বৌদ্ধ সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বৌদ্ধ সাহিত্য প্রধানতঃ অপভ্রংশমূলক এবং দোহাজাতীয়; অর্থাৎ গীতিধর্মী।

পালযুগের হিন্দুরা দার্শনিক ও স্মৃতি সম্বন্ধীয় আলোচনায় অধিকতর নিমগ্ন ছিলেন; বর্ণাশ্রম ধর্মের যাথার্থ্য প্রমাণেই ব্যতিব্যস্ত অর্থাৎ সমাজ-সত্যের যৌক্তিকতা প্রদর্শনই তাঁদের মুখ্য কাজ। সেনযুগে রাজশক্তি হিন্দুদের করায়ত্ত হয়। এ-যুগে স্মৃতিশাস্ত্র রচনার জোয়ার লেগে যায়। "To philosophy it contributes nothing, although there were perhaps much scope in this derection for discrediting Buddhistic thought and ideas ; but Bengal obviously preferred practical ritualistic regulation to abstract speculative thought."[১] কিন্তু সৃষ্টিমূলক সাহিত্যে (creative literature) অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব এড়ান গেল না। সেনযুগের শ্রেষ্ঠ কবিকর্ম হোল 'গীতগোবিন্দ' ও 'পবনদূত'। গীতগোবিন্দ ও পবনদূত—উভয় কাব্যেই অবশ্য কাহিনীর সূত্র আছে, কিন্তু সে শুধু সূত্রই। বহু সমালোচক বলেছেন, গানের কুসুম গাঁথবার জন্য ঐটুকু সূত্রের সেদিন প্রয়োজন ছিল; কারণ গীতিকবিতার স্বচ্ছন্দ দায়হীন উৎসারণের উপযোগী অনুভাবনা তখনও তৈরি হয়নি; কাহিনী-নিরপেক্ষ পটভূমিকার বিস্তার ঘটেনি।

সিদ্ধাচার্যদের সাহিত্যে কাহিনীর এই সূক্ষ্ম সূত্রটি ছিন্ন; বৌদ্ধ সাধন-

ভজনের নানা রূপক ও প্রতীক তখন অনুভূতির জগতে দানা বেঁধেছিল; তাকে সম্বল করেই তখন কবির পক্ষে স্বতন্ত্র ও কাহিনী-নিরপেক্ষ জগৎ সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল। কিন্তু বৈষ্ণব আরাধনা কালের বিচারে অর্বাচীন; আর ধ্যানের বিচারে নবাগত। বৈষ্ণব ভাবধারা অনুভূতির দুয়ারে করাঘাত করেছে, কিন্তু এখনও দোসর হয় নি। বৈষ্ণব ভাবধারা নিয়ে কাহিনী-নিরপেক্ষ কাব্য সৃষ্টি করলে তা শ্রোতার পক্ষে অনধিগম্য হবে।

সিদ্ধাচার্যদের সাহিত্যে হৃদয়ানুভূতিই প্রবল; কবির ব্যক্তিগত ভক্তি উচ্ছ্বাস, মুক্তি-কামনা এখানে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। এ সাহিত্যে জাতি-ভেদ, শাস্ত্রাচার, বিশেষ করে বেদ-ব্রাহ্মণ সম্পর্কে তীব্র ব্যঙ্গোক্তি আছে।

গীতিকবিতা জন্মসূত্রেই ব্যক্তিনির্ভর; এবং ব্যক্তিনির্ভর বলেই সমাজ-সত্যের বিরোধী। তাই এ সাহিত্য সে যুগে ছিল অসন্তোষের সাহিত্য, প্রতিবাদের সাহিত্য। উপভোগের সাহিত্যও মাঝে মাঝে যে হয় নি, তা নয়; কিন্তু সেটা তার বিকৃতি বা স্বধর্মচ্যুতি। সিদ্ধাচার্যদের চর্যাগীতিকারও প্রধান সুর হোল অসন্তোষের ও প্রতিবাদের। কাজেই এ সাহিত্যকেও অসন্তোষের ও প্রতিবাদের সাহিত্য বলা যেতে পারে।

বাংলাসাহিত্য-আলোচনার আসরে চর্যাপদ ও গীতগোবিন্দ মালাচন্দনের অধিকারী। আপাতবিচারে এই দুটি সাহিত্য শাখাই নানা দিক থেকে পৃথক; ভাষা আলাদা, কাব্য-রীতি পৃথক, কাব্য-বিষয় ও কাব্য-ভাবনাও এক জাতীয় নয়। কিন্তু এসব গরমিল সত্ত্বেও উভয় সাহিত্যই বাংলা কাব্যের চিরকালের কাব্য-পথটি তৈরি করে দিল।

চর্যাগীতিকায় বর্ণিত নরনারী অভিজাত বংশীয় নয়; এইভাবে জনচিত্ত সংস্থিতির অঙ্গীকারের দিকে বাংলাকাব্য প্রথম দিন থেকেই ধাবিত হোল। শবর শবরী বা নেড়া নেড়ী এই কবিতার প্রেমিক প্রেমিকা বা নায়ক নায়িকা। প্রতীক নির্বাচনে এই "গণতান্ত্রিকতা" চর্যাগীতিকারদের আপন-জাত পরিচয় সঞ্জাত। চর্যাকারগণ নিজেরা ছিলেন অধিকাংশই অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রতিনিধি।

যে মানব এবং যে মানবীর জীবন আলেখ্য আঁকা হয়েছে, তারা নিয়মানুগ নয়; স্বাভাবিক ও সুন্দর সৎ জীবনের সরিকও নয়। কিন্তু বাংলাকাব্যে সেই শাশুড়ী-ননদ পরিবৃতা গৃহস্থবধূর গৃহ-গণ্ডী অতিরিক্ত প্রেমিকা-মূর্তির এক বিশেষ অর্থ আছে।

চর্যাপদের বাক্-সংহতি, অলংকার প্রয়োগের অনিবার্যতা, আবেগ অকৃত্রিমতা বাংলা কাব্যের গর্বিত উত্তরাধিকার। এ ছাড়াও, দ্বিতীয় বিশিষ্টতাই সাদরে উল্লিখিতব্য। চর্যাপদের বাক্-প্রতিমাতে—অলংকঙ্কার-প্রসাধনে বাংলার আকাশ-মাটি-জল-বায়ুর চিরস্থায়ী আসন পাতা হোল। নদী-বহুল দেশের কাব্য-ভাবনায় নদী-সংশ্লিষ্ট শব্দই যে আধিপত্য করবে, তা বলা বাহুল্য। চর্যাপদের উপমায় উৎপ্রেক্ষায় রূপকে নদী, নৌকা, নদীর তীর, জাল, কুমির, সাঁকো, মাঝি, বৈঠা, গভীর জল, থই প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। এর সঙ্গে রয়েছে বাংলাদেশের চিরকালের কুটির, কার্পাস ফুল, গোরু, হরিণ, পাহাড়, তীর ধনুক, সোনা রূপা; এসবই বাংলার প্রাকৃতিক ও অর্থ-নৈতিক ভূগোলের চিরকালের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর সংস্কৃত কাব্যের ধার-করা অলংকার নয়, আপন প্রতিভার সৃষ্ট অলংকারে বাংলা কাব্যলক্ষ্মী সালংকারা হলেন। উপমা ও উৎপ্রেক্ষা-প্রয়োগের চিরকালের পথটি এইভাবে তৈরি হোল। বাংলা কাব্যের বাক্-প্রতিমা বা নিজস্ব অলংকার সৃষ্টির উদ্যোগ-পর্ব এইভাবে সম্পন্ন হোল।

পয়ার বাংলা কাব্যের প্রাণ-প্রবাহিণী। গঙ্গা ভারতের জীবন-নদী; পয়ার বাংলা কাব্যের জীবন-ছন্দ। চর্যাগীতিকায় সেই জীবন-ছন্দ প্রথম শোনা গেল। গীতগোবিন্দে, অপভ্রংশ ও গাথা সাহিত্যে অন্ত্যানুপ্রাস থাকলেও চর্যাগীতিকায় অন্ত্যানুপ্রাস কাব্যরচনার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রতিজ্ঞা বলে গৃহীত হোল। চর্যাগীতিকার মিল প্রয়োগ সর্বত্র নিপুণ নয়; এক অক্ষরের বা দুই অক্ষরের মিলই বেশি। ক্রিয়াপদের মিলও হামেশা দেখা যায়। চর্যার ছন্দ অধিকাংশ স্থলেই চার মাত্রামূলক; মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যে চার মাত্রা ও ছয় মাত্রামূলক ছন্দেরই প্রাচুর্য।

চর্যাপদের বক্তব্য বাস্তবের বক্ষ বিদীর্ণ করে আবির্ভূত হয়েছে। জীবনের বিষামৃতের প্রতি এমন নির্বিচার অকুণ্ঠ অনুরাগ আর আধুনিক-পূর্ব সাহিত্যে দ্বিতীয়বার উচ্চারিত হবে না। তাই এখানে ঝংকৃত হয়েছে বাংলা কাব্যের পথ চলার আধুনিক রাগিণী। বাংলার বৈষ্ণব সঙ্গীত, বাউল গান, মুসলিম মারফতী গানের মূল সুর হোল দেহকে ভিত্তি করে দেহাতীতের ভজনা; সেই ভজন-পথের পাথেয় এখান থেকেই মুঠি মুঠি যুগে যুগে সংগৃহীত হবে।

লক্ষ্মণসেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুদ্ধার ব্রতী ছিলেন, তাঁরই রাজত্বকালে

তাঁর সভাকবি জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করেন। গীতগোবিন্দকে সংস্কৃত সাহিত্যের বিশুদ্ধ ঐতিহ্যবাহী বলা চলে না। সমালোচকদের মতে গীত-গোবিন্দ প্রচলিত নিয়মের কাব্য নয় (irregular type)।[২] ভাষা বাংলা না হলেও বাংলাকাব্যের ইতিহাসে জননী-স্থানীয়া। এর কারণ প্রথমতঃ কাব্য-বিষয়। গীতগোবিন্দের বিষয়বস্তুর আগামী দিনের বাংলা কাব্যের প্রধান উপজীব্য। নাট্যশাস্ত্রের ভাষায় এখান থেকে বাংলাগীতি কাব্যের 'script' পরিবেশন করা হয়ে গেল। দ্বিতীয়তঃ, এ কাব্যের নায়িকা-কল্পনা (Conception of Ideal Woman) ও নায়ক-কল্পনা (Conception of Ideal Man) বাংলা প্রেম-কাব্যের স্থায়ী অনুকল্প হয়ে রইল। নিত্য অবসরভোগী সাংসারিক দায়-দায়িত্বহীন হৃদয়ানুভূতিতে ধনী এই যুগলমূর্তি বাংলাকাব্যে প্রতীকরূপে অবিরত ব্যবহৃত হবে। এই প্রতীক বাংলা-কাব্যের বীজ প্রতীক। তাছাড়া, নদীতীর, যমুনা, কদম্বতরু, মোহন বেণু, কালিন্দী-নদী, বরষার রাত্রি, ময়ূরপুচ্ছ—বাংলা গীতিকাব্যের নানা ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে। চতুর্থতঃ, গীতগোবিন্দের কাব্য-ভাষা বাংলাগীতি কবিতার জগতে চির অনুকরণীয়। সঙ্গীতধর্মিতা বাংলা-গীতিকাব্যেরও বৈশিষ্ট্য ; এ বৈশিষ্ট্য গীতগোবিন্দ থেকে উৎসারিত হয়েছে। গীতগোবিন্দের শব্দচয়ণ-নৈপুণ্য বিভিন্ন সমালোচক কর্তৃক প্রশংসিত। কাব্যে ভাষা শুধু বক্তব্যকে বলে দায়মুক্ত হয় না—গীতগোবিন্দ একথা প্রথম বাংলাদেশের কাব্য-রসিকদের জানিয়ে দিল। বাংলাভাষার ধ্বনি-সুষমা গীতগোবিন্দ আবিষ্কার করেনি ; কিন্তু বাংলাভাষায় চিরকাল গৃহীত হবে এমন বহু শব্দের ঝংকার জয়দেব প্রথম শুনিয়ে গেলেন, এবং এক্ষেত্রে চর্যাপদ থেকে তিনি বহুদূর অগ্রসর। তবে দুটি বিপদও থাকল—সে দুটি হোল অনুপ্রাস-যমকের আতিশয্য। বাংলা-কাব্যে এই দুইটি অলংকার ব্যক্তি-ভেদে ও যুগ-ভেদে নানা দুর্গতির কারণ হয়েছে। গীতগোবিন্দ ব্যতীত আরও নানা সংগ্রহগ্রন্থ সে যুগের গীতিকাব্য-প্রবণতার নিঃসংশয়িত স্বাক্ষর বহন করছে। বাংলা-কাব্য-পরিমণ্ডল গঠনে তাদের অবদানও কম নয়।

তুর্কী-বিজয় পরবর্তী যুগ

॥ ১ ॥

বাংলার মধ্যযুগীয় কাব্যে আখ্যায়িকাধর্মী কাব্য ও গীতিকাব্য যুগপৎ রচিত হয়েছে। তুর্কী-বিজয় আচম্বিতে ঘটেছে কিনা সে তর্ক মীমাংসার দায় ঐতিহাসিকদের। কিন্তু এই বিজয়ের ফলে বৌদ্ধ ও হিন্দুমতের সংঘর্ষ ধীরে ধীরে তলিয়ে গেল। বিদেশী শাসকের হাত ধরে আরও একটি নবীন ধর্মমত এদেশে এল। হিন্দুসমাজে রক্ষণশীল মনোবৃত্তি বড় হয়ে দেখা দিল। "As a set off against the lawlessness of the Buddhistic free thinkers, absolute obedience to the leaders of society was enforced. The Mahammadans as the new ruling race, did not interfere with the social and spiritual movements of the Hindus. Full powers thus came to be vested in the leaders of society. Without a reverence for the promulgators, Truth loses much of its force. Hence in the Puranic Renaissance the Brahmin came to the forefront, stood next to God in popular estimation. Hinduism thus became in a far greater sense than ever before, Brahmanism, or a Brahminical cult."[৩] স্বভাবতই এই পরিবেশে 'পুরাণ'-জাতীয় রচনাই আসর জাঁকিয়ে বসবে। মধ্যযুগের সাহিত্যে 'মঙ্গলকাব্য' নব্য হিন্দু-পুরাণ। দেবদেবীর গোত্র বিচারের প্রয়োজন নেই। এই কাব্য সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই রচিত। বিদেশী হামলার সম্মুখে রাজনৈতিক পরিভাষায় যাকে বলে consolidation—মঙ্গলকাব্য হোল তার সাহিত্যিক consolidation।

তুর্কী-বিজয়ের প্রথম যুগে এই সামাজিক শাসন প্রকট হয়ে ওঠার আগেই মিথিলার পিকরাজ বিদ্যাপতির আবির্ভাব। জাতে বিদ্যাপতি মৈথিলী; তাঁর ভাষাও বাংলা নয়। কিন্তু গীতগোবিন্দের মতোই এ সাহিত্য বাংলা-সাহিত্যের অচ্ছেদ্য অংশ। "তবে আমাদের একটা ভালোবাসার আধিপত্য আছে; বঙ্গ দেশের বহুদিনের অশ্রু, সুখ ও প্রেমের কথার সঙ্গে তাঁহার পদাবলী জড়িত হইয়া পড়িয়াছে।"[৪] গীতগোবিন্দের আর বিদ্যাপতির

পদাবলীতে একই প্রতীক, একই বিষয় ও একই কল্প-লোক—তবে বিশেষত্ব কোথায়? বিশেষত্ব এইখানে যে, একই বিষয় বুকের আরও নিবিড়তর ভাষায় পরিবেশিত। এই পদাবলীর বর্ণ-বিচিত্রতা অধিকতর; উপমা উৎপ্রেক্ষা যেন হর্ষবর্ধনের প্রয়াগের মেলায় অকৃপণ দানের মতো মুঠো মুঠো যত্রতত্র ছড়ান হয়েছে; গীতগোবিন্দ অপেক্ষা বাস্তবজীবনের স্পর্শেও এই পদাবলী সজীবতর, নায়িকার হাসির শব্দটুকু পর্যন্ত তিনি ধরতে পারেন (ক্ষণে ক্ষণে দশন ছটাছট হাস)। নায়িকার চক্ষুর অক্ষিগোলকের সঞ্চরণ পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না,

(চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারসি
অঞ্জন শোভয় তায়।
জনু ইন্দীবর পবনে ঠেলল
অলি ভরে উলটায়॥),

আর সাধারণ নারীর তুচ্ছ চলাফেরাটুকুকে অলংকারের চুমকি দিয়ে তিনি অনন্য করে তোলেন; আবার আত্মনিবেদনের আকুতি আশ্চর্য আন্তরিক ভাষায় বের হয়ে আসে—

সখি হে হামারি দুখক নাহি ওর
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥

সর্ব ইন্দ্রিয়ের এমন আরতি ইতিপূর্বে আর কে কবে দেখেছে? আজ আর কাহিনীর প্রয়োজন নেই; ভাগবতাশ্রয়ী বৈষ্ণব ভাবনার কাব্যিক পরিমণ্ডল তৈরি হয়ে গেছে—যেটুকু বাকি ছিল, একটির পর একটি পদ রচনা ক'রে বিদ্যাপতি তা সম্পূর্ণ করলেন।

কাহিনীবিরহিত শুদ্ধ ভাব-কেন্দ্রিক টুকরো টুকরো পদ রচনার মধ্য দিয়ে তিনি বিদেহ ভাব-বস্তুর এক অভিনব সূক্ষ্ম কাহিনী-দেহ রচনা করলেন। এই দেহ ঠিক বিবরণ-গ্রাহ্য নয়, কিন্তু অনুভব-গ্রাহ্য। এই আঙ্গিক বা রচনা-কৌশল বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে 'ব্রজাঙ্গনা' ও 'বীরাঙ্গনা' হয়ে 'মানসী' পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। গীতিকাব্য রচনার সাধারণ প্রতিজ্ঞা এই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হোল। গীতিকাব্য কাহিনী-ভিত্তিক নয়, ভাব-ভিত্তিক বা রস-ভিত্তিক।

বিষয়, ভাব ও রচনা-কৌশল বা আঙ্গিকের এবংবিধ অপূর্ব একাত্মতা কালিদাসের কাব্যসৃষ্টির পর আর দেখা যায় নি। অলংকার ভাবের আজ্ঞাবহ, কিন্তু তারও যে স্বতন্ত্র সৌন্দর্য ও চমৎকারিত্ব আছে সে কথা তিনিই প্রথম প্রমাণ করলেন। সাহিত্য নিছক ভাবনার প্রকাশ নয়, আবেগেরও মামুলী শব্দ-রূপ নয়, সহজ ও স্বভাবজাত বিষয়কে যে সুন্দরতর করে প্রকাশ করতে হবে, এবং তার জন্য যে প্রচুর বৈদগ্ধ্য ও অনুশীলনের প্রয়োজন, এই তত্ত্ব তিনি প্রমাণিত করলেন। বাংলা কাব্যে বিদ্যাপতি এক মহিমাময় আদর্শ।

॥ ২ ॥

শাস্ত্রীয় অনুশাসন যখন প্রবল প্রতাপান্বিত, সেই মুহূর্তেই নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব। সামাজিক অনুশাসনের কঠিন বন্ধন জাতির জীবনী-শক্তিকে খর্ব করে তুলেছিল।

"তবু এই বন্ধনজর্জর চিত্ত একেবারে চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। সমাজের একান্ত আত্মসংকোচনের অচৈতন্যের মধ্যেও তাহার আত্মসম্প্রসারণের উদ্বোধন চেষ্টা ক্ষণে ক্ষণে যুঝিয়াছে, ভারতবর্ষে তাহার দৃষ্টান্ত দেখিতেছি।"[৫]

"বর্ষাঋতুর মতো মানুষের সমাজে এমন একটা সময় আসে যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুররূপে বিচরণ করিতে থাকে।

চৈতন্যের পরে বাংলাদেশে সেই অবস্থা আসিয়াছিল। তখন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আর্দ্র হইয়াছিল; তাই দেশে সে সময় যেখানে যত কবির মন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল সকলেই সেই রসের বাষ্পকে ঘন করিয়া কত অপূর্ব ভাষা এবং নূতন ছন্দে কত প্রাচুর্যে এবং প্রবলতায় তাহাকে দিকে দিকে বর্ষণ করিয়াছিল। * * * মুক্তি কেবল জ্ঞানীর নহে, ভগবান কেবল শাস্ত্রের নহে, এই মন্ত্র যেমনি উচ্চারিত হইল অমনি দেশের যত পাখি সুপ্ত হইয়াছিল, সকলেই এক নিমেষে জাগরিত হইয়া গান ধরিল।"[৬]

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি বিশ্লেষণ করলে তিনটি বক্তব্য বেরিয়ে আসে—

* এই কাব্যের জন্য দেশ ও সমাজ প্রস্তুত ছিল।
* শাস্ত্রাচার অপেক্ষা হৃদয়ানুভূতি শ্রেয়ঃ—এই হোল এই আন্দোলনের সংকল্প-ধ্বনি।

* কাব্যের ভাষায় অপূর্বতা এসেছে, ছন্দে এসেছে অজস্রতা; অর্থাৎ চিরাচরিততা ও পৌনঃপুনিকতার দায়মুক্ত হয়েছে এই কাব্য।
এই কাব্যের প্রাণবেগ অত্যন্ত প্রবল।

বৈষ্ণব কাব্য-সাধনার প্রধান ফলশ্রুতি গীতিকবিতা; আর বৈষ্ণব দর্শন অভিজাত জীবন-দর্শনের উল্টা ভজন; রক্ষণশীলতার বিপরীত কোটিতে সে গুণ পরিয়েছে। দীনেশ বাবু ঠিকই বলেছেন, "বৈষ্ণব পদে স্বাধীনতার বায়ু খেলা করিতেছে।"[৭]

বৈষ্ণব গীতিকাব্যের সঙ্কীর্ণ ও ধর্মাঙ্কিত বিষয়বস্তুর জন্য কেউ কেউ এর দেশ-কালাতিশয়ত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারেন। কিন্তু মধ্যযুগের কোন সাহিত্যে ধর্ম প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেনি? বিষয়বস্তু কোন সাহিত্যে সঙ্কীর্ণ নয়? ব্যক্তিনিষ্ঠ সাহিত্যেরও মধ্যযুগের পটভূমিকায় বিকশিত হবার একটা সীমা আছে; কারণ ব্যক্তিনিষ্ঠ সাহিত্যের পরিপূর্ণ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বিকাশ ব্যক্তির সম্পূর্ণ মুক্তি ব্যতীত সম্ভব হতে পারে না। আর রেনেসাঁস ব্যতীত ব্যক্তির এই মুক্তি সম্ভব নয়। ইউরোপে ব্যক্তিনিষ্ঠ সাহিত্যের জয়যাত্রা সূচিত হোল রেনেসাঁসের পর। কেউ কেউ বাংলার বৈষ্ণব ভাব-আলোড়নকে রেনেসাঁস বলে ভুল করেছেন। কিন্তু রেনেসাঁসের প্রধান শর্ত ধর্মীয় মুক্তি—রাষ্ট্রিক ও ব্যক্তিক জীবনে।

বাংলার বৈষ্ণব ভাব-আন্দোলনে তার সুযোগ কোথায়? নিঃসন্দেহে বৈষ্ণব ভাব-আন্দোলন ব্যক্তির জীবন-পথের কয়েকটি শৃঙ্খল-অপসারণে উদ্যোগী হয়েছে, কিন্তু তবু তা রেনেসাঁস নয়। ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানব-প্রেম—এই উভয়বিধ বোধে বৈষ্ণব মুক্তি-মন্ত্রের দেহ মার্জন ঘটে নি। তা সত্ত্বেও বৈষ্ণব কবিতা অনির্বচনীয়কে বচনীয় করে তুলেছে; অর্থ যাকে প্রকাশ করতে পারে না, দ্যোতনা তাকে বহন করেছে। লৌকিক ভাষার অলৌকিক ক্ষমতা এই প্রথম স্বীকৃত হোল। প্রাকৃত ও লৌকিক রাধাকৃষ্ণ-লীলা-প্রসঙ্গ অলৌকিক ও অপ্রাকৃত লীলারসে উন্নীত হোল। চৈতন্যদেবের অলৌকিক জীবন থেকে হয়ত ইঙ্গিত গ্রহণ করেছে, কিন্তু সে তো মানুষেরই জীবন! হয়ত বৃন্দাবনের গোস্বামী মহাশয়গণ এর দার্শনিক ভিত্তি আরও মজবুত করেছেন, কিন্তু সেও তো নর-সমাজেরই আরতি! "বৈষ্ণব গীতিকবিতা বিশুদ্ধ পারমার্থিক কবিতা নয়, নিছক লৌকিক কবিতাও নয়। পারমার্থিকতা

ও লৌকিকতা দুই মিলিয়া গিয়া বৈষ্ণব গীতিকবিতা বিশুদ্ধ সাহিত্যের অমরতা অর্জন করিয়াছে। বৈষ্ণবের গান শুধু বৈষ্ণবের তরেই নয়।"[৮] বৈষ্ণব কাব্য তাই সাম্প্রদায়িক হয়েও অসাম্প্রদায়িক; যথার্থ সাহিত্যকে সব সময়েই এই প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে হয়।

বৈষ্ণব গীতিকাব্যের ঐতিহাসিক অবদান কম নয়; প্রথমতঃ প্রণয়মূলক কাব্যেরনায়ক নায়িকা প্রতীকের বিচিত্র বর্ণালী এখানে ধরা পড়েছে; নায়ক-নায়িকাকে নানা অবস্থায় নিক্ষেপ করে কবি তাদের হৃদয়-কমলকে নানা ঢেউয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ-ছাড়া কাব্যিক আঙ্গিকেও এর অবদান চিরায়ত হয়ে আছে। উপমা উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কার প্রয়োগে যে-যে বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে, তা আজও অবলম্বিত হয়। বৈষ্ণব গীতিকাব্যের উপমা উৎপ্রেক্ষা বস্তুজগত থেকে অবচয়িত হলেও তার মধ্যে এমন একটা আত্মমগ্ন তদ্‌গত ভাব আছে, যা কাব্য-বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া অসম্ভব। সেই কদম্বতরু, যমুনাতীর, পীতধড়া, ময়ূরপুচ্ছ, আর বংশীধ্বনি—বাংলার প্রণয়-মূলক কাব্যের চিরন্তন প্রসাধন-সামগ্রী। এছাড়া মনপবন, কালীদহ, মন-ভোমরা, প্রেমতরু, আঁখিপাখি, ঘনমেঘ, ভবসিন্ধু প্রভৃতি শব্দ বা যুগ্মশব্দ নানাভাবে কাব্য-দেহকে অলঙ্কৃত করেছে, অর্থের অধিক সুষমা দান করেছে। আবার শুধুমাত্র স্বরভক্তির সাহায্যে অনেক শব্দে মিষ্টত্ব আনয়ন করা হয়েছে, আজও তা পরিত্যক্ত হয়নি। উনমত, ধৈরজ, বিদগধ, বজর, (বজ্র), পরসঙ্গ (প্রসঙ্গ), মূরতি, মনমথ (মন্মথ), দীঘল, পিরীতি, নেহা, শবদ, পরকাশ, পরতীতি প্রভৃতি শব্দের মধ্যে অনেকগুলিই বাংলা কাব্যের আধুনিক যুগেও অব্যবহার্য নয়। আবার কোন কোন শব্দ নতুন আমদানী হয়ে বাংলা কাব্য-ভাষার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাড়িয়েছে—যথা নাগর, সই, হিয়া, অনুরাগ, আবেশ, অনুভব, বন্ধু, কলঙ্ক, প্রীতি বা পিরীতি, রূপ, রস, পুলক, কুলবতী, বিদগধ, বিলাস। এই শব্দগুলি আভিধানিক অর্থের অধিক সম্পদে ধনী হয়েছে; অনেকে আবার আভিধানিক অর্থ হারিয়ে ফেলেছে—যেমন বিলাস। 'বিলাস'-এর লাস্যের সঙ্গে একটু হীনতা ছিল, কিন্তু বৈষ্ণবের করস্পর্শে তার আনন্দ পবিত্রতার গঙ্গায় স্নান করেছে। প্রত্যেক বড় কাব্য-আন্দোলন এইরকম নতুন শব্দ আমদানী করে; শব্দগুলি সবসময়েই নতুন নয়, পুরাতন শব্দও নতুন তাৎপর্য পায়। বলা যেতে পারে যে, এগুলি নতুন আন্দোলনের

পরিভাষা বা Technical terms—ঐগুলি ব্যতীত সেই আন্দোলনের প্রতিপাদ্য বিষয় পরিষ্কার হ'ত না। এ কথাও ঠিক যে, বৈষ্ণব কাব্যের ভাষাকে সামাজিক ভাষা বলা চলে না। এ ভাষা আত্মগত ভাষা বা আত্মনিষ্ঠ ভাষা। এ-ভাষা সামাজিক দায়িত্ব পালন করছে না; তাই একে অসামাজিক ভাষাও বলা যেতে পারে। আর এ কবিতার বক্তব্যই কি সামাজিক? অবশ্যই না। রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গই সমাজ-বহির্ভূত জীবন থেকে গৃহীত।[৮ক] বৃন্দাবনের মহাজনেরা ভদ্রস্থ করার সাধনায় এর এক দার্শনিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, তাতে এর ভাবগত স্থূলত্ব নিশ্চয়ই কমেছে; কিন্তু বিষয়গত মূর্তি থেকে এক তিল মৃত্তিকা খসে নি। বৈষ্ণব গীতিকার দেহ ক্ষুদ্র; তাই তার বিষয়-সংক্ষিপ্তির মধ্যে রূপের বৈচিত্র্য সঞ্চার করার দায়িত্ব এসে পড়ে। ফলে ছন্দোগত বৈচিত্র্য বিপুলভাবে বেড়েছে। মঙ্গলকাব্যে বা অন্য আখ্যায়িকা-ধর্মী কাব্যে এত বৈচিত্র্যের প্রয়োজন নেই। সংস্কৃত গীতিকাব্য প্রসঙ্গে কীথ সাহেব লিখেছেন—"For the flow of epic narrative such metrical forms were wholly unsuited; on the other hand, the limited theme of love demanded variety of expressions."[৯] বৈষ্ণব গীতিকবিতা প্রসঙ্গে এই উক্তি অনায়াসে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। যৌগিক মাত্রাবৃত্ত এবং মাঝে মাঝে স্বরবৃত্ত ছন্দ বৈষ্ণব কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে। চার মাত্রা ও ছয় মাত্রার ছন্দই অধিক। তবে তিন মাত্রার ছন্দও অপ্রতুল নয়।

অবশ্য বৈষ্ণব কাব্যের মাত্রাবৃত্ত ছন্দ প্রয়োগ সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্র অনুমোদিত; বাংলা উচ্চারণের বিশুদ্ধতা রক্ষা ক'রে এ ছন্দ বিরচিত নয়। সংস্কৃত পদ্ধতিতে শব্দের ধ্বনিগুণ বিচার করা হয়েছে। যথার্থ বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের জন্ম সম্ভবপর হবে যে কবিমহাজনের লেখনীস্পর্শে, তিনি বৈষ্ণব ভাবলোকেরও সার্থকতম ধারাবাহী।

॥ ৩ ॥

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতা ও আখ্যায়িকা-ধর্মী কবিতা—দুই ধারারই সমান্তরাল যাত্রা বাধাহীন হয়েছে। আখ্যায়িকাধর্মী কাব্য

সাধারণভাবে পুরাণজাতীয় রচনা; 'মঙ্গলকাব্য' নামে পরিচিত। 'জীবনী-কাব্য' বা 'অনুবাদকাব্য'-ও মঙ্গলকাব্য জাতীয় রচনা,—রচনাশৈলী এবং কাব্য-ঔচিত্যের দিক থেকে।

সম্ভবতঃ গদ্যের প্রচলন থাকলে পদ্যের কলেবর এত ভারী হ'ত না। এগুলি পদ্যের মাধ্যমে গদ্যের অধিকার হরণ। অনেকে তাই মনে করেন যে, এই কাব্যগুলি বাংলাকাব্য-আলোচনার আসরে জবরদখলকারী, অবৈধ প্রবেশকারী—'ট্রেসপাসার'।

শুধু বিভিন্ন দেবদেবীর কৃতিত্ব নয়, মানবমাহাত্ম্যও এ কাব্যগুলিতে বর্ণিত হয়েছে। চরিত্রসৃষ্টিতে যে দক্ষতা নেই, তা নয়। তবু এগুলি যতটা পদ্য-আশ্রিত উপন্যাসজাতীয় রচনা, ততটা পদ্য-আশ্রিত গাথাকাব্য নয়। ভাষার ক্ষেত্রে অমনোযোগিতা এগুলির কাব্যমূল্য স্বীকৃতির পথে প্রধান বাধা। মঙ্গল কাব্যের ভাষা সামাজিক দায়িত্বের ভাষা; বৈষ্ণব গীতিকবিতার মত আত্মনিষ্ঠ ভাষা নয়। সামাজিক ভাষা বলেই যে সর্বত্র সৎ এবং সাধু ছিল, তাও নয়। সামাজিক ভাষাও অসামাজিক এবং অসৎ হতে পারে, যদি সমাজ বিকৃত হয়। সামাজিক ভূষণেও যৌনজীবনের ক্লেদাক্ত চিহ্ন এখানে-ওখানে লেগে থাকতে পারে। মঙ্গলকাব্য কতখানি কাব্য সে বিচারে প্রবৃত্ত হলে শুধুমাত্র তার বিচিত্র নতুন কাহিনী ও চরিত্র-সৃজনের নৈপুণ্য প্রসঙ্গ সবিস্তারে বললে চলবে না। কাব্যে ভাষা একটি প্রধান সম্পদ; শুধুমাত্র চটকদার ভাষা বা অলংকৃত ভাষা হলেই তা কাব্যের ভাষা হয় না। কাব্যের ভাষা শুধুমাত্র তথ্যকে বহন করে না, তথ্যের জন্মান্তরও ঘটায়। এক ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর আর কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলের কোন কোন অংশ ব্যতীত আর কোন মঙ্গলকাব্যই এই কৃতিত্ব দাবী করতে পারে না। তাছাড়া কাব্যে চাই মৌলিকতা—সেই মৌলিকতা আসে কবির ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে। সংস্কৃত আলংকারিকেরা যাকে বলেছেন অপূর্ব-বস্তু নির্মাণ-ক্ষম—চাই সেই প্রতিভা। পুনরাবৃত্তির যূপ-কাষ্ঠে মঙ্গলকাব্য বলিপ্রদত্ত। প্রকৃতি ও মানব—উভয় জগতের প্রতি কবির যে দৃষ্টি, তা নিতান্তই প্রথাসিদ্ধ। মধ্যযুগে বৈষ্ণবদর্শন ছিল অন্যতম দর্শন, একমাত্র দর্শন নয়। বৈষ্ণব দার্শনিকমত আচণ্ডালে কোল দিলেও ব্রাহ্মণ্য সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করেনি, সামন্ত শ্রেণীতেও এর সমর্থক সংখ্যা বেশি হয়নি। ব্রাহ্মণসন্তান চৈতন্যদেব এই আন্দোলনের নেতা, ব্রাহ্মণ অদ্বৈত প্রধান

পারিষদ; প্রধান অমাত্য রূপ-সনাতন আদি যুগের ভক্ত, জমিদারনন্দন রঘুনাথ দাস ষড়গোস্বামীর অন্যতম তবু এ ধর্ম বাংলার অব্রাহ্মণ্য সমাজের ধর্ম; বণিক ও কারুজীবী সম্প্রদায় এর প্রভাবে এসে জড়ো হয়েছিল। সুবর্ণবণিক, তাঁতি জোলা ও অন্যান্য 'নবশাখ' এই ধর্মমতকে আঁকড়ে ধরে।

সমগ্র ভারতবর্ষের পটভূমিকাতেও এই কথা সত্য। "Like the Protestant Reformation in Europe in the 16th century, there was a religious, social and literary revival. This religious revival was not Brahmanical in its orthodoxy, it was heterodox in its spirit of protest against forms and ceremonies and class distinctions based on birth, and ethical in its preference of a pure heart, and of the law of love, to all other acquired merits and good works. This religious revival was the work also of the people, of the masses, and not of the classes. At its head were the saints, prophets, poets and philosophers, who sprang chiefly from the lower orders of society—tailors, carpenters, potters, gardeners, shopkeepers, barbers, and even mahars (scavengers) more often than from Brahmins."[১০] শাক্তমত তখন প্রবল; তন্ত্রসারের লেখক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ও শাক্তানন্দতরঙ্গিনীর লেখক ব্রহ্মানন্দ গিরি চৈতন্য-যুগের লোক। বৈষ্ণব জীবনী-গ্রন্থে শাক্ত-জমিদার ও দস্যু সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে।* রাজা রামমোহন তাঁর 'A Defence of Hindu Theism' পুস্তিকায় একই কথা বলেছেন: "Debauchery, however, universally forms the principal part of the worships of her (Kali) followers."[১১]

প্রেমবিলাসে জমিদার চান্দরায়ের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

শক্তি উপাসনা সদা মৎস্য মাংস খায়।
পরস্ত্রী ঘর দ্বার লুটি লঞা যায়॥
দুর্গা মহোৎসবে পূজা করয়ে প্রতিমা।
যত জন্তু বধ করে নাহি তার সীমা॥ (যশোদা তালুকদার১৩০২, পৃ-১৫৫)

নরোত্তম বিলাসে—বারেন্দ্রভূমির জমিদার হরিশ্চন্দ্র রায়ের ক্রিয়াকলাপ বর্ণনার শেষে বলা হয়েছে—

এ দেশের লোক দস্যুকর্মে বিচক্ষণ।
না জানয়ে ধর্ম কিবা কর্ম বা কেমন। (পৃঃ—৮৯)

সামন্তনৃপতিরাই ছিলেন অধিকাংশ মঙ্গলকাব্য রচয়িতার পোষ্টা। স্বভাবতই এই জাতীয় কাব্য ব্যক্তির কামনার অভিব্যক্তি হতে পারে না; সমাজ-সম্মত বিষয়বস্তু সামাজিক প্রয়োজনেই কেবল পরিবেশিত হতে পারে। গীতিকাব্য এই বক্তব্যের বাহন নয়।

শুধু বাংলাদেশে নয়, ভক্তি আন্দোলনের জোয়ারে প্লাবিত অন্যান্য প্রদেশেও দোহা বা গীতিকবিতাই তৎকালীন সাহিত্যের প্রধান বাহন হয়েছে। দাক্ষিণাত্যে আল্বার সম্প্রদায়ের সাধন-সঙ্গীত হল দোহা; মহারাষ্ট্রের দাদু তুকারাম একনাথের 'অভঙ্গ' ঐ একই সুরে বাঁধা।[১২] উত্তরভারতের নানক, কবীর, সুরদাস, মীরাবাঈ, বিহারীলাল প্রভৃতি হলেন গীতিকবিতার অমর শিল্পী; শুধু ভক্তের নয়, সকল কাব্যামোদীর হৃদয়ে তাঁদের আসন চিরকালের জন্য পাতা।

অষ্টাদশ শতাব্দী ঃ সমাজ ও সাহিত্য

"The end of the seventeenth century reveals the Mughal empire rotten at the core. Then treasury was empty. The imperial army knew itself defeated and recoiled from its foes. The centrifugal forces were asserting themselves successfully, and the empire was even greater than the material ; the Government no longer commanded awe of its success, the public servants had lost honesty and efficiency ; ministers and princes alike lacked statesmanship and ability ; the army broke as an instrument of force."[১৩]—সর্বভারতীয় রাজনৈতিক অবস্থার এই বিশ্লেষণের সঙ্গে প্রাদেশিক অবস্থার মিল আছে। বাংলাদেশ অনুরূপভাবেই অষ্টাদশ শতকে প্রবেশ করেছে। ১৭০৫-১৭২৭ খৃষ্টাব্দ—মাত্র এই বাইশ বৎসর মুর্শিদকুলি খাঁর শাসনাধীনে বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিরতা ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর জামাতা সুজাউদ্দীন মসনদ পেলেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে সুজাউদ্দীনের পরলোকপ্রাপ্তিতে সরফরাজ খান সিংহাসনে বসলেন। এক বৎসরের মধ্যেই তাঁকে সিংহাসন হারাতে হল। আলিবর্দী ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে বাংলা দখল করলেন। তিনি প্রায় সতের বৎসরকাল রাজত্ব করেছিলেন;

কিন্তু এই সতের বছরের মধ্যেই রয়েছে বারবার মারাঠাদের বাংলা আক্রমণ; তার সঙ্গে রয়েছে শোভাসিংহের বিদ্রোহজনিত বিশৃঙ্খলা। আলিবর্দীর মৃত্যুর পর দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলাহ্ সিংহাসন পেলেন; কিন্তু এক বছরের মধ্যেই মন্দভাগ্য সরফরাজ খানের মত তাঁকেও সিংহাসন হারাতে হল; কিন্তু এবার স্বদেশবাসী ও স্বধর্মীর হাতে নয়।

এই বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে আছে তদপেক্ষা ভয়াবহ অর্থ-নৈতিক দুর্গতির ইতিহাস। রাজশক্তির সাংগঠনিক ক্ষমতা যখন ধ্বংসপ্রায়' তখন বিদেশী বণিকের বিকল্প সাংগঠনিক প্রতিভার স্ফুরণ ঘটছে ভারতের মাটিতে।

বাংলার সম্পদ কিংবদন্তীর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল; সেকালে নানাদেশের ভাগ্যান্বেষী লোককে আকর্ষণ করেছিল। ঐতিহাসিকদের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করছি:

"Bengal from the mildness of its climate, the fertility of its soil and the natural history of the Hindoos was always remarkable for commerce."[১৪].

"The trade of Bengal supplied rich cargoes for fifty and seventy ships yearly * * * * The balance of trade was against all nations in favour of Bengal, and it was the sink where gold and silver disappeared without the least prospect of return."[১৫]

সম্পদের খবর পেয়ে শুধু বিদেশী নয়, ভারতবর্ষেরও বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসী বাংলাদেশে এসে ভিড় জমাতে লাগল—কাশ্মিরী, মুলতানী, পাঠান, সেখ, সুন্নী, পগিয়া, ভুটিয়া ও অন্যান্য জাতি।[১৬]—কিন্তু বিদেশীরা যখন সংঘবদ্ধ ও গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য সুরু করে, ভারতীয়রা তখনও ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা করত। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত প্রদেশেও বিদেশীদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয়—এই ধরনের সুসংগঠিত শৃঙ্খলাপরায়ণ সংগঠন তখন আর দেশীয়দের ছিল না।

বিদেশীরা মুখেই বাণিজ্যের মন্ত্র আওড়েছে। কিন্তু বণিকী পুঁজি (merchant capital) যেরকম নিরংকুশ বাণিজ্যিক অধিকার কামনা করে, তা রাজনৈতিক অধিকার ব্যতীত করায়ত্ত করা সম্ভব নয়। বণিকী পুঁজি বা

মূলধনের চরিত্রই হচ্ছে তার আপন শ্রীবৃদ্ধি ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনে তৎপর হওয়া।

অতীত যুগের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জেমস মিল বলেছেন,

During that age the principles of public wealth were very imperfectly understood, and hardly any trade was regarded as profitable but that which was inclusive, the different nations which traded in India, all traded by way of monopoly ; and several exclusive companies treated every proposal for a participation in their traffic as a proposal for their ruin."[১৭]

এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক তাৎপর্য ব্যাখ্যাছলে জনৈক আধুনিক ঐতিহাসিক লিখেছেন, "The main concern of these merchant companies was for the maintenance of a profit margin between the price in the market of purchase and the price in the market of the sale. Obviously, for this reason they always demanded on monopolistic trade ; otherwise if they were to be subjected to unrestrained competition, what source could there be for the immense profits they reaped ? Secondly, they were not only interested in selling commodities dear by means of their monopoly rights, but also buying these commodities cheap. This necessitated substantial control over theuy bing country, so that goods could be bought at a very low price, or practically for nothing, when they were obtained by means of virtual loot and plunder. In other words, a political control over the countries they traded with was a sine qua non of the merchant companies."[১৮]

গঙ্গাতীরবর্তী ভূমিতেই প্রধানত বিদেশীদের আনাগোনা ; নানা জাতির বিলাস ও লোভের নিকেতন হয়ে উঠেছিল এই অঞ্চল।

সামাজিক বোধ

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে এই সামাজিক অবক্ষয় আরও গভীর হল। সদ্য বিজয়ী ক্লাইভ যেদিন মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করেন, সেদিনকার চিত্র দেখুন।

That the inhabitants who were spectators upon that occasion, must have amounted to some hundred thousands; and if they had an inclination to have destroyed the Europeans, they might have done it with sticks and stones."[১৯] পার্লামেণ্টারী কমিটিতে সাক্ষ্যদানকালে এই খবর শুনিয়েছেন স্বয়ং লর্ড ক্লাইভ।

এই ধরনের নির্মম নির্লিপ্ততার উদাহরণ আরও আছে। বর্গীর আক্রমণের ভয়ে গ্রামের পর গ্রাম থেকে লোকজন গৃহত্যাগ করে পালাচ্ছে অথচ প্রতিরোধ করছে না, তার এক মর্মান্তিক চিত্র "মহারাষ্ট্র পুরাণে" আছে। দেশপ্রেম বা পল্লী-প্রীতির সে এক অভিনব নিদর্শন!

শুধু বিদেশী আক্রমণের সম্মুখে বা পররাজ্য-লোলুপ দেশীয় শক্তির আক্রমণের সম্মুখে নয়, দেশের দুর্দিনে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুহূর্তে দেশের সমাজ-বোধ কিরূপ উন্নত ছিল, তার উদাহরণ দেওয়া যাক—

At Chinsurah, a woman taking her two small children in her arms, plunged in into the Ganges and drowned herself. * * * The banks of the river were covered with dying people; some of whom, unable to defend themselves, though still alive, were devoured by jackals. This happened even in the town of Chinsurah itself, where a poor sick Bengalee, who had laid himself down in the street, without any assistance being offered to him by anybody was attacked in the night by the jackals, and devoured alive; and though he had strength enough to cry out for

help, no one would leave his own abode to deliver the poor wretch, who was found in the morning dead and half-devoured."[২০]

আর একজন বিদেশী মন্বন্তরের মর্মন্তুদ বর্ণনা দিয়েছেন, তবে তিনি স্বয়ং শাসক গোষ্ঠীর লোক। স্যার জন শোরের কবিতাটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা গেল—

Still fresh in memory's eye the scene I view
The shrivell'd limbs, sunk eyes, and lifeless hue,
Still hear the mothers' shrieks and infants' moans
Cries of despair and agonising moans.
In wild confusion dead and dying lie ;
Hark to the jackals' yell and vultures' cry,
The dogs' full howl, amidst the glare day,
The riot unmolested on their prey !
Dire scenes of horror which no pen can trace
Nor rolling years from memory's page efface.[২১]

সেদিনকার এই হল সামাজিক মমত্ববোধ! শুধু ছিল স্মৃতির অনুশাসন, সামাজিক বিধিনিষেধের বেড়াজাল। এতদিনকার সহজাত ধর্মবোধের উপর ভিত্তি করে নানাবিধ বিকৃত আত্মনিগ্রহপরায়ণ আচার অনুষ্ঠান প্রচলিত হয়েছিল।

সহমরণ, অন্তর্জলি, নরবলি—এগুলির ভয়াবহতা আর বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। এ ছাড়া ছিল গঙ্গাসাগরে সন্তাননিক্ষেপ, অধিক সন্তানের আশায়, মায়ের বন্ধ্যাত্ব ঘুচাবার কামনায় সন্তান মানত—এগুলি মাতৃত্বের পক্ষে যে কত বড় লাঞ্ছনা তা কি আর ব্যাখ্যা করে বলতে হবে? নারী-বিক্রয়, বেশ্যা-বৃত্তির আধিক্য, দাস-বিক্রয় প্রভৃতি মর্মান্তিক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক কারণেই ব্যাপক হারে চলেছিল।[২২]

কৌলীন্যপ্রথা ব্রাহ্মণসমাজের রক্ত শোষণ করেছিল: বহুবিবাহপ্রথা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ উভয় সমাজের এক বড় অংশের মধ্যে দুর্নীতির বান ডাকিয়েছিল। 'সংবাদপত্রের সেকালের কথা'য় এর ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে।[২৩]

ভক্তি ও সম্ভ্রমের কেন্দ্র হল—গঙ্গা, ব্রাহ্মণ, তুলসীপত্র, বিল্বপত্র, তীর্থক্ষেত্র (নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, শ্রীক্ষেত্র, গয়া, কাশী); গুরু ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর দেবতা ও মোহান্ত মহারাজেরা। পদধৌত উদক, পদধূলি ও গোচোনা ও গোবিষ্ঠা—পবিত্র ও সম্মানিত বলে পরিগণিত হল। মানুষই সর্বাপেক্ষা হতমূল্য।

এই অবক্ষয় আরও ঘনীভূত হোল দুটি কারণে: (১) এতদিন যে অভিজাত শ্রেণী বঙ্গদেশের নেতৃস্থানীয় ছিল, তাদের দিনাবসান ঘোষিত হোল। নাটোর, দিনাজপুর, পুঁটিয়ার জমিদারী-হ্রাস বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাসে কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়।[২৪] এঁদের জমিদারী নতুন এক ধনী সম্প্রদায় কিনে নিতে লাগলেন; এঁরা ইংরেজ বণিকের লুণ্ঠন-যজ্ঞের ঋত্বিক হিসাবে অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ থেকে এঁদের আসন মজবুত হোল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে পুরাতন অভিজাত বংশীয়দের মধ্যে তাঁদেরই সম্পত্তি হ্রাস পাচ্ছিল, যাঁরা নতুন নগর-সভ্যতার এক্তিয়ার-বহির্ভূত এলাকায় বাস করতেন। নতুন যুগের বৈষয়িক জীবনে অভিজাত হলেন ইংরেজ বা ফরাসী বা ডাচ কুঠির 'বেনিয়ান' মুৎসুদ্দির দল। জমিদার রূপেও এঁরা হয়ে উঠলেন সংস্কৃতি ও সমাজের ধারক। এই নতুন সমাজপতিরাই আবার কবি ও গায়কদের হলেন পোষ্টা—"ঘুড়ী তুড়ী জস দান আখড়া বুলবুলি মনিয়া গান। অষ্টাহে বনভোজন এই নবধা বাবুর লক্ষণ।"[২৫]

"বিষয় সম্পত্তির লাভের আশ্বাসের সহিত আমোদ-সম্ভোগ এবং সুখ্যাতির আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদিগের ধর্মপ্রবৃত্তির প্রধান সূত্র, নতুবা প্রতিমা অর্চনাতে নৃত্যগীত গৃহসজ্জা প্রভৃতির জন্য বিশেষ মনোযোগী হইয়া প্রচুর অর্থব্যয় অনেকে কেন করেন? * * * যিনি পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে পঞ্চাশৎ সহস্র টাকা একদিনে ব্যয় করিয়া থাকেন, তিনি সেই পুত্রের অধ্যয়ন হেতু মাসিক পাঁচ টাকাও প্রদান করিতে ক্লেশ বোধ করেন।[২৬]

"ধনী হইলেই যে লোকে পুণ্যবান হয়, তাহা নয়। দেখ, অনেক বড় মানুষ মিথ্যাবাদী, জুয়াচোর। প্রায় সকলেই মদখোর, বেশ্যাসক্ত। ইহারা মরিলে ইহাদের শ্রাদ্ধে বড় ঘটা হইবেক। শ্রাদ্ধের জোরে ইহারা কখন স্বর্গে যাইতে পারিবেক না, কারণ ইহারা স্বর্গে গেলে স্বর্গ জুয়াচোর মাতালে পরিপূর্ণ হইবেক, এমন স্থান ভদ্রলোকের বাসযোগ্য না।…… …… ধনী হউক

আর নির্ধন হউক, তিনি (ঈশ্বর) পাপীকে দণ্ড করেন, কেবল পুণ্যবানকে স্বর্গে যাইতে দেন।”[২৭]

এই হাওয়া অনেকদিন যাবত চলেছিল—এবং সমাজের মুখ্য অঞ্চল জুড়ে চলেছিল। ১৭৬৭ শকাব্দের ১লা আশ্বিন সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই দূষিত পরিবেশ দেখে লেখা হয়েছে—

“অধুনা কলিকাতা লম্পট বিদ্যা শিক্ষার পাঠশালা স্বরূপ হইয়াছে।”[২৮]

(২) ব্রাহ্মণ ও মৌলবীরাই ছিলেন সমাজের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। ব্রাহ্মণেরা বহুকাল যাবৎ স্মৃতি ও নব্যন্যায়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিতর্কে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ফলে তাঁরা হৃদয়ের ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলেন, চিত্তের উদারতা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। এঁরা পুরাতন পোষ্টার আশ্রয় ত্যাগ করে দলে দলে গুড়ের গন্ধে আকৃষ্ট পিপীলিকার মত কলকাতায় এসে জমা হলেন।

“এই দীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বিদ্যা উপার্জন করিয়া পরিবারদিগের উদর ভরণ পোষণার্থে কিঞ্চিত কিঞ্চিত অর্থাকাজ্ক্ষী হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। অন্যান্য ব্যবসায় কিছুই জানেন না, কেবল সব লোকের নিকট যাতায়াত করেন, দশ বার বার গিয়া আশীর্বাদ করিয়া থাকেন, তাহাতে বাবুর কিছুই মনোযোগ হয় না, তবে কি করিবেন বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে বাবু নিতান্ত বিজ্ঞাভিমানী অতএব ইহাকে বিজ্ঞ বলিলে অধিক সন্তুষ্ট থাকেন এই হেতু কেহ ২ চতুরতা করিয়া দুইজনে ঐক্য হইয়া ন্যায় দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের কোন বচনের উপর দোষ দিয়া তদুদ্ধার নিমিত্ত বাবুকে তাহার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করেন সেই বাবু তাহাদিগের চতুরতা বিবেচনা না করিয়া আপন বুদ্ধ্যনুসারে একটা কোন কথা কহেন, পণ্ডিত মহাশয়রা সেই কথায় তাঁহাকে সাধুবাদ করত অনেক প্রশংসা করেন বাবুজী তাহাতেই তুষ্ট হইয়া কিছু ২ দেন ইহাতেই কাল যাপন করিতেছেন অতএব তাঁহাদিগের উপর কোন দোষ হইতে পারে না।[২৯]

“যাঁহারা ব্রাহ্মণত্ব ও পাণ্ডিত্য লইয়া দম্ভ করেন, অনাহূত অনাদৃত, তিরস্কৃত হইলেও ধনিদিগের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করা তাঁহাদিগের প্রাতঃকৃত্য হইয়াছে, এবং ধনিদিগেরই উপাসনা আন্তরিক ধর্মানুষ্ঠান হইয়াছে।[৩০]

এ সমালোচনা নির্মম হতে পারে, কিন্তু সত্য। উদরান্ন সংস্থানের জন্য ব্রাহ্মণের এই অধোগতি সামাজিক বৈষয়িক সঙ্কটের প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ

করে। আর অভিজাত মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই মুর্শিদাবাদের পতনের পর উত্তর ভারতের বিভিন্ন শহরে চলে গিয়েছিলেন ; কেউ কেউ সুদূর পারস্য পর্যন্ত পাড়ি জমিয়েছিলেন—

"The greater part of the nobles have gone to Delhi or have returned to Persia from Murshidabad after the fall of Nawab."[৩১]

সাহিত্যের অবক্ষয়

॥ ১ ॥

অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে বৈষ্ণব সাহিত্যের অঙ্গনে মোহান্ত জীবনী ও কড়চা জাতীয় নিবন্ধ বা তত্ত্বমূলক রচনা প্রাধান্য লাভ করে। এ ছাড়া পূর্বতন সাহিত্যের অনুবর্তন তো ছিলই।

বৈষ্ণব পদাবলীর দার্শনিক ভিত্তি চিড় খেয়েছে তখন। "সহজ মতে"র নামাবলী পরে নানাবিধ বিকৃতির আনাগোনা শুরু হয়েছে।

একদামধুর ব্রজবুলি অধিকতর কৃত্রিম হয়ে পড়েছে ; তার ভাষাগত অভিনবত্ব আজ চোখে পড়ছে না, ভাবগত দৈন্যও প্রকট হয়ে পড়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা ক্রমশঃ জীবনের অন্তরঙ্গতা থেকে দূরে স'রে গিয়ে কাব্যিক কসরত বা কৌশলে পরিণত হচ্ছিল। অথচ পদাবলীর ভাষা আত্মনিষ্ঠ ; দুঃখের বিষয় সেদিন এই নিষ্ঠা আত্ম থেকে স'রে গিয়ে প্রথা বা ভঙ্গির উপর ভর করছিল।

অত্যধিক পরিমাণে হিন্দী শব্দ আমদানী ক'রে হিন্দীর সঙ্গে সংস্কৃত ও বাংলা মিশিয়ে এক অভিনব অবাস্তব উৎকট কৃত্রিম মিশ্র ভাষার উদ্ভব ঘটান হচ্ছিল। এই সময়ে 'ভাট সাহিত্য' নামে যে নতুন সাহিত্য গজাচ্ছিল, তার প্রকৃতি ছিল এই প্রকার।[৩২]

এইভাবে সেদিন বাংলা গীতি-সাহিত্যের স্বাভাবিক বিকাশের পথ আগাছায় ভরে উঠছিল।

মঙ্গলকাব্য শাখায় এযুগে 'ধর্মমঙ্গল' ও 'অন্নদামঙ্গল' বিশেষ জনপ্রিয়তা

লাভ করে—একটি রাঢ়অঞ্চলে, অপরটি কলকাতার আশেপাশে গঙ্গাতীরবর্তী এলাকায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সাহিত্যে মুখ্য অংশ জুড়ে রয়েছে গঙ্গাতীর-বর্তী এলাকার সাহিত্য। তার অর্থ এই নয় যে, অন্য অঞ্চলের সাহিত্য রচনার স্রোত শুকিয়ে গিয়েছে। বরং রচনার প্রাচুর্য আদৌ কমে নি।

তবে সেদিন নতুন নতুন কাব্যিক 'ফর্ম' এই গঙ্গাতীরস্থ এলাকাতেই দেখা দিচ্ছে। সেই সাহিত্যই হচ্ছে তখনকার প্রধান সাহিত্য আন্দোলন।

বিদ্যাসুন্দর কাব্যের কাহিনীর মূল অতীত যুগে অনুসন্ধানলভ্য; কিন্তু এই যুগেই তার ডাল পালায় ফুল ফোটে। অনুকূল পরিবেশই তার হেতু।

ভারতচন্দ্র হলেন হুগলির বাসিন্দা; জীবনের কিছু অংশ কেটেছে গঙ্গাতীরবর্তী চন্দননগরে, ও গঙ্গার নিকটবর্তী কৃষ্ণনগরে। তাঁর রুচি ও সাহিত্যবোধ গঠনের পিছনে রয়েছে এই দুটি নগরের নাগরালি। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে প্রকাশিত কৈলাসচন্দ্র ঘোষের "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস" (১২৯১ বঙ্গাব্দ) নামক গ্রন্থে বলা হয়েছিল যে, ভারতচন্দ্রের রুচিবিকৃতির জন্য শুধু কৃষ্ণনগরের রাজসভা, বা বর্ধমানের রাজকারাগারই দায়ী নয়, বিদেশী বণিকের বিলাসপুষ্ট গঙ্গাতীরবর্তী এলাকার উচ্ছল জীবনের প্রভাব খুব তুচ্ছ নয়। তৎকালের ইংরেজ বা দিনেমার বা ফরাসী বণিকেরা আদৌ পূত চরিত্রের লোক ছিলেন না।

"Christianity was looked upon by the natives of Hindoosthan only as another name for irreligion and immorality."[৩৩]

"Europeans gave little time to study; hours of liesure are devoted to idleness and bodily indulgences."[৩৪]

ভারতীয়দের মত তাঁরাও অসংখ্য দাস-দাসী রাখতেন; এবং দশ জনের আহার্য একজনে খেতেন বা নষ্ট করতেন। সাংস্কৃতিক দিক থেকেও তাঁরা ছিলেন খুবই দরিদ্র। জীবন-উপভোগ বলতে তাঁরা স্থূল ব্যাপার বুঝতেন।

লেখাপড়া, জ্ঞান-চর্চার তাঁরা ধার ধারতেন না। তাঁদের মধ্যে যাঁদের সামান্যতম জ্ঞান-স্পৃহা ছিল, তাঁদেরও বইএর অভাবে পীড়িত হতে হোত। শুধু বৌএর সন্ধানে জাহাজঘাটায় দাঁড়াতেন না, নতুন বইএর জন্যও জাহাজ-ঘাটায় দাঁড়াতেন। তবে এঁদের সংখ্যা খুব কম। এঁদের অনেকে আবার দেশীয় বিদ্যাচর্চায় মনোযোগী হলেন। ভারত-বিদ্যার চর্চা এই ভাবে সুরু হয়। কেউ কেউ হিন্দুমতে পূজা-অর্চনাও করতেন। "সেকালের সাহেবরা অর্ধেক হিন্দু ছিলেন।"[৩৫]

বিদেশী পর্যটকেরা বিদ্রূপ করে এঁদের "Brahminised" বলেছেন।[৩৫ক]

ধীরে ধীরে পরিবর্তন দেখা দিল।

"We may date the rapid and substantial improvement in the social condition of the English in India from the the Marquis of Cornwallis. Clive and Hastings brought with them to India no settled principle......Cornwallis brought with him to India all the finest characteristics of a highly-minded English noble man."[৩৬]

১৮২৫-৩০ সালের পর থেকে অবস্থার আরও পরিবর্তন ঘটল। "Steam has done much to bring about this intellectual revolution. We are no longer isolated savages."[৩৭]

"Now books are as plentiful in Calcutta......as they are in any town of England."[৩৮]

আর ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে সুয়েজখাল খননের ফলে অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটল; ইউরোপের সঙ্গে দূরত্ব প্রচুর পরিমাণে হ্রাস পেল।

কিন্তু এসব হল পরবর্তীকালের ঘটনা।

ভারতচন্দ্রের যুগের অবক্ষয়ের সমগ্র কারণ ভারতীয় সমাজের অধোগতি নয়। বিদেশী বণিকের প্রভাবও আছে।

গৃহগমনোৎসুক সুন্দরকে আরও কিছুদিন ধরে রাখবার জন্য বিদ্যা লোভ দেখিয়ে বলেছিল—

"নদে শান্তিপুর হতে খেঁড়ু আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব॥

বুঝা গেল থেঁড়ু বর্ধমানের সামগ্রী নয়, এবং খুব আধুনিক সঙ্গীত-রীতি। এই পরিবেশে কোন সৎ ও মহৎ কাব্য সৃষ্টি হতে পারে না। এ যুগেও ভারতচন্দ্র যে ভাষার অপূর্ব তাজমহল সৃজনে সক্ষম হয়েছিলেন, সে তাঁর অসাধারণ প্রতিভাহেতু। ভাষার যে অতুল ঐশ্বর্য, চরিত্রসৃষ্টিতে যে মুন্সীয়ানা তাঁর অধিগত হয়েছিল, তা যেন আঠার শতকের সামাজিক রিক্ততার এক বিপরীত উত্তর।

ভারতচন্দ্র অভিজাত শিল্পী ; তাঁর সৃষ্টির সর্বত্র অনুশীলন ও বৈদগ্ধ্যের ছাপ। এখানে তাঁর জুড়ি কেবল বিদ্যাপতি ; গোবিন্দদাস কবিরাজে এই প্রবণতা থাকলেও সার্থকতার বিচারে অনেকাংশে অধোমুখ। ভারতচন্দ্রের ভাষা ও ছন্দের কুশলতা পৃথকভাবে আলোচনার বিষয়। সংস্কৃত ছন্দের সার্থক বঙ্গীয়করণই তাঁর একমাত্র সফলতা নয় ; বরং মুখ্য সফলতা প্রচলিত পয়ারের পুষ্টিসাধনের মধ্যেই নিহিত।

যৌগিক ছন্দের 'শোষণ শক্তি' সর্বজনবিদিত। যুক্তাক্ষরকে অবলীলাক্রমে বহন করার ক্ষমতা এ ছন্দের প্রভূত। এর ফলে পয়ার বহুকালযাবৎ তৎসম শব্দ ও সমাস-সন্ধি-কণ্টকিত শব্দের ভারে জবুথবু ছিল। ভারতচন্দ্র এই পয়ারের বুক থেকে সমাস-সন্ধির কণ্টকনিচয় উৎপাটন ক'রে তদস্থলে বাংলা বুলির (idiom) প্রচুর প্রয়োগে পয়ারের গোত্রান্তর সাধন করলেন। মুখের বুলির সমস্ত বৈচিত্র্য এখন থেকে পয়ারের দেহপটে ধরা পড়ল। পয়ারের নমনীয়তা (plasticity) অসম্ভব পরিমাণে বেড়ে গেল। সুর ক'রে না পড়লে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এতদিন পয়ারের মাত্রা রক্ষিত হত না। আজ সে দায় থেকে পয়ার স্বাধীন হল। এই কারণেই সমালোচকপ্রবর মোহিতলাল মজুমদার বলেছিলেন, ভারতচন্দ্রই বাংলা কাব্যকে সাঙ্গীতিকতার দায় থেকে মুক্তি দিলেন।[৩৮ক]

ভারতচন্দ্রের হাতে বাক্য ছন্দের দাসত্ব করেনি, ছন্দ বাক্যের প্রতাপে গ'ড়ে উঠেছে। পূর্ববর্তী কবিদের হাতে বাক্য কোনক্রমে ছন্দের অভ্যন্তরে একটু স্থান সংগ্রহ করে নিত। ভারতচন্দ্র পয়ারের ক্ষুদ্র আয়তন সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সংস্কৃত শব্দ ও সন্ধি-সমাসের শরণাপন্ন যে তিনি হন নি, তারও কারণ এই।

মোহিতলালের ভাষায় "তিনি বাংলাভাষাকেই চাঁছিয়া ছুলিয়া বাহুল্যবর্জিত করিয়াছেন।"[৩৮খ] ভারতচন্দ্রের হাতে ভাষার ধ্বনি ঐশ্বর্যকে ছন্দ অঙ্গীকার

করতে পারেনি। ভারতচন্দ্রের ছন্দে যথাস্থানে বর্ণের হসন্ত উচ্চারণ না মেনে উপায় নেই ; ভাষার চাপে ছন্দ দোরস্ত হয়ে উঠেছে। এ ভাষা কৃত্রিম ভাষা নয়, চল্‌তি ভাষা। কবীরের ভাষার অসামান্যতা বর্ণনাপ্রসঙ্গে কবীরশিষ্য রজ্জব বলেছিলেন, "সংস্কৃত কূপজল, কবীরা ভাষা বহতা নীর।" ব্রজবুলির ভাষা কূপজল, আর ভারতচন্দ্রের ভাষা 'বহতা নীর'। ভারতচন্দ্র বলেছিলেন, "অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল"। কারণ তিনি জানতেন,

"যে হোক সে হোক ভাষা কাব্য রস লয়ে।"

ভারতচন্দ্রের এই নবীন কৃতিত্ব কবিওয়ালাদের উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক কাব্যচর্চার ঢক্কা নিনাদে বেশিদিন টিকল না। বাংলা কাব্য আবার তার পুরাতন অভ্যাসে ফিরে এলো। পয়ার তখন আবার পূর্বের মত সুরের হাত ধরে আপন চরণের সংকীর্ণতা সংশোধনে ব্যস্ত হোল।

॥ ৩ ॥

বৈষ্ণবদের মোহান্ত-স্তুতিমূলক গ্রন্থে শাক্ত মতালম্বীদের দস্যু বলে উপহাস করা হোল, এবং তার আরাধ্যা দেবীকে দস্যুর দেবী বলা হোল। অথচ অষ্টাদশ শতকের সেই রাষ্ট্রিক দুর্যোগে চোর-ডাকাতের হামলা ও অন্যান্য গোলযোগ ও অনিয়মের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য চোরের আরাধ্যা দেবী কালীই হলেন 'কৈবল্যদায়িনী'। "The Thugs were reported to be devotees of Goddess Kali."[৩৯]

রামমোহন রায়ও একই কথা বলেছিলেন : "Debauchery, however, universally forms the principal part of the worship of her (Kali) followers."[৪০] বাংলার সেই দুর্দিনে সমাজবিরোধীদের শুভ পুণ্যাহ।

অসহায় মানুষ ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য রাষ্ট্রশক্তির আশ্রয় পাচ্ছে না বলেই সে তার স্বীয় পরিচিত ভাব-জগত থেকে অধ্যাত্ম-শক্তির কল্পনা করছে ; যে শক্তির রূপ এই দুর্দিনের ন্যায়-ই ভয়াবহ, মসীময়ী।[৪১] সেই দেবীকে 'মা' বলে ডেকে ভক্ত নিশ্চিন্ত হোল—সংঘ বা সম্প্রদায়ের উদ্দিষ্টা নন তিনি, তিনি ভক্তের ব্যক্তিগত আরাধ্যা। শাক্ত পদাবলীর মধ্যে একটা ঐকান্তিকতার

সুর আছে, সেই ঐকান্তিকতা সমসাময়িক অসহায় অবস্থা থেকে উপজাত হয়েছে।

এতদিন যা ছিল একান্তই আখ্যায়িকা কাব্যের বিষয়, তা আজ গীতি-কবিতার শত কুসুমে প্রস্ফুটিত হোল। অবশ্য সে কুসুম শ্বেত শেফালিকা নয়, রক্তজবা। ভাষায়ও সেই রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার পরিচয় ফিন্‌কি দিয়ে উঠেছে। খড়্গ, অমানিশা, নরমুণ্ড, খপ্পর, শিবা, প্রেত, ডাকিনী, যোগিনী, রক্তকমল, রক্তজবা, মদ, উলঙ্গ নৃত্য, এলোকেশ—সবই ভয়ানক রসের শব্দ; জীবনের প্রাত্যহিকতার অতীত জগতের শব্দ সম্পদ। আর একদিকে রয়েছে কুলো, ঢেঁকি, বলদ, ক্ষেত, আবাদ, ফসল, ঘানি, চাষের বিবিধ সরঞ্জাম, তৈজসপত্র, দলিল, দস্তাবেজ, মামলা, মোকদ্দমা, ডিগ্রী, শমন, ফরমান, সাক্ষী, তহশীলদার, চোর, ডাকাত, ঠ্যাঙারে প্রভৃতি নিত্যদিনের সদাব্যবহৃত শব্দ। শব্দগুলির মধ্যে একটা রিক্ততা ও শূন্যতার হাওয়া খেলা করছে। জীবন-জ্বালার এমন অভিব্যক্তি প্রাক্-আধুনিক কাব্যে আর দ্বিতীয়বার দেখা যায় নি। ছন্দও প্রচলিত পথ পরিত্যাগে ব্যস্ত। মাত্রাবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত—বাংলা বা সংস্কৃত—কোনটিই নয়, একেবারে স্বরবৃত্ত বা লৌকিক বা ছড়ার ছন্দ এর প্রধান সম্বল। রামপ্রসাদের ছন্দ আজও অনুকরণের ও প্রবর্ধনের অপেক্ষা রাখে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-চর্চার প্রথম ও শেষ পর্যায়ে এই ছন্দ-অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছিল।[৪২] উপমা-উৎপ্রেক্ষাগুলিতেও এই নিঃস্বতার গৈরিক রং বা ধূসর আভা লেগেছে। অলংকার যা দেহে শোভমান, তাও রুদ্রাক্ষ মালা, শ্মশানের ছাই আর বিষধর সর্প। কিন্তু এই চিত্রই সবটুকু নয়। এর উল্টা দিকে রয়েছে গার্হস্থ্য-জীবনের অপরূপ মাধুরী। তখনকার বঞ্চনাময় জীবনে সহজ শান্তসম্মিত জীবনের যতটুকু সৌরভ অবশিষ্ট ছিল, তাই দিয়ে এদিকে এর অঙ্গরাগ!

"চণ্ডী ক্রমে যখন ভক্তিতে ও রসে মধুর হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন তাহা মঙ্গলকাব্য ত্যাগ করিয়া খণ্ড গীতে উৎসারিত হইল।"[৪৩] "মঙ্গলকাব্য ত্যাগ করিয়া" এই বাক্যাংশটির তলায় আমরা দাগ দিয়ে রাখলাম। মঙ্গলকাব্য সমাজ-সত্যকে প্রকাশ করেছে। সেখানে ব্যক্তির আনন্দ-বেদনাবোধের স্ফূর্তির মঞ্চ নাই। ভক্তির উৎস চিরদিনই ব্যক্তির বক্ষ, সমাজের মুণ্ড নয়।

বৈষ্ণব পদাবলীর যশোদা-কেন্দ্রিক গার্হস্থ্য-সুধারস শাক্তকাব্যেও স্থান খুঁজে পেল। পিতৃগৃহ-গমনেচ্ছু বালিকা বধূর হৃদয় আকুতি বিন্দু বিন্দু অশ্রুর

নিবেদনে ঝ'রে পড়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী ধারণের পূর্বে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারের তুচ্ছ সাধ-আহ্লাদ এর অপেক্ষা অধিকতর সহানুভূতির সঙ্গে আর বুঝি বর্ণিত হয় নি!

শাক্ত পদাবলীতে আদর্শ নারী-কল্পনায় (Conception of Ideal Woman) এখন আর নায়িকা বা প্রেমিকামূর্তির স্থান নাই। এখন নারী শুধু জননী আর কন্যা। জননীও একান্তই পালয়িত্রী ও রক্ষায়িত্রী। আর কন্যা নিতান্তই গৃহপ্রত্যাগমনেচ্ছু বালিকাবধূ। সম্ভবতঃ মহাকালের সেই তাণ্ডব নৃত্যের আসরে প্রেমিক-প্রেমিকার মৃদু কাকলির স্থান আর ছিল না। তাই শাক্ত পদাবলীতে নায়িকা পলাতক; আখ্যায়িকাধর্মী কাব্যে সুন্দর যদিও বা তাকে খুঁজে পেয়েছিল, তাও সুড়ঙ্গ খুঁড়ে—সে সুড়ঙ্গ নিঃসন্দেহে শালীনতার সুড়ঙ্গ নয়।

কবিসঙ্গীত

॥ ৪ ॥

এযুগের সাহিত্যে নানা ধারাই প্রবাহমান ছিল; পুরানা ধারা কোনমতে টিকে ছিল; নতুন ধারার মধ্যে ভারত-অনুবর্তী 'দূতী'কাব্য এবং কবিগানই প্রবল। 'দূতী'কাব্য অপেক্ষা কবিগানেরই সাহিত্যিক ও সামাজিক মূল্য অধিকতর।

কবিগান সম্পূর্ণভাবে নতুন নাগর-সভ্যতার ফসল এবং প্রধান ফসল।

"ইংরেজের নতুন সৃষ্ট রাজধানীতে রাজসভা ছিল না, পুরানা আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ রাজার সভার উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্য-রস-আলোচনার অবসর, যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয়জনের ছিল? তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিক-সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না।

কবির দল তাহাদের সেই অভাব পূরণ করিতে আসরে অবতীর্ণ হইল। তাহারা পূর্ববর্তী গুণীদের গানে অনেক পরিমাণে জল এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে

চটক মিশাইয়া, তাহাদের ছন্দোবদ্ধ সৌন্দর্য ভাঙ্গিয়া, নিতান্ত সুলভ করিয়া দিয়া, অত্যন্ত লঘুসুরে উচ্চৈঃস্বরে চারিজোড়া ঢোল ও চারিখানা কাঁসি সহযোগে সদলে সবলে চীৎকার করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। কেবল গান শুনিবার ও ভাবরস সম্ভোগ করিবার যে সুখ তাহাতেই তখনকার সভ্যগণ সন্তুষ্ট ছিলেন না—তাহার মধ্যে লড়াই এবং হারজিতের উত্তেজনা থাকা আবশ্যক ছিল। সরস্বতীর বীণার তারেও ঝন্ ঝন্ শব্দে ঝংকার দিতে হইবে আবার বীণার কাষ্ঠদণ্ড লইয়াও ঠক্‌ঠক্ শব্দে লাঠি খেলিতে হইবে। নূতন হঠাৎ রাজার মনোরঞ্জনার্থে এই এক অপূর্ব নূতন ব্যাপারের সৃষ্টি হইল।"[৪৪] এখানকার বিশ্লেষণের সঙ্গে মোটামুটি আমরা একমত। শুধু একটি বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি" ;—বস্তুতঃ কবিগানের পোষ্টা ছিলেন সর্বসাধারণ নয়, অতি অসাধারণ ব্যক্তিরা, আলংকারিক রাজা নয়, যথার্থ 'রাজন্যবর্গ।'

"পূর্বকার অতি প্রধান প্রধান মহিমান্বিত অর্থাৎ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর, নবকৃষ্ণ বাহাদুর প্রভৃতি উচ্চ লোকেরা এবম্ভূত অদ্ভুত স-কার ব-কারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন, আমোদের পরিসীমা থাকিত না। জ্ঞাতি-কুটুম্ব, স্বজন, সজ্জন, পরিজনে পরিবেষ্টিত হইয়া গদগদ চিত্তে শ্রবণ করিতেন।"[৪৫]

"মহারাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর বিস্তর অনুরোধ করেন। তাহাতে সম্মত না হইয়া এই উত্তর করিলেন যে মহাশয়ের পিতার নিকট আমি লজ্জাশূন্য হইয়া যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছি আপনার নিকট কদাচ সে প্রকার করিতে পারিব না।"[৪৬] এর পর সম্ভবতঃ আর বিতর্কের অবকাশ থাকবে না। জনসাধারণ তার প্রাকৃত বুদ্ধি ও রুচি নিয়ে এই প্রভাবের অধীন হবে, তাতে আর বিচিত্র কি? শুধু কি সঙ্গীতে? নাটকেও একইরকম রুচি বিকৃতি। তখন সং-এর ছিল আধিপত্য। শুধু কালুয়া-ভুলুয়া বা মেথরাণীর সং নয়, নলরাজা, দময়ন্তী, এমন কি হংসদূতকে নিয়ে পর্যন্ত সং হত। লেবেডেফ তাঁর নাট্য প্রযোজনার মুহূর্তে এই অবস্থা পর্যালোচনা করেছিলেন; তাঁর 'A Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন,··· "having observed that the Indians preferred mimicry and drollery to plain grave solid sense, however purely expressed

—I therefore fixed on those plays and which are most pleasantly filled up with a group of watchmen, chokey-dars, savoyards, canera, thieves, ghoonias, lawyers, gumostas; and amongst the rest a corps of petty plunderers."[৪৭]

কবিগণের রচনাপদ্ধতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মত নির্মম হলেও সত্য। কবিগানের ছন্দোবদ্ধতার অবসান কাব্যের ক্ষেত্রে এক দুর্ঘটনা। কারণ পরবর্তী কাব্যের ছন্দ-শিথিলতার পক্ষে এ অন্যতম প্রশ্রয় হয়ে থাকল।

নিধুবাবুর গান রচনাপদ্ধতি নিম্নরূপ: "ভাবের উদয় মাত্রেই মুখ হইতে স্বভাবতঃ যে সকল কথা নির্গত হইত ইনি তাহাই সুর ও রাগ যুক্ত করিয়া গান করিতেন।"[৪৮] অন্যান্য কবিগান রচয়িতাদের পদ্ধতিও অনুরূপ। "যদিও এই কবিতায় ছন্দের ও মিলের বিস্তর দোষ আছে, এবং লিঙ্গ ঘটিত উক্তির দোষ দৃষ্ট হইতেছে, এ দোষ যথার্থই দোষ বটে, তাহা স্বীকার করিব। কিন্তু যাঁহারা পদাবলী রচনা করেন, তাঁহারা ছন্দ ও মিলের দোষ ধর্তব্য করেন না। সুতরাং এই দোষেই আর আর দোষ ঘটিয়া থাকে।"[৪৯]

"আমরা যে সকল গীত প্রকাশ করিতেছি, তাহার লেখার দোষ কেহ ধর্তব্য করিবেন না। কারণ গানের সুর যেরূপ তদনুসারে লিপিবদ্ধ করিতে হয়। নচেৎ কোন মতেই গাহনা করা যাইতে পারে না। পয়ার, ত্রিপদীর যেরূপ নিয়ম, গীতের নিয়ম তদ্রূপ নহে। সুরানুযায়ী উচ্চারণ এবং উচ্চারণানুযায়ী লিখন।"[৫০]

গীতিকাব্যের সূক্ষ্ম ভাব-দেহ বৈষ্ণব পদকর্তাগণ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে রচনা করেছিলেন; তা বিনষ্ট হোল না বটে, কিন্তু কলুষিত হোল। ছন্দের শিথিলতা, ও অন্ত্যমিলের দুর্বলতা তাঁরা অনুপ্রাসের সস্তা চটক দিয়ে গোপন করার প্রয়াসী হলেন। ফলে কবিসঙ্গীতের ভাষা যেখানে অনুপ্রাসবহুল, সেখানে কৃত্রিম।

কবিগানের শব্দভাণ্ডার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, রসিক, পীরিত, পর, নাগর, মদন, কাম, বিরহ, কুল, আগুন, প্রেম, প্রাণ, যৌবন, নয়ন, সজনি, বিচ্ছেদ, প্রবাস, বিষ, চাতুরী, বসন্ত, সরস, ছলনা, মান, অভিমান, লজ্জা, কটাক্ষ প্রভৃতি শব্দ বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রাণি-জগত ও উদ্ভিদ-জগত থেকে কোকিল, ভ্রমর, চাতক, চাতকী, অলি, কুমুদিনী, মধু,

ভুজঙ্গ শব্দ বেশি দেখা যায়। ক্রিয়াবাচক শব্দের মধ্যে ভোলা, মজানো, সঁপা (সমর্পণ করা অর্থে), ছলা (ছলনা করা অর্থে), ভাসা, দহা (দগ্ধ হওয়া), কাঁদা, হারান, পোড়া, হানা প্রভৃতির আধিক্য। সর্বনাম-এর মধ্যে 'তুমি'র একচ্ছত্রতা। আর সংখ্যাবাচক শব্দের মধ্যে "পঞ্চ"-এরই প্রভুত্ব। অলংকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে শতরঞ্জ রূপক, সসৈন্য ঋতুরাজ বিশেষ অর্থবহ ও বিশিষ্ট অলংকার। কবিগানের ভাষা অসামাজিক, বা সমাজগ্রাহ্য নয়। ভাষার দিক থেকে কবিওয়ালারা হিন্দীর অনুপ্রবেশ ও ব্রজবুলির কৃত্রিমতার অবসান ঘটালেন। অনুপ্রাস-প্রিয়তার মাত্রাধিক্য সত্ত্বেও তাঁদের হাতে বাংলাবুলির সবিশেষ বিকাশ ঘটে। রাম বসুর কবিতা সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুর প্রশংসা উল্লেখযোগ্য—"রাম বসুর কবিতাগুলি যেন স্বভাবের হস্ত হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বহির্গত হইয়াছে।"[৫১] কোন কোন শব্দের নতুন অর্থ সমৃদ্ধিও ঘটে—যেমন জীবন ও যৌবন সমার্থক হয়ে পড়ে; মন ও প্রাণ শব্দ দুইটি প্রেমিক-প্রেমিকার সমার্থক হয়ে পড়ে।

কবিগানকে কেউ কেউ ধর্ম-নিরপেক্ষ 'secular' কাব্য বলে মনে করেন। এ কাব্যের মূল সুর যে ধর্মনিরপেক্ষ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে এর গাঁটছড়া সম্পূর্ণ ছিন্ন হয় নি। এ কাব্যের পটভূমিকা তৈরী করেছে বৈষ্ণব কাব্যের ভাব-জগত। বৃন্দাবনের সেই অতিপরিচিত গোপবালক-বালিকাদ্বয়ই এর নায়ক-নায়িকা; কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্যাসুন্দরের ছলনা চাতুরীও এর পশ্চাদপট হিসাবে কাজ করেছে। কবিসঙ্গীতের সাধ্য কি যে বৈষ্ণব কাব্যের মূল সুর গ্রহণ করে! সেটা তার চরিত্র-অনুগত নয়। বৈষ্ণব কাব্যে ভোগ নয়, ত্যাগই বড়; মিলন অপেক্ষা বিরহই প্রবলতর সুর। মিলন যেটুকু আছে তাও ভাব-সম্মিলন—"দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া"। অপর ক্ষেত্রে, কবিসঙ্গীতে শুধু মিলন নয়, সম্ভোগই হোল প্রধান উপজীব্য—যেটুকু অন্তরায়, তার জন্য ছলনা ও অভিমানের তো শেষ নেই। আর এই জন্যই তো চন্দ্রাবলীপ্রসঙ্গ এত প্রাধান্য পেয়েছে।

"আমাদের কবিওয়ালারা বৈষ্ণব কাব্যের সৌন্দর্য এবং গভীরতা নিজেদের এবং শ্রোতাদের আয়ত্তের অতীত জানিয়া প্রধানতঃ যে অংশ নির্বাচিত করিয়া লইয়াছেন, তাহা অতি অযোগ্য। কলঙ্ক এবং ছলনা ইহাই কবিওয়ালাদের গানের প্রধান বিষয়।"[৫২]

সমগ্র বিষয়বস্তুর মধ্য থেকে কোন প্রসঙ্গ-বিশেষের এইভাবে দীপ্ততর হয়ে ওঠার কারণ অনুসন্ধান করার মত। অবশ্য ডাঃ সুশীল কুমার দে বলেন, "তাহাতে (কবিগানে) লেখক রাধাকৃষ্ণ বিদ্যাসুন্দরের নামগন্ধ নাই।"[৫৩] এ-মত কবিসঙ্গীতের বহিরঙ্গটুকু দেখেই প্রকাশিত হয়েছে বলে আমাদের অনুমান।

এখানে যে বৈষ্ণব কবিতার ধর্মীয় আবরণের অবসান হচ্ছে, তা সবাই বলেছেন। ঐহিকতার এবং মানবমুখীনতার অধিকতর প্রকাশ ঘটেছে, এবিষয়েও অনেকে একমত।

তাহারে কি ভুলিতে পরি, যাহারে আমি সঁপিলাম মন।
দেখিতে যার বদন, অতি কাতর নয়ন,
শুনিতে বচন সুধা, শ্রবণ তেমন।
দেখিলাম কতশত, নাহি দেখি তার মত,
সেজন এমন।
যদি তার বিরহেতে, সতত হয় জ্বলিতে,
জ্বলিতে জ্বলিতে হবে নির্বাণ কখন।[৫৪]

এখানকার এত পুংখানুপুংখ বর্ণনা দেখে মনে পড়ে কবি রবীন্দ্রনাথের সেই অমর ভাষণ—

হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে।

কিন্তু যখন পড়ি,

কাজল নয়নে আর, দিও না কখন।
শরে কেবা নাহি মরে, বিষযোগ তাহে কেন ॥
তোমার কটাক্ষে কেহ, না বাঁচিত প্রাণ।
বাঁচিবার এক হেতু, আছে তাহে শুন।
সুধা হলাহলে সুরা, নয়নের তিন গুণ ॥[৫৫]

তখন বুঝি এ আলাপন বৈষ্ণব কবিতা থেকে অনেক স্থূল; অনেক চাতুরী মাখানো; নাগারালির চতুর প্রকাশ।

বিচ্ছেদে যে ক্ষতি তাহা অধিক মিলনে
আঁখির কি আশা পূরে ক্ষণ দরশনে ॥

প্রবল অনল দেখ কিঞ্চিত জীবনে।
নির্বাণ হইতে কেহ দেখেছ কখনে ॥[৫৬]

এর মধ্যে যে বাগবৈদগ্ধ্য প্রকাশ পেয়েছে, তা নিশ্চয়ই সাধুবাদের যোগ্য; কিন্তু অকৃত্রিম নয়। রামবসুর—

যৌবন জনমের মত যায়।
সে তো আসাপথো নাহি চায় ॥
কি দিয়ে গো প্রাণসখি, রাখিব উহায়।
জীবন যৌবন গেলে আর।
ফিরে নাহি আসে পুনর্বার ॥
বাঁচিতে বসন্ত পাবো, কান্ত পাবো পুনরায়।[৫৭]

এ কবিতার আক্ষেপ উক্তিতে ভোগ-বঞ্চনার কথাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। নিম্নোদ্ধৃত পদেও ঐ একই বিচ্যুতি—

একে আমার এ যৌবনকাল, তাহে কালবসন্ত এলো।
এ সময়ে প্রাণনাথ, প্রবাসে গেলো ॥
যখন হাসি হাসি, সে আসি বলে।
সে হাসি, দেখিয়ে ভাসি নয়নজলে ॥
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ধরিতে,
লজ্জা বলে ছি ছি ধোরো না।[৫৮]

এ-গীতির বাক-ভঙ্গিতে সারল্য ও অকপটত্ব আছে। কিন্তু সবরকম অকপটত্বই সমর্থনযোগ্য নয়।

আমাদের মাঝে মাঝে অনুমান করতে সাধ যায় যে, এই গীতিধারা যদি বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক না রাখত, পৌরাণিকতার দায় যদি না স্বীকার করত, তাহলে হয়ত পাপমুক্ত হোত; কারণ এই ধর্মীয় আবরণের ছলনাটুকু সম্বল করার ফলেই এই গীতিকাব্যের বিকৃতি এতদূর দুঃসাহসী হয়েছিল। পরবর্তীকালে রাধাপ্রসঙ্গ অবতারণাতেই একটা সংকোচ বা taboo দেখা গিয়েছিল, তারও কারণ বোধহয় এই। 'মেঘনাদবধকাব্যে'র কবিকে আশ্বাস দিতে হয়েছিল, "In the present work you will see nothing in the shape of "Erotic similies,"......not a single reference to the incestuous love of Radha."[৫৯] ব্রজাঙ্গনা কাব্যের

ভূমিকায় তিনি বললেন "I think you are rather cold towards the poor lady of Braja. Poor man! When you sit down to poetry, leave aside all religious bias."[৬০] মধুসূদনের মত কবির পক্ষে এ সংকোচের প্রয়োজন ছিল না। কারণ এই জাতীয় বিষয়বস্তু ব্যবহারের কালে যে সব খানাখন্দ পার হতে হয়, তা তিনি অনায়াসেই পার হয়ে যেতে পারবেন। "If she had a bard like your humble servant from the beginning, she would have been a very different character. It is the vile imagination of poetasters that has painted her in such colours."[৬১]

॥ ৫ ॥

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের আদর্শশূন্য এবং মানবতাবোধ-হীন স্থূল ও অশ্লীল ঐহিকতার কবলে পড়ে বাংলা-কাব্যের নাভিশ্বাস উঠেছে। সুন্দর যাকে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে পেয়েছিল, তাকেই যেন কবিওয়ালারা সভার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে রসিয়ে-রসিয়ে উপভোগ করলেন। বিজন বিলাসিনী সরস্বতী এহেন সভায় অধিক্ষণ তিষ্ঠুতে পারেন না।

এ যুগ আত্ম-আবিষ্কারের যুগ নয়, আত্মবিস্মরণের যুগ; প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির উদার ও মহৎ ধারার সঙ্গে সংযোগশূন্য হয়ে পড়েছে। ভারতীয় সাহিত্যের সুমহৎ ও সুন্দরতম সৃষ্টির সঙ্গে হয়ে পড়েছে পরিচয়হীন। এমন কি বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সুমহৎ প্রকাশের সঙ্গেও তাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে। ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ হয়ত যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন, কিন্তু সমাজ সে দাবী করতে পারে না। স্মৃতি আর নব্যন্যায় পণ্ডিতদের অবলম্বন; আর কবিরা হলেন রাধাকৃষ্ণের চাতুরালি আর বিদ্যাসুন্দরের নাগরালির নির্লজ্জ গায়েন। আত্ম-সংকোচনই এযুগের বৈশিষ্ট্য। আত্ম-আবিষ্কার ব্যতীত আত্ম-সম্প্রসারণ কি করে ঘটবে?

তাই এযুগের সাধ্য কি আখ্যায়িকা-পুষ্ট কাব্যের বিরাট হর্ম্যকে ধরে রাখতে পারে? এযুগ "অঙ্গদ রায়বার" পালার যুগ; "চন্দ্রকান্ত", "কামিনী কুমারের" যুগ, মুসলীম 'কেচ্ছার যুগ'। বাংলাসাহিত্যের দুর্বলতম অংশগুলির

আতিশয্যপূর্ণ অনুকীর্তনই এযুগের আখ্যায়িকা কাব্যের ধর্ম। আর গীতিকাব্য যেহেতু ব্যক্তিনিষ্ঠ, আর ব্যক্তি যেহেতু তখনও কুব্জপৃষ্ঠ ও খঞ্জ, তার সাধ্য কি গীতিকাব্যের আনন্দময় স্বচ্ছন্দ বিকাশ সম্ভবান্বিত করে! ব্যক্তির মুক্তি দেব-নির্ভর ও গোষ্ঠী-চালিত সমাজে সুদূরপরাহত। আর শুধু স্থূল বৈষয়িক বুদ্ধির দ্বারা চালিত সমাজেও তার স্ফুরণ সম্ভব নয়। ব্যক্তি যেদিন গোষ্ঠীর বন্ধন যুক্তিবাদিতার কুঠারে ছিন্ন করে মানববিকতাকে সিংহাসনে বসাবে, সেদিন গীতিকাব্যেরও মুক্তি। আগমনী-বিজয়ার অশ্রুজল শুধু নয়, শাক্ত পদাবলী রিক্ততাশূন্যতার দীর্ঘনিশ্বাস কেবল নয়, কবি-সঙ্গীতের ছলনাচাতুরীর শ্বাসরোধকারী তিমিরাচ্ছন্নতাও নয়, মুক্ত আলোকবিকীর্ণ নানা তরঙ্গে বিভঙ্গ আনন্দময় রূপ হবে সেই গীতিকাব্যের। তার পূর্বে প্রয়োজন ব্যক্তির মুক্তির; এক বিশেষ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিবেশে কেবল এই মুক্তির মন্ত্র উচ্চারিত হতে পারে। আমরা ভিন্ন অধ্যায়ে সে প্রসঙ্গ বর্ণনা করব।

* * * *

আমাদের এতাবৎ আলোচনার মধ্য দিয়ে এ সত্যটুকু আশা করি ফুটে উঠেছে যে, বাংলাকাব্যের কোন বিশেষ ধারাই সর্বযুগের প্রতিনিধিস্থানীয় ধারা নয়। গীতি-কবিতার অনিবার্যতা যুগ-বিশেষে অবধারিত, এ তথ্য আমরা ইতিহাসের বাঁকে-বাঁকে ঘুরে খুঁজে বের করলাম। আবার গীতি-কবিতাও যে সর্বযুগে ও সর্বস্তরে এক মৃত্তিকাজাত নয়, তার রং ও রস পৃথক হয়েছে, এ খবরও আমরা পরিবেশন করেছি। বঙ্কিমের বিশেষ মতটি বিচার করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বাংলা-কাব্যের নিজস্ব রূপটি কেমন করে ফুটে উঠছে, তার ইতিহাসও বর্ণনা করেছি। বাংলাকাব্য সংস্কৃত কাব্যের অনুবর্তন মাত্র নয়। নর-নারীর প্রেম বর্ণনায় রাধাকৃষ্ণ বা হরগৌরীর যে মধুর বা রুদ্রমূর্তি ফুটে উঠেছে, তা সংস্কৃত-কাব্যের অনুবাদ নয়। শুধু বিষয়ে বাঙালী-জীবন ও বাঙলার মাটির চিহ্ন থাকবে, তাই নয়। বিষয়-পরিবেশন রীতিতেও বাংলার নিজস্ব বাক-ভঙ্গিমার সমস্ত চাহনি প্রকাশিত হবে। উপমায়-উৎপ্রেক্ষায় নদনদীবহুল দেশের আর্দ্রতা দেখা যাবে; বাংলার ভূগোল এখানে আপন স্থায়ী স্বাক্ষর রাখবে। কয়েকটি রূপ-কল্প বা বাক-প্রতিমা একান্তভাবেই বাংলার নিজস্ব। এবং সর্বকালের বাঙালীর সাহিত্যে তার উপস্থিতি অনিবার্য হয়ে থাকল। একথা সন্দেহাতীত যে, আধুনিক কাব্যে আধুনিক জীবন

থেকে আলোছায়ার নানা অনুলেপন তুলে আনা হবে; জীবনের নিত্যনবীন পরিবেশ থেকে সেগুলি সংগ্রহ করা হবে। তারা মিলিতভাবে বাংলাকাব্যের সমসাময়িক পরিমণ্ডল তৈরী করবে।

আগামী দিনের কাব্যের রূপ-বৈচিত্র্যের আস্বাদন-মুহূর্তে বিগত দিনের এই দায়ভাগ যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

"Surely the great poet is, among other things, one who not merely restores a tradition which has been in abeyance, but one who in his poetry re-twines as many straying of tradition as possible."[৬২] কবিবিশেষের পক্ষে এ বক্তব্য যদি সত্য হয়, কাব্যপ্রবাহের স্তরবিশেষ বা তরঙ্গবিশেষ সম্পর্কে এ বক্তব্য অধিকতর সত্য। কারণ ব্যক্তি স্বয়ম্ভু হতে পারে, কিন্তু যুগ নয়।

পাদটীকা

১। History of Bengal—Dacca University. Vol I. পৃঃ—৩৫৮।

২। History of Bengal—Dacca Universtiy. Vol I. পৃঃ—৩৭২।

৩। History of Bengali Literature—D. C. Sen. C. U. Publication—পৃঃ—১৫২।

৪। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন—সপ্তম সংস্করণ পৃঃ—২২৬।

৫। ইতিহাস—ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী পৃঃ—৫২।

৬। সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃঃ—১০০

৭। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন—সপ্তম সংস্করণ, পৃঃ—১১২।

৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড—সুকুমার সেন—দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ—২৮২।

৯। History of Sanskrit Literature—A. B. Keith—পৃঃ—৪২।

১০। Shivaji and His Time—J. N, Sarkar, পৃঃ—১৩।

১১। Works of Raja Rammohan Ray—Centenary edition. Vol I-1928, পৃঃ—১০৯।

১২। An Advanced History of India—Datta, Ray Chowdhury & Majumdar, 1953. পৃঃ—২০৫, ৫১১।

১৩। History of Aurangzeb, Vol I—J. N. Sarkar. M. C, Sarkar, পৃঃ—১৮।

১৪। Hindostan, Vol I—Dow, পৃঃ—ciii.

১৫। Voyage to East Indies, Vol II—Grose, পৃঃ—২৩৮।

১৬। Considerations Of Indian Affairs—Bolts, পৃঃ—২০০

১৭। The History of British India—James Mill. James Madden. London. 1858, পৃঃ—২৯।

১৮। Rise and Fall of the East India Company—R. K. Mukherjee, পৃঃ—১৬৭।

১৯। Rise of the Christian Power in India—B. D. Basu, Vol I, পৃঃ—৩৬।

২০। Voyages to East Indies, (1761-1771)—John Splinter Stavorinus. Vol I, পৃঃ—১৫২।

২১। Memoirs of the life and Correspondence of John Lord Teignmouth, by his son Vol I, 1843. পৃঃ—২৫-২৬।

২২। Stavorinus—Vol I—পৃঃ—৪১৪।

২৩। সংবাদপত্রে সেকালের কথা—ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ—১৭৭-১৭৯; ৩৮৭-৩৮৮।

২৪। Annals of Rural Bengal—Hunter, পৃঃ—৫৬-৫৭।

২৫। সমাচার চন্দ্রিকা—১৮২৪, ২৪শে ফেব্রুয়ারী।

২৬। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—৫৬ সংখ্যা, ১৭৬৮ শকাব্দ, ১লা শ্রাবণ।

২৭। মাসিক পত্র—১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা—১৮৫৪।

২৮। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—১২৬৭ শকাব্দ, ১লা আশ্বিন।

২৯। কলিকাতা কমলালয়—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২৩০ বঙ্গাব্দ, পৃঃ—৯০-৯১।

৩০। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৩৬ সংখ্যা, ১৭৬৮ শকাব্দ, ১লা শ্রাবণ।

৩১। Calcutta Review—Vol VI, 1864—July-December. পৃঃ—৪৪০।

৩২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড—সুকুমার সেন, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ—৬৭২।

৩৩। Calcutta Review - 1843 Vol I, পৃঃ—২৯২।

৩৪। ঐ পৃঃ—২৯৩।

৩৫। সেকাল ও একাল—রাজনারায়ণ বসু, পৃঃ—৩।

৩৬। Calcutta Review—1843 Vol I, পৃঃ—২৯৩।

৩৭। ঐ পৃঃ—২০৩

৩৮। বাংলা ছন্দের ইতিহাস—মোহিতলাল মজুমদার, পৃঃ—২০০।

৩৯। An Advanced History of India—Datta, Ray Choudhury & Majumdar, পৃঃ—৮২৫।

৪০। দ্রষ্টব্য—১১ সংখ্যক পাদটীকা।

৪১। Rise & Fulfilment of the British Empire—Thompson & Garret.
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন—সপ্তম সংস্করণ, পৃঃ—৫৩৩।

৪২। ছন্দ—রবীন্দ্র রচনাবলী, ২১ খণ্ড—পৃষ্ঠা—৩৮০-৩৮১, ৩৯৪-৪১৮।

৪৩। সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ—১৫৮।

৪৪। লোকসাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ—৭৯।

৪৫। সংবাদ প্রভাকর, ১২৬১, ১লা পৌষ।

৪৬। সংবাদ প্রভাকর, ১২৬১, ১লা অগ্রহায়ণ।

৪৭। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, ২য় মুদ্রণ—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ—৮, পাদটীকা।

৪৮। সংবাদ প্রভাকর, ১২৬১, ১লা শ্রাবণ।

৪৯। সংবাদ প্রভাকর, ১২৬১, ১লা মাঘ।

৫০। ঐ

৫১। বাংলাভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব—রাজনারায়ণ বসু, ১৮০০ শকাব্দ, পৃঃ—৪৫।

৫২। লোকসাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ—৮৩।

৫৩। নানা নিবন্ধ—সুশীলকুমার দে, এ মুখার্জি এণ্ড কোং লিঃ, পৃঃ—১১৮।

৫৪। গীতরত্ন—রামনিধি গুপ্ত, তদাত্মজ জয়গোপাল গুপ্ত কর্তৃক প্রণীত, ৩য় সংস্করণ—১২৭৬, পৃঃ—১৩১।

৫৫। ঐ পৃঃ—১৩৬।

৫৬। সংবাদ প্রভাকর—১২৬১, ১লা আশ্বিন।

৫৭। ঐ

৫৮। ঐ

৫৯। মেঘনাদ বধ কাব্য—ভূমিকা।

৬০। ব্রজাঙ্গনা কাব্য—ভূমিকা, পৃঃ—।৶০।

৬১। ব্রজাঙ্গনা কাব্য—ভূমিকা, পৃঃ—।৶০।

৬২। The Use of Poetry and the Use of Criticism—T. S. Eliot. Faber & Faber Ltd. London, 1945. পৃঃ—৮৫।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উনবিংশ শতাব্দী : নবীন মানুষ ও নবীন পিপাসা

পুরাতনের নব মূল্যায়ন

॥ ১ ॥

ইউরোপীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের পরিচয় মধ্যযুগীয় ঘটনা। ইউরোপের রেনেসাঁসের যুগ থেকে এই যোগাযোগ বাড়তে থাকে। কিন্তু পরিচয় পুরান হলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশ পর্যন্ত ভারতীয়রা ইউরোপীয়দের সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যের খবর নেবার প্রকৃত কোন চেষ্টা করেনি। তাদের ভাষা শিক্ষার কোন চেষ্টা তারা করেনি; বৈষয়িক লেনদেনই শুধু ধাপে ধাপে বেড়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের অবস্থা বর্ণনা করে এডওয়ার্ড ইভস্ বলেছেন, Although there were many schools for the education of the children, yet they seldom learn more than their mother tongue. It is indeed surprising considering the great number of English that are settled amongst them and with whom they have continued dealings......"[১]

বৃটিশ বিজয়ের পর মুৎসুদ্দী, মুনশী, বেনিয়ান, দেওয়ান মহাশয়েরা আত্ম-প্রয়োজনে কিছু কিছু ইংরাজি শিখেছিলেন। ইংরাজি ভাষার তখন খুব বৈষয়িক চাহিদা; পাদ্রীদের প্রচারে ধর্মীয় চাহিদাও কিছু কিছু দেখা দিচ্ছিল। ধর্মীয় প্রয়োজনে মিশনারীরা বহু পাঠশালা স্থাপন করতে সুরু করে। সে শিক্ষা যদিও ইংরাজি-ভিত্তিক, তবু তাকে আধুনিক শিক্ষা বলা চলে না। রাজা নবকৃষ্ণ কোর্টে দাঁড়িয়ে ইংরাজিতে সওয়াল করতে পারতেন, তবু তাঁকে যেমন আধুনিক মানুষ বলা চলে না।

॥ ২ ॥

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ভারতীয় জীবনের কূপমণ্ডুকতার অবসান হতে থাকল। প্রথম দুইটি প্রতিষ্ঠানের ভারত-আবিষ্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে, ভাস্কো-ডা-গামার অভিযান থেকেও তা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

ইউরোপীয়দের ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে কৌতূহল আরও একশত পূর্বেকার ঘটনা। ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে এক ইংরেজ ভদ্রলোক ভগবদগীতার অনুবাদ করেছিলেন; বৃটিশ মিউজিয়ামে এই অনুবাদ সংরক্ষিত আছে।[২] ভারত সংস্কৃতি ও ভারতীয় শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন পর্তুগীজ পণ্ডিতেরা। Abbe Journdain's Journal থেকে জানা যায় যে, ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথ, মথুরানাথ, গদাধর প্রভৃতির অমূল্য গ্রন্থরাজি পর্তুগীজরা ফ্রান্সের রাজার গ্রন্থাগারে পাঠায়। Aquati Du Perron বলেন যে, Father Mosac নবদ্বীপে সংস্কৃত শিখেছিলেন।

কিন্তু এগুলো হল প্রত্নতাত্ত্বিকের খবর। সত্যকার ভারত-চর্চা এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার পর সুরু হয়। এ হোল নতুন যুগের জীবন জিজ্ঞাসায় স্পন্দিত প্রতিষ্ঠানের ভারত-চর্চা। ভারতবিদ্যার সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য এই প্রথম ধরা পড়ল। এবং এ বিষয়ে একটি আন্দোলন ও সচেতনতা এই প্রথম সৃষ্টি হল।

এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে উইলকিন্স সাহেব ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ভগবদগীতার এক অনুবাদ প্রকাশ করেন; এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ স্যার উইলিয়াম জোন্সের 'শকুন্তলা' ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তারপর ক্রমান্বয়ে হিতোপদেশ (১৮০৬), মনুসংহিতা (১৮১৩), মেঘদূত (১৮১৩), নলোদয় (১৮১৪), লীলাবতী (১৮১৬), মাণ্ডুক্য উপনিষদ (১৮১৭), ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্যের বীজগণিত (১৮১৭), বিষ্ণুপুরাণ (১৮৪০), মহাভারত (১৮৪২), প্রভৃতি গ্রন্থ অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হতে থাকে।

এশিয়াটিক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবসে স্যার উইলিয়াম জোন্স বক্তৃতা-প্রসংগে বলেন, "Nor can we reasonably doubt how

degenerate and abased soever the Hindoos may now appear, that in some early age they were splendid in arts and arms, happy in Government, wise in legislation, and eminent in various knowledge."[৩] এ উক্তি এমন এক ব্যক্তির যাঁর বিষয়ে সমসাময়িক বৃটেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ডাঃ জনসন বলেছিলেন, "The most enlightened of the sons of men."[৪] প্রখ্যাত জার্মান পণ্ডিত, সাহিত্য-শিল্পে রোমানটিক ভাবনার অন্যতম পথিকৃৎ ফ্রেডারিক শ্লেগেল কেরী-মার্শমান কৃত বাল্মীকির রামায়ণের অনুবাদ পড়ে বলেছিলেন, "Tenderness of feeling, genial grace, artless beauty pervade the whole, and if at times, the fondness for indolent solitude, the delight excited by the beauty of nature, especially the vegetable kingdom, are here and there dwelt upon with a profusion and poetic ornament, it is only the adornment of innocence"[৫] ভগবদ্‌গীতার অনুবাদ প'ড়ে তিনি লিখলেন, "The most beautiful and perhaps the only truly philosophical poem—that the whole range of literature known to us [illegible] produced." প্রখ্যাত জার্মান পণ্ডিত হুমবোল্ড-এর এক নিবন্ধ ভগবদ্‌গীতার উপর প্রকাশিত হোল । হুমবোল্ড ছিলেন গ্যয়টে ও শিলারের ব্যক্তিগত বন্ধু। জোন্সের শকুন্তলা প'ড়ে গ্যয়টে অভিনন্দন জানালেন—

W t thou express in one word, the bloom of the spring and the fruit of the autumn—all that attracts and entrances—all that feeds and satisfies—the Heaven itself and the Earth ! name thee Sakontala !—and it is done.[৫ক]

১৮১৫ খৃষ্টাব্দ থেকে রামমোহন রায়ের সম্পাদনায় উপনিষদসমূহ প্রকাশিত হতে থাকে। ক্যালকাটা মনথলি গেজেটে লেখা হোল, "We are satisfied that the intellectual exhortations of Rammohun Roy will be remembered with the gratitude—and if the labours of Luther in Western World are entitled to be commemorated by Christians—the Herculean efforts of individual we

have alluded to must place him high among the Hindoo portion of mankind."[৬]

এইভাবে ভারত-বিদ্যা-চর্চার শাস্ত্রীয় দিক এগিয়ে চলল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনস্তম্ভ ও শিলালিপির পাঠোদ্ধার সুরু হোল। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে চার্লস উইলকিন্স অশোক শিলালিপির পাঠোদ্ধার করলেন ; ঠিক একই সময়ে পণ্ডিত রাধাকান্ত শর্মা অশোক শিলালিপি পাঠোদ্ধারে সক্ষম হন। এই দিন থেকে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব গবেষণার সূত্রপাত হোল। পরবর্তীকালে প্রিন্সেপ, ফার্গুসন, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উদ্যোগে ভারতীয় ইতিহাসের নানা অধ্যায় আলোকিত হতে লাগল। বিদেশীদের উদ্যোগে প্রাথমিক কাজ সুরু হলেও শীঘ্রই বাঙালীরাও এদিকে এগিয়ে এলেন, এশিয়াটিক সোসাইটির কাজে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিলেন। রামগোপাল ঘোষ, রামকমল সেন, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র সোসাইটির নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ও কবি-বন্ধু গৌরদাস বসাক সোসাইটির পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন। বিভিন্ন গ্রন্থ টীকা-টিপ্পনীসহ প্রকাশিত হলে ভারতীয় মনীষার পরিচয়ে বিদেশী-পদানত জাতির হীনমন্যতাবোধ বিদূরিত হোল। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আত্ম-আবিষ্কার ও আত্ম-সচেতনতা দেখা দিল।

আবার প্রাচীন নগর, স্মৃতিস্তম্ভ, বিজয়-তোরণ, শিলালেখ, মুদ্রা প্রভৃতি আবিষ্কারের ফলে ভারতের বৈষয়িক জীবনের শ্রীবৃদ্ধির সংবাদ প্রচারিত হোল। এলোরা, অজন্তা, কার্লে, মহাবলীপুরম্, নালন্দা, উদয়পুর, পুরী, উদয়গিরি-খণ্ডগিরি, কোনার্ক, খাজুরাহো, বাগ প্রভৃতি আবিষ্কারে হিন্দু-বৌদ্ধযুগের সংস্কৃতির সংবাদ প্রকাশিত হোল ; তেমনি বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, বিদর, দিল্লী, আগ্রার সঙ্গে নব পরিচয়ের ফলে মুসলমান যুগের সংস্কৃতির উচ্চমান সম্পর্কে সর্বসাধারন অবহিত হোল। এইভাবে ভারত-সংস্কৃতির ঐশ্বর্য ও বিচিত্রতার ধারণা সুনিশ্চিত হোল।

"The self-esteem of India which had touched its depths at the end of the eighteenth century received its first aid to recovery at the hands of the most renowned man, in the sense as one of the fathers of the Great Recovery which followed in the nineteenth century,"[৭]

"The great work of Sir William Jones also began to bear unexpected fruit in India. The cultivation of Sanskrit in Europe opened the eyes of Indians to the great riches that their ancestors had left to them. It may sound strange but it is none the less true that it was the enthusiasm of Max muller, Monier Williams and others for the culture of India that gave the first impetus to the modern study of classics in India. Also it was through the translations published by European scholars in English that the new middle classes began to know of the higher things in their own thought."[৮]

নবীনের আবির্ভাব

১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠাও একই প্রকার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁদের পণ্ডিতমহাশয়দের দ্বারা লিখিত কতকগুলি বাংলা গদ্যগ্রন্থ প্রকাশ করলেন—তাঁদের হাতেই বাংলা গদ্যের উদ্ভব হোল। গদ্য ব্যতীত চিন্তার সম্পূর্ণ শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে পারে না—গদ্যসাহিত্যই যুক্তিসমৃদ্ধ তত্ত্বমূলক বিষয়বস্তু পরিবেশন করার ক্ষমতা রাখে। চৈতন্য-চরিতামৃতের কথা স্মরণে রেখেও আমরা একথা বলছি।

দ্বিতীয়তঃ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যসূচীর এক বিরাট স্থান দখল করেছিল প্রাচ্যবিদ্যা ও ভারত-সংস্কৃতি। মনুসংহিতা, বাল্মীকির রামায়ণ, গীতগোবিন্দ ও নব্যন্যায়ের বিবিধ গ্রন্থ এঁদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল। ইতিপূর্বে চার্লস উইলকিন্স ও পঞ্চানন কর্মকারের যুগ্ম প্রচেষ্টায় বাংলা হরফের জন্ম হয়েছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্ররা ছিলেন বৃটেন* থেকে নবাগত সিভিলিয়ানরা। তাঁদের উপকারার্থে গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হলেও সাধারণভাবে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে এগুলির প্রভাব অনুভূত হয়েছিল—খৃষ্টীয় ১৮০১ থেকে ১৮২২ অব্দ পর্যন্ত যে সমস্ত পুস্তক বিরচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল পর পৃষ্ঠায় আমরা তার তালিকা দিচ্ছি—

রামরাম বসু	—	রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত	(১৮০১)
	—	লিপিমালা	(১৮০২)
উইলিয়ম কেরী	—	কথোপকথন	(১৮০১)
	—	ইতিহাস মালা	(১৮১২)
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার	—	বত্রিশ সিংহাসন	(১৮০২)
	—	হিতোপদেশ	(১৮০৮)
	—	রাজাবলি	(১৮০৮)
	—	প্রবোধচন্দ্রিকা	(১৮১৩—আনুমানিক)
গোলোকনাথ শর্মা	—	হিতোপদেশ	(১৮০২)
তারিণীচরণ মিত্র	—	ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট	(১৮০৩)
চণ্ডীচরণ মুনশী	—	তোতা ইতিহাস	(১৮০৫)
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	—	মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং	(১৮০৫)
রামকিশোর তর্কচূড়ামণি	—	হিতোপদেশ	(১৮০৮)
হরপ্রসাদ রায়	—	পুরুষ পরীক্ষা	(১৮১৫)
কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন	—	পদার্থ কৌমুদী	(১৮২১)
	—	আত্মতত্ত্ব কৌমুদী	(১৮২২)

পুস্তকগুলির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এগুলির বক্তব্য অষ্টাদশ শতকের বক্তব্য থেকে পৃথক্। দেবমহিমা নয় মানব-মহিমা প্রচার করাই উদ্দেশ্য। তান্ত্রিক তত্ত্ব প্রকটন করা উদ্দেশ্য নয়, পদার্থের রহস্য বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। দেবমহিমার স্থলে মানব-মহিমা, তান্ত্রিক কড়চার স্থলে আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসা, পয়ারের স্থলে গদ্য সাহিত্য-মর্যাদার অধিকারী হচ্ছে। গ্রন্থগুলি যে সমসাময়িক যুগের জ্ঞানীগুণীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তার প্রমাণ এই যে, এদের দুর্মূল্যতার জন্য সস্তা দামে অনুরূপ গ্রন্থাদি প্রকাশের জন্য ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি গঠিত হোল (১৮১৭)।

নমুনা হিসাবে সংযোজিত জগতধির রায়ের বাংলা পত্র ছাপাতে গিয়ে বাংলা হরফ ছেনি দিয়ে কাটা হোল। বাংলা মুদ্রাযন্ত্রের জন্ম এক বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ ঘটনা। হস্তলিখিত পুঁথির মুষ্টিমেয় পাঠক-ভজনার অবসান হোল। ছাপাখানার সঙ্গে সঙ্গে এল সংবাদপত্র।

"যখন যে জাতির ব্যবহারের বর্ত্মে সভ্যতার সমাগম হয় তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশে সংবাদপত্রের সৃষ্টি হইয়া বিদ্যার পথ মুক্ত হইতে থাকে।"[৯]

শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক দিগদর্শন নামক মাসিক এবং সমাচার দর্পণ নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। দিগদর্শনের প্রথম দুইটি সংখ্যায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ স্থান পায়—

আমেরিকার দর্শন বিষয়।

বেলুন দ্বারা সাদলর সাহেবের আকাশ গমন।

হিন্দুস্থানের সীমা বিবরণ। হিন্দুস্থানের বাণিজ্য। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বিবরণ।

উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে প্রথম আসিবার কথা।

বাষ্পের দ্বারা নৌকা চালানোর বিষয়। ইত্যাদি—।

এ-গুলি নিতান্তই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংবাদ; কিন্তু বিরাট বিচিত্র বিশ্বের বিবিধ রহস্যের কুয়াশা এই ছোট ছোট সংবাদের আলোকেই অপসৃত হচ্ছিল। ভারতীয় জীবনের স্থবিরত্বে এর ফলে ফাটল ধরছিল। বাঙ্গাল গেজেটি (১৮১৮, জুন?), ব্রাহ্মণ সেবধি (১৮২১), সম্বাদ কৌমুদী (১৮২১, ডিসেম্বর), সমাচার চন্দ্রিকা (১৮২২, মার্চ), সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১, সাপ্তাহিক), জ্ঞানান্বেষণ (১৮৩১, জুন), সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় (১৮৩৫), বেঙ্গল স্পেকটেটর (১৮৪২), তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৪৩), বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫১), মাসিক পত্রিকা (১৮৫৪), এডুকেশন গেজেট (১৭৫৬), সোমপ্রকাশ (১৮৫৮) প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হতে লাগল। এবং তার ফলে দেশে বিদ্যা-চর্চার উৎসাহ বাড়ল।

"কিছুদিন আলোচনার পথ (road) অপরিষ্কৃত হইয়াছিল, এইক্ষণে পুনর্বার তদপেক্ষা সদবস্থা হইয়াছে; অনেকেই লেখা-দ্বারা ও বক্তৃতা-দ্বারা তর্কবিতর্ক করিতে উৎসুক হইয়াছেন, বিদ্যার্থিগণ বাল্যক্রীড়া ত্যাগ করিয়া অনুশীলনের ক্রীড়ায় আমোদ করিতেছে, সংবাদপত্রে বিবিধ বিষয় লিখিয়া দেশের মঙ্গল করিতেছে। * * বেকনের এসে, সেক্সপিয়ারের প্লে,

কালিদাসের কাব্য, গীতার শ্লোক, শ্রুতির অর্থ ও বস্তুনির্ণয় প্রভৃতি সমুদয় সদ্বিষয়ের আলোচনা করিতেছে। এই সকল দৃষ্টে পুণ্যাত্মা রামমোহন রায়ের জীবিতাবস্থা স্মরণ হইবায় মন শোক-মিশ্রিত-কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হইতেছে।"[১০] তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই প্রথম তত্ত্বজিজ্ঞাসার পত্রিকা; শুধু অন্তর্মুখী সাধনার সংবাদ নয়, বহির্মুখী সংগ্রামের সংবাদও এই পত্রিকায় পরিবেশিত হোত।

এশিয়াটিক সোসাইটি যে ভারত-চর্চার সূত্রপাত করেছিল। এইসব সংবাদপত্র সেই ধারাকে পুষ্ট করল। বিবিধার্থ সংগ্রহের ১ম পর্বে ১ম সংখ্যার বিজ্ঞাপনে বলা হল যে, "জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ভূগোলবিদ্যা, পুরাবৃত্ত, ইতিহাস, সাহিত্যালংকারাদি সকল শাস্ত্রের মর্ম"—এই পত্রিকায় আলোচিত হবে। এবং সুখের বিষয় যে, সে-প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়েছিল। "বিবিধার্থ সংগ্রহে"র বিবিধ সংখ্যায় ভারত-সংস্কৃতির উপর যে সমস্ত নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, আমরা নিম্নে তার তালিকা দিচ্ছি—

পর্ব	সংখ্যা		বিষয়
১ম পর্ব,	১ম সংখ্যা	...	শিখ ইতিহাস
	২য় সংখ্যা	...	রাজপুত্র ইতিহাস
	৩য় সংখ্যা	...	ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাস
২য় পর্ব,	১৫ সংখ্যা	...	ইলোরার গুহা
		...	কাশীর ইতিহাস
	১৬ সংখ্যা	...	দিল্লী নগরের বৃত্তান্ত
	২০ সংখ্যা	...	পাটনা
৩য় পর্ব,	৩৪ সংখ্যা	...	নূরজাহানের বৃত্তান্ত
৪র্থ পর্ব,	৪১ সংখ্যা	..	টোডাজাতির ইতিহাস
	৪৭ সংখ্যা	.	মহাবীর
৫ম পর্ব,	৫১ সংখ্যা	...	রাজসাহী জেলার বিবরণ
	৫৫ সংখ্যা	...	অজন্তা নগরের গুহা
	৫৬ সংখ্যা	...	শিবাজী
	৫৯ সংখ্যা	...	শিবাজী

রহস্য সন্দর্ভের ১ম পর্বের ১ম খণ্ডে বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল, "পুরাবৃত্তের আলোচনা, প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের উপন্যাস, প্রাচীন তীর্থাদির বৃত্তান্ত, স্বভাবসিদ্ধ

রহস্য ব্যাপার, জীব সংস্থার বিবরণ, খাদ্য দ্রব্যের প্রয়োজন, বাণিজ্য-দ্রব্যের উৎপাদন, নীতি-গর্ভ উপন্যাস, রহস্যব্যঞ্জক আখ্যান, নূতন গ্রন্থের সমালোচন প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের আলোচনা পত্রিকায় স্থান পাবে। রহস্য সন্দর্ভে বুঁদি, সিন্ধিয়া, বিকানীর, যয়সলমীর, সিরোহী, রীবা (Rewa) রাজ্যের বিবরণী প্রকাশিত হয়েছিল। আগরা, তুগলকাবাদ, উজ্জয়িনী নগরীর বিবরণ এবং পেশোয়াদের কাহিনী বর্ণিত হয়েছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ১৭৬৯ শক থেকেই ভারত-বিদ্যা আলোচিত হতে থাকে। তাছাড়া এসিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রখানি শিক্ষিত সমাজের কাছে অপরিচিত ছিল না। এই ভাবে আত্ম-বিস্মরণ ও আত্ম-সঙ্কোচন পর্বের অবসান ঘটতে থাকল।

নবীন শিক্ষা : নবীন মানুষ

॥ ১ ॥

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ২০ শে জানুয়ারী হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হোল। ভবিষ্যৎ-মুখীনতার দিক থেকে অপর দুইটি প্রতিষ্ঠান অপেক্ষাও এই শিক্ষায়তনের গুরুত্ব অধিকতর। ইউরোপীয় বা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী ব্যতীত এসিয়াটিক সোসাইটির ভারত-বিদ্যা চর্চার মূল্য প্রণিধান করাও হয়ত ছিল অসম্ভব। আর হিন্দু কলেজই ভারতীয় জীবনে আধুনিকতার মন্ত্র প্রথম উচ্চারণ করেছিল। ইতিপূর্বে কলকাতায় ইংরেজী-প্রধান বিদ্যালয় যে ছিল না, তা নয়। আর সেখানে ছাত্রের সংখ্যা খুব কম ছিল না। কিন্তু তা সত্বেও এই বিদ্যালয়ই প্রথম আধুনিক বিদ্যালয়—আধুনিক বিদ্যা এখান থেকে পরিবেশিত হয়েই সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার সঙ্গে সঙ্গে এইভাবে আধুনিক শিক্ষা প্রচলিত হতে থাকে। মিঃ হাইডের মতে কাপ্তেন বেলামির 'চ্যারিটি' স্কুলই (৭৩১-৩২) প্রথম ইংরাজী স্কুল। এই সময়ে মিঃ কিয়ারগাণ্ডার একটি স্কুল স্থাপন করেন। উনবিংশ শতকের প্রথম দশকে ড্রামণ্ড, শোরবোর্ণ, মেকলে, আরাতুন পিক্রস, হার্টম্যানের স্কুলে বাঙ্গালী বিত্তবানদের ছেলেরা পাঠ অভ্যাস করতো। এছাড়া ছিল বাঙ্গালী পরিচালিত বিদ্যালয়।

শোরবোর্ণ সাহেবের স্কুলের ছাত্র হলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর; তিনি নব্য

বঙ্গের অন্যতম নেতা ও রাজা রামমোহন রায়ের বিশ্বস্ত সহচর। ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুলের ছাত্র ডিরোজিও নব্য বাঙ্গালার দীক্ষাগুরু। সামান্য বাইশ বছরের আয়ুষ্কালে ডিরোজিও কলকাতা-সহরের জীবনে নতুন আদর্শ ও নতুন ভাবনা দৃঢ়বলে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন। ড্রামণ্ড সাহেব নিজেও ছিলেন আধুনিক বিদ্যায় ও তত্ত্ব জিজ্ঞাসায় অতীব সচেতন। কাজেই এ সমস্ত বিদ্যালয়ের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু তা সত্ত্বেও হিন্দু কলেজই সর্বপ্রথম দেশীয় ছাত্রদের সম্মুখে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণদ্বার উদ্ঘাটিত করল। হিন্দু কলেজ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ২০ শে জানুয়ারী প্রতিষ্ঠিত হয়, ২০ জন ছাত্র আর ৬০ হাজার টাকা নিয়ে। তিন মাসের মধ্যেই ছাত্রসংখ্যা বেড়ে ৬০ জনে দাঁড়াল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ভাবে চলল; শেষের দিকে বিদ্যালয়টি কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ল। ছাত্র সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস পাচ্ছিল। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে সরকার একজন পরিদর্শক নিয়োগ করলেন। এইচ. এইচ. উইলসন প্রথম পরিদর্শক নিযুক্ত হলেন। এখন থেকেই বিদ্যালয়টি আবার উন্নতির পথে পা বাড়াল। সরকারী তত্ত্বাবধানে এর ছাত্র সংখ্যা বাড়তে লাগল; সুশিক্ষিত শিক্ষক মণ্ডলী এখানে নিযুক্ত হলেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ডিরোজিও হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। শুধু বিদ্যালয়ের কক্ষেই শিক্ষা দান কার্যে তিনি ব্যাপৃত থাকতেন না। Academic Association গঠন করে তিনি সচেষ্ট হলেন বুদ্ধির মুক্তি সম্ভাবিত করতে। এ সভা রামমোহন রায়ের আত্মীয় সভা বা রাধাকান্ত দেবের ধর্মসভার মত প্রবীণদের সভা নয়, যদিও মতবাদে রামমোহন রায়ের আত্মীয় সভার সঙ্গেই তার আত্মিক মিল। Academic Association নব বঙ্গের মুক্তি-মঞ্চ। "The principles and practices of Hindu religion were openly ridiculed and condemned, and angry disputes were held on moral subjects; the sentiments of Hume had been widely diffused and warmly patronised. The degraded state of the Hindu formed the topic of many debates; their ignorance and superstition were declared to be the causes of such a state, and it was then resolved that nothing but a liberal education could enfranchise the minds of the people. The degradation of the female mind

was viewed with indignation ; the question at a very large meeting was carried unanimously that Hindu women should be taught[১১ক]. Academic Association-এর সভায় ডেভিড হেয়ার, কর্ণেল বেনসন, কর্ণেল বীটসন, ডাঃ মিলস্ প্রভৃতি উপস্থিত থাকতেন। ডিরোজিওর প্রয়াসের ফলে বাঙ্গালী যুবকদের মনে এক নবীন উন্মাদনা দেখা গেল।

"A young Bengalee is remarkably intelligent. His first glimpse into the science and knowledge of the Western world filled him with astonishment and delight. The master spirit of this new era was Derozio."[১২] সেই "master spirit" বাঙ্গালার নব জাগ্রত তরুণদের সম্পর্কে নিজেই লিখলেন—

Expanding, like petals of young flowers ;
I watch the gentle opening of your minds,
And the sweet loosening of the spell that binds
Your intellectual energies and powers,
That stretch (like your bird in soft summer hours)
Their wings to try their strength... ..[১৩]

নতুন যুগের নতুন মানুষের এই হোল প্রথম 'আগমনী সঙ্গীত'।

হিন্দু কলেজ ও অন্যান্য আধুনিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধুনিকতম তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থরাজি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। সাহিত্য, মনোদর্শন বা মনস্তত্ত্ব (Mental Philosophy), ইতিহাস, গণিত, ভূতবিদ্যা (Natural Philosophy), নীতি শাস্ত্র (Moral Philosophy)ও ভূগোল পাঠ্য তালিকা ভুক্ত হয়েছিল। সাহিত্যের পাঠ্যসূচীতে ছিলেন সেক্সপীয়ার, মিলটন, পোপ, ড্রাইডেন, গ্রে, এ্যাডিসন ও হোমার অনূদিত ; দর্শনে বেকন, লক, ষ্টুয়ার্ট, হোয়াটলি, হিউম ; বিজ্ঞানে নিউটনের তিন শাখা (three sections), পোর্টারের বলবিদ্যা (Mechanics), হাইমারের জ্যোতির্বিদ্যা, হিলের উচ্চতর গণিত ও জ্যামিতি ; ইতিহাসে গ্রীস, রোম, আধুনিক ইউরোপ, বিশেষ করে ইংলণ্ডের ইতিহাস, ভারতবর্ষের ইতিহাস ; ভূগোলে রবার্টসন, পাই প্রভৃতির গ্রন্থ পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়েছিল। গিবন ও হিউমের ইতিহাস

বিশেষ জনপ্রিয় ছিল অর্থনীতিতে ছিল এ্যাডাম স্মিথের সন্থ প্রকাশিত গ্রন্থ।

এছাড়াও সাহিত্যে ক্যাম্পবেল ও ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের ইংরেজ কবিদের কাব্য-সংকলন পড়ান হোত। এই দুইটি সংকলন-গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা যথাস্থানে করা যাবে। অধ্যাপক হিসাবে যাঁরা যোগদান করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ডিরোজিও ব্যতীত ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন, ডাঃ টাইটলার প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য। তখনকার ছাত্ররা এঁদের শিক্ষাগুণে নব্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয়, এবং অতি দ্রুত নবীন জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। শিক্ষা পরিষদের একদা সভাপতি ও হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ কার তৎসম্পাদিত Novum Organum গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছিলেন, "I think I can foresee that its language of scholarship and of public business will be English ; that its scholars, speaking a variety of vernacular tongues will communicate with each other in English ; that Shakespeare, Milton and Bacon will supply it with those profound striking maxims. They (Bacon, Milton, Adam Smith, and Shakespeare) will make him a moral and intellectual being !"[১৪] এই আশা যে ফলবতী হয়েছিল তার প্রমাণ ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসনের বিদায়-সভার বক্তৃতা—"I behold my own pupils, old and young, in every direction and I am led to make a rough calculation of the thousands of oriental intellects that I have contributed to influence or to mould by familiarising them with the thoughts and feelings of the West—with the immortal works of the nöblest British authors. It is a truimph to me to have introduced them to such writers as Bacon, Shakespeare, Milton, Addison, Johnson, Young and Cowper, Hallam and Macaulay".[১৪ক]

॥ ২ ॥

নতুন যুগের মানুষের জন্ম হয়ে গেছে; রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দেব, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি হলেন এযুগের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি। গঙ্গা, তুলসীপত্র, শালগ্রামশিলা, ও বিবিধ তীর্থের মাহাত্ম্য এঁরা স্বীকার করলেন না। বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, জাতিভেদ—এ সব সামাজিক প্রশ্নে তাঁদের সুস্পষ্ট অভিমত ছিল। তাঁরা হলেন যথার্থ আধুনিক মানুষ, এক একজন 'মর্ডার্ণ ম্যান'। তাঁদের সমাজ বিষয়ক মনোভাব কি রকম ছিল ইণ্ডিয়া গেজেটে উদ্ধৃত 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার বিবিধ মন্তব্য থেকে তা জানা যায়।

অনেকে কলকাতায় আধুনিক জীবনের সূত্রপাত রাজা রামমোহন রায়ের কলকাতা-বসবাসের সময় থেকে গণনা করেন। রাজা ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে সুরু করেন। রাজার প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়সভা প্রথম আধুনিক জন-প্রতিষ্ঠান। তাঁর আত্মীয়-সভা, তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনা, বিভিন্ন সমাজ-উন্নতিমূলক কাজ ও ধর্মসংস্কারমূলক আন্দোলন কলকাতার শ্রাদ্ধ-বিবাহ-উৎসব-লালিত সমাজ-জীবনকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। প্রতিবাদে রক্ষণশীল ব্যক্তিরা ধর্মসভা গঠন করেছিলেন।

"আমাদের ইতিহাসের আধুনিক পর্বের আরম্ভকালে এসেছেন রামমোহন। তখন এযুগকে স্বদেশী কি বিদেশী কেউ স্পষ্ট করে চিনতে পারেনি। তিনিই সেদিন বুঝেছিলেন এযুগের যে আহ্বান সে সুমহৎ ঐক্যের আহ্বান। তিনি জ্ঞানের আলোকে প্রদীপ্ত আপন উদার হৃদয় বিস্তার করে দেখিয়েছিলেন সেখানে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান কারো স্থান-সংকীর্ণতা নেই। তাঁর সেই হৃদয় ভারতেরই হৃদয়; তিনি ভারতের সত্যপরিচয় আপনার মধ্যে প্রকাশ করেছেন।"[১৫]

খৃষ্টীয় ও হিন্দুধর্মের যুক্তি-বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম ঘোষণা করলেন। যিশুর উপদেশ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তিনি লক ও নিউটনের নব্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে গ্রহণ করলেন; ত্রিত্ববাদের স্থলে তিনি একত্ববাদের প্রতিষ্ঠা

করলেন। আবার ভারতীয় অধ্যাত্ম-চিন্তার ব্যাখ্যায় তিনি একই যুক্তি-বিজ্ঞান প্রয়োগ ক'রে "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—এই সত্যে উপনীত হলেন। তাঁর সেই অমর-উক্তি "বিশ্বাস,—ভগবদ্-বিশ্বাস মানব-জ্ঞানের অতিরিক্ত হতে পারে, কিন্তু বিরোধী নয়। যা মানব-জ্ঞানের বিরোধী হবে, তা পরিত্যজ্য।" তিনি দৃঢ়স্বরে আরও বললেন যে, অলৌকিক ধর্ম যেন স্বাভাবিক ধর্মের বিরুদ্ধে না যায়। তাঁর এই বক্তব্যের সঙ্গে ইউরোপের নব্যদর্শনের সাযুজ্য ছিল। তবে তিনি নব্যদর্শনের সমস্ত শাখা-প্রশাখার সঙ্গেই একমত ছিলেন না; হিউমের সন্দেহবাদ তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। কিন্তু বেকন, লক, ভলটেয়ার, ভলনি, পেইন ও গিবন তাঁর প্রিয় গ্রন্থকার ও দার্শনিক।

বহুকাল পরে বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছিলেন, "রাজা ইংরেজী বর্ণমালার প্রথম অক্ষরের জ্ঞানলাভ করিবার পূর্বেই আপনার জীবন-ব্রত গ্রহণ করিয়া-ছিলেন।"[১৬]

রামমোহন আরবীভাষা মারফৎ বস্তুবাদী যুক্তিবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। ইউক্লিডের জ্যামিতি, পরফিরির তর্কশাস্ত্র, এ্যারিস্ততল ও প্লেটোর দর্শনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আরবী অনুবাদের মাধ্যমেই সম্ভব হয়। মহম্মদীয় যুক্তিবাদী মোতাজালি সম্প্রদায়ের বক্তব্য যে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু কি আরবী যুক্তিবিজ্ঞানই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল? তিনি ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র, বৌদ্ধশাস্ত্র, অর্বাচীন হিন্দুশাস্ত্র—যথা কবীরপন্থী, নানকপন্থী, দাদূপন্থীদের বক্তব্যও অনুধাবন করেছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত পরিচিতিই কি যথেষ্ট? ভারতের প্রথম "মডার্ণ-ম্যান" শুধু এশীয় নয়, আন্তর্জাতিক ভাবধারায় স্নান করে পরিশুদ্ধ হয়ে জাতীয় জীবনের ব্রাহ্ম মুহূর্তে দেখা দিলেন; নবযুগের সূর্যকে অভিবাদন করলেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে বা পরে নিম্নলিখিত ঘটনা ও আন্দোলনগুলি ঘটে গেছে:

১৭৬২—রুশোর সমাজচুক্তি গ্রন্থপ্রকাশ

১৭৭৬—আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা

১৭২৬—এ্যাডাম স্মিথের Wealth of Nations প্রকাশ

—ডেভিড হিউমের Principles of Morals and Treatise on Human Nature প্রকাশ

১৭৮১—কাণ্টের Critique of Pure Reason প্রকাশ

১৭৮৯—ফরাসী বিপ্লব

এই সমস্ত ঘটনার প্রভাব স্বভাবতই যে তাঁর উপরে সবিশেষ সক্রিয় হবে, তা বলাই বাহুল্য। বেন্থাম-বন্ধু এবং ওয়েন-বিরোধী এই মানব-প্রেমিকের জীবন-দর্শন এক সুস্থির যুক্তি-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছিলেন একাধারে স্বপ্নচারী ও বাস্তববাদী। তাই তাঁর জীবনে রুশো ও টমাস পেইন অপেক্ষা মণ্টেসকুই, ব্লাকষ্টোন, বেন্থামের প্রভাব অধিকতর কার্যকরী হয়েছিল। "তাঁহার কালের পূর্বে তিনি উদয় হয়েছিলেন, অথবা তিনি এক নূতন যুগের প্রারম্ভ করিলেন।"[১৭]

"রামমোহন রায়ের মনুষ্যত্ব ভারতবর্ষে ধরে নাই, উছলিয়া জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।"[১৮] রামমোহন রায় আত্ম-চেষ্টায় আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি হলেন ব্যতিক্রম। হিন্দু কলেজই সর্বপ্রথম এক নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করল— এঁরা নব্য আদর্শে দীক্ষিত। হিন্দু-কলেজের ছাত্রদের সম্পাদিত নানা সাময়িকপত্রে পার্থিনন, জ্ঞানান্বেষণ, হিন্দু পাইওনীয়র, বেঙ্গল স্পেকটেটর, এনকয়ারার, কুইল প্রভৃতি পত্রিকায় পুরাতনের প্রতি অবিশ্বাস অবিরত ধ্বনিত হতে লাগল।

"Free Will, free ordination, fate, faith, the sacredness of truth, the high duty of cultivating virtue, and the meanness of vice, the nobility of patriotism, the attributes of God, and the arguments for and against the insistence of the duty as these have been set forth by Hume on the one side, Ried and Dugald Stewart and Brown on the other ; the hollowness of idolatry, and the shams of the priesthood, were subjects which stirred to the very depths of the young, fearless, hopeful hearts of the leading Hindoo youths of Calcutta.[১৯]

নবীনের দীক্ষাগুরু

"ফরাসী বিপ্লবের আন্দোলনের তরঙ্গসকল ভারত ক্ষেত্রেও আসিয়া পৌছিয়াছিল। ১৮২৮ সালে যাঁহারা শিক্ষাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন ও যে যে কবি ও গ্রন্থকারের গ্রন্থাবলী অধীত হইত, সেই সকল শিক্ষকদের মন ও উক্ত গ্রন্থাবলী ফরাসী বিপ্লবজনিত স্বাধীনতা প্রবৃত্তিতে সিক্ত ছিল বলিলে অত্যুক্ত হইবে না। বঙ্গীয় যুবকগণ যখন ঐসকল শিক্ষকের চরণে বসিয়া শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন তখন তাঁহাদের মনে এক নব আকাঙ্ক্ষা জাগিতে লাগিল। সর্বপ্রকার কুসংস্কার, উপধর্ম ও প্রাচীন প্রথা ভগ্ন করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের মনে প্রবল হইয়া উঠিল। ভাঙ্গ ভাঙ্গ ভাঙ্গ এই তাঁহাদের মনে ভাব হইয়া দাঁড়াইল। ইহাও অতিরিক্ত পাশ্চাত্য-পক্ষপাতিত্বের অন্যতম কারণ, ফরাসী-বিপ্লবের এই আবেগ বহু বৎসর ধরিয়া বঙ্গসমাজে কার্য করিয়াছে; তাহার প্রভাব এই সুদূর পর্যন্ত লক্ষ্য করা গিয়াছে।"[২০]

লক হলেন তখন অত্যন্ত আধুনিক, যদিও তিনি "carried out the Baconian programme". লক সম্বন্ধে প্রখ্যাত অধ্যাপক ব্যসিল উইলি বলেছেন, "John Locke stands at the end of the Seventeenth century and at the beginning of the eighteenth century. His work is at once a summing up of the seventeenth century conclusions and the starting point of the eighteenth century enquiries. It was Locke who determined the subsequent course of philosophical development."[২১]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও ফরাসী-বিপ্লবের পশ্চাতে তাঁর প্রভাব সবাপেক্ষা কার্যকরী; বেন্থাম মতবাদ তার দর্শনেরই অনিবার্য পরিণতি। "Locke was a contemporary and friend of Newton; his great book, The Essay concerning Human Understanding was published at almost the same moment as Newton's Principles. His influence has been enormous, greater, in fact, than his abilities would seem to warrant, and this

influence was not philosophical, but quite as much political and social. He was one of the creators of the eighteenth century literature: democracy, religious toleration, freedom of economic enterprise, educational progress—all owe much to him, the English Revolution of 1688 embodied his ideas; the American Revolution of 1776 and the French Revolution of 1789 expressed what had grown in a century, out of his teaching. And in all these movements, philosophy and politics went hand in hand. Thus practical success of Locke's ideas has been extra-ordinary.[২২]

লকের মতবাদের এই বিশ্ববিজয়ের ইতিহাসের সঙ্গে ভারতের নামও যুক্ত হোল। রামমোহন তাঁর Precepts of Jesus গ্রন্থে বার বার লকের যুক্তিপ্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। রামগোপাল ঘোষও "লক ষ্টুয়ার্টের দর্শনশাস্ত্র, সেক্সপিয়ারের নাটক, রাসেলের ইউরোপ বৃত্তান্ত এবং পদার্থবিদ্যার উপক্রমণিকা প্রধানরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন।"[২২ক]

বেকনের জনপ্রিয়তার কথা পূর্বেই বলেছি; ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই বেকনের Novum Organum-এর দুইটি সংস্করণ বেরিয়েছিল; একটির সম্পাদনা করেন রেভারেণ্ড টি. স্মিথ; অপরটির সম্পাদনা করেন হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ কার। মিঃ কার তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছিলেন, "He is not alone, but he is the greatest among the percusors of scientific thought in England. It was the trumpet which roused Europe, not indeed from torpid slumber, but from idle and fantastic dreams, such as Asia is still dreaming; from which she is still to be awakened."[২৩]

বেকন-প্রসঙ্গ রামমোহন বার বার উচ্চারণ করতেন; নানা সাক্ষ্যে এ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ বসু বেকনের যুক্তি-বিজ্ঞানের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। "Vedantic doctrines Vindicated" নামক প্রবন্ধে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "Has the Baconian philosophy a more natural connection with

Christianity than with Hindooism! Would it not have been received in all christendom as the means of discovering the hidden paths and ways of nature, even though the illustrious Bacon had been born in Thibaut or Kamaschatka?[২৪]

আর রাজনারায়ণ সম্পর্কে ঈশ্বরগুপ্ত ছড়া কেটেছিলেন, "বেকন পড়িয়া করে বেদের বিচার।" এই ছড়াটি রাজনারায়ণ বসু সকৌতুকে তাঁর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বার্কলে-দর্শন অপেক্ষা বেকন-দর্শনকে প্রকৃষ্টতর মনে করতেন। সংস্কৃত কলেজের পাঠ্যসূচী (Curriculum) নিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে বালানটিন সাহেবের যে বিতর্ক হয়, তাতে শেষ পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় জয়ী হন। এই বিতর্কে বিদ্যাসাগর মহাশয় বেকন, লক ও মিলের দর্শনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। হরকান্ত ঘোষ বেকন-নিবন্ধ অনুবাদ করেছিলেন; সেকালের বিখ্যাত পণ্ডিত রামকমল ভট্টচার্যও বেকন অনুবাদ করেছিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ধর্মদাস অধিকারী বেকন-প্রবন্ধ অনুবাদ করেছিলেন। এ-ছাড়া বেকন সম্পর্কে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে; বা বিভিন্ন প্রবন্ধে বেকন প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। অক্ষয় কুমার দত্ত তাঁর বিবিধ রূপক রচনায় বেকনের Atlantis গ্রন্থের আদর্শ গ্রহণ করেছেন। শ্রীরামপুরের জনৈক মিশনারী রেভারেণ্ড ওয়ার্ড ১৮২০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে তাঁর বন্ধুকে লিখিত এক পত্রে দুঃখ করেছিলেন এই বলে যে, ভারতে কোন বেকনের জন্ম হয়নি। ভারতে একজন নয়, একাধিক ক্ষুদে বেকনের জন্ম হয়েছিল; মিঃ ওয়ার্ডের দুঃখ অহেতুক। তৃতীয় ও চতুর্থ দার্শনিক হলেন পেইন ও হিউম।

পেইনের দার্শনিক স্বতন্ত্রতা কিছু নেই। তিনি লক-অনুসারী। তৎকালে Age of Reason-এর জনপ্রিয়তা নিয়ে একাধিক গল্প প্রচলিত আছে। ইয়ং বেঙ্গলরা এঁদের প্রতি যে অতিশয় প্রেমপূর্ণ ছিলেন, তার উল্লেখ করেছেন রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডাফ্—"Their great authorities were Hume's Essays and Paine's Age of Reason. With copies of the latter in particular, they were abundantly supplied...

It was some wretched bookseller in the United States of America who, basely taking advantage of the reported infidel leanings of a new race of men in the East and apparently regarding no God but his silver dollars despatched to Calcutta a cargo of the most malignant and pestiferous of all anti-Christian publications. From one ship a thousand copies were landed, and at first were sold at the cheap rate of one rupee per copy ; but such was the demand that the price soon rose. Besides the separate copies of the Age of Reason, there was also a cheap American edition, in one thick vol. 8VO. of all Paine's works including the 'Rights of Man', and other minor pieces, political and theological."[২৫] সেকালে এক টাকা দামের বই পাঁচ টাকায় বিক্রি হয়েছিল। সংবাদপ্রভাকরে 'Age of Reason'-এর অংশবিশেষ অনূদিত হয়েছিল। এবং এই অনুবাদে খৃষ্টীয় মিশনারীরা যে আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিল, তারও নজির আছে। আলেকজাণ্ডার ডাফ নাকি এই অনুবাদ দেখে বলেছিলেন, "Here the evil genius of Paine was again resuscitated. Passages from his Age of Reason were often translated verbatim into Bengali and inserted in the native newspapers."[২৬]

পুরানা খৃষ্ট-বিরোধী বাংলা রচনার উৎস অনুসন্ধানে Calcutta Review পত্রিকায় বলা হয়েছিল, "Their notions of the religion of Jesus were drawn chiefly from Paine's "Age of Reason" and pages of Gibbon and Hume."[২৭]

হিউম সেকালে এদেশে বিশেষ জনপ্রিয় দার্শনিক ছিলেন ; এই জনপ্রিয়তার কারণ তৎকালের অবিশ্বাস ও সন্দেহবাদ। শুধুমাত্র পাশ্চাত্ত্য প্রভাব এর কারণ নয়, দেশীয় ভাবাদর্শের ব্যর্থতা-বিকৃতিও এর জন্য দায়ী। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে হরচন্দ্র ঘোষ হিউমের লেখার কিয়দংশ অনুবাদ করেন। অক্ষয় দত্ত হিউম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, একথা অনেকেই বলেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিরীশ্বরবাদী বা অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন, একথা "পুরাতন প্রসঙ্গে"

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন। এবং দুর্জ্ঞেয়তাবাদের পিছনে হিউমের যে হাতছানি ছিল, তা অবধারিত।

অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (কবিও বটে) হিউম-প্রভাবিত ছিলেন; রেভারেণ্ড লং লিখেছিলেন, "I am glad that like your master Hume you pay as much attention to style as to matter."[২৮]

"Cyrus's Travels by Chevalier Ramsay পড়িয়া প্রচলিত হিন্দু ধর্মে আমার বিশ্বাস বিচলিত হয়। তৎপরে রামমোহন রায়ের Appeal to the Christian Public in favour of the Precepts of Jesus এবং চ্যানিঙ্গের (Channing) গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টীয়ান হই, পরিশেষে কলেজ ছাড়িবার অব্যবহিত পূর্বে Hume পড়িয়া সংশয়বাদী হই। যে পুস্তক যখন পাঠ করা যায় তখনই সেইরূপ হওয়া অবশ্য বালকতা বলিতে হইবে। আর তখন যথার্থই বালক ছিলাম।"[২৯]

বালসুলভ চপলতার কথা না হয় বাদ দিলাম, প্রবীন ও স্থিতধী ব্যক্তিও হিউম-প্রভাবিত হয়েছিলেন। হিন্দু কলেজের অন্যতম শিক্ষক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংশয়বাদী ছিলেন এবং হিউম-প্রভাবিত ছিলেন—এখবরটি রাজনারায়ণ বসুই জানিয়েছেন।[৩০]

কাণ্ট, কঁৎ (Comte), ও মিল এ যুগেই বাঙ্গালা দেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পরিচিত হয়েছেন; কিন্তু আর দশ বৎসর পরেই তাঁদের প্রভাব সমাজের অভ্যন্তরে অধিকতর অনুভূত হবে।

পুরাতনের ভগ্নাবশেষ

কিন্তু এই নতুন-দর্শনে উদ্বুদ্ধ মানুষের সংখ্যা অধিক নয়। "The Renaissance was not a popular movement; it was a movement of a small number of scholars and artists."[৩১]

শুধু ইউরোপের ক্ষেত্রে এই অভিমত সত্য নয়, আমাদের দেশের পটভূমিকাতেও এটা প্রযুক্ত হতে পারে।

দেশের অধিকাংশ লোকই বিগত দিনের বিশ্বাস নিয়ে দিন যাপন করত;

সেই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের নামে বিলাসের আড়ম্বর, সাহিত্যের নামে স্থূল ইন্দ্রিয়-চর্চা ; নৃত্য-গীতের নামে উদ্দাম-উন্মত্ততা !

অর্থ যে ভাবেই উপার্জিত হোক, সেই অর্থ এবম্বিধ "সৎপথে" ব্যয়িত হলেই তাঁরা কৃতকৃতার্থ হতেন। আর সমাজের বৃহত্তম অংশ যেহেতু পশ্চাৎপদ, তাঁরা "উপার্জিত অর্থের সদ্ব্যবহার করিলেই তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতেন।"[৩২]

ধনাঢ্য ব্যক্তিরা এই সমাজের অধিনায়ক ; আর, ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা তাঁদের দার্শনিক বা তত্ত্বব্যাখ্যাকারী। এই সমাজের আনুকূল্যে যে সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হত, তার কিছু ফিরিস্তি এখানে দেওয়া গেল :—

১৮২৪— প্রাণতোষিণী, মুণ্ডমালা, মৎস্যসূক্ত, মহিষমর্দিনী, মায়াতন্ত্র, মাতৃকাভেদ, মাতৃকোদয়, মহানির্বাণ, মালিনী-বিজয়, মহানীলতন্ত্র, মহাকাল সংহিতা, মেরুতন্ত্র, ভৈরবীভূতডামর, বীরভদ্র, বীজচিন্তামণি, একজটা নির্বাণমন্ত্র, তারারহস্য।

১৮২৫, ২২ জানুয়ারী— পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়কৃত পদ্মপুরাণান্তর্গত রতিক্রিয়া-যোগসারের পয়ার অনুবাদ। কৃষ্ণমোহন দাসকৃত রতিমঞ্জরী, পদাঙ্কদূত, পঞ্চাঙ্গসুন্দরী, আনন্দলহরী, রাধিকা-মঙ্গল।

বারাণসী আচার্যকৃত কালীর সহস্র নাম, বিষ্ণুর সহস্র নাম, রাধিকার সহস্র নাম। রামকমল সেনের জনসন ডিকসনরী, কেরীর ডিকসনরী, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূতীবিলাস, কবিতা রত্নাকর।

১৮২৬, ২২ আগষ্ট— প্রাচীন পদাবলী, চাতকাষ্টক, ভ্রমরাষ্টক, পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, বানরাষ্টক, বানর্যষ্টক।

১৮৩০— শঙ্করগীতা, বায়ুব্রহ্ম, আসামবুরঞ্জি, ভাগবতের একাংশ। মহাভারতের আদিপর্ব, সভাপর্ব, বিদ্যাসুন্দর, নিত্যধর্ম, রসমঞ্জরী, পদাঙ্কদূত, মানসিংহোপাখ্যান, পঞ্জিকা। সংসারসার, গঙ্গাভক্তি, বিষ্ণুর সহস্র নাম, অভয়ামঙ্গল, চন্দ্রকান্ত, রতি-মঞ্জরী, ভাগবত, ব্যবস্থার্ণব, নল-

দময়ন্তী, বিদ্যাসুন্দর, অন্নদামঙ্গল, মহিম্নস্তোত্র, কর্ম-
বিপাক, নিত্যকর্ম, বেলাল চন্দ্রবংশ, পঞ্জিকা।

তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই ; এই তালিকা হতে তখনকার সাংস্কৃতিক চিত্র উদ্ঘাটিত হবে। এই পুস্তক-তালিকার সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ মিলিয়ে পড়লেই উভয়প্রকার গ্রন্থরাজির পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম হবে।

পুরাতন ভাবধারার ধারক ও বাহকেরা নব্য শিক্ষাদীক্ষার জনপ্রিয়তাকে খুশীমনে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উপদেশ দিলেন : "তুমি লোকা (Locke) ও বেকনের গ্রন্থে মিথ্যা কালক্ষেপণ করিতেছ, তাহা অপেক্ষা বরং আলেপ বে পড়িলে ভাল হয়।[৩৩]

"মনে করিলাম ছেলেটির বিদ্যা তো বিদ্যার মত হইল ভাল অন্য ২ বালকের কি রীতি ইহা জানা উচিত পরে দেখিলাম আমার বাচ্চার রীতি অন্য হইতে নূতন নহে উপর উক্ত লক্ষণ সকলি আছে অধিকন্তু যথার্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে চোর ও ডাকাইত গরু বলে পিতৃব্যপিতৃদিগকে নির্বোধ কহে মিথ্যার সেবা যথেষ্ট করে কিন্তু বাহ্যে সত্যবাদির ন্যায় তাহারা কেহ নাস্তিক কেহ বা চার্বাক কেহ একাত্মবাদী কেহ বা দ্বৈতবাদী নিশ্চিত আচার-ব্যবস্থার দ্বেষী যাহা ভাল বোধ হয় সেই গ্রাহ্য ইঙ্গরেজী ব্যবহার ও চলনে অসীমক ভক্তি বিষয়কর্ম আর অন্য প্রকরণে সুস্তি এবং অমনোযোগী দীর্ঘসূত্রী কিন্তু যখন হাঁটে ইঙ্গরেজদের মত মস্‌মস্‌ করিয়া দ্রুত চলে স্বদেশীয় তাবৎ বিষয় দ্বেষ করে···ইহারা স্থানে স্থানে সভা করিয়াছে···তাহাতে আচার-ব্যবহার ও রাজনিয়মের বিবেচনা করে"···হিন্দুকালেজ ছাত্রস্য পিতঃ[৩৩ক]।

বাড়াবাড়ি যে হয়নি, তা নয়। কোন্ নতুন আদর্শ আতিশয্যময় নয় ? নবীন যৌবন চিরকালই উদ্দাম, হয়ত উচ্ছৃঙ্খল ! হিন্দুকলেজের ছাত্ররা বিদেশী অনুকরণের কবলে প'ড়ে আতিশয্য প্রকাশ করেছে। মাইকেলের "একেই কি বলে সভ্যতা" এবং দীনবন্ধু মিত্রের "সধবার একাদশী"তে এই নতুন আলোকপ্রাপ্ত যুবাজনের আচরণ বর্ণনা করা হয়েছে। ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও শেষোক্তদলই নবীন পৃথিবীর দিশারী।

রাজনীতি

মোহভঙ্গের ইতিহাস

অষ্টাদশ শতকের মানুষ বৃটিশ-বিজয়ের রাজনৈতিক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেনি। সেই কারণে হাজার হাজার মানুষের নির্লিপ্ততা বিজয়ী লর্ড ক্লাইভের বিস্ময়ের কারণ হয়েছিল। কিন্তু ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের পর থেকেই এর গুরুত্ব অনেকটা অনুমানের বিষয় হয়ে পড়েছে। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে এক আইন বলে ভারতীয়দের উচ্চপদাধিকার রহিত হয়ে গেল—মহম্মদ রেজা খাঁ, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, সীতাব রায়দের কাল শেষ হোল।

সদর নিজামত মুর্শিদাবাদ থেকে একেবারে স্থায়ীভাবে কলকাতায় উঠে এল; মুসলমান ন্যায়াধীশের স্থলে সপার্ষদ গভর্ণর জেনারল বাহাদুর বিচার-বিভাগেরও সর্বোচ্চ ক্ষমতা গ্রহণ করলেন।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত কর্নওয়ালিশ 'কোর্ড' অনুযায়ী বিচার-বিভাগ ও শাসন-বিভাগের পৃথকীকরণ সম্পন্ন হোল। এই পৃথকীকরণের ফলে বিচার-বিভাগে দেশীয়দের এতকালের আধিপত্যের অবসান ঘটল। শাসন ও বিচার—উভয়-বিভাগেই বৃটিশের একচ্ছত্র অধিকার কায়েম হোল। "The net result of the changes introduced by Cornwallis was to divide the entire administrative work in a district between two European officers, one acting as a Collector of Revenue, and the other as a Judge and Magistrate. Indians were deliberately excluded from offices involving trust and responsibility."[৩৪]

বিচার বিভাগের ন্যায়পরায়ণতার কথা তুলতে চাই না; কিন্তু শাসন বিভাগের কাজকর্ম যে বিশেষ সুপরিচালিত হয়নি, তা বলাই বাহুল্য। কারণ রাজস্বআদায়ে এমন একটা অবিচার চলছিল, যার ফলে চাষী ও শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ অনবরতই বিদ্রোহ করছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে সুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহ সমুদ্রতরঙ্গবৎ একটির পর একটি এসে সমাজ-দেহের উপর আছড়ে পড়ছিল। অষ্টাদশ শতকে বাংলার বৃটিশ বিজয়ের পরই সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ঘটে; বিভিন্ন

অঞ্চলে চাষী ও তাঁতি বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুরের চাষীরা বিদ্রোহ করেন; তাঁদের নেতা দরজী নারায়ণ নিজেকে নবাব বলে ঘোষণা করেন। মেদিনীপুরে লবণ শিল্পে মালঙ্গীরা, শান্তিপুরে তাঁতিরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর ও বীরভূমে বড় আকারের কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে চোয়ার বিদ্রোহ অষ্টাদশ শতকের সর্ববৃহৎ বিক্ষোভ।

এই সমস্ত বিক্ষোভ-বিদ্রোহে কোন সুসংগঠিত সংগঠন ও মতাদর্শ ছিল না। সাময়িক অত্যাচার ও অবিচারের প্রতিবাদেই এগুলির জন্ম। এবং এ-গুলির পশ্চাতে শিক্ষিত জনসমাজের কোন নৈতিক সমর্থন ছিল না। অবশ্য শিক্ষিত জনসমাজ তখনও নেতৃত্বের আসনে বসতে পারেনি। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে অন্ততঃ দশটি বিদ্রোহের খবর পাওয়া যাচ্ছে। এ-গুলি ধীরে ধীরে সাংগঠনিক রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে; এগুলি থেকে স্বতঃস্ফূর্ততার অবসান ঘটে: তাতে মতাদর্শের ছোঁয়াও লাগতে থাকে।

কটকে পাইক বিদ্রোহ (১৮১৭), ফরিদপুর-বারাসাত প্রভৃতি অঞ্চলে ওয়াহাবী বিদ্রোহ (১৮৩১-৫৭), মানভূমে ভূমিজ বিদ্রোহ (১৮৩২), উত্তর-পূর্ব-সীমান্ত প্রদেশে খাসিয়া বিদ্রোহ (১৮৩৩), ময়মনসিংহে পাগলাপন্থীদের বিদ্রোহ (১৮৩৩), কাছাড়ে কুকি বিদ্রোহ (১৮৪৪), উড়িষ্যায় খোন্দ বিদ্রোহ (১৮৪৬), বীরভূমে সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫), নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯), পাবনায় কৃষক বিদ্রোহ (১৮৫৯)—সবগুলি বিদ্রোহের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এ-গুলির ঘটবার মূল কারণ রাজস্ব নীতি; কোন বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রশ্ন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর সঙ্গে জড়িত নয়। এ-সব আন্দোলনের প্রথম স্তরে উনিশ শতকের নতুন মানুষ সাড়া দেয় নি; পরে দিয়েছে। সে চেতনার উন্মেষ বিলম্বে ঘটার কারণ আছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ সুরু হবার পূর্বেই নিম্নলিখিত সমাজ-সংস্কার-মূলক আন্দোলন দেখা দেয়—

(১) আধুনিক উচ্চশিক্ষার জন্য আন্দোলন; ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা।

(২) সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলন এবং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সতীদাহ প্রথা রদ।

(৩) দাসত্বপ্রথা বিলুপ্তির আন্দোলন—১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে দাসত্ব প্রথা বিলোপ।

(৪) স্ত্রীশিক্ষার জন্য আন্দোলন—১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা।

(৫) নারীমুক্তি আন্দোলন—১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তন।

এই আন্দোলনগুলির ফলে বাংলার জনসমাজের মধ্যে এক নতুন ভাব-আন্দোলন দেখা দিল। ধর্মীয় অনুশাসন ও আচারসর্বস্বতার বিরুদ্ধে যুক্তি ও হৃদয়ধর্ম বড় হয়ে দেখা দিল। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ও নব্যশিক্ষিতেরা মুদ্রিত গ্রন্থ পড়ে যে নব্য জ্ঞান আহরণ করেছিলেন, তা এই আন্দোলনসমূহের মধ্য দিয়ে সমাজের মধ্যে সঞ্চারিত হোল। ব্যক্তিগত ভাবে নব্যশিক্ষিতেরা যে নবীন জ্ঞান লাভ করেছিলেন, তা এই ভাবে সামাজিক উত্তরাধিকারে পরিণত হোল। সমাজের এক বিশেষ অংশ এইভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে—social cohesion দেখা দিতে থাকে।

নবীন শিক্ষার প্রতি আগ্রহ আমরা ইতিপূর্বেই বর্ণনা করেছি। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাসংক্রান্ত পার্লামেণ্টারী কমিটি গঠিত হোল। তারই ফলে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে (বিশ বৎসর পরে) বের হোল মিঃ উডের লিপি (Wood's Despatch)। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হোল, আধুনিক শিক্ষার আন্দোলন এইভাবে উচ্চতম সাংগঠনিক রূপ পেল।

সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে যেমন আন্দোলন চলছে, নবীন শিক্ষার প্রতি যেমন আগ্রহ বাড়ছে, তেমনি রাষ্ট্রপরিচালনায় ন্যায্যঅংশ প্রাপ্তির পক্ষে ধীরে ধীরে আন্দোলন দেখা দিল। এই আন্দোলনের অংশগ্রহণকারীদের চরিত্র পৃথক। পুরাণো ভাবধারায় শিক্ষিত বা আদৌ শিক্ষিত নয় এমন সম্প্রদায়ের আন্দোলনএ নয়। নব্য শিক্ষিতদের আন্দোলন আবেদন-নিবেদনের পথ বেয়ে অগ্রসর হোল—একেই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন বলা হয়।

দেশীয়দের দায়িত্বপূর্ণ সহযোগিতা ব্যতীত দেশশাসন সম্ভব নয়, একথা উনিশ শতকের নব্যশিক্ষিতেরা বারবার বলেছেন।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে প্রেস আইনের বিরুদ্ধে, ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে জুরি আইনের বিরুদ্ধে রামমোহন প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছিলেন। রায়তদের দুর্গতি মোচনের জন্যও

এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে অভিমত প্রকাশিত হয়। সরকারী চাকুরীতে দেশীয়দের দায়িত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণের দাবী এই সময় উপস্থিত হয়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে যখন সনদ সংশোধনের সময় উপস্থিত হোল, তখন রাজা রামমোহন রায় বিলেতে গিয়ে ভারতীয়দের দাবীদাওয়া বৃটিশ জনমতের সম্মুখে রাখলেন। তার ফলে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে নতুন সনদে বলা হোল যে, কোন ভারতীয় "shall by reason only of his religion, place of birth, descent, colour, or any of them be disabled from holding any office of employment under the Company." তবে এই সুপারিশ বহু মহৎ বাক্যের মতই কালো কালির দয়াহীন অক্ষরের অবয়বের মধ্যেই মৃতকল্প হয়ে থাকল।

রামমোহনের অনুপ্রেরণা তবে ব্যর্থ হোল না। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ১৮ই এপ্রিল হিন্দু কলেজের ছাত্ররা টাউন হলে এক জনসভা আহ্বান করলেন। সেই সভায় তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রধান প্রস্তাবটি উত্থাপন ক'রে বললেন যে, সিভিল সার্ভিসে ইংরেজদের একচেটিয়া অধিকার ন্যায়সঙ্গত নয়। তাঁরা এক আবেদন-পত্র যথাস্থানে সেদিন পাঠালেন।

এই আন্দোলন বাংলার সংবাদপত্র জগতেরও অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করল। ডিরোজীয়পন্থী ছাত্রদের সঙ্গে তারা গলা মিলাল। ইংরেজী বিদ্যায় হিন্দু কলেজের ছাত্ররা যথার্থই পারঙ্গম হয়ে উঠছে, অথচ তদনুপাতে কোন সম্মানীয় চাকুরী পাচ্ছে না। "ঐ সকল ছাত্র অতুল অধ্যয়ন করিয়াছেন, শিল্পবিদ্যাতেও নিপুণ এবং গদ্য ও কবিতা এমত লেখেন বোধ হয় তাঁহারদের স্বদেশীয় ভাষাতে তাহারদের হস্ত হইতে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ পাইতেছে তাহা দৃষ্টি করিলে বোধ হইতে পারিবেক তত্রাপি গবর্ণমেণ্ট হইতে কৃপণীয় মনোনীত হইয়া তাঁহারদের গুণাগুণের পুরস্কার হয় না……এতন্নিমিত্ত আমি মহাশয়ের নির্মল দর্পন দ্বারা শ্রীল শ্রীযুত গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের কর্ণগোচর করিতে প্রার্থনা করি যে ঐ সকল ছাত্রেরা বহুকালাবধি কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ইঙ্গরেজী বাঙ্গালা এবং এবং পারশ্য ভাষাতে নিপুন হইয়াও ন্যায় পরিতোষিক না পাইয়া সামান্য কেরাণীর সমপদী হইলেন জুদিসিয়াল ও রেবনিউ সম্পর্কীয় যে সকল উচ্চপদ প্রকাশ পাইয়াছে তত্রাপি ঐ সকল ছাত্রেরা অর্থ ও বন্ধু বিরহ জন্য ঐ সকল পদশূন্য হইয়াছেন যদ্যপি শ্রীল শ্রীযুত গবরর্ণর জেনারেল বাহাদুর কালেজের

ছাত্রদের পক্ষে সহকারিতা করিয়া ঐ পদাভিষিক্ত করেন যেহেতু তাঁহার সহকারিতা ব্যতিরেকে ঐ পদ পাওনের তাঁহারদের কোন সম্ভাবনা নাই তবেই তাঁহারদের পরিশ্রম ও গুণের যথার্থ পুরস্কার হয়।"[৩৫]

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে 'সমাচার দর্পণে' জনৈক পত্রলেখক সবিনয়ে উল্লিখিত ক্ষোভসূচক পত্রটি প্রকাশ করেছেন। লর্ড বেন্টিংক তাঁহার সহজাত কাণ্ডজ্ঞানের বলে বুঝতে পেরেছিলেন যে, দেশীয়দের সহযোগিতা ব্যতীত রাজ্যশাসন সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ হতে পারে না। তাই তিনি উদ্যোগী হয়ে এই ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে দেশীয়রা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটারের পদে নিযুক্ত হবার অধিকারী হলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে সবাইকে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার অধিকার দেওয়া হোল। তবে তার জন্য ন্যূনতম বয়স ধার্য করা হল ২১ বৎসর। কাজেই এক হাতে দান করে, আর এক হাতে সেই অধিকার কেড়ে নেওয়া হোল। সরকারী চাকরীতে দেশীয়দের অধিকার স্বীকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি আন্দোলন দেখা দিল। ভারতবাসী 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' ছিল। এমন যে ধর্মাধিকরণ, সেখানেও বর্ণবৈষম্য ছিল। বীটন আইনের চক্ষে সাদা কালোর ভেদ বিলুপ্ত করার প্রয়াসী হলেন। সেই আইনকে সাদারা 'কালো কানুন' বলে অভিহিত করল, তার বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রতিরোধ আন্দোলন গ'ড়ে তুলল। এই প্রস্তাবিত আইনটির সমর্থনে দেশীয়দের মধ্যেও এক আলোড়ন দেখা দিল। বিখ্যাত বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রভৃতির বক্তৃতা-কুশলতা বিতর্ক সভার বাইরে এই প্রথম একটা মঞ্চ খুঁজে পেল। শ্বেতকায়দের প্রবল প্রতিরোধে স্বজাতিবৎসল শাসক এই আইন প্রত্যাহার করলেন। "কালো আইনের বিরোধী ইংরাজগণ জয়যুক্ত হইলেন; যে আন্দোলনের ঝড় উঠিয়াছিল, তাহা থামিয়া গেল; মহামতি বীটন পরলোকগমন করিলেন; কিন্তু দেশীয় শিক্ষিতদের মনে একটা গভীর অসন্তোষ থাকিয়া গেল। একতা ও আন্দোলন দ্বারা কি হয় তাহা তাঁহারা চক্ষের উপর দেখিলেন। ইংরাজগণ তাঁহাদের চীৎকারের ধ্বনিতে কিরূপ ভুবন কাঁপাইয়া তুলিলেন, কিরূপে দেখিতে দেখিতে শত শত ব্যক্তি একত্র হইলেন, কিরূপে দেখিতে দেখিতে ৩৬ হাজার টাকা তুলিলেন, এ সমুদয় যেন ছায়াবাজীর ন্যায় তাঁহাদের নয়নের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইল। রামগোপাল ঘোষ ইংরেজদিগের

অবলম্বিত নীতির প্রতিবাদ করাতে এগ্রিহর্টিকালচরল সোসাইটিতে কিরূপে তাঁহাকে অপমানিত হইতে হইল তাহাও সকলে অবগত আছেন। অনেকে সেই অপমানে আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিলেন। এই সকল কারণে শিক্ষিত দলের মধ্যে রাজনীতির আন্দোলনের জন্য সম্মিলিত হইবার বাসনা প্রবল হইল। তাঁহারা বুঝিলেন স্বদেশের হিতের জন্য সমবেত হওয়া আবশ্যক।"৩৬

এইভাবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম ত্বরান্বিত হোল। সমাজসংস্কার আন্দোলন এর ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেও রাজনৈতিক আন্দোলন থেকেই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্মকথা

একদিকে আধুনিক শিক্ষা যেমন তাকে জীবন সম্পর্কে কৌতূহলী করছে, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে আশান্বিত করছে, আবার শাসন ব্যবস্থায় তার সীমিত অধিকার, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার উদ্যম-হরণ তাকে হতাশ ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিহান করছে। এইসব প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটেছে নানা সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে, নানা সভা-সমিতির মাধ্যমে। এইসব সাময়িক পত্রিকা ও সভা-সমিতি শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সমাজ-বোধ উজ্জীবনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। রামমোহনের আত্মীয়সভা, ডিরোজিওর একাডেমিক এসোসিয়েসন, ডিরোজিওপন্থীদের জ্ঞানান্বেষণ সভা (Society for the Acquisition of General Knowledge), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী সভার বিবিধ সামাজিক ও ধর্মীয় মতামত ও আলোচনাদি থেকে সমসাময়িক যুগের জীবন-জিজ্ঞাসা প্রতিফলিত হচ্ছিল। এই সমস্ত সামাজিক ও ধর্মীয় আলোচনাদির মধ্য থেকে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক প্রশ্ন দেখা দিতে লাগল; এবং সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকেই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অংকুর-উদগম হোল। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ভূম্যধিকারী সভা (Landholders' Association) গঠিত হোল। জমিদারদের নিরংকুশ অধিকার থাকলেও পূর্বতন সামন্ত অধিপতির মত বিচার বিভাগীয় ও শাসনতান্ত্রিক কোন অধিকার তাঁদের ছিল না। এই সব কারণে জমিদারগণ এক সংগঠন খাড়া করে নিজেদের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হলেন।

রামমোহন রায় ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বিলেত যান; সেখানে তিনি ইংলণ্ডের গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা অবলোকন করেন; ইতিপূর্বে বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্য দিয়ে এ বিষয়ে তিনি অবহিত ছিলেন।

প্রিন্স দ্বারকানাথের বিলাত যাত্রার রাজনৈতিক (এবং অর্থনৈতিক) গুরুত্ব আছে; তিনি ইউরোপের বহু মনীষীর সান্নিধ্য লাভ করেন। তাঁর সঙ্গে বৃটেনের উদারনৈতিক নেতা প্রখ্যাত বাগ্মী মিঃ টমসন ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে আসেন। টমসনের উদ্যোগে ঐ বৎসরই ২০শে এপ্রিল British India Society গঠিত হোল। ভূম্যধিকারী (Landholders' Association) ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির ভূমিকা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান ঐতিহাসিক ভোলানাথ চন্দ লিখলেন, "One represented the aristocracy of wealth, the other the aristocracy of of intelligence."[৩৭]

দ্বারকানাথ অবশ্য বিলাত ভ্রমণকালে শেফিল্ড, নিউ ক্যাসেল, ম্যাঞ্চেষ্টার, বার্মিংহাম, লিভারপুল, এডিনবরা, গ্লাসগোর শিল্পকেন্দ্রগুলি বিশেষভাবে দেখে আসেন। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কলকারখানা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্য হোল স্বদেশে তাকে প্রয়োগ করা। কিন্তু তার সুযোগ অনুপস্থিত। রাজনীতি আর অর্থনীতি এইভাবে যুক্ত হোল।

হিন্দু কলেজ ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে নবভাবে সংগঠিত হোল, আর ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দেই প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হোল। এই কারণে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন, "১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বিংশতি বর্ষকে বঙ্গের জন্মকাল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে।"[৩৮]

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ভূম্যধিকারী সভা ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি সম্মিলিত হোল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল সাঁওতালবিদ্রোহ—আর সে আগুন নিভ্‌তে না নিভ্‌তেই 'সিপাহী বিদ্রোহ' সুরু হোল। তার পর 'নীলের হাঙ্গামা'। বিভিন্ন স্তরের মানুষ এইসব আন্দোলনে বিভিন্নভাবে যোগ দিয়েছিল। এইসব আন্দোলন থেকে অবশ্য কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল না। কিন্তু এসব আন্দোলন থেকে দেশের লোক শিক্ষা গ্রহণ করেছে। ক্রমশঃ ব্যাপকতর ভাবে দেশবাসীর মোহভঙ্গ ঘটছে। তার অর্থ অবশ্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামমুখীনতা নয়; বরং কখনও দেশবাসী সংগ্রামী, কখনও আত্ম-সমর্পণে উদগ্রীব।

তবু এইসব নানা আন্দোলন ও আবেগের মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ দেশবাসীর অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে, সে অগ্রগতি আত্মপ্রতিষ্ঠার। নানা সংবাদপত্রও জন্মলাভ করছে এবং একটি জাতীয় সম্মেলনের প্রতিষ্ঠা এইভাবে আসন্ন হয়ে উঠছে।

ভাঙনের ইতিহাস

ইংরেজ যখন পলাশী-যুদ্ধে জয়লাভ করে, তখন বাংলা দেশের অর্থনীতির বড়ই সচ্ছল অবস্থা। কৃষিজাত পণ্য প্রচুর উৎপন্ন হচ্ছে; এবং তার সঙ্গে শিল্পজাত দ্রব্যও পাল্লা দিয়ে চলেছে।

(১) "The whole difficulty of trading with the East lay in the fact that Europe had so little to send out that the East wanted—a few luxury articles for the court, lead, copper, quicksilver and tin, coral, gold, and ivory, were the only commodities except silver that India would absorb. Therefore it was mainly silver that was taken out."[৩৯]

(২) "In former times the Bengal Countries were the granary of nations, and the repository of commerce, wealth and manufacture in the East......

But such has been the restless energy of our misgovernment that within the short space of twenty years many parts of these countries have been reduced to the appearance of a desert. The fields are no longer cultivated; extensive tracts are already overgrown with thickets; the husbandman is plundered; the manufacturer oppressed; famine has been repeatedly endured; and depopulation has been ensued."[৪০]

তথ্য বেশি বাড়িয়ে লাভ নেই। দুইটি উদ্ধৃতি থেকেই বুঝা যাবে ভারতের

অর্থনীতির স্বয়ংসম্পূর্ণতা। পলাশী বিজয়ের পরে এই চরিত্র বদলাতে থাকবে। দ্বিতীয় উদ্ধৃতির শেষাংশে সে কথা বলা হয়েছে। পলাশী যুদ্ধের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয় পণ্য বিদেশে পাঠিয়ে মুনাফা লুণ্ঠন করত। তখন বাজার-দর অপেক্ষা শতকরা ১৫ থেকে ৪০ ভাগ পর্যন্ত কম দাম দিয়ে কোম্পানীর কাছে জিনিষ বেচতে ভারতীয় শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের বাধ্য করা হোত। ভারতীয় তন্তুবায়দের অবস্থা ক্রীতদাসের অপেক্ষাও হীন ছিল; তাদের কাছ থেকে জোর করে চুক্তিপত্রে সই আদায় করা হোত। ইংরেজের কারখানায় কাজ করবার ভয়ে অনেকে আঙুল কেটে ফেলত। বৃটেনে শিল্প-বিপ্লব ঘটলে নীতিরও পরিবর্তন ঘটল। তখন আর তৈরী মাল নয়, কাঁচা মাল রপ্তানী সুরু হোল। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে পার্লামেণ্ট বলল, ভারতে কাঁচা রেশম রপ্তানীর উৎসাহ দাও; কিন্তু রেশমবস্ত্র পাঠিও না। ১৭৮৬-১৭৯০ খৃষ্টাব্দে গড়ে ১ লক্ষ ২০ হাজার পাউণ্ড মূল্যের সূতীবস্ত্র ভারতে রপ্তানী হোত; ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াল ১৮ কোটি ৪ লক্ষ পাউণ্ড। পরবর্তীকালে তার পরিমাণ আরও বাড়বে ছাড়া কম হবে না।[৪১] "Thus we came to the threshhold of the nineteenth century in which Bengal's economy became fully subservient to that of England."[৪২] ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক একচ্ছত্রতা বিলুপ্ত হোল; কিন্তু তাহলেও ভারতীয়দের বাণিজ্যিক সুখসুবিধা বিশেষ সৃষ্টি হোল না। প্রথমতঃ মূলধনের অভাবে, দ্বিতীয়তঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূমিতে অর্থ বিনিয়োগ বেড়ে গেল। অষ্টাদশ শতকের অবসানে ও উনিশ শতকের প্রারম্ভে অর্থনৈতিক দুর্গতির জন্য ক্ষোভ কারুজীবীদের ও শ্রমজীবীদের মুখ থেকেই উত্থাপিত হয়েছে। উনিশ শতকের নব্যশিক্ষিত মানুষ আপন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রূঢ় আঘাত খেয়ে অবস্থা উপলব্ধি করল। কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা নিষিদ্ধ হলেও এজেন্সী হাউসের পত্তনের মধ্য দিয়ে বৃটিশ পুঁজির অনুপ্রবেশ অধিকার বৃদ্ধি পেল।

"Under the pretence of free trade, England has compelled the Hindus to receive the products of the steam-looms of Lancashire, Yorkshire, Glasgow, etc. at mere

nominal duties; while the hand-wrought manufacturers of Bengal and Behar, beautiful in fabric and durable in wear, have had heavy and almost prohibitive duties imposed on their importation to England."[৪৩]

১৭৯৩ থেকে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারত থেকে সূতীবস্ত্র রপ্তানীর উপর শতকরা ১৮ ভাগ থেকে ৭১ ভাগ শুল্ক ধার্য করা হোল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের পর এই শুল্ক রহিত করা হোল। এর কারণ বৃটিশ ন্যায়পরায়ণতা নয়। এর কারণ বৃটিশ শিল্প ইতিমধ্যেই পাকাপোক্ত হয়েছে। ভারতে আমদানী শুল্ক মাত্র শতকরা ২½ ভাগ ধার্য করা হয়েছে; অথচ ভারতে তৈরী বস্ত্র ভারতে বিক্রয় করতে হলেও অন্তর্দেশীয় শুল্ক দিতে হত শতকরা ১৭৲ টাকা হারে। এর ফল হোল কি? ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে বৃটেন থেকে ভারতে ১৯৪ পাউণ্ড সূতীবস্ত্র আমদানী হয়; ১৮১৩ সালে সেই আমদানীর পরিমাণ দাঁড়ালো ১০৮,৪২৪ পাউণ্ড। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ১৫২০ গজ কাপড় বৃটেন থেকে আসত; ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে—৬০,০০০,০০০ গজ, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে-৬৪,০০০,০০০ গজ কাপড ভারতে আসল। এর বিপরীত চিত্রই বা কি? বাঙলার বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র ঢাকার জনসংখ্যা দেড় লক্ষ থেকে কমে বিশ হাজারে দাঁড়াল। "We hold it (India) as the finest outlet for British goods in general, and for Lancashire in particular"—উক্তিটি নির্লজ্জ হতে পারে, কিন্তু সত্য।

বৃটিশ বিজয়ের প্রাক্কালে ভারত সূতীবস্ত্রশিল্প, জাহাজশিল্প, রেশমশিল্পে সমৃদ্ধিশালী ছিল। আমরা শুধু বস্ত্র-শিল্পের ধ্বংসসাধনের ইতিহাস বর্ণনা করলাম; এর থেকেই বৃটিশ অর্থনীতির মূল তাৎপর্য বোঝা যাবে। পুরানো যে শিল্প ছিল, এইভাবে তা ধ্বংস হোল।

ভারতে নূতন শিল্পায়ন

ইউরোপে নেপোলনীয় যুদ্ধ ঘটে গেল। আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা করল, এবং তা আদায় করল। ইউরোপ-আমেরিকায় এবার বৃটেন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হোল। ভারতে প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা নেই। কারণ ভারতে মূলধন বলতে যা ছিল, ক্লাইভ-সহচরদের লুণ্ঠনে নিঃশেষিত হয়েছে। যেটুকু

অবশিষ্ট ছিল তাও জমিদারী-প্রথা প্রবর্তনের ফলে আরামলোভী বাবু হবার ক্ষুধার নিবৃত্তিতে ব্যয়িত হোল। ফলে ভারতে বৃটিশ পুঁজি নিয়োগের পথ হোল নিরংকুশ। ভারতে বৃটিশ অর্থনীতির এই তৃতীয় স্তর এবং বৃটিশ পুঁজিরও ভারত-আবিষ্কারের এই হোল মর্মকথা। এর জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার বিলুপ্ত করা হোল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই পাটকল, চটকল ও কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। ধীরে ধীরে চা-চাষ ও নীল-চাষ ব্যাপক আকারে দেখা দেয়। কয়লা খনিরও বিকাশ হোল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম কাপড়ের কল, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে লোহার কারখানা, ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে কয়লা খনি, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে পাটকল ও ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে চা-শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে ভারতের মাটিতে আধুনিক যন্ত্রচালিত কলকারখানা গড়ে উঠল। বৃটিশ পুঁজি এগুলির প্রতিষ্ঠা করলেও ভারতের জাতীয় জীবনে এর প্রভাব অসামান্য। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ৫ই জানুয়ারী 'সমাচার-দর্পণে' চরকা-কাটুনী দরখাস্ত করছে তার দুর্ভাগ্যের প্রতিকারের আশায়—ম্যাঞ্চেষ্টার তার ভাগ্যকে জবরদখল করেছে। তার দশ বৎসর পরে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ৯ই জানুয়ারী সমাচারদর্পণ পাঠে জানতে পাই দিনমজুরদের দুঃখ দুর্দশার কথা—যারা মিস্ত্রীর কাজ করে, ইমারতী কর্ম করে, স্বর্ণকারের কর্ম করে, দরজীর কর্ম করে, তারা আজ কর্মহীন, বেকার। "সূচী ব্যবসায়ীরা এক্ষণে সূচ্যগ্র ভূমি ক্রয় করা দূরে থাকুক অন্নাভাবে সূচের ন্যায় শুষ্ক হইয়া গেল।"[৪৪] আমরা অষ্টাদশ শতকের চুঁচুড়ার দুর্ভিক্ষ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছি—সেখানে এক বিস্ময়কর নীরবতা ও নিস্পৃহতা প্রত্যক্ষ করেছি। আজ সেই নির্মম নিস্পৃহতার অবসান হচ্ছে—হৃদয়হীনতার স্থলে সমবেদনা দেখা দিচ্ছে। সমাচারদর্পণের সংবাদ-পরিবেশনভঙ্গীর মধ্যেও সেই তথ্যটুকু ধরা পড়েছে।

দেশীয় শিল্প মৃতপ্রায়; দুই-একটি কলকারখানা যা ভারতে আমদানী করা হচ্ছে, তার প্রতিক্রিয়াও কল্যাণকর নয়। ১৮২৬ সনে দেখছি, কলকাতায় "তণ্ডুল সম্পাদক নূতন যন্ত্র" স্থাপিত হওয়ায় ঢেঁকি ও ভাঁড়ানীদের কর্মসংস্থান হ্রাস পাচ্ছে।[৪৫] ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের আর এক বিজ্ঞপ্তিতে জানা যাচ্ছে যে, গঙ্গাতীরে একটি "৩০ অশ্বের বলধারী বাষ্পযন্ত্র" চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দুই হাজার মণ গম পিষ্‌ছে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে আর এক বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যাচ্ছে যে কলকাতায় গমপেষাই কল চালু হওয়াতে দেশীয় ব্যবসায়ীরা সংকটে পড়েছে।[৪৬]

দুর্গতদের অর্থনৈতিক দুর্দশায় দেশের লোক সহানুভূতি জানাচ্ছে—আজ আর "অন্যে পলাণ্ড দেখ্যা আমিও পলাণ্ড"—নয়। ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব ঘটায় বৃটিশ পুঁজি ভারতে একচ্ছত্র অধিকার আদায় করছে। তাছাড়া এই কারিগরী কুশলতার সঙ্গে রাজনৈতিক প্রশ্নও জড়িত। "Ever since the termination of the Napoleonic wars the British money-market had been growing steadier year by year and outgrowing rapidly the geographical limits of Britain."[৪৭] এখন আর হল্যাণ্ড আর ফ্রান্সের দিক থেকে প্রতিযোগিতার কোন কারণ নেই। তাছাড়া, ভারতে যন্ত্রপাতি আমদানী কার্যতঃ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কাজেই সেখানেও কোন প্রতিযোগিতার আশংকা নেই। "By means of heavy custom duties the exportation of machinery from the United Kingdom was prohibited."[৪৮] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি আমদানী করে কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়েছে মাত্র। রামদুলাল সরকার, মতিলাল শীল, মথুরামোহন সেন, লক্ষ্মীকান্ত বড়াল, স্বরূপচাঁদ বড়াল, সনাতন শীল—উনিশ শতকের আদিযুগ থেকে মধ্যযুগ অবধি দেশীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে খ্যাতনামা। কিন্তু এঁদের ব্যবসায় আমদানী-রপ্তানী, শেয়ার-বাজার ছাড়া মৌলিক শিল্পের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশে সক্ষম হয়নি। সেক্ষেত্রে দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বড় রকমের আঘাত পেয়ে এক্ষেত্রেও তাঁদের চক্ষুরুন্মীলন ঘটবে। দ্বারকনাথের বিলাতী অভিজ্ঞতা প্রয়োগ-ক্ষেত্রই বা এদেশে কোথায়?

দেশীয় মূলধন বৃটিশ পুঁজির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে কিছুকাল তিষ্ঠুতে পেরেছিল। কিন্তু ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের পর সে প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেল। একটিমাত্র উদাহরণ দাখিল করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ১৮৩০-৩২ খৃষ্টাব্দে—

১। পামার এণ্ড কোম্পানী

২। ক্রুটেনডন্ ম্যাককিলপ এণ্ড কোং

৩। আলেকজাণ্ডার এণ্ড কোং

৪। ফার্গুসন এণ্ড কোং

৫। ম্যাকিনটস এণ্ড কোং

৬। কলভিন এণ্ড কোং

একত্রে এই ছয়টি 'হৌস' প্রায় ১৫০ লক্ষ ষ্টার্লিং পাউণ্ড মূলধন নিয়ে

কারবার করত। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক তখনকার দেশীয়-বিদেশীয় শিল্প-সহযোগিতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এই ব্যাঙ্ক এই সমস্ত 'হৌস'কে বহু টাকা ধার দিয়েছিল, ধার দিয়েছিল এইসব 'হৌসে'র দেউলিয়া হবার সম্ভাবনার কথা জেনেও। এদের পতনে বিশেষ করে ফার্গুসন এণ্ড কোং, গিলমোর এণ্ড কোং—এই দুই কোম্পানীর পতনের ফলে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বিশেষ ভাবে আঘাত পেল। বাঙ্গালীর বিশিষ্ট ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান কার এণ্ড টেগোর এণ্ড কোম্পানীর সমস্ত স্থায়ী আমানত এখানে জমা ছিল। ফলে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনে এই কোম্পানীটি দেউলিয়া হয়ে গেল। ব্যাঙ্কটির ইংরেজ কর্ম্মচারীর চক্রান্তই এর পতনের কারণ। "He had contended against unlimited advances to particular houses; he had contended also against the working of the Indigo factories by the Bank's capital.[৪৯]

বৃহৎ ব্যবসা ও শিল্পজগত থেকে দেশীয় পুঁজি এইভাবে কোণঠাসা হয়ে পূর্বক্রীত জমিদারী তদারকে নিশ্চিন্ত হবার ভাণ করল। এই অবস্থা যে আদৌ সুখকর নয়, তা নীচের তলার সাধারণ মানুষের প্রতি নিবদ্ধ-দৃষ্টি হলেই হৃদয়ঙ্গম হবে। এখনকার জীবন আশাবাদে ও নৈরাশ্যে একই সঙ্গে আন্দোলিত হোল। অথচ বৈষয়িক জীবনেও পরিবর্তনের পদচিহ্ন অজস্র আঁকা। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে টেলিগ্রাফ ও ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে রেলপথ দেখা দিল। বাষ্পীয় জলযান দেখা দিতে শুরু করল। দূরত্বের দুর্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে চলল। নতুন যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতিতে পুরাতন জরদগব রক্ষণশীল কূপমণ্ডুক সমাজের মৃত্যু পরোয়ানা জারী হোল। ১৮৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দে সুয়েজ খাল খোঁড়া শেষ হোল; ১৮৬০ থেকে এই খালপথে যাতায়াত আরম্ভ হোল। ইউরোপের দূরত্ব এক লাফে অনেকটা কমে গেল। বৈষয়িক জীবনের বন্ধ্যাত্ব আর আধ্যাত্মিক জীবনের সম্ভাবনা—এই দুই বিপরীত পরিণতির দোলনায় দোল খেল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদের বাঙালী।

পোপ গেয়ে উঠেছিলেন ইংলণ্ডের মাটিতে

> Nature and Nature's laws lay hid in night;
> God said, Let Newton be! and all was light.

একই কথা বলেছিলেন বেকন সম্পর্কে ডিরোজিও। উভয়ের ভাষার মিল লক্ষণীয়। (২১ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

বৃটেনের সমাজে তখন "Wealth and leisure were on the increase, widely diffused among large classes ; civil peace and personal liberty were more secure than in any previous age ; the limited liability of the wars we waged oversea with small professional armies gave very little disturbance to the peaceful avocations of the inhabitants of the fortunate island."[৪৯ক] এই সুখকর অবস্থা ভারতে তখন কোথায় ? এই বৃটিশ উপনিবেশে একটু পূর্বেই দেশ-জোড়া বিদ্রোহের তরঙ্গ বয়ে গেছে ; আরও নানা তরঙ্গ আসছে। কিন্তু নবীন শিক্ষা, নবীন জ্ঞানবিজ্ঞান তাকে অভিভূতই কি কম করছে ? রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তচ্যুত, অর্থ নৈতিক অধিকার লুণ্ঠিত, কিন্তু নবীন সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত—এই বিভ্রান্তিক অবস্থায় আনন্দের সঙ্গে বেদনা, ভরসার সঙ্গে অনাস্থা, লক্ষ্যের সঙ্গে উদ্দেশ্যহীনতা, কর্মের সঙ্গে নিষ্ক্রিয়তা যে একই সঙ্গে উদ্ভূত হবে,—এ আর বিচিত্র কি !

পাদটীকা

১। History of Bengal Subah, 1740-1770--K. K. Datta. C. U. Publication. গ্রন্থে ২৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। Edward Eves-এর Voyage গ্রন্থের ২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২। Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal Vol VI. 1846. পৃষ্ঠা—৪৩৫।

৩। Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal Vol VI. July-December, 1846. পৃষ্ঠা—২২৩।

৪। ঐ Vol X. July-December—1848.

৫। Lectures on History of Literature—Frederick Schlegel, 1815. পৃষ্ঠা—১১৮।

৫ক। Calcutta Review—Vol XV. January-June, 1815.

৬। Calcutta Monthly Gazette—December, 1817.

৭। Survey of Indian History—K. M. Pannikar. Second Edition. 1954. পৃষ্ঠা—২০৪।
৮। ঐ পৃষ্ঠা—২১৫।
৯। সংবাদপ্রভাকর, ১লা চৈত্র, ১২৬০ বঙ্গাব্দ।
১০। ঐ।
১১। Parochial Annals of Bengal. Calcutta 1901. পৃষ্ঠা—৮৬।
১১ ক। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী। নিউ এজ সংস্করণ, ১৯৫৭। পৃষ্ঠা—১০১।
১২। Calcutta Review—Vol XVII. 1852.
১৩। The Bengal Annual, 1831.
১৪। Novum Organum—Eited by W. P. Kerr. ভূমিকা।
১৪ ক। Western Influence on Bengali Literature—P. R. Sen. পৃষ্ঠা—৮৩-৮৪।
১৫। ভারত-পথিক রামমোহন রায়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১৬। নবযুগের বাংলা—বিপিনচন্দ্র পাল, পৃষ্ঠা—২২।
১৭। বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮।
১৮। সাহিত্য রত্নাবলী—শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃষ্ঠা—২৫।
১৯। From Rammohun to Dayananda—B. B. Majumder. C. U. পৃষ্ঠা—৮৭।
২০। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। পৃষ্ঠা—৯৫-৯৬।
২১। The Seventeenth Century Background—Basil Willey. Chatto. and Windus, London. 1953. পৃষ্ঠা—২৭৩।

সর্বপ্রথম না হলেও ডিরোজিও এদেশে প্রবলভাবে বেকন সম্পর্কে ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর Sonnet on the Philosophy of Bacon বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

> Then Nature's Priest proclaimed—Man must remain,
> Shut from the light of Truth nor shall he see.

That Second Path (where mortal cannot err
Ingaining her bright temple) till he be
Great nature's servant and interpreter.

(The Poetical Works of Derozio—B. B. Shah. Vol I. 1907. পৃষ্ঠা—১৬২।

বেকনের আটল্যান্টিসের অনুপ্রেরণায় ডিরোজিও নতুন এক 'সব পেয়েছির দেশ' লিখেছিলেন—কবিতাটির নাম "The New Atlantis"। এখানে রচনার ভঙ্গীটি বেকনীয়, কিন্তু অন্তরপ্রেরণা বাইরণীয়। প্রেম ও নৈরাশ্যই প্রধান বিষয়।

২২। An Outline of Philosophy—Bertrand Russel. London. 1953. পৃষ্ঠা—২৫৫-২৫৬।

২৩। Novum Organum—Dr. T. Smith, 1848. Calcutta. Preface.

২৪। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—১৭৬৬ শকাব্দ, ১লা ফাল্গুন, ১৯ সংখ্যা।

২৫। India and Indian Mission—Alexander Duff. পৃষ্ঠা—৬৪০।

২৬। Calcutta Review—1911. পৃষ্ঠা—২৮।

২৭। ঐ 1852—Vol XVII. The History of Native Education in India প্রবন্ধে উদ্ধৃত।

১৮। সাহিত্যসাধক চরিতমালা—পরিষৎ-সংস্করণ।

২৯। আত্মচরিত—রাজনারায়ণ বসু, ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী—১৯, পৃষ্ঠা—৩৯।

৩০। ঐ পৃষ্ঠা—৩৯।

৩১। History of Western Philosophy—Bertrand Russel. পৃষ্ঠা—৫২।

৩২। মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের জীবনচরিত—বিপিনবিহারী মিত্র। পৃষ্ঠা—৯০।

'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে' লিখিত আছে: "একদিন সুবিখ্যাত দার্শনিক লকের (Locke) গ্রন্থাবলী পড়িবার সময় রামগোপাল

বলিয়া উঠিলেন, লকের মস্তক প্রবীণের ন্যায় কিন্তু রসনা শিশুর ন্যায়।" পৃষ্ঠা—১২৩, নিউ এজ সংস্করণ।

৩৩। সমাচার চন্দ্রিকা—১৮৩০, ৬ই নবেম্বর।

৩৪। An Advanced History of India—Roychoudhury, Majumder & Datta 1953. পৃষ্ঠা—৭৮৮।

৩৫। সংবাদপত্রে সেকালের কথা—২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা—১৩৫-১৩৬।

৩৬। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী, নিউ এজ সংস্করণ, পৃষ্ঠা—১৭৫।

৩৭। Life of Digamber Mitra, Vol I—Bholanath Chanda. 2nd Edition. পৃষ্ঠা—৬৬।

৩৮। রামতনু লাহিড়ী·· পৃষ্ঠা—৯৫।

৩৯। Economic Development of the Overseas Empire—L. C. A. Knowles. পৃষ্ঠা—৭৩।

৪০। India Today—Rajani Palme Dutt গ্রন্থের ৯২-৯৩ পৃষ্ঠায় William Fullarton লিখিত A View of English Interests in India নামক গ্রন্থ থেকে এই অংশটি উদ্ধৃত হয়েছে।

৪১। An Advanced History of India—Majumder, Roychoudhury and Datta. Macmillan & Co. Ltd. 1953. পৃষ্ঠা—৮০৯।

৪২। Economic History of Bengal, Vol I—N. K. Sinha. পৃষ্ঠা—৩০।

৪৩। Economic History of India in the Victorian Age—R. C. Dutt গ্রন্থে Montgomery Martin লিখিত Eastern India গ্রন্থে এই অংশটি উদ্ধৃত আছে।

৪৪। সংবাদপত্রে সেকালের কথা—পৃষ্ঠা—১৮২-১৮৬।

৪৫। ঐ

৪৬। ঐ

৪৭। Indo-British Economy—Hundred Years Ago—N. C. Sinha. A. Mukherjee & Co. Ltd. পৃষ্ঠা—৩।

৪৮। Calcutta Review—1848, January-July. পৃষ্ঠা—৩৪।

৪৯। ঐ পৃষ্ঠা—১৭২।

৪৯ ক। English Social History—G. M. Trevelyan. Third Edition. Longmans, Green & Co. 1948. পৃষ্ঠা—৩৯৭।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যুগসন্ধির কাব্য ঃ ভাষা, বিষয় ও আদর্শের বিরোধ

এই সময়ে নব্যশিক্ষিতদের দ্বারা ইংরেজী ভাষাতে সাহিত্য সৃষ্টি শুরু হোল। মেকলের সুপারিশের ফলে ইংরেজি ভাষায় মর্যাদা আরও বহু গুণ বেড়ে গিয়েছে। সমসাময়িক বাংলাসাহিত্য তত সুরুচিপূর্ণ ছিল না বলে "আলোকপ্রাপ্ত" নব্যশিক্ষিতেরা বাংলা অপেক্ষা ইংরেজি সাহিত্যের প্রতিই অধিকতর আকৃষ্ট হলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হলে রামগোপাল ঘোষ উৎফুল্ল হয়েছিলেন। তার কারণ কোন উচ্চ ভাবনাসম্পন্ন সুরুচিপূর্ণ রচনা যে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হতে পারে, এ তাঁরা ধারণাই করতে পারতেন না। এমনই বিরূপ ধারণা তাঁরা পোষণ করতেন সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে। ১৮৩৪ সালের ঘটনা হচ্ছে এইটি। এই যুগের সাহিত্য-চর্চার মাধ্যম হোল ইংরেজী। এ ব্যাপারটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি এ যুগের সাহিত্য চর্চার বিষয়বস্তু ও কলা-কৌশল কম কৌতূহলের বিষয় নয়। এযুগের হিন্দু কলেজ বা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রম এ যুগের সাহিত্যবোধকে সবিশেষ নিয়ন্ত্রন করেছে। এযুগের পাঠ্য-তালিকায় সেক্সপীয়র, মিলটন, পোপ, স্পেন্সার, ড্রাইডেন, গ্রে, গোল্ডস্মিথ স্থান পেয়েছেন। সাম্প্রতিক কালের কবিদের মধ্যে স্কট পর্যন্ত স্থান পেয়েছেন, কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থ নন। মূর পর্যন্ত সম্মানিত কবি; শেলী, কীটস নন। গদ্যে বেকন, এ্যাডিসন, গিবন, মেকলে স্থান পেয়েছেন। কোন কোন অধ্যাপকের প্রভাবও এবিষয়ে কম কার্যকরী হয়নি। এঁদের ব্যক্তিগত সাহিত্যবোধে ছাত্রদের সাহিত্যবোধ নিয়ন্ত্রিত হোত। "In fact Mr. Derozio acquired such an ascendency over the minds of his pupils that they would not move even in their private concerns without his counsel and advice. On the other hand, he fostered their taste in literature; taught the evil effects of idolatry and superstition; and so far formed

their moral conceptions and feelings, as to place them completelv above the antiquated ideas and aspirations of the age."[১] ডিরোজিও এবং ক্যাপটেন রিচার্ডসন সাহিত্যের প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক। এঁরা দুইজনেই সাহিত্যের কেবল অধ্যাপক ছিলেন না, ছিলেন কবি ও সমালোচক। মৃত্যুর বেশ কিছুকাল পরে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ডিরোজিওর কাব্য-সংকলন প্রকাশিত হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর কবিতার এক নব সংস্করণ অক্সফোর্ড য়ুনির্ভাসিটি প্রেস কর্তৃক ব্রাডলি বার্টের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দেশ-প্রেম, উদার মানবতাবাদ, নারীর প্রতি শ্রদ্ধা, ও প্রকৃতির রূপ-সম্ভোগ এগুলিতে মুখ্য জায়গা জুড়েছে। অর্থাৎ রোম্যান্টিক কবিকুলের বিশিষ্টতা তাঁর মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর কাব্যগ্রন্থের বিষয়সূচী নিম্নরূপ :

To India, My Native Land
The Harp of India
Freedom to the Slave
Heaven
Thermopylae
Love's First Feeling
Morning after a Storm
Poetry
The Fakir of Jungheera
My Dream
The Dese, ted Girl
The Poet's Grave
Night
Evening in August
Tasso
Address to the Greeks
The Greeks at Marathon
The Enchantress of the Grave
The Deserted Girl—ইত্যাদি।

এছাড়া, হাফেজের কয়েকটি অনুবাদ তাঁর কাব্য-সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই কাব্যের বিভিন্ন কবিতার শিরোদেশে বিভিন্ন কবির পংক্তি বিশেষ উদ্ধৃত হয়েছে। তা থেকে ডিরোজিওর প্রিয় কবিদের সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যায়। আমরা এই প্রিয় কবিদের একটি তালিকা নীচে দিচ্ছি :—

Harp of India—Moore.
Love's First Feeling—L. E. L. Landor.
Freedom from the Slave—Campbell.
Heaven—(কবিতাটির শুরুতেই বলা হয়েছে In Imitation of Lord Byron).
Evening in August—Campbell.
The Poet's Grave—Campbell.
The Greeks at Marathon—Byron.
The Enchantress of the Grave—Moore, Byron.
Romeo and Juliet—Byron.
Hope—Moore.
Yorick's Scull—Shakespeare.
Phyle—Byron.
Leaves—Shelley.

সেক্সপীয়র ও শেলী উদ্ধৃত হয়েছে ; কিন্তু সে উদ্ধৃতিও দুঃখবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শেলীর উদ্ধৃতিটি মৃত্যু-ভাবনায় আকুল :—

One step to the white Death-bed,
And one to the bier,
And one to the charnel ; and one—
Oh where ?

প্রধান প্রেরণা যে শেলী নন, এ বুঝা কষ্টকর নয়। তাঁর অন্যতম কাব্য-সংকলক বি. বি. সাহ বলেছেন "Byronic sunset flung their glow over Derozio's sky".[১ক] কথাটা সর্বাংশে সত্য। বাইরণ, মূর ও

ল্যাণ্ডর তাঁর রচনাশৈলী প্রভাবিত করেছেন। এঁদের সঙ্গে ক্যাম্পবেলের নামও উল্লেখ করতে হবে। অন্তিমশয্যায়ও তাঁকে ক্যাম্পবেলের "Pleasures of Hope" কবিতাটি পড়ে শোনান হয়েছিল।১খ To India, My Native Land কবিতায় তিনি স্বদেশের অতীত গৌরবে গর্ববোধ করেছেন; ভারত-আত্মার বাণী সন্ধানে এখানে তিনি অন্বিষ্ট, বিশেষ করে যখন ভাবা যায় এক ফিরিঙ্গি যুবক এই কবিতার রচনাকারী :—

My country ! in thy day of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast,
Where is that glory, where that reverence now ?
Thy eagle pinion is chained down at last
And grovelling in the lowly dust art thou !
Thy minstrel hath no wealth to weave for thee,
Save the sad story of thy misery !
Well let me dive into the depths of time,
And bring from out the ages that have rolled.
A few small fragments of those wrecks sublime
Which human age may never more behold ;
And let the guerdon of my labour be
My fallen country ! One kind wish for thee !

পরবর্তী যুগের কবিদার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কবিতাটির এক অনুবাদ প্রকাশ করেন। মিলের সর্ববিধ বৈচিত্র্য অবশ্য তিনি রক্ষা করেন নি, কিন্তু তবু বিশ্বস্ত।

স্বদেশ আমার, কিবা জ্যোতির মণ্ডলী !
ভূষিত ললাট তব ; অস্তে গেছে চলি
সেদিন তোমার ; হায় সেইদিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে !

কোথায় সেই বন্দ্যপদ ! মহিমা কোথায় !
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।
বন্দীগণ বিরচিত গীত উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর ?
দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন।
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ।
এই শ্রমের এ মাত্র পুরস্কার গণি ;
তব শুভ ধ্যায় লোকে, অভাগা জননি !

কবিতাটি যে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত জনপ্রিয় ছিল, তা দ্বিজেন্দ্রনাথের এই অনুবাদ থেকেই বুঝা যায়। কবির দেশপ্রেম এখানে কয়েকটি অভ্যস্ত বুলির পুনরাবৃত্তি মাত্র নয়, হৃদয়ের ছোঁয়া লেগে তা অনুভববেদ্য। ঈশ্বর গুপ্তের বিখ্যাত 'স্বদেশ' কবিতাটির সঙ্গে ডিরোজিও-র কবিতা তুলনাযোগ্য। শুধু বিষয়-স্বাধর্ম্যে নয়, বিষয়কে জারিত করেছে যে-মন, সেই মনের বিভিন্ন ভঙ্গিও লক্ষনীয়।

জান না কি জীব তুমি জননী জন্মভূমি,
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তান জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে ?

সুধাকরে কত সুধা দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
স্বদেশের শুভ সমাচার ॥
ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥

দেশের কুকুর আর বিদেশের ঠাকুরের মধ্যে তারতম্য বিচারে যে আকস্মিকতা সৃষ্টি করা হয়েছে; তার জন্যই কবিকে বিস্তর বাহবা দেওয়া হয়। এই বাহবার সবটুকুই কাব্য-উৎকর্ষগত নয়।

ডিরোজিওর উল্লিখিত কবিতাটির বক্তব্যে এ ধরণের আকস্মিকতা নেই; কিন্তু আছে অকৃত্রিম হৃদয়ানুভূতি। দেশের সমগ্র ইতিহাসের প্রতি আছে মর্মজ্ঞ দৃষ্টি, আর আর আছে সন্তানের মাতৃপূজার অকপট শপথ।

ঈশ্বরগুপ্তের ব্যঙ্গ-নিপুণতা, অলংকার-পটুত্ব হৃদয়-অনুভূতির প্রকাশে সর্বত্র সহায়ক হয়নি; বরং কথার চটকদারি বক্তব্যের উপরে অনাহূত খবরদারি করেছে। বাংলা কাব্যের সে এক সংকট কাল।

বিদেশী ভাষায় আধা-বিদেশী কবির লেখনীমুখে বাংলা ভাষার মাধ্যমে না হোক, বাঙালী মনের সংকট-মুক্তি ঘটল। ডিরোজিও-র সনেটের এই বাগ-ভঙ্গি এবং সহৃদয়তা পরবর্তী দেশপ্রেমমূলক কবিতার আদর্শ। মাইকেল মধুসূদন দত্তের "পরিচয়" কবিতার সঙ্গে চরিত্রগত মিল আছে।

যে দেশে উদয়ি রবি উদয়-অচলে
ধরণীর বিম্বাধর চুম্বেন আদরে
প্রভাতে; যে দেশে গেয়ে, সুমধুর কলে,
ধাতার প্রশংসা-গীত, বহেন সাগরে
জাহ্নবী।

এ কবিতার কল্পনা-বৈভব, ভাষা ও বিষয়-পরিবেশম-কৌশল আধুনিক; এবং ডিরোজিও অনুগামী।

The Harp of India কবিতায় শুনিয়েছেন তিনি সেই একই দেশপ্রেমের বাণী।

Why hang'st thou lovely on yon withered bough ?
Unstrung, for ever, must thou there remain ?
Thy music once was sweet who hears it now ?
Why doth the breeze sigh over thee in vain ?
Silence hath bound thee with her fatal chain.
Neglected, mute, and desolate art thou,

Like ruined monument on desert plain :
······but if thy notes divine
May be by mortal wakened once again,
Harp of my country, let me strike the strain !

এ বীণা অগ্নিবীণা, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত-সঙ্গীতে' এ বীণার সুরেরই অনুকরণ।

আবার Thermopylae কবিতায়

Why they fought, and why they fell ?
'T was to be free !
How liberty in death is won,
What deeds with Freedom's sword are done
In Freemen's hands !
They thought for free and hallowed graves
They scorned to breathe the breath of slaves :

এ তো রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের কাব্যবিষয়। তিনি "Freedom to the Slave" কবিতাটিতে লিখলেন :—

How felt he when he first was told
A slave he ceased to be ·
How proudly beat his heart, when first
He knew that he was free.

মনে রাখা উচিত এই কবিতাটি যখন প্রকাশিত হয়, তখনও ইউরোপে দাসপ্রথা রহিত হয়নি। দাসপ্রথা ১৮৬৩ সালে বাতিল হয়। এই কবিতায় ধ্বনিত মুক্তির আনন্দ সমসাময়িক যুগের চিত্তের বড়ই নিকটবর্তী। সমসাময়িক ভারতবর্ষ কুসংস্কারের শৃঙ্খলে, অর্থনৈতিক দুর্দশার শৃঙ্খলে, রাজনৈতিক পরাধীনতার শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ছিল—তার কাছে ক্রীতদাসের এই মুক্তি-আনন্দ অবশ্যই নতুন আশ্বাস বহন করে আনবে।

ডিরোজিও-র সর্বাধিক পরিচিত কবিতা হচ্ছে 'দি ফকীর অব ঝংগিরা।'

দেশের কুকুর আর বিদেশের ঠাকুরের মধ্যে তারতম্য বিচারে যে আকস্মিকতা সৃষ্টি করা হয়েছে; তার জন্যই কবিকে বিস্তর বাহবা দেওয়া হয়। এই বাহবার সবটুকুই কাব্য-উৎকর্ষগত নয়।

ডিরোজিওর উল্লিখিত কবিতাটির বক্তব্যে এ ধরণের আকস্মিকতা নেই; কিন্তু আছে অকৃত্রিম হৃদয়ানুভূতি। দেশের সমগ্র ইতিহাসের প্রতি আছে মর্মজ্ঞ দৃষ্টি, আর আর আছে সন্তানের মাতৃপূজার অকপট শপথ।

ঈশ্বরগুপ্তের ব্যঙ্গ-নিপুণতা, অলংকার-পটুত্ব হৃদয়-অনুভূতির প্রকাশে সর্বত্র সহায়ক হয়নি; বরং কথার চটকদারি বক্তব্যের উপরে অনাহূত খবরদারি করেছে। বাংলা কাব্যের সে এক সংকট কাল।

বিদেশী ভাষায় আধা-বিদেশী কবির লেখনীমুখে বাংলা ভাষার মাধ্যমে না হোক, বাঙালী মনের সংকট-মুক্তি ঘটল। ডিরোজিও-র সনেটের এই বাগ-ভঙ্গি এবং সহৃদয়তা পরবর্তী দেশপ্রেমমূলক কবিতার আদর্শ। মাইকেল মধুসূদন দত্তের "পরিচয়" কবিতার সঙ্গে চরিত্রগত মিল আছে।

যে দেশে উদয়ি রবি উদয়-অচলে
ধরণীর বিম্বাধর চুম্বেন আদরে
প্রভাতে; যে দেশে গেয়ে, সুমধুর কলে,
ধাতার প্রশংসা-গীত, বহেন সাগরে
জাহ্নবী।

এ কবিতার কল্পনা-বৈভব, ভাষা ও বিষয়-পরিবেশন-কৌশল আধুনিক; এবং ডিরোজিও অনুগামী।

The Harp of India কবিতায় শুনিয়েছেন তিনি সেই একই দেশপ্রেমের বাণী।

Why hang'st thou lovely on yon withered bough?
Unstrung, for ever, must thou there remain?
Thy music once was sweet who hears it now?
Why doth the breeze sigh over thee in vain?
Silence hath bound thee with her fatal chain.
Neglected, mute, and desolate art thou,

Like ruined monument on desert plain :
……but if thy notes divine
May be by mortal wakened once again,
Harp of my country, let me strike the strain !

এ বীণা অগ্নিবীণা, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত-সঙ্গীতে' এ বীণার স্বরেরই অনুকরণ।

আবার Thermopylae কবিতায়

Why they fought, and why they fell ?
'T was to be free !
How liberty in death is won,
What deeds with Freedom's sword are done
In Freemen's hands !
They thought for free and hallowed graves
They scorned to breathe the breath of slaves :

এ তো রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের কাব্যবিষয় ! তিনি "Freedom to the Slave" কবিতাটিতে লিখলেন :—

How felt he when he first was told
A slave he ceased to be ·
How proudly beat his heart, when first
He knew that he was free.

মনে রাখা উচিত এই কবিতাটি যখন প্রকাশিত হয়, তখনও ইউরোপে দাসপ্রথা রহিত হয়নি। দাসপ্রথা ১৮৬৩ সালে বাতিল হয়। এই কবিতায় ধ্বনিত মুক্তির আনন্দ সমসাময়িক যুগের চিত্তের বড়ই নিকটবর্তী। সমসাময়িক ভারতবর্ষ কুসংস্কারের শৃঙ্খলে, অর্থনৈতিক দুর্দশার শৃঙ্খলে, রাজনৈতিক পরাধীনতার শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ছিল—তার কাছে ক্রীতদাসের এই মুক্তি-আনন্দ অবশ্যই নতুন আশ্বাস বহন করে আনবে।

ডিরোজিও-র সর্বাধিক পরিচিত কবিতা হচ্ছে 'দি ফকীর অব ঝংগিরা।'

এটি একটি 'metrical romance'। এ কাব্যে Scott, ও Byron-এর অনুকৃতি আছে; পার্ণেলের 'হার্মিট' কবিতার প্রতিধ্বনিও আছে।

সহমরণে যাবে সে। অনুপমা সুন্দরী মুলিনীর (নলিনীর ইংরেজী বানান লেখা হয়েছে Nulinee) চিতায় তোলার আয়োজন সম্পূর্ণ। এমন সময় ঝংগিরার এক ফকীর এসে তাকে উদ্ধার করল। দস্যুদলের নেতা এই ফকীর ঘটনা-ক্রমে মুলিনীর পূর্বপ্রণয়ী। মুলিনীর সঙ্গে মিলনের পরে ফকীরের জীবনে বিরাট পরিবর্তন এল;

> "Henceforth I turn my willing knee
> From Alla, Prophet, heaven, to thee".

দেবতা অপেক্ষা মানুষ বড়; এবং সে মানুষ আবার মানসী। মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের দাবীর সঙ্গে আরও একটি বাণী এইভাবে যুক্ত হোল, এবং এ বাণী ভবিষ্যত কাব্য-ভাবনার পরম সম্পদ। গল্পটি এইভাবে এগিয়ে চলল:—

ফকীর দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করার সঙ্কল্প নিয়েছে; কিন্তু শেষবারের মত ডাকাতি করতে গিয়ে সে আহত হোল। আহত হোল, তার কারণ এবার ডাকাতি করায় সময় তার মনে ছিল দ্বিধা। আহত ফকীর গুহায় ফিরে এলো; এবং এখানেই তার মৃত্যু হোল। পরদিন মৃত ফকিরের পাশে মুলিনীকেও মৃতা অবস্থায় শায়িতা দেখা গেল। একদিন চিতা থেকে এই নারীই পালিয়েছিল, আজ সে-ই স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করে দেখাল যে সে মরতে ভয় পায় না। এবং মরণকে সে জয় করেছে।

এইভাবে কাব্যটি শেষ হোল সহমরণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে। মানুষের স্নেহপ্রেম-ভরা পার্থিব জীবনের অনন্যতা ঘোষিত হোল। বিধবার প্রেমানুরাগ, ব্যর্থপ্রেমের হতাশারঞ্জিত বিষণ্ণতা, এবং অরণ্য জীবনের দুঃসাহস—সবই দেশীয় পরিবেশে উদ্‌ঘাটিত হোল। বিলাতী রোমান্সরস দেশী পাত্রে পরিবেশিত হোল; তাতে বিস্বাদ লাগল না—ভাষার প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও। বালক বয়সে ডিরোজিও একবার ভাগলপুরে বেড়াতে গিয়েছিলেন; এই ভাগলপুর অঞ্চলের নিবিড় বন, ইতস্তত বিন্যস্ত পাহাড়, প্রশস্ত নদী তাঁকে

বিমুগ্ধ করেছিল। আলোচ্য কাব্যে সেই ভূপ্রকৃতিই পটভূমিকার দায়িত্ব বহণ করেছে।

পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে একাধিক কাহিনীকাব্য একই ঘটনা-সংস্থান, এবং ঘটনা-বিন্যাস-প্রণালী অনুসরণ করবে। অক্ষয় চৌধুরীর 'উদাসিনী', নবীনচন্দ্র সেনের 'জুমিয়া জীবন', 'রঙ্গমতী', এবং রবীন্দ্রনাথের একাধিক গাথা কবিতা এই কাব্যশাখার পুষ্পস্তবক। রবীন্দ্রকাব্যে 'নলিনী' নামটিও ছিল একদা অত্যন্ত প্রিয়।

এইভাবে বিদেশী ভাষায় লিখিত ফিরিঙ্গী যুবকের কাব্য-চর্চা বাংলা কবিতার ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করবে। আঙ্গিক নির্বাচনে ডিরোজিও প্রদর্শিত পথই হাতছানি দেবে, ঈশ্বরগুপ্তের বা কবিওলাদের পথ নয়।

ক্যাপটেন রিচার্ডসন হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শক্তিধর সাহিত্যাধ্যাপক। তাঁর শিক্ষণ, তাঁর লেখা (কবিতা ও প্রবন্ধ) তখনকার হিন্দু কলেজের ছাত্রদের রুচি নিরূপণে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। মধুসূদনের শৈশবকালীন লিখিত কবিতার তিনি ছিলেন উৎসাহদাতা এবং সংশোধক। মধুসূদনের কাব্য মতামত গঠনে তাঁর প্রভাব অপরিসীম। ডেভিড লিষ্টার রিচার্ডসনের 'লিটরারী রিক্রিয়েশনস' (Literary Recreations) এবং 'লিটরারী লিভস্' (Literary Leaves) গ্রন্থদ্বয়ে বহু কবিতা সংকলিত আছে। 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকার কাব্য সমালোচক রিচার্ডসনের সনেটগুলির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। "The sonnet is a favourite vehicle of poetic thought and language with our author, and he is fastidiously careful in the construction of this difficult form of verse" ২ এই সংকলন-দ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কবিতাবলীর মধ্যে Woman, English Hill, The Ganges, Banks of Hooghly, A Breeze at Mid-day, A Calm at Mid-day, Portrait of a Lady প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কাব্য-বিষয় ও কাব্য-প্রকরণ নির্বাচন উভয়বিধ কারণেই এই কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য।

ডিরোজিওর কবিতার মত এগুলির অধিকাংশের পটভূমিকা বাংলাদেশ। তবে ডিরোজিও এদেশকে স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁর বঙ্গ-বন্দনামূলক কবিতায় সৌন্দর্য-প্রীতির সঙ্গে মিলেছিল দেশ-প্রীতি; অপরক্ষেত্রে রিচার্ডসনের

বঙ্গ-প্রসঙ্গ নিতান্তই সৌন্দর্য-সন্ধান-সঞ্জাত। তাঁর Ganges থেকে কিছু উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

At my feet a river flows,
And its broad face richly glows
With the glory of the sun,
Whose proud race is nearly run.

বা

Calm and grave as Socrates
Where the sluggish buffalo
Wallows in mud.
Where the river watered soil
Scarce demands the royt's toil.
And the rice field's emerald light
Outlines Italian meadows bright.

(Banks of Hooghly)

রিচার্ডসনের কবিতায় সৌন্দর্য-সম্ভোগই বড় কথা। তাঁর সৌন্দর্য-সম্ভোগ প্রকৃতি-বন্দনা ও নারী-বন্দনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। উল্লিখিত কবিতা দুইটি ছাড়াও A Breeze at Mid-day, A Calm at Mid-day তাঁর প্রকৃতি-বন্দনামূলক কবিতা। তাঁর Woman, Portrait of a Lady নারী সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে রোম্যানটিক স্তুতিগান। ইংল্যাণ্ডের স্মৃতিতে দুঃখভারাক্রান্ত কবির হৃদয়-বেদনার প্রকাশও ঘটেছে তাঁর কাব্যে। Home Visions written in India তাঁর সেই স্বদেশ-স্মৃতির রোমন্থন; বাংলাদেশের মাটিতে প্রথম 'nostalgic' কবিতা; সুন্দরের স্বদেশ-প্রত্যাবর্তন-আকাঙ্ক্ষা বা কারাবন্দী ধনপতি সদাগরের গৃহ-প্রত্যাগমন আকুতির সঙ্গে এর চরিত্রগত পার্থক্য আছে। একটিতে স্বদেশ নিতান্তই গৃহপরিবার ও সম্পদবিভবের প্রতীক; অপরটিতে স্বদেশ একটি বিমূর্ত-ভাব (Abstract Idea)—যেমন তাঁর Woman কবিতায় Abstract Woman-এর উদ্দেশ্যে স্তবগান।

এই ধরণের nostalgic poem আরও লেখা হয়েছে—Herton-এর লেখা Five years in the East (1847) বা Captain G. P. Thomas লিখিত Lines written in India on sending a Daughter Home (1847) ঐ জাতীয় কবিতা। এছাড়া ভারতে ইংরেজের সামরিক সাফল্যকে বর্ণনা করে একাধিক কাব্য লেখা হয়েছে; এগুলি এদেশের রাধাকৃষ্ণ লীলা বা বিদ্যাসুন্দরীয় কাব্য-পরিমণ্ডলের উপর আঘাত হানবে। বাংলাদেশের সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে এ সমস্ত বিষয়-বস্তু নিঃসন্দেহে বিপ্লবাত্মক। Mrs. Norton-এর লেখা The child of the Islands, a poem (1844), Beckersteth-এর লেখা Cabul (1845), Ignatius John-এর Advance of The Sikh Army upon India (1847), H. P. Brooks-এর The Victories of Sutlej (1847), Charles Mission-এর Legend of the Afghan Country (1848) প্রভৃতি কাব্য হোলো বিভিন্ন সামরিক সাফল্যের উপর কাব্যিক গেজেটিয়ার। এ-গুলির বিষয়-বৈচিত্র্য এত দিনের দেব-নির্ভর মঙ্গলকাব্য-পক্ষপুটাশ্রয়ী আখ্যায়িকা-কাব্যের মুক্তিঘোষণা করবে। শুধু বিদেশস্থ বিদেশী কাব্য নয়, স্বদেশস্থ বিদেশী কাব্য নয়; স্বদেশস্থ বিদেশী ভাষায় স্বদেশী বিষয়বস্তু অবলম্বনে লিখিত কাব্যও নিশ্চয়ই দেশীয় ভাষার কবিগণকে নব বিষয়বস্তু নির্বাচনে প্রচুর উৎসাহিত করবে। উভয় কবির কাব্য-ভাবনা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ডিরোজিওর লিখিত কোন সাহিত্য-প্রবন্ধ আমরা দেখিনি। তবে তাঁর এ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশনের কার্য-বিবরণীর মধ্যে সাহিত্যচর্চার এক বিশেষ স্থান ছিল। তখন যুগ ছিল পরিবর্তনের; যে কাব্য যে সাহিত্য এই সমাজ পরিবর্তনের জয়ধ্বনি দিয়েছে, তাই হোত তখন অধিকতর উল্লিখিত।

"The sentiments delivered were fortified by oral quotations from English authors. If the subject was historical, Robertson and Gibbon were appealed to ; if political, Adam smith and Jeremy Bentham ; if scientific, Newton and Davy ; if religious' Hume and Thomas Paine ; if metaphysical, Locke and Reid, Stewart and

Brown. The whole was frequently interspersed and enlivened by passages cited from some of our most popular English poets, particularly Byron and Sir Walter Scott. And more than once were my ears greeted with the sound of Scotch rhymes from the poems of Robert Burns.[3]

রবার্ট বার্ণস পর্যন্ত তাঁরা এসেছেন; ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী ও কীটস পর্যন্ত তাঁরা আসতে পারেন নি। ডিরোজিও প্রায় বালকবয়সে কাণ্টের দর্শনের উপর এক নিবন্ধ লেখেন। খুব সম্ভব সেটি কাণ্ট-বিরোধী আলোচনা; বিদ্যাসাগর যেমন বার্কলের বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁর দর্শনে বেকন, লকের প্রভাবই স্বাভাবিক। ১৮২৭ সালে জুলাই মাসে Oriental Herald-এ তাঁর কবিতাবলীর এক সমালেচানা বের হয়। ডিরোজিওর কবিতাবলীর সঙ্গে বাইরন টমাস মূর প্রভৃতির কাব্যের সাদৃশ্য বর্ণনা করে সমালোচক উপদেশ দেন যে, "Let him lay Moore and Byron on the shelf, burn the 'Troubadour' and the 'Improvisatrice', read Shakespeare, Milton and Spencer, the old dramatists, and Robert Burns; study earnestly condensation in style, and above all, stick to Truth and Nature in word and thought.[3] সমালোচকমহাশয় ওয়ার্ডসওয়ার্থে এসে পৌছান নি। তাঁর আদর্শ লেখক সেক্সপীয়র, মিলটন, স্পেনসার আর গ্রীক নাট্যকারগণ ও বার্ণস। নিঃসন্দেহে এঁদের কাব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকলে 'exaggerated passion, falsetto sentiment' এবং 'gaudy language and harsh abrupt versification'-এর দায় থেকে তাঁর কাব্য অব্যাহতি পাবে। শুধু আঙ্গিক নয়, বিষয়-নির্বাচনেও পরিবর্তন আসবে—"to select worthier subjects for his muse than bandit-Fakeers or Moslem-lovers.'

সমালোচকমহাশয় তাঁর বক্তব্য এক যুগ আগে দাখিল করেছেন। বঙ্গদেশ তখন নতুন যে প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে—তার কাছে ভাবুকতা ও মন্ময়তা অপেক্ষা কর্মোদ্দীপণা ও রোমাঞ্চকরতাই অধিকতর শ্রেয়।

রিচার্ডসনের সাহিত্য-জিজ্ঞাসা ও কাব্য-জিজ্ঞাসা সম্পর্কে পরমত

সংগ্রহের প্রয়োজন নাই। তাঁর Literary Leaves, Literary Chit-chat ও Notices of the British poets, biographical and critical, From Chaucer To Thomas Moore গ্রন্থত্রয় ১৮৪৮সালের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থগুলিতে তিনি মিলটন, সেক্সপিয়ার, স্পেনসার, মূর, পোপ, স্কটের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন; অপর পক্ষে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীটস, ল্যাণ্ডর অর্থাৎ রোমানিটিক কবিকুলের প্রতি তাঁর বিরূপতা প্রকাশ পেয়েছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতাবলী সম্পর্কে তিনি বলছেন, "have no body, no telling points"। তাঁর সারল্য সম্পর্কে বলছেন, এ সারাল্য "is mawkish, coloured, artificial fales and utterly foolish." [৫]

কীটসের প্রতি একটু প্রশংসাবাণী উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বলা হোল "his faculties are not well-balanced।" শেলী সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন, "his mind in some degree is unsound." [৬]

কলিনস্‌, গ্রে, বার্ণস পর্যন্ত প্রশংসিত; কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থ, এমন কি টেনিসনের মাধুর্য তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি। ক্যালকাটা রিভিউ ১৮৫০ (জানুয়ারী-জুলাই) রিচার্ডসনের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন 'on each (Wordsworth and Tennyson) he was severe.' [৭]

রোম্যানটিক কাব্যের কল্পনার বিচিত্র প্রসার ও উদার মানবতাবাদ সম্ভবতঃ তিনি বরদাস্ত করতে পারেন নি। কারণ তিনি রাজনৈতিক মতাদর্শে ছিলেন টোরি; আর সাহিত্যাদর্শে ছিলেন সুখবাদী Utilitarian। তাঁর Literary Recreations-এ Utilitarianism ও কবিতার মধ্যে সম্পর্ক বিচার করে এক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তাঁর মতাদর্শের গুণাগুণ আমরা বিচার করতে চাই না; কিন্তু এ মতাদর্শের প্রভাবে যে ভবিষ্যতের বাংলাসাহিত্য গ'ড়ে উঠবে এইটুকু সংবাদ সরবরাহ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। তাঁর মৃত্যুতে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় লেখেন, "তিনি এবং হ্যাজিলিট কৃতবিদ্য অধ্যাপকদিগের নিকট বিদ্যাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। হ্যাজিলিটের সঙ্গগুণেই তিনি প্রবন্ধকার সাহিত্যবিৎ হইয়া উঠিয়াছিলেন। মেকলে কহিয়াছিলেন—আমি ভারতবর্ষের সকল বিষয় ভুলিয়া গেলেও তোমার সেক্সপীয়র পঠনের প্রণালী বিস্মৃত হইব না।

কোন ২ অস্মদ্দেশীয় কৃতবিদ্য যাঁহারা আজকাল সাহিত্যবিৎ আছেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, মেজর রিচার্ডসনের প্রসঙ্গেই তাঁহারা যত কিছু শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।" ৮ এই বক্তব্য যতই একদেশদর্শী হোক, রিচার্ডসনের প্রভাবের কথা মানতেই হবে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য সংকলনগ্রন্থ হোল ক্যাম্পবেলের Specimens of the British poets; গ্রন্থখানিতেও biographical and critical notes দেওয়া হয়েছিল; ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। স্কট, স্পেনসার, গ্রে, মিলটন, মুর ও কলিনসের কবিতা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। মুরের Lalla Rookh এবং কলিনসের নিম্নলিখিত Ecologues সংগৃহীত হয়েছে—

Selim or the Shepherd's Moral.
Hashan or the Camel Driver.
Abra or the Georgian Sultana.
Agib and Secander or the Fugitives.

প্রাচ্য বা এশীয় বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা এই কবিতাগুলি এক বিশেষ স্বাদ ও তাৎপর্য বহন করে নিয়ে আসে। কারণ এশিয়া বলতে এঁরা বুঝেছেন উটচালক, মেষপালক, সুলতানা আর ভবঘুরে। এই জাতীয় কবিতা পাঠ্যপুস্তকে স্থান পাওয়ায় এবং আদর্শরূপে বিবেচিত হওয়ায় বহুকাল ধরে সংসার-বহির্ভূত-ঘটনা, অপরিচিত পরিবেশ ও অসাধারণ মানুষ কাব্য-জগতের মৌরশী পাট্টা অর্জন করবে। হিন্দু কলেজের শিক্ষায় অচিরেই বাঙ্গালী যুবকেরা ইংরেজী কবিতা রচনায় এগিয়ে এলেন। তাঁরা যে বাংলা ভাষায় কবিতা না লিখে ইংরেজী ভাষায় কবিতা লিখলেন, তার কারণ শুধু বিদেশী ভাষার প্রতি প্রেমভাব এবং মাতৃভাষার প্রতি অনীহা নয়। মাতৃভাষা যে কোনরকম সৎ শালীন সুন্দর ভাব বহনে সক্ষম, এ ধারণা তাঁরা পোষন করতে পারতেন না। এই কারণে অক্ষয়কুমার দত্তসম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দেখে রামগোপাল ঘোষ রামতনু লাহিড়ী মহাশয়কে বলছিলেন, রামতনু। রামতনু! বাঙ্গালা ভাষায় গম্ভীর ভাবের রচনা দেখেছ? এই দেখ।" ব্রাহ্ম আন্দোলন এবং

বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমারের গদ্যসাহিত্য এইভাবে রুচির পরিবর্তন সাধন ক'রে প্রকারান্তরে বাংলার নব্য কাব্য উদ্ভবে সহায়তা করেছে।

দেশীয় বিষয়, দেশীয় কবি ও বিদেশী ভাষা।

॥ ১ ॥

মাতৃভাষার প্রতি দ্বেষ না করেও, যাঁরা বিদেশী ভাষায় কাব্য-চর্চায় বাধ্য হয়েছেন তাঁদের অবদান বর্তমানে আমরা পর্যালোচনা করব। এবং আধুনিক বাংলাকাব্যের ইতিহাসে তাঁদের প্রাসঙ্গিকতা বর্ণনায় প্রয়াসী হবো। ইংরেজী ভাষার আদিতম বাঙ্গালী কবি সম্ভবত কাশী প্রসাদ ঘোষ, "being the first Hindu who has ventured to publish," [১] তাঁর The Shair and Other Poems ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়া গেজেট প্রেস থেকে স্কট এণ্ড কোম্পানী কর্তৃক মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়, এই কাব্য সংকলনের নামপত্রিকায় বাইরণের নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশ মুদ্রিত ছিল—

"Nor mote my shell awake the weary Nine ?
To grace so plain a tale of this lowly lay of mine ?

এই কাব্য বাঙ্গালীহিতৈষী লর্ড বেণ্টিঙ্কের নামে উৎসর্গীকৃত হয়।

প্রথম কবিতাটির নাম The Shair। এখানেও সেই কোকিল, বুলবুল, অরণ্য, নদী, পর্বত, উপত্যকা, আর পাহাড়ের পার্শ্ববর্তী লতাপাতার কুটীর। অভ্যস্ত পরিবেশ থেকে দূরে কাহিনীর ঘটনাস্থল। জনৈক বক্তা সমস্ত কাহিনীটি বলে গেছেন, এই টেকনিক অভিনব, এবং স্কট-ধর্মী। কাব্যটি তিনটি সর্গে সম্পূর্ণ। এই কাব্যের বাক-প্রতিমা রচনায় অভিনবত্ব আছে। উদাহরণ দিচ্ছি—

Gay as the dear that bound at down.
To drink the dew upon the lawn.

(পৃষ্ঠা—১৩)

And on his brows engraven were
The hieroglyphics of despair.

(পৃষ্ঠা—৩৪)

His sorrows in his bosom caged,
Like a black storm there widely raged.

(পৃষ্ঠা—৪০)

His innocence was like the fawn's
Bounding in joy when morning dawns.

(পৃষ্ঠা—৪১)

Pale as a downcast lily flower
Reft of the moon, at morning's hour.

(পৃষ্ঠা—৬২)

কাব্যটির মূল স্বর বিষাদ; Scott-এর 'metrical romance' এটিরও আদর্শ।

'Tis ever so 't will ever be—
The lot of man is misery.

(পৃষ্ঠা—৩৪)

অন্যত্র তিনি উপসংহারে বলেছেন—

World ! what a monster thou born !
Here ends my long and mournful tale.

Shair সমুদ্রে আত্মবিসর্জনের প্রাক্‌কালে যে বিদায়-সঙ্গীত গেয়েছে, এতে তৎকালীন মনোভাব যাই প্রকাশিত হোক, কবির দেশপ্রেমিক মনের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

Farewell my lovely native land !
Where roses bloom in many a vale.
Where green-clad hills majestic stand,
Where flowrets woo the scented gale ;

Where Surya from his throne above
With brightest colour paints the day ;

Where Mighty Ganga's billows low ;
And wanders many a country by ;
Where ocean smiles serene below ;
Beneath thy blue and sunny sky.

Land of the Gods and lofty name ;
Land of the fair and beauty's spell ;
Land of the bards of mighty fame ;
My native land ! for e'er fare well. (পৃষ্ঠা—৬৮)

Shair ছাড়া অন্যান্য কবিতার মধ্যে The Hero's Reward, The Haunt of the Muse, The Lover's Life, Hope উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বিভিন্ন হিন্দুউৎসব ও পালপার্বণের উপর কবিতা আছে—দশহরা, রাসযাত্রা, জন্মাষ্টমী, শ্রীপঞ্চমী, দুর্গাপূজা, দোলযাত্রা, কার্তিকপূজা, কোজাগরী পূর্ণিমা, কালীপূজা, অক্ষয়তৃতীয়া, ঝুলন পূর্ণিমা। এছাড়াও প্রকৃতি-কবিতা হিসাবে Stories written in Spring, The Setting Sun, Evening in May, Lines to a Star, Morning in May, Sonnet to the Moon প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তিগত ভাবনামূলক কবিতাও আছে—

Grief, forget me not,
Can I cease to remember,
Wishes ।

এই বিষয়-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে কবির বাঙ্গালী মনের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে —শুধুই বাঙ্গালী মন, জীবন্ত বাঙ্গালী মনের পরিচয়। মাইকেলের চতুর্দশপদী কবিতার বিষয় নির্বাচনে যে মনস্বিতার ও স্বাদেশিকতার পরিচয় পেয়ে আমরা

বিমুগ্ধ হই, তার পূর্বতন নজির পাচ্ছি কাশীপ্রসাদ ঘোষের কাব্য-সংকলনে। স্তবক রচনায়, ছন্দে ও মিল-প্রয়োগে কবির বিশিষ্টতা আছে। স্পেন্সরীয় স্তবক তিনি সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। সনেটের বাগবন্ধও তিনি আয়ত্ত করেছেন। এছাড়া ওড (ode) ও এলিজি জাতীয় কবিতা রচনায় কুশলতা প্রকাশ পেয়েছে। এবং পুরাণকে নতুন যুগের রুচি অনুসারে তিনিই প্রথম পরিবেশন করেন। তাঁর The Hero's Reward কবিতায় পুরুরবার সঙ্গে উর্বশীর প্রণয়লীলা সার্থকভাবে বর্ণিত হয়েছে। মাইকেলের তিলোত্তমা সম্ভব এবং বীরাঙ্গনা কাব্যের সূত্রপাত এখানে হয়ে গেল।

And in the garden's centre stands,
A palace built by heavenly hands.
With saphires decked the golden walls
Of Satakratu's courtly halls,
Reflecting fling their beauteous light,
And glisten round all fair and bright.

এ রাজসভা-বর্ণনা সার্থকভাবে পরিণতির পথে যাবে মাইকেলেরই হাতে। নারীরূপ বর্ণনার অভিনবত্বও লক্ষণীয়—

Her form was delicate and fair
As moon beams through th' autumnal air,
Her lips were lighted with a smile,
Which Indra's heart did once beguile. (পৃষ্ঠা—৮৪)

এ বর্ণনাও তিলোত্তমার রূপ বর্ণনার সমগোত্রীয়। কাশীপ্রসাদ ঘোষের কবি-কৃতি ইংরেজীর মাধ্যমে পরিবেশিত হলেও তা বিষয়বস্তুর মাহাত্ম্যে ও কাব্য-প্রসাধনের চমৎকারিত্বে আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাস উদ্ঘাটনে অপরিহার্য। সম্ভবতঃ ডিরোজিও ও রিচার্ডসনের কবিতাবলী অপেক্ষা এগুলি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কাশীপ্রসাদ ঘোষের সহগামী ছিলেন অনেকেই; তন্মধ্যে রামবাগানের দত্তমহাশয়গণ স্মরণীয়। দত্তমহাশয়দের মধ্যে গোবিন্দ চন্দ্র দত্তই শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর Lamentation of a Love-lorn Muslim Girl, Night on the Ganges, Gour, Time, Lines written on

the Fly Leaf of My Bible প্রভৃতি কবিতা তাঁর কাব্য-সংকলনে স্থান পেয়েছে। এঁর কবিতাসমূহেও বাইরন ও টমাস মুরের সুরই প্রবল। তাঁর Lines written on the Fly Leaf of My Bible কবিতার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি—

I sought for fame : by day and night,
 I struggled, that my name might be,
Emblazoned forth in types of light,
 And wafted o'er the pathless sea,
But sunken chicks, and vision dim,
 Were all I got by seeking him.
I sought for wealth. The best of gold
 Sucked my best feeling, seared my heart,
Destroyed those aspirations bold
 That formed my nature's bitter part ;
And, at the last, though seeming fair,
 The prize, I clutched, was empty air
I sought for Power ; the loftiest steep
 The topmost heights I strove to scale,
Nor dark abysses, yawning deep
 Around me, could my courage quail.

এ কবিতায় যে বিষাদ-সঙ্গীত ব্যক্ত হয়েছে, তার থেকে মাইকেলের আত্মবিলাপ বিশেষ দূরবর্তী নয়। ঈশ্বর গুপ্তের আত্মবিলাপ মাইকেল-জগতের আত্মবিলাপ নয়।

শশীচন্দ্র দত্তের কবিতায় গঙ্গাপ্রসঙ্গ আছে ; আছে হিন্দু প্রতিমার প্রসঙ্গ (Hymn to the Deity)। হরচন্দ্র দত্ত স্বদেশের ইতিহাস, সামাজিক ও পারিবারিক জীবন থেকে কবিতার বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছেন। তাঁর গ্রন্থের নাম 'Oriental Lyrics'। তাঁর Rajputani Bride বেশ উল্লেখযোগ্য কবিতা। ভারতীয় ইতিহাসকে অবলম্বন ক'রে, বিশেষ ক'রে রাজপুত ইতিহাসকে অবলম্বন করে কবিতা লিখিত হলে তা বিশেষ অর্থবহ হয়ে পড়ে।

She comes, she comes, and in her hand
The champac breath she brings,
The fretted, sounding roof on high
With thrilling music rings ;
And warriors, dressed in green and gold,
Of his renown and bearing bold,
To her their homage pay ;
And as she moves with queen-like grace ;
The flushes deepen on her face ;
For 'tis her bridal day.

এ বর্ণনায় যাদু আছে ; এ যাদু মানবীকরণের যাদু। ইতিহাসকে এইভাবে জীবন্ত করে তোলার ব্রত পরবর্তীকালে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক পালিত হবে—সাহিত্যের ইতিহাসে সেটা একটা প্রধান ঘটনা। এবং এই বংশের শেষোক্ত কবি হচ্ছেন গিরীশচন্দ্র দত্ত। তাঁর কবিতায় নারী সম্পর্কে Abstract ধারণা অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

I think of thee, I think of thee,
When glows the East with day,
When o'er the wide extended lea,
The perfumed breezes stray ;
When sunlight laughs upon each stream.

পরবর্তীকালে রামবাগানের দত্ত বংশীয়দের কবিতার এক সংকলন Dutt's Family Album নামে বেরিয়েছিল। তাতেও ভারতীয় বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছিল।

॥ ২ ॥

পঞ্চম দত্তবংশীয় কবি হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ক্যালকাটা রিভিউ এর সমালোচক মধুকে রামবাগানের দত্তবংশীয় বলে ভুল করেছিলেন ²° ভারতীয় পুরাণের গল্প অবলম্বনে লেখা তাঁর প্রথম কাব্য 'Upsori' (অপ্সরী)। স্পেনসরীয় স্তবকের সাহায্যে কবিতাটি

বিরচিত। তিনি King Porus নামে আর একটি কবিতা রচনা করেন। এই কবিতার শুরুতে সেক্সপীয়র ও বাইরনের উদ্ধৃতি আছে।

মাইকেলের Captive Ladie—Scottএর আদর্শে লিখিত একটি 'metrical tale'; এটিও রাজপুত ইতিহাস থেকে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছে—সংযুক্তা-পৃথ্বিরাজ কাহিনী; যদিও কারও নামই উল্লিখিত হয়নি। তাঁর Visions of The Past হলো 'A Fragment of Blank Verse'। 'Visions of The Past'-এর পটভূমিকা বাংলাদেশ: সুদূর মাদ্রাজে বসে শ্যামা বঙ্গভূমির কথা মনে পড়েছে। আর একবার চতুর্দশপদী কবিতাবলী রচনাকালে আরও সুদূরতর স্থান থেকে জন্মভূমির স্মৃতি তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করবে। Rizia তাঁর অপর কাব্য—নাট্যকাব্য; অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। Queen Sita নামদিয়ে পরবর্তীকালে আর একখানি ইংরেজী কাব্য রচনা সুরু করেছিলেন।[১১]

Visions of The Past-এর ভূমিকায় আছে একটি সনেট। এবং এই সনেটটি বাইরনের 'Dream'-এর আদর্শে রচিত। মাইকেলের অনেকগুলি সনেট এখানে সংগৃহীত হয়েছে। সনেটগুলির বিষয়বস্তু স্বদেশীয়; বহু 'ইমেজ' বা বাকপ্রতিমা স্বদেশীয়। এই সনেটগুলির গঠন কৌশলে নানারূপ 'ব্যতিক্রম' (Variations) অনুসরণ করা হয়েছে—

১ ও ৪ সংখ্যক সনেটের গঠনপদ্ধতি নিম্নরূপ—

ক খ ক খ ক খ ক খ। গ ঘ গ ঘ গ ঘ

২ ও ৩ সংখ্যক সনেটের গঠন রূপ:

ক খ ক খ গ ঘ গ ঘ। ঙ চ চ ঙ ছ ছ।

তা ছাড়া আরও নানারকম মিল-বিন্যাস আছে; যথা, ক খ খ ক গ ঘ ঘ গ চ ঙ চ ছ চ ঙ;

ক খ ক খ খ ক ক খ। গ গ ঙ ঙ চ চ;

ক খ ক খ খ ক ক খ। গ ঘ ঙ গ ঘ ঙ।

পরবর্তী জীবনে চতুর্দশপদী কবিতাবলী রচনাকালেও তাঁর সনেটে মিল-বিন্যাস ও পদবন্ধের এই স্বাধীনতা লক্ষিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতা অবশ্য সনেটের প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করেছে। এই চতুর্দশপদীর

৮+৬ পর্ববিভাগ সুস্পষ্ট বা অর্থগত নয়। দ্বিতীয় কারণ সনেট যেমন ভাব-বাহী হবে, মাইকেলের ক্ষেত্রে সনেট কখনো কখনো নিছকই সংবাদবাহী।

যাই হোক, মাইকেল এইভাবে বাংলা ভাষায় কাব্য-চর্চার পূর্বাহ্নে ইংরেজীর মাধ্যমে সনেট রচনা-বিধির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন; পরিচিত হয়েছেন Blank Verse শৈলীর সঙ্গে। অবশ্য তাঁর ক্ষেত্রে ইংরেজী সূত্র থেকে বঙ্গভাষায় নিষ্ক্রমনে বিষয়-নির্বাচন খুব বেশি সহায়তা করেনি। রাজপুত কাহিনী নাটকে জায়গা জুড়েছে, কিন্তু কাব্য বা মহাকাব্য তিনি রচনা করলেন পুরাণকে অবলম্বন করে। ইতিহাস এখানে প্রবেশাধিকার পায়নি। ক্যালকাটা রিভিয়ু-এর সমালোচক তাঁকে গোবিন্দচন্দ্র দত্তের সঙ্গে তুলনা ক'রে বলেছিলেন "He is less fertile in poetic thought than Govind chandra, but on the other hand, perheps excels him in force of diction, music of rhyme, and rythm"।[১২] যে কবি পরবর্তীকালে বাংলা কাব্যে নতুন কাব্য-ভাষা, ছন্দ ও তার ধ্বনিসুষমা প্রবর্তন করবেন, তাঁর ইংরেজী কাব্য সম্পর্কে এ প্রশংসা কৌতুহলোদ্দীপক। গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত অপেক্ষা তিনি কাব্যপ্রতিভায় নূন্য ছিলেন, এ সিদ্ধান্তে অবশ্য আজ আর কেউ নিশ্চয়ই সম্মতি দেবেন না।

বঙ্গ ভাষা, নতুন বিষয় ও পুরাতন রীতি।

॥১॥

"যাঁহারা ইংরাজী বিদ্যায় অত্যন্ত নিপুন; তাঁহারদিগের মধ্যে অত্যল্প ব্যক্তি ব্যতীত ভারতেই বঙ্গভাষার প্রতি সমাদর করেন না, 'ইয়ং বেঙ্গল' যুবকদলেরা স্বদেশের কল্যাণকারি বলিয়া সর্ব্বদাই অভিমান করেন, কিন্তু সে কল্যাণ কিসে হয়?

ইয়ং বেঙ্গল সাহেবেরা যে জাতির দৃষ্টান্ত দ্বারা সভ্য বলিয়া অহঙ্কার করেন; তাঁহারা এদেশের ভাষার প্রতি সমাদর করেন তাহা কি দেখিতে

পান না ; এইক্ষণে ইউরোপখণ্ডে সমুদয় প্রদেশের সুসভ্য মহাশয়েরা সংস্কৃত ভাষানুশীলনে এবং সংস্কৃত বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থসকল মুদ্রাঙ্কিত করণে অত্যন্ত উৎসুক হইতেছেন।" [১০]

সংবাদপ্রভাকরের সম্পাদকের এই ভৎর্সনা যথাস্থানেই প্রযুক্ত হয়েছে। ইউরোপীয়রা যে সংস্কৃতচর্চায় অভিনিবিষ্ট হয়েছিলেন সে সংবাদ আমরা আমরা ইতিপূর্বেই সরবরাহ করেছি। সংস্কৃত ব্যতীত বাংলাভাষার চর্চাতেও তাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম কেরীর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। শুধু গদ্যচর্চায় নয়, পদ্য চর্চায়ও তাঁরা উৎসাহ দিয়েছেন। বিদ্যাসুন্দর রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁদের আনুকুল্যে মুদ্রিত হয়ে প্রচারিত হয়।

উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে নবীন বাংলা কবিতার সূত্রপাত ঘটতে থাকে। কাশীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের মতে এযুগের শ্রেষ্ঠ কবি রাধামোহন সেন। রাধামোহনের অনুবাদ গ্রন্থাদি ছাড়া কয়েকটি গীতির সন্ধান পাওয়া গেছে—এ গুলি পুরাতন বিদ্যাসুন্দরীয় গীতির অনুকরণ। কাশীপ্রসাদ ঘোষ নিজেও কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন, এগুলিও প্রাচীনপন্থী। সেই বিরহ-তাপিত নারীর উক্তি ; সেই চাঁদ, চকোর ও খঞ্জনের রূপক ব্যবহার। [১৩ ক]

কাশীপ্রসাদ ঘোষ ইংরাজীতে নব্য গীতিকাব্য লিখেছেন , কিন্তু বাংলায় চিরাচরিত রীতির পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। নব্যরীতি প্রবর্তনের উপযোগী যুগান্তকারী প্রতিভার জন্ম ভবিষ্যতের গর্ভে তখনও।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের প্রধানতম কবি ঈশ্বরগুপ্ত, কিন্তু আধুনিক কবি কিনা তা আলোচনাসাপেক্ষ।

ঈশ্বরগুপ্তের প্রথম পদ্যপুস্তক কালীকীর্তন ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে কাব্যও নেই, আধুনিকতাও নেই। 'প্রবোধপ্রভাকর,' 'হিতপ্রভাকর' তাঁর গদ্যপদ্য মিশ্রিত নীতিকথামূলক রচনা। 'প্রবোধ প্রভাকর' প্রশ্নোত্তরছলে লিখিত ; বেথুন সাহেবের অনুরোধে বিষ্ণু শর্মার হিতোপদেশের আদর্শে রচিত। বক্তব্যের নীতিকথায় সমসাময়িক ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব আছে বলে অনেকে মনে করেন। "ইহা আশ্চর্য্যবোধ হইতে পারে যে এই অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন লোক আধুনিক ব্রাহ্মদের অগ্রদূত স্বরূপ।" [১৪]

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে সংবাদপ্রভাকর প্রথম প্রকাশিত হয়; ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে এই পত্রিকা দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। এবং তখন থেকেই নানাবিধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে। এই পত্রিকার গদ্যে লিখিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধের সঙ্গে পদ্যেও কিছু বক্তব্য থাকত।

"ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত একজন উপস্থিত ও দ্রুত কবি ছিলেন।"[১৫]

"নিত্য নৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এসকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়। আজ শিখের যুদ্ধ, কাল পৌষপার্ব্বণ, আজ মিশনরি, কাল উমেদারি, এসকল যে সাহিত্যের অধীন, সাহিত্যের সামগ্রী, তাহা প্রভাকরই দেখাইয়াছিলেন।"[১৬]

উভয় সমালোচকই ঈশ্বরগুপ্তের কবি-বিশিষ্টতার প্রসঙ্গ সঠিকভাবেই বর্ণনা করেছেন। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা হোল কাব্যে সাংবাদিকতা। কিন্তু সে Journalism যে আবার কতদূর প্রকট ছিল, তার অনুসন্ধান আজ পর্যন্ত হয় নি। ঈশ্বর গুপ্ত শুধু সমসাময়িক ঘটনা বা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে পদ্য লিখতেন না, সংবাদপ্রভাকরের সম্পাদকীয় মন্তব্য গদ্য-পদ্য মিশ্রিত থাকত। এবং তাঁর অধিকাংশ বিখ্যাত কবিতাই এই রীতিতে লেখা। উদাহরণ দিচ্ছি—

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ১লা বৈশাখ বাবু গিরীশচন্দ্র দেবের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে এক সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখা হোল। সেই মন্তব্য শুধু গদ্যে নয়, তাঁর সঙ্গে পদ্যও গাঁটছড়া বেঁধেছিল।

ওরে ধীবর কাল, পাতিয়া বিশাল জাল,
সংসার সাগরে কর খেলা।
কিবা দিবা বিভাবরী রোগরজ্জু করে ধরি,
মোহানলে ভাসায়েছ ভেলা॥

শুধু ব্যক্তিগত বিষয়ে নয়, রাজনৈতিক বিষয়েও ঐ একই কৌশল ব্যবহৃত হোল। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মযুদ্ধ উপলক্ষে ঐ বৎসর ২৬শে এপ্রিলের কাগজে ব্রহ্মযুদ্ধের উপর সম্পাদকীয় মন্তব্যের সঙ্গে পদ্য থাকল—

উঠিল যুদ্ধের ভাব নৃপতির মনে।
ছুটিল ইংরেজ সেনা, রেঙ্গুনের রণে।

শুধু ব্যক্তি বা প্রকৃতিবিষয়ক কবিতা নয়, আধ্যাত্মিক রসসমৃদ্ধ বহু বিখ্যাত কবিতাও এইভাবে লিখিত হয়। ১৮৫৩ ও ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদকীয় নিবন্ধে আধ্যাত্মিকতার অংশ বেশি। ১৮৫৩ সালের ১৫ই জুলাই-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত ভোজ দেখতে পাই।

"পরমপূজনীয় শ্রীশ্রীসর্বাধ্যক্ষ পরমেশ্বর পরমপিতা ঠাকুর মহাশয় শ্রীচরণ-কমলেষু" শিরোনামায় গদ্যে ও পদ্যে বক্তব্য পেশ করা হোল।

কাতর কিঙ্কর আমি, তোমার সন্তান।
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান॥
বারবার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান॥
একবার তাহে তুমি নাহি দাও কাণ॥

তুলি হে ঈশ্বরগুপ্ত, ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বরগুপ্ত, কুমার তোমার॥

ঐ সালের ১লা অগ্রহায়ণ তিনি লিখছেন,

ঈশ্বর সাধনা করি, যদি হয় দুখ।
তার কাছে কিছু নয়, সম্পদের সুখ॥
ঈশ্বর সাধনা বিনা যদি হয় সুখ।
সে সুখ সুখ নহে, ঘোরতর দুখ॥

ঐ বছরই বড়দিনের উপর যে কবিতা লেখা হোল, তাতে ভক্তিরসের বাণ ডাকল, কিন্তু কৌতুকের তরঙ্গও উথলে উঠল—

খৃষ্টের জনম দিন, বড় দিন নাম।
বড় সুখে পরিপূর্ণ, কলিকাতা ধাম॥
কেরানি দেওয়ান আদি, বড় বড় মেট।
সাহেবের ঘরে ঘরে পাঠাইছে ভেট॥

ঈশ্বর গুপ্তের হাতে এইভাবে পদ্য সর্বভুকে পরিণত হয়েছে।

"যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয়, যাহা আকাঙ্খিত, তাহা কবির সামগ্রী। কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত তাহাই বা নয় কেন? তাহাতে কি কিছু রস নাই? কিছু সৌন্দর্য নাই? আছে বৈকি। ঈশ্বর গুপ্ত সেই রসের রসিক, সেই সৌন্দর্যের কবি। যাহা আছে, ঈশ্বরগুপ্ত তাহার কবি। তিনি এই বাঙ্গালী সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা সহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্যদেশের কবি। এই সমাজ, এই শহর, এই দেশ বড় কাব্যময়। অন্যে বড় তাহাতে রস পান না।

* * *

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের কাটায়, রান্না ঘরের ধুঁয়ায়, নাটুরে মাঝির ধ্বজির ঠেলায়, নীলের দাদনে, হোটেলের খানায়, পাঁটার অস্থিস্থিত মজ্জায়।

স্থূল কথা, ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist। ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য, এবং ইহাতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

(ঐ পৃষ্ঠা ৮৫০-৮৫১)

এই কথাই বীম্‌স সাহেব ইউরোপীয় নজির উল্লেখ ক'রে বলেছেন, "Ishwar Chandra Gupta, a sort of Indian Rabelais" (Comparative Grammar. Beams. Vol 1. পৃষ্ঠা—৮৬)।

কিন্তু realism-এরও প্রকার ভেদ আছে। সাহিত্যের বাস্তবতা আর জীবনের বাস্তবতা এক নয়। ঈশ্বর গুপ্তের এই নগ্ন বাস্তবতা সাহিত্যের এতদিনকার বাস্তবতার সঙ্গে মেলে না। এই বাস্তবতা সম্ভবতঃ বিদ্রোহসূচক। কবিওয়ালাদের কাব্য-জগৎ পুরাতন কাব্য-পরিমণ্ডলকে

আশ্রয় করে গ'ড়ে উঠেছিল। —সেই রাধা-কৃষ্ণ-প্রণয়-বৃত্তান্ত, সেই মান-অভিমান, ছল-চাতুরী, চন্দ্রাবলী-কুব্জার ঈর্ষ্যা-দ্বেষ! বা বিদ্যা-সুন্দরের চাতুরালি ও অবাধ যৌন-অভিজ্ঞতা! ঈশ্বর গুপ্ত যেন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে কাব্যের মৌল প্রতিজ্ঞা ধ'রেই টান মারলেন। তাতে কাব্যের ভিত্তিভূমি পর্যন্ত ন'ড়ে উঠল। কাব্য-ভাবনার ক্ষেত্রে আদর্শ নর ও আদর্শ নারী কল্পনায় চতুরতা ও লাম্পট্যের উস্কানি ছিল, তার পরিবর্তন নব্য শিক্ষিতেরা কামনা করছিলেন। কিন্তু তাই বলে কাব্য-ভাবনার মূলোচ্ছেদ কেউ বরদাস্ত করতে পারেন না। নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা কাব্যের একমাত্র ঘটনা—এ সংবাদ কাব্যের চির-কালের সংবাদের বিপরীত। এ কথাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মনে তো আছে, যেদিন ঈশ্বর গুপ্ত পাঁঠার উপর কবিতা লিখেছিলেন, সেদিন নূতন ইংরেজদের এই হঠাৎ শহর কলিকাতার বাবুমহলে কি রকম তার প্রশংসা-ধ্বনি উঠেছে। আজকের দিনের পাঠক তাকে কাব্যের পংক্তিতে স্বভাবতই স্থান দেবে না; পেটুকতার নীতিবিরুদ্ধ অসংযম বিচার করে নয়; ভোজনলালসার চরম মূল্য তার কাছে নেই বলে।"[১৮] মনে অবশ্য রবীন্দ্রনাথেরও থাকবার কথা নয়, কারণ কবিতাটি লেখা হয়েছে রবীন্দ্র-আবির্ভাবের সাত বৎসর পূর্বে। আর স্বয়ং ঈশ্বর গুপ্ত দেহত্যাগ করেছেন কবির নরদেহ ধারণের দুই বৎসর পূর্বে। কালগত অযথার্থতা যাই থাক, কাব্যগত বিচার যথার্থই হয়েছে এক্ষেত্রে।

॥ ৪ ॥

তবে একথাও ঠিক বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের বিপুল সাহিত্য-সৃষ্টির প্রধান বৈশিষ্ট্য কি, তা নিপুণভাবেই বিশ্লেষণ করেছেন। এখন বিচার্য হচ্ছে যে তা কি কবিধর্মের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে? কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত যেখানে তাঁর আপন সৃষ্টির ব্যতিক্রম, সেখানে তিনি যে যথার্থ কবি, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। আমরা দুইটি উদাহরণ দিচ্ছি—

(১) সহস্রকরের করে, কিবা শোভা সরোবরে,
সে রূপের নাহি অনুরূপ।
নলিনী ফেলিয়া বাস বিস্তার করিয়া বাস,
প্রকাশ করেছে নিজরূপ ॥

মাথায় আঁচল খুলে, প্রিয় পানে মুখ তুলে,
হেসে হেসে কি খেলা খেলায়।
আহা কিবা মনোহর, দিবাকর দিয়া কর,
স্নেহে তার বদন মুছায়॥
নেচে নেচে ক্ষণে ক্ষণে, হেটমুখে পড়ে রণে,
মনে এই ভাবের আভাষ।
কমল দলের তলে, রবি ছবি জলে জ্বলে,
বিদূরিত হতেছে বিলাস॥

(ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ ; পৃষ্ঠা—১৮১)

(২) গ্রীষ্মের প্রতাপ বলে, পূর্বে ছিল ধরাতলে,
কৃশানদী বালিকার প্রায়।
না ছিল রসের রঙ্গ, ধূলায় ধূসর অঙ্গ,
তরঙ্গের রসহীনতায়।
রাজ্য হোলো বরষার, জীবনে যৌবন ভার ;
পয়োধর প্রভাবে সঞ্চার।
হেলেদুলে চলে যায়, বিপুল লাবণ্য তায়,
সলিলে স্থখের নাহি পার॥

(বর্ষার নদী, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ ; পৃঃ ২৬৩)

প্রথমটির রচনায় সংস্কৃত কাব্যের অভ্যস্ত অলঙ্কার ও কবিওয়ালাদের যৌন-প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে। মাইকেল যাকে বলেছেন "Erotic similes" এবং "Silly allusions to the loves of lotus and the moon"—তারই প্রকাশ ঘটেছে এখানে। কিন্তু তবু এখানে নিত্যনৈমিত্তিকের বেদীমূলে ধুপ-ধুনা দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয়টির ভাষা স্থানে স্থানে আধুনিকতার অঙ্গরাজ্যে প্রবেশ করেছে—"ধুলায় ধুসর অঙ্গ"—এই চরণাংশের মাধুর্য শুধু অনুপ্রাসের করতালিতে ধ্বনিত হয়নি। "হেলে দুলে চলে যায়"—এই বর্ণনাতেও বাস্তবের নবরূপায়ন ঘটেছে। গ্রীষ্মের নদীর সলিল-গতি-রেখা সঙ্কীর্ণ হতে পারে, কিন্তু ভাষার প্রাণবন্ত রেখায় তা বাঁধা পড়েছে।

এই দুইটি কবিতা সেকালের সুধীজনের প্রশংসা অর্জন করেনি। এমনই উৎকট ছিল সেদিনকার আদিরস-বৈরিতা! বঙ্কিম এই কবিতাদ্বয়ের

গুরুত্ব স্বীকার করেন নি; ভবিষ্যৎ বাংলাকাব্যের ভাষা ও ভাবনা হয়ত প্রথম কবিতাটি থেকে বিশেষ কিছু না-ও সংগ্রহ করতে পারে; কিন্তু দ্বিতীয়টিকে এত সহজে তাচ্ছিল্য করা যায় না। বাংলাকাব্যের ভবিষ্যৎ-মুখীনতার বিচারে এ কবিতাদ্বয় যদি সাদরে গৃহীত হোত, অনুকৃত হোত, তাহলে বাংলাকাব্যের আধুনিকতার ফুল ঈষৎ আগেই ফুটত।

শুধু এই কবিতাদ্বয় নয়, অন্য কবিতাতেও ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য-ভাষার স্বকীয়তা ও চমৎকারিত্ব আমাদের বিস্মিত করে। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি—

কর্তাদের গালগল্প, গুড়ুক টানিয়া।
কাঁটালের গুঁড়ি প্রায়, ভুঁড়ি এলাইয়া॥

(পৌষ পার্বণ)

ধীরি ধীরি শোভে গিরি, স্বভাবের সাজে।
গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়্ নহবৎ বাজে॥

(—বর্ষার ধুমধাম)

ধনীর শরীরে শাল, গরীবের পক্ষে শাল,
কম্বল সম্বল করি রয়।
বেণের পুঁটুলি হোয়ে, শুয়ে থাকে শীত শোয়ে,
উম বিনা ঘুম নাহি হয়॥

(—শীত)

কষিত কনককান্তি, কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁফদাড়ি, তপস্বীর প্রায়॥

(—এণ্ডাওয়ালা তপস্যা মাছ)

সকল নয়ন মাঝে, রক্ত-আভা আছে।
বোধ হয় রূপসীর চক্ষু উঠিয়াছে॥

(—আনারস)

যামিনী বিগত হয়, তরুণ অরুণোদয়,
শশাঙ্কের শঙ্কিত হৃদয়।
কাতরা যতেক তারা, চক্ষেতে নীহার ধারা,
বহে শ্বাস প্রভাত সময়॥

(—শারদীয় প্রভাত)

একেবারে পড়ে ধারা, কিবা শোভা করে তারা,
তারা যেন পড়িছে খসিয়া।

(—বর্ষার আবির্ভাব)

ঈশ্বরগুপ্তের ভাষার দুইটি মহল আছে, একটি অন্ত্যজ, অপরটি ব্রাহ্মণ্য অন্ত্যজ মহলের ভাষায় আছে হালকা লঘু চটুল চাল; পাঁঠা, এণ্ডাওয়ালা তপস্যা মাছ, নববর্ষ, পৌষপার্বণ এই মহলের ভাষায় লিখিত। আবার মাতৃ-ভাষা, স্বদেশ, কবি, আত্মবিলাপ, হায়! আমি কি করলাম প্রভৃতি কবিতায় ব্রাহ্মণ্য মহলের বুলি ফুটেছে। এখানকার ভাষার রং গাঢ়; তার পদচারণা অনেক সংযত ও সুস্থির।

প্রথমটির নজির এই—

জলের উঠেছে দাঁত, কার সাধ্য দেয় হাত,
আঁক করে কেটে লয় বাপ।
কালের স্বভাব দোষ, ডাক ছাড়ে ফোঁস ফোঁস,
জল নয় এযে কাল সাপ।

দ্বিতীয়টির একটি নজির দিচ্ছি—

হায় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ।
দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ ॥
অগাধ দুঃখের জলে সদা ভাসে ভাষা।
কোন মতে নাহি তার জীবনের আশা ॥
নিশাযোগে নলিনী যে রূপ হয় ক্ষীণা।
বঙ্গভাষা সেইরূপ দিন দিন দীনা ॥
অপমান অনাদর প্রতি ঘরে ঘরে।
কোনমতে কেহ নাই সমাদর করে ॥

দুই একটি তদ্ভব শব্দ ছাড়া অন্ত্যজ শব্দ একটিও নেই। অথচ প্রথমটিতে তার ছড়াছড়ি। বিষয়ভেদেই ভাষার এই হেরফের।

॥ ৫ ॥

বিষয় সম্পর্কে তাঁর ঔদার্যের পরিণতি কি তা আমরা আলোচনা করেছি ভাষার ঔদার্যের ফলে গদ্য ও পদ্যের বিভেদ বিলুপ্ত করার চেষ্টা হোল। তাঁর পদ্যে বৈষয়িক ভাষা নিঃসঙ্কোচে স্থান গ্রহণ করেছে; তার জন্য কোন ভণিতা

নেই। এমন উদ্ধত নিঃসঙ্কোচ আচণ্ডালে আলিঙ্গনদান কাব্য-ভাষার ক্ষেত্রে অভিনব উদাহরণ। ভাষার কৌলীন্য-রক্ষার সাধু-সংকল্পে আমরা নৈষ্ঠিক পুরোহিত নয়, কাব্য-ভাষার পৃথক শব্দ-ভাণ্ডার রক্ষার সংগ্রামে আমরা উৎসাহী সৈনিকও নই ; কিন্তু এই পরিবর্তন ভবিষ্যৎ কাব্য-ভাষাকে চলতা-শক্তি দিল কিনা, এ প্রশ্নের মীমাংসায় আমরা উৎকণ্ঠা বোধ করি। ঈশ্বর গুপ্তের শব্দভাণ্ডার বিশ্লেষণ করলে আমরা তিনপ্রকার শব্দ দেখতে পাই। প্রথমতঃ তৎসম (ও সমাসবদ্ধ) শব্দ :—

সংযোগী, স্বভাব (প্রকৃতি অর্থে), ব্যবহার, উপকার, উপদেশ, অভিধান, ত্রিসংসার, পরিচ্ছদযুক্ত, সুশোভিত, সুপ্রকাশ্য, প্রেমক্ষুধাহরা, শুদ্ধাচার, স্থিরবুদ্ধি, ত্রাণকর্ত্রী, হিতাহিত, হীরকাদি, চর্মচক্ষু ইত্যাদি।

ইংরেজী শব্দ :—মেট, বুট, সিলিপার, ফ্রেস, ফেদর, ফোলোরিস, রোজ, রিবিন (ribbon), বেলাক, নেটিভ, লেডি, শেম, মেরি, ভেরিগুড, ডব, চ্যাপলেন, হোটেল, হ্যালো, গো-টু-হেল, ড্যাম, টেবিল, মেজেষ্টরি ইত্যাদি।

তৃতীয় এক শ্রেণীর শব্দ ও 'ইডিয়ম' তিনি ব্যবহার করেছেন, এগুলি নানা জাতীয় আঞ্চলিক ও অন্ত্যজ শব্দভাণ্ডার (slang vocabulary) থেকে সংগৃহীত :

হায়, ফ্যাক, রিষ্টি, তুড়ি, আড়ি, দাপ্, কালা, ভেট, দেওয়ান, কেরানি, আত্মারাম, বিবিজান, লবেজান, উল্কি, খোল, বিচিলি, আমলা, মামলা, গামলা, ভূষি, ঘুষি, হুট্, বুট, তুকতাক, খ্যাল, মাগী, ঠ্যাকার, সত্ত্বি, দিব্বি, চুকুলি, পোষড়া, গুড়ুক, খোপ, বলিহারি, লাল, (লালা) হাড়গিলে, ঠ্যাং, শিং, নাকাল, ডামাডোল, নেড়া, গতোর, হেড়া, টেরা, জো, কোঁৎকা, ট্যাঁস, খানা, ছুঁড়ী, তুড়ী, বোল, বিলাতী, কাঁটাচামচ, পিঁড়ি, রাঁড়, হাঁপ, চুলো, অঁক করা, ফোঁস ফোঁস, ছ্যাঁক ছ্যাঁক (শব্দ), ছ্যাঁকা তেল ইত্যাদি।

এই তিন শ্রেণীর শব্দ বাংলা কাব্যের স্বাভাবিক শব্দ-ভাণ্ডার নয় ; তবে তাঁর পক্ষে বলবার এইটুকু যে, এ ভাষা তাঁর বিষয়বস্তু ও মেজাজের সঙ্গে একটুও আড়াআড়ি করে নি। পদ্যরচনায় তাঁর অবিসংবাদী কৃতিত্বের কারণও এইগুলি। বঙ্কিম-ভাষিত খাঁটি বাংলার অনেকখানি প্রাণশক্তি এই শব্দ কৌটার (সোনার নয়) মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে।

"যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায়, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায় আর কেহ কি গদ্য কি পদ্য কিছুই লেখেন নাই।

তাহাতে সংস্কৃতজনিত কোন বিকার নাই, ইংরেজনবিশীর বিকার নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না—সরল, সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ঈশ্বরগুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখেন নাই—আর লিখিবার সম্ভাবনা নাই।[১৯]

একথা অস্বীকার করা যায় না যে ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর কালের চলতি শব্দগুলিকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সমস্ত চলতি শব্দই কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না; যেমন সমস্ত বিষয়ই কাব্যের বিষয়ীভূত হতে পারে না। গদ্য ও পদ্যের উভয়ের ধর্ম পৃথক ভাবাই যুক্তিসঙ্গত। মধ্যযুগীয় সাহিত্যের পদ্য-সর্বস্বতার অবসানে উভয় মাধ্যমের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হওয়াটাই স্বাভাবিক পরিণতি বলে আমরা মনে করি। পদ্য-ধর্মের এই বিশেষ পরিণতির সংবাদ বঙ্কিমের বক্তব্যে অনুপস্থিত।

গদ্যের ভাষা ও পদ্যের ভাষার মধ্যে কোন পার্থক্য না রাখার ফলে ভবিষ্যতে বাংলাকাব্য নানা বিড়ম্বনার সম্মুখীন হবে। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের পদস্খলনের ইসারা এখান থেকেই সংগৃহীত।

অথচ ঈশ্বরগুপ্ত কবি হিসাবে না হোক কাব্য-জগতের কর্মী হিসাবে যেখানে নমস্য, সেখানেও প্রণতি পৌছাচ্ছে না। তাঁর পয়ার রচনার কৌশল আজ কেন বিস্মৃতির গহ্বরে অন্তর্হিত? ছড়ার ছন্দ বা লৌকিক ছন্দকে তিনি যে সার্থকতার দোরে পেঁাছে দিচ্ছিলেন, সে খবর আজ কেন অবহেলিত? তাঁর আবোলতাবোল ছড়া (non-sense rhyme)—বোধেন্দু বিকাশের গানগুলি আজ কেন বারবার পঠিত হয় না?

মনে থাকল শুধু কতপ্রকার সংস্কৃত ছন্দ তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন, তারই প্রসঙ্গ। কিন্তু বাংলা ছন্দের ইতিহাস ত সংস্কৃত ছন্দের অনুবাদের উচ্ছিষ্ট ইতিহাস মাত্র নয়।

ঈশ্বর গুপ্তের দুর্ভাগ্য যে, সমসাময়িক যুগের স্ফূর্তিবাজ, উচ্ছল, চঞ্চল মজলিশী 'আপষ্টার্ট' সমাজের সাহিত্য তৃষ্ণা-নিবৃত্তির দায়িত্ব তাঁরই ওপর বর্তেছিল। গভীর, সত্যানুসন্ধানী, রহস্য-অভিসারী নবীন সমাজের উদগ্র রসপিপাসা তাঁর মধ্যে চরিতার্থতা খুঁজে পেল না।

ঈশ্বর গুপ্তের যুগে ঈশ্বর গুপ্ত প্রভাবিত নন, এমন কবিরও অভাব ছিল না। মঙ্গলকাব্যের ধারা তখনও অব্যাহত ছিল। রঘুনন্দন গোস্বামীকে অনেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের একজন প্রধান কবি বলে মনে করেন।

রঘুনন্দনের রামরসায়ন (১৮৩৭), রাধামাধবোদয়, ও গীতমালা প্রাচীনপন্থী কাব্য ; কিন্তু আদি রসাত্মক নয়, ভক্তিমূলক।

॥ সমসাময়িক অন্যান্য কবি ॥

ঈশ্বরগুপ্তের প্রতিভা বাংলাসাহিত্যের প্রাঙ্গণে যখন অতিশয় দীপ্যমান, তখন জনপ্রিয়তার বিচারে আরও কয়েকজন কবি খুব উপেক্ষণীয় ছিলেন না।

"বত্রিশ সিংহাসন" ও "বেতালপঞ্চবিংশতির" লেখক কালীপ্রসাদ কবিরাজ 'ভানুমতীর উপাখ্যান' এবং 'চন্দ্রকান্ত' নামে তুইখানি কাব্য রচনা করেন। শেষোক্ত কাব্যখানি বিশেষ জনপ্রিয় হয়। 'চন্দ্রকান্ত' কাব্যের জনপ্রিয়তার কারণ হোল তার গল্প-রস। মধ্যযুগের সীমিত জীবনে রোমান্সের যতটুকু অবকাশ ছিল, তার চূড়ান্ত ব্যবহার এখানে করা হয়েছে ; কাহিনী, ভাষা ও কাব্য-আঙ্গিক একেবারে ভারতচন্দ্রীয়। উভয় কাব্যই উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষাংশে প্রকাশিত হয়।

তারাচরণ দাসের "মন্মথ কাব্য"ও চন্দ্রকান্তের অনুরূপ কাহিনী সম্বলিত। কাব্যটি ১৮৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বটতলার সাহিত্যের অন্যতম প্রধান প্রতিনিধি এই কাব্য-গ্রন্থ। এই গ্রন্থের আদর্শে একাধিক কাব্য বিরচিত হয়।

উল্লিখিত কাব্যত্রয়ের কাহিনী স্বকপোলকল্পিত ; অন্ততঃ পৌরাণিক আশ্রয় খোঁজে নি, যদিও এগুলিতে কালীমাহাত্ম্য প্রচারের প্রবণতা আছে। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের পদ্যকাব্য 'বাসবদত্তা', সুবন্ধু রচিত বিখ্যাত সংস্কৃত গদ্য কাব্য 'বাসবদত্তা' অবলম্বনে লেখা। ১৮৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। অনেকে এই কাব্যখানিকে অনুবাদ বলে ভ্রম করেছেন ; অবলম্বন সুবন্ধু, কিন্তু অনুসরণ ভারতচন্দ্রের। মদনমোহনের রসতরঙ্গিণীও ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী'র অনুকরণে লেখা। ঈশ্বরগুপ্তীয় ধারার অন্যতম প্রধান কবি হলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

"রসতরঙ্গিণী ও বাসবদত্তা এই তুই গ্রন্থই আদিরসবহুল হওয়াতে কবি পূর্ণ বয়সে যুবাকাল লিখিত এই তুই গ্রন্থের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহার জীবদ্দশায় বাসবদত্তা পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। তাঁহার এক

ভগিনীপতি নিজের নাম দিয়া কেবল রসতরঙ্গিণী দুই একবার মুদ্রিত করিয়াছিলেন।”[২০]

তর্কালঙ্কারের ‘প্রভাতবর্ণন’ কবিতাটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। অক্ষয়কুমার দত্ত এই কবিতাটি সম্পর্কে যে সমালোচনা করেন, তা শুধু এই কবিতাটি সম্পর্কে প্রযুজ্য নয়, এই জাতীয় অনেক কবিতা সম্পর্কেই প্রযুজ্য। বিভিন্ন পংক্তি বিশ্লেষণ ক'রে অক্ষয়কুমার বলেন,

পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।

রাত্রি প্রভাত হইবার সময়ে সকল-ই দূরে থাক, অতি অল্প পুষ্পই প্রস্ফুটিত হয়ে থাকে। “ফুটিল মলতী ফুল সৌরভ ছুটিল”—মালতী ফুল বিকালে ফোটে। আর কবি বলেছেন, “পাতায় পাতায় পড়ে নিশার শিশির”—যে ঋতুতে নিশিকালে শিশির পড়ে সে ঋতুতে মালতী ফুল ফোটে না। এইভাবে অক্ষয়কুমার এই কবিতার তথ্যের বিকৃতি বিশ্লেষণ করেন।[২০ক]

হরিমোহন মুখোপাধ্যায় রচিত কবিচরিত ১ম ভাগে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবন-কাহিনী প্রকাশিত হলে রহস্যসন্দর্ভ পত্রিকায় আপত্তি জানিয়ে বলা হয়, “ঐ ব্যক্তি একজন সহৃদয় সুপণ্ডিত ছিলেন, সন্দেহ নাই। পরন্তু প্রধান কবিদিগের পর্যায়ে তাহার গণনা হইবার কোন কারণই বর্তমান নাই।” কারণ উক্ত সমালোচকের মতে বাসবদত্তা-রসতরঙ্গিণী উভয় কাব্যই অনুবাদ মাত্র।[২০খ]

অক্ষয়কুমার দত্তের ন্যায় আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্যতম পথিকৃৎ ‘অনঙ্গমোহন’ লিখেছিলেন, নব্যশিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা মদনমোহন তর্কালঙ্কার যৌবনে ‘বাসবদত্তা’ ও ‘রসতরঙ্গিণী’র ন্যায় কাব্য রচনা করেছিলেন! এমনই ছিল সমসাময়িক কাব্যধারার প্রভাব! অক্ষয়কুমার যেমন অনঙ্গমোহন-এর নামোল্লেখ করতে চাইতেন না; মদনমোহনও তেমনি তাঁর কাব্যদ্বয়ের পুনঃ প্রকাশে অসম্মত ছিলেন।

যৌন বিষয়, যৌন-প্রতীক ও রূপকের আতিশয্যে বাংলা কাব্য-ভাষা ও ছন্দ কলুষিত হয়ে পড়েছিল। কাব্যবিষয়ের জন্য ঐ শ্রেণীর লেখকদের ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন “নৈতিক আদালতে বেত্রাঘাতযোগ্য” বলে মত প্রকাশ করেছিলেন।

কিন্তু তবু তিনি এই কাব্যসমূহের ভাষাকে মার্জিত বলেছিলেন।[২১] সম্ভবতঃ ডাঃ সেন যৌন প্রতীকের গূঢ়ার্থ ইচ্ছা করেই ব্যাখ্যা করেন নি।

উনিশ শতকের সমাজে তখনও পুরাতন শ্রেণীর প্রভাব বিশেষ সক্রিয়। আধ্যাত্মিকতার আবরণে তখনও তান্ত্রিকতার যত বিকৃত রূপ অতিশয় প্রভাবশালী। তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড ব্যাখ্যা ক'রে নানা গ্রন্থ, টীকা, টীকার টীকা প্রচুর সংখ্যায় প্রকাশিত হোত। এ গ্রন্থের লেখক, পাঠক ও প্রকাশক হলেন কলকাতার নব্য ধনীসম্প্রদায়, যাঁরা অর্থ যে-ভাবেই উপার্জন করুন, তার এবম্বিধ "সদ্ব্যবহারে" সক্ষম হলেই নিজেদের কৃতকৃতার্থ বোধ করতেন।[২২]

"কালী নামের সঙ্গে সংশ্রবহেতু আমাদিগের বৃদ্ধগণ এই সব পুস্তকের শৃঙ্গার রসের মধ্যেও আধ্যাত্মিকতা দেখিয়াছেন।"[২৩] এই জাতীয় সাহিত্য আধুনিক রুচির প্রতিকূল; নবীন রস-পিপাসা এই সাহিত্যপাঠে চরিতার্থ হতে পারে না। শুধু রুচিবিকৃতি হেতু নয়, এমন জীবন-বিকৃত ভোগ-সর্বস্ব সাহিত্য নবীন যুগের নব্যদৃষ্টিসম্পন্ন তরুণসম্প্রদায়ের পঠিতব্য হতে পারে না।

॥ ঈশ্বর গুপ্ত ও তাঁর প্রভাবিত কবিসম্প্রদায় ॥

॥১॥

"আর ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কীর্তি ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবিশদিগের একটা কীর্তি আছে। দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একজন। বাবু দীনবন্ধু মিত্র আর একজন। শুনিয়াছি, বাবু মনোমোহন বসু আর একজন। ইহার জন্যও বাঙ্গালার সাহিত্য প্রভাকরের নিকট ঋণী। আমি নিজেও প্রভাকরের নিকট বিশেষ ঋণী। আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন।"[২৪] কাব্যের ক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্ত শিষ্য বা প্রভাকর শিক্ষানবিশদের কীর্তি কিরূপ, তা অনুসন্ধানীয়। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে ঈশ্বরগুপ্তীয় বিশিষ্টতা যে ছিল না, তা নয়। যে সাহিত্য সৃষ্টির জন্য রঙ্গলাল বাংলা সাহিত্যে অমর, সেখানে ঈশ্বরগুপ্তীয় বিশিষ্টতা প্রবল নয়। দীনবন্ধু মিত্রের প্রতিষ্ঠা আজ আর তাঁর কবিখ্যাতির উপর নির্ভরশীল

নয় ; নাট্যকার দীনবন্ধুই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বন্দনীয়। আর বঙ্কিমের কবি-পরিচয় সাহিত্যের প্রত্নতাত্ত্বিকেরই কেবল গবেষণার বিষয়। কবি বঙ্কিম বঙ্কিম-পরিচিতির প্রধান পতাকা বহন করে না ; এ পরিচয় নিতান্তই গৌণ। এক মনোমোহন বসু ব্যতীত ঈশ্বর গুপ্তীয় বিশিষ্টতা অন্য কোন কবি বহন করেন নি। এবং মনোমোহন বসু বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে আদৌ একজন প্রধান কবি (major) নন।

সংবাদ প্রভাকরের লেখক গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। রঙ্গলাল তো সংবাদ প্রভাকরের অন্যতম কর্মীই ছিলেন। অক্ষয়কুমার (সম্ভবতঃ গুপ্তকবির প্রভাবেই) অনঙ্গমোহন নামে এক কাব্য রচনা করেন। এ কাব্য ভাবে ও ভাষায় 'কামিনীকুমার' ও 'জীবনতারা' গোত্রীয়। পরবর্তীকালে অক্ষয়কুমার এ কাব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। আধুনিক ভাবধারার অন্যতম পথিকৃৎ হলেন অক্ষয়কুমার। তাঁর আবাসস্থল 'শোভনোদ্যানে'র বর্ণনা থেকে তাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বুঝা যাবে। শোভনোদ্যানে শোভা পেত :

"নানাবিধ বৃক্ষ, নানাপ্রকার শংখ, শম্বুক, প্রস্তর, জীবজন্তু, উদ্ভিদ, আকরীয় ধাতু, প্রবাল, স্ফটিক, অনুবীক্ষণ যন্ত্র, তাপমান যন্ত্র ; ব্যাঘ্রচর্ম, সর্প-চর্ম, ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশের তাম্র ও রৌপ্য মুদ্রা ; রামমোহন রায়, ডারউইন নিউটন, হাক্সলি ও জন ষ্টুয়ার্ট মিলের প্রতিকৃতি ; ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভূতত্ত্ব ও প্রাণবস্তুবিদ্যা বিষয়ক চিত্রাবলী, পুরাতন ভারতবর্ষের মানচিত্র, তাজমহলের ছবি, কতপ্রকার শিল্পকার্য ইত্যাদি।"[২৫] এ হেন ব্যক্তির পক্ষে 'অনঙ্গমোহনে'র স্থূলত্ব স্থবিরত্ব অধিক দিন বহন করা সম্ভব নয়।

॥২॥

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘকাল সংবাদ প্রভাকরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। র. ল. ব—এই ছদ্মনামে তাঁর বহু কবিতা সংবাদপ্রভাকরে প্রকাশিত হয়েছে। ১২৫৪ সালে ২রা বৈশাখ ঈশ্বর গুপ্ত পত্রিকা পরিচালনায় তাঁর সহযোগিতার কথা স্বীকার করেন।

"রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অস্মদিগের সংযোজিত লেখক বন্ধু! ইহার সদ্-

গুণ ও ক্ষমতার কথা কি করিয়া ব্যাখ্যা করিব * * * কবিত্ব ব্যাপারে ইহার অধিক শক্তি দৃষ্টি হইতেছে। কবিতা নর্তকীর ন্যায় অভিপ্রায়ের বাদ্যতালে ইহার মানসরূপ নাট্যশালায় নিয়ত নৃত্য করিতেছে। ইনি কি গদ্য—কি পদ্য উভয় রচনা দ্বারা পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন।"[২৬]

রঙ্গলালের এই যুগের কবিতা ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য-পরিমণ্ডলে রচিত; শুধু কাব্য-রীতিতে নয়, কাব্য-বিষয়েও। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্য-সাধক চরিতমালায় 'প্রভাত' শীর্ষক একটি কবিতা রঙ্গলাল-লিখিত বলে উল্লেখ করেছেন। এই কবিতার ভাষা ও ভঙ্গী যে ঈশ্বরগুপ্তীয় তা আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

মৃণালাভা ম্লান হয়, হেরি দিবাকরোদয়,
নিশাকর চলে অস্তগিরি।
যামিনী হইল সারা, সমুদিত শুকতারা,
সমীরণ বহে ধীরি ধীরি ॥[২৭]

সংবাদ প্রভাকরে রঙ্গলাল একাধিক ইংরেজী কবিতা অনুবাদ করেন; এ-গুলির বিষয়গত অভিনবত্ব লক্ষণীয়। এমন কি স্তবক বিভাগ, মিল-রচনাও নবীন পথ-অনুসারী। কিন্তু কাব্য-ভাষা পুরোপুরি ঈশ্বর গুপ্তীয়। এই যুগে তাঁর সাহিত্যজিজ্ঞাসাও ঈশ্বর গুপ্তেরই অনুরূপ ছিল; তাঁর "বাংলা কবিতা বিষয়ক নিবন্ধে" তার প্রমাণ রয়েছে।

॥ ৩ ॥

ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেকে ও বন্ধু দীনবন্ধু মিত্রকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কাব্য-ক্ষেত্রে উভয়েই যে ঈশ্বর গুপ্তের প্রত্যক্ষ শিষ্য এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঐ সময়ে সংবাদ প্রভাকরে যে কবিতা-যুদ্ধ হয়, তাই 'কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ' নামে পরিচিত। তবে কালেজের ছাত্র ছাড়াও আরও অনেকে 'প্রভাকরে' কবিতা লিখতেন।

কালেজীয় ছাত্রদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, দ্বারকানাথ অধিকারী, যাদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র সেন, ভুবনমোহন দত্ত, আনন্দচন্দ্র গুহের নাম পাওয়া যাচ্ছে।

তাছাড়াও সূর্যকুমার সেনগুপ্ত, অক্ষয়নারায়ণ দাস, বিশ্বম্ভর দাস বসু, কৃষ্ণ-

দাস শূর, রাধামাধব মিত্র, মধুস্থদন সেন, বিরাজমোহিনী দেবী প্রভৃতির কবিতা প্রকাশিত হোত।

১৮৫২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী থেকে সংবাদ প্রভাকরে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে। সংবাদ প্রভাকরের প্রকাশিত কবিতার কয়েকটি আবার কালেজীয় কবিতার মারামারির অন্তর্গত। অধিকাংশ কবিতাই স্ত্রী-পতির কথোপকথনের রীতিতে লেখা। বলা বাহুল্য, বিভিন্ন ঋতুকে অবলম্বন করে আদিরসাত্মক পদ্য রচনাই তাঁর উদ্দেশ্য। এই রীতি বাংলা কাব্যের চিরাচরিত রীতির অনুকারী; এমন কি সংস্কৃত ঋতু-কাব্যেরও অনুগত। নতুন যুগের চিন্তার সঙ্গে তার কোন আত্মীয়তা নেই। ভাষাও সম্পূর্ণ ঈশ্বর গুপ্ত ও ভারতচন্দ্রপন্থী। ভারতচন্দ্রের প্রভাবই প্রবলতর। বঙ্কিম তখন নিতান্ত কিশোর বালক; এ বয়সে যে-কোন অনুভূতিই আতিশয্যে বিকৃত হতে পারে। এই আতিশয্য হুগলি কালেজের ছাত্র গোপাল চন্দ্র সেনের রচনাতেও আছে। ১৮৫২ সালে তাঁর কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে; অধিকাংশ কবিতাই কথোপকথনমূলক। একটি কবিতায় গভর্ণমেণ্ট কলেজের ছাত্ররা পাঠক্রমের (Curriculum) বিপুলত্ব নিয়ে আক্ষেপ করছে।

হোমারাদি ড্রাইডেন সেক্সপিয়র মিলটন
ইস্মিতাদি যত ফিলজাফি।

—ছাত্রদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়ায় কবি অনুযোগ করছেন।

খৃষ্টীয় ১৮৫৩ অব্দে ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র দ্বারকা নাথ অধিকারীর 'আশা' নামক এক কবিতা প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে তিনিও কালেজীয় কবিতাযুদ্ধে যোগদান করেন। পরপর তাঁর কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। অধিকাংশই আদিরসাত্মক কবিতা, কথোপকথনের রীতিতে লেখা। দুইটি কবিতা শুধু ব্যতিক্রম; একটি হোল সতীত্বের আক্ষেপোক্তি (১৮৫৩, ১লা বৈশাখ)। এটিও রূপকধর্মী রচনা। এখানে সতীত্বকে নারী-রূপে কল্পনা করা হয়েছে। ভারতের বর্তমান দুরবস্থার জন্য সতীত্ব অরণ্য মধ্যে ক্রন্দন করছে। এই কবিতার মূল্য অকিঞ্চিতকর; কিন্তু একটি সুরসাল তথ্য আছে—

নবীন যুবকগণে স্বদেশী যুবতী সনে
বিবাহের পূর্বে চাহে ভাব।

বুঝা গেল বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েষা ও জগৎসিংহের ইতিহাস-আশ্রিত কোর্টশিপের (Courtship) ভিত্তিভূমি তদানীন্তন সমাজেই ছিল। তাঁর আর একটি কবিতার বিষয়বস্তু হোল বঙ্গভাষার সহিত ইংরেজী ভাষার কথোপকথন। শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনোজগতের বহু সংবাদ এখানে ধরা পড়েছে। বলা বাহুল্য শেষোক্ত কবিতাটিও রূপক। হিন্দু কালেজের আর একজন ছাত্র দীনবন্ধু মিত্রের কবিতাও সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়েছে; জামাই ষষ্ঠির কবিতা ১৮৫১, ৫ই জুন প্রকাশিত হয়—কবিতাটির সঙ্গে সম্পাদকের মন্তব্য থাকে—"এই জামাই ষষ্ঠির রসের কসুর নাই। ফল না ধরিতেই রসের ছড়াছড়ি হইয়াছে।" এত উল্লাসের কারণ দীনবন্ধু মিত্র গুরুর আদর্শ সম্পূর্ণই অনুসরণ করেছেন। দ্বিতীয়বারের জামাই ষষ্ঠি—১৮৫২, ২৫শে মে প্রকাশিত হয়। এই দুটি কবিতা সেকালে বিশেষ প্রশংসিত হয়। কবিতা দুটিই ঈশ্বর গুপ্তের পৌষ-পার্বণের আদর্শে রচিত। এ কবিতায় আধুনিকত্ব কিছু নাই ; কবিত্ব ততটুকুই যতটুকু দাবী ঈশ্বরগুপ্ত করতে পারেন। সংবাদপ্রভাকরের কবি হিসাবে দীনবন্ধুর স্থান আজ হতমূল্য। তাঁর পরবর্তী কাব্যসাধনার বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে।

কৃষ্ণনগর কালেজের দুইজন ছাত্র ভুবনমোহন দত্ত, ও আনন্দচন্দ্র গুহের কবিতা ১৮৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৮৫৪ সাল ৩রা জানুয়ারী পর্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। দুই কবির রচনাই ঈশ্বরগুপ্তীয় আদর্শ-আশ্রয়ী। সব কটি কবিতাই রূপকের আকারে লেখা। যেমন ভুবনমোহন দত্ত লিখিত "জেনারেল এসেম্বলি নাম্নী সুপ্রতিষ্ঠিত পাঠশালার খেদোক্তি"। এই খেদোক্তি ইংরেজী 'এলিজী' নয়, এ নিতান্তই মঙ্গলকাব্যের আত্মবিলাপ।

কালেজীয় ছাত্র ব্যতীত যাঁরা 'প্রভাকরে' কবিতা লিখতেন, তাঁদের মধ্যে শিবপুরনিবাসী সূর্যকুমার সেনগুপ্ত, মেদিনীপুরনিবাসী অক্ষয়নারায়ণ দাস (১৮৫৩, ২৯ এপ্রিল), কোতরঙ্গনিবাসী বিশ্বম্ভর দাস (১৮৫৩, ২৪ মার্চ্চ), ফরাসডাঙ্গানিবাসী কৃষ্ণদাস শূর, জেজুরনিবাসী রাধামাধব মিত্র, কাঁচড়াপাড়া নিবাসী মধুসূদন সেন, ও বিরাজমোহিনী দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে আবার সূর্যকুমার সেনগুপ্ত এবং রাধামাধব মিত্রেরই কেবল একাধিক

কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৫২ সালে ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে সূর্যকুমার সেনগুপ্তের চার পাঁচটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ঐ বছরই ২৬শে মে, ১৯৫৩ সালে ২০শে এপ্রিল ও ২৯শে সেপ্টেম্বর তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলি প্রকৃতি-বিষয়ক। সূর্যকুমার সেনগুপ্তের একটি কাব্যও প্রকাশিত হয়েছিল—কাব্যটির নাম "চিত্ততোষিনী কাব্য"—Chittya Toshinee—A series of miscellaneons poetical pieces by Soorjce Coomar Sengoopt, প্রকাশ কাল ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ। অর্থাৎ মাইকেল আবির্ভাবের বেশ দূরবর্তী রচনা। স্তোত্র, ঈশ্বরের নির্ভর; রজনীতে আকাশ দর্শনান্তর, স্বদেশ, অবোধবন্ধু, দুর্গোৎসব, প্রণয়, অহঙ্কার, একেলের আমোদ, মাতাল, স্বভাবসম্বোধন প্রভৃতি কবিতা কাব্যটিতে আছে। প্রকৃতি অর্থে স্বভাব ব্যবহার করা হয়েছে। দিবাকর, শশধর, স্রোতস্বতী, সমীরণ, অটবী, গিরি প্রত্যেকের মুখ দিয়ে প্রকৃতি বর্ণনা করা হয়েছে; রূপকধর্মী রচনা। অর্থাৎ বাংলা কাব্য-জগতে যে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে, তার থেকে কবি কোন শিক্ষাই গ্রহণ করতে পারেন নি—এমনই দুর্মর ছিল গুরু ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব।

জেজুরনিবাসী রাধামাধব মিত্রের কবিতা ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ৭ই এপ্রিল প্রভাকরে প্রথম প্রকাশিত হয়। কবিতাটির নাম 'তত্ত্বপ্রকরণ'।

অবিরত ওরে মন সাবধানে রও।
সাধু সঙ্গে থাকো, সাধু উপদেশ লও ॥

বুঝতেই পারা যায় যে, এ কবিতা আর যাই হোক, কবিতা-ও নয়; আধুনিক-ও নয়। পরবর্তীকালে রাধামাধব মিত্রের একাধিক কাব্য প্রকাশিত হবে। "বসন্তে বিচ্ছেদে কুলকামিনীর খেদ" নামক কাব্য ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সরকারী চাকুরী উপলক্ষ্যে স্বামীরা প্রবাস-জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছেন—এই সামাজিক তথ্যটুকু এই কাব্যের মূলধন। আর সবই মঙ্গলকাব্যীয় প্রলাপ। "কবিতাবলী" নামে তাঁর অপর এক কাব্য ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন :

"গৌরবান্বিত বঙ্গকবিকুলচূড়ামণি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, যেহেতু কবিতা রচনা বিষয়ে তিনিই আমার একমাত্র শিক্ষাগুরু।"

॥ শিক্ষাগুরুর কাব্যাদর্শ ॥

শিক্ষাগুরু প্রতিভাশালী ব্যক্তি এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; তাঁর বহুমুখী কর্ম-ক্ষমতা সাহিত্য, তথা সমাজসেবার ক্ষেত্রে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তাঁর ব্যক্তিত্বের বিবিধমুখী প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বাংলাকাব্য এই প্রতিভার সংস্পর্শে সত্যই উপকৃত হয়েছে কিনা, বা হলেও কতটুকু হয়েছে, তার যথার্থ বিচার আজও হয়নি। কবিতা কোন কোন যুগে তথ্য ও তত্ত্বের বাহন হয়, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বাহনের তনুর দীপ্তিও নয়নরঞ্জক হয়।

বিদেশী সাহিত্যে এর ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। Verse ও Poetry—পদ্য ও কবিতার পার্থক্য তখন লুপ্ত হয়ে যায়। সাহিত্য-অঙ্গনে তখনই যথার্থ মাৎস্যন্যায়। এমন একটি যুগ হল হোল ইংরেজী সাহিত্যের সপ্তদশ শতক। সপ্তদশ শতকের ইংরেজী সাহিত্যে বুদ্ধির তরবারিতে শান দেওয়া হয়েছিল; Iambic couplet-এর যুগল বেষ্টনীর মধ্যে তরবারির যে খেলা প্রদর্শিত হয়েছিল, তার ঝকমকানি সমসাময়িক যুগের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল, একথা অস্বীকার করবে কে? বিতর্ক আর কাব্যের ভেদ লুপ্ত হোল; গদ্য আর পদ্যের চৌহদ্দি মুছে দেওয়া হোল। পুঁথি-পড়া বিদ্যা আর চিরাচরিত ভাষা—এই হোল মূলধন। এ যুগই হোল যুক্তি এবং গদ্যের যুগ। তাই কবিতার নাম হোল An Essay on Criticism, An Essay on Man. বক্তব্যে এই বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ ভাষার কারিকুরিতে আত্মপ্রকাশ করল। পুরাতন অলঙ্কার (সবই অবশ্য গিল্টির নয়) ঘসা-মাজা ক'রে তার ঔজ্জ্বল্য বাড়ান হোল। ছন্দের দ্রুততাও বিস্ময়কর ভাবে বাড়ল। Coleridge তো ড্রাইডেনের ছন্দকুশলতা সম্বন্ধে বলেই ফেললেন:

Dryden's genius was of that sort which catches fire by its own motion; his chariot's wheel get hot by driving fast."[২৮]

আর পোপ তো এঁদের মধ্যে রাজাধিরাজ। "In the directness and lucidity of his style he improved his inheritance from Waller, Denham and Dryden."[২৯] পোপের ছন্দ পারঙ্গমতা-কে জনৈক সমালোচক বলেছেন, "In Pope, it very often perfects epigram."[৩০] এত আয়োজন সত্ত্বেও কিন্তু এভাষা যতটুকু বলে ততটুকুই বলে। উপরি

কিছু বলতে পারে না। অথচ কাব্য হোল ভাষার এই অতিরিক্ততা, এই উপচে-পড়াটা। ইংলণ্ডের যুগসন্ধির কবি গ্রে চটেমটে বলেছিলেন, "The language of the age is not the language of poetry." পোপ ও ড্রাইডেনের কাব্য-উৎকর্ষ নিয়ে মতবিরোধ আছে। হাল আমলের সমালোচক হার্বাট রীড বলেছেন, "Such art is not poetry"। এবং আরও বলেছেন, "It is wit written, not poetry". হার্বাট রীডের এই মন্তব্য টি. এস. এলিয়ট কর্তৃক সমালোচিত হয়েছে।[৩০ক] ভাষা-নির্বাচনে যে নীতি অনুসৃত হয়েছে, তা কবিতার নীতি নয়, সাংবাদিকতার। বিস্ময় বা চমক সৃষ্টিই এর লক্ষ্য। নানা কসরত প্রয়োগে পদ্যের কলেবরে কলরব আনা যায়, কিন্তু কাকলী ফোটান যায় না।

অনেকে এই নব্য ক্লাসিকধর্মীয় কাব্যের সঙ্গে ঈশ্বরগুপ্তীয় কাব্যের তুলনা করে থাকেন। এ তুলনা নিতান্তই বহিরঙ্গগত ; তা-ও যথেষ্ট ব্যাপক নয়। যে তীক্ষ্ণ স্পষ্ট যুক্তিবাদ, জাগ্রত জীবন-এষণা এবং মর্ত্য-প্রেম পোপ-ড্রাইডেনের কাব্যের আন্তর সম্পদ, ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে তার প্রতিধ্বনি কোথায় ? বৈষয়িক জীবনের স্থূল ঘটনাপঞ্জী কেবল তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। বৈষয়িক জীবন মর্ত্য-প্রেমের বিরোধী নয়, কিন্তু সর্বস্ব নয়। মর্ত্য-প্রেম স্থূল বৈষয়িকতা নয়। ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যে এ সংবাদের স্বীকৃতি নেই।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ঈশ্বরগুপ্তের কালে মানবতাবাদী মর্ত্য-নিষ্ঠা দেখা দিয়েছিল কি ? যুক্তিনির্ভর সমাজবোধ অঙ্কুরিত হয়েছিল কি ? মানবপ্রেম, সমাজবোধ ও বৈষয়িকতা যে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী চেতনা নয়, এ সংবাদ তখনই বঙ্গ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল।

রামমোহন তখন সবে বিগত হয়েছেন ; কাজেই তাঁর যুক্তি-নির্ভর জীবন-এষণা ঈশ্বরগুপ্তের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার কথা নয়। এবং তা যায়ও নি,—তাঁর সম্পাদকীয় নিবন্ধে তার প্রমাণ আছে। আর অক্ষয়কুমার দত্ত ত তাঁরই আবিষ্কার! অক্ষয়কুমার দত্তের "বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় ; তাতে স্পষ্টভাষায় বলা হোল, "দেশাচার মাত্রই বিহিত, একথা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। যে রীতিবর্ত্ম পরমেশ্বরের নিয়মানুযায়ী, তাহাই যথার্থ বিহিত।"[৩১] চারুপাঠ ১ম ভাগ ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় ; "সত্যধর্ম প্রচারিত হয়, তদর্থে সচেষ্ট হওয়া উচিত।"[৩২] এর

পর 'পদার্থবিদ্যা', 'ধর্মনীতি' প্রকাশিত হয়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর দুরারোগ্য শিরঃপীড়া হয়। অক্ষয়কুমারের শিরঃপীড়া নিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত ছড়া কাটলেন। অক্ষয়কুমার যখন নব্য জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনা করছেন, সেই সময় ঈশ্বর গুপ্ত "কুলকামিনীর খেদ" রচনাকারীদের উৎসাহ দিচ্ছেন। যে নবীন চেতনা এই যুগকে জয় করতে এগিয়ে আসছিল, ঈশ্বর গুপ্ত ক্রমশই তার থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। এত আলো তাঁর সহ্য হচ্ছিল না।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে রঙ্গলালের যে কবিতাগুলি পাঠান্তে তিনি প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, তাতে নবযুগের কোন বাণী ছিল না। ১৮৫২ সালে ২৮শে মার্চ "অধুনা গভর্ণমেণ্ট কলেজের ছাত্রদিগের খেদ" কবিতার প্রশংসা ক'রে তিনি উপদেশ দিলেন, "যেন অভিধানের উপর অধিক নির্ভর না করেন।" আটপৌরে বাংলা ব্যবহারের জন্যই তাঁর উৎকণ্ঠা। ১৮৫২ সালে মার্চ মাসে প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্রের "জামাইষষ্ঠী"র প্রশস্তি বাক্য আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি। এই বছরই মার্চ মাসে দ্বারকানাথ অধিকারীর "মনের প্রতি উপদেশ" তাঁর দ্বারা প্রশংসিত হোল ; এবং "কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ" তাঁর আশীর্বাদ লাভ করল। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ২৬শে সেপ্টেম্বর আনন্দচন্দ্র গুহের "সহচরীর প্রতি বিরহিণীর উক্তি" কবিতা পাঠ ক'রে তিনি লিখলেন, "আনন্দের রচিত এই পদ্য অদ্য অতিশয় আনন্দজনক হইয়াছে।" ১৮৫৩ সালে ৫ই ফেব্রুয়ারী বঙ্কিমের "শিশির বর্ণনছলে স্ত্রী-পতির কথোপকথন" কবিতা পাঠে তিনি শুধু প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ ক'রেই ক্ষান্ত হলেন না, নানারূপ "গঠনমূলক" উপদেশ দিলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বনওয়ারীলাল রায়ের 'যোজনগন্ধা' প্রকাশে তিনি আনন্দ প্রকাশ করলেন। ইতিপূর্বে রসিকচন্দ্র রায়ের 'জীবনতারা' (১৮৩৮) তাঁর প্রশংসা পেয়েছিল। বঙ্কিমপ্রসঙ্গে বললেন :

"বঙ্কিম পদ্য রচনায় আর সমুদয় বঙ্কিম করুন, তাহা কাব্যের জন্যই হইবে। কিন্তু ভাবগুলীন প্রকাশার্থ যেন বঙ্কিম ভাষা ব্যবহার না করেন, যত ললিত শব্দে পদবিন্যাস করিতে পারিবেন ততই উত্তম হইবেন। এবং 'এবে', 'করয়ে', 'ছেনু', 'গেনু' ইত্যাদি প্রাচীন কবিগণের প্রিয় শব্দগুলীন পরিহার করিতে পারিলে আরও ভাল হয়। অপিচ প্রতিনিয়তই আদিরসের সেবা না করিয়া এক একবার অন্য রসের উপাসনা করা কর্তব্য হইতেছে, তাঁহার পদ্য অস্মাদির

অন্তঃকরণকে প্রেমাভিষিক্ত করিয়া থাকে এবং অবিলম্বে আগু ছাড়িয়া অপর কোন রসের এক প্রবন্ধ প্রেরণ করিবেন।"৩৩

ভাষা-ব্যবহারে তাঁর যে বাছ-বিচার ছিল, সুস্পষ্ট নীতি ছিল, সে তথ্য তাঁর কবিতা পাঠ থেকেই প্রণিধান করা যায়; তাঁর মুখের কথার প্রয়োজন ছিল না। তবু আমাদের পূর্ব বক্তব্য এর দ্বারা অধিকতর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বলে আমরা তাঁর আরও কতিপয় মতামত উদ্ধৃত করছি:

'লেখা' এই শব্দটি শুনিতে অতি সহজ বটে; কিন্তু উহা কিরূপ কঠিন ব্যাপার তাহা তিনিই জানেন যিনি নিয়ত বিশেষ পরিশ্রমপূর্বক অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টে মনোগত ভাবের সূত্রে শব্দ পুষ্পের হার গাঁথিয়া থাকেন। বিষয় বিশেষে অভিপ্রায়ের সহিত শব্দের সংযোগ করিতে হয়।

কবিতা রচনা অতি কঠিন ইহা বল দ্বারা হয় না, ও মনুষ্যকৃত নিয়মের অধীন নহে, এই জগন্মোহিনী-বিদ্যার অসাধারণ মহিমা ব্যাখ্যা করা যায় না, পরমেশ্বর প্রদত্ত এক অনির্বচনীয় ক্ষমতা দ্বারা কবিমহাশয়েরা সেই মনোহর রস ব্যক্ত করিয়া থাকেন।

* * *

কবিতার ন্যায় আশু হৃদয়-আর্দ্রকারী বিদ্যা আর কিছুই নাই। ভাব অর্থ অলঙ্কার শব্দ ছন্দ ও অভিপ্রায় প্রভৃতি সমুদয় অঙ্গ সুন্দর না হইলে কবিতা হয় না।

* * *

কেহ কেহ কবির সহিত চিত্রকরের তুলনা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা কোনমতেই সম্ভাব্য নহে, কারণ চিত্রকর কেবল বাহ্য বিষয় চিত্র করেন, কবি অন্তর বাহির দুই বিষয় চিত্র করেন।"৩৪

"বাঙ্গালা কবিতার মধ্যে যমক অত্যন্ত শ্রুতিসুখকর। বিশেষতঃ নানার্থ-বাচক এক শব্দে যে সকল পদ্য প্ররচিত হয় তাহা সর্বাপেক্ষা আরো অধিক প্রীতিকর হইয়া থাকে। কিন্তু এ প্রকার বাঙ্গালা কবিতা অতি বিরল, নাই বলিলেই হয়। পূর্বতন কবিগণ নিজ নিজ গ্রন্থে স্থানে স্থানে যে সকল যমক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে সাধু শব্দ অল্পই আছে, কিন্তু তাহা স্বাদু শব্দ বটে, ফলতঃ ঐ সমস্ত শব্দ অসরূপ হলবর্ণ-ঘটিত এবং একপদ নহে। যথা—সব। শব। গু, বাক। গুবাক। আঁটি। আটি। স্ব, মন। শমন। শপথ।

স্ব, পথ। বি, সখা। বিসখা। ইত্যাদি। বস্তুতঃ যমকে এরূপ শব্দসকল প্রযোজ্য বটে, তাহা অলঙ্কারদুষ্ট নহে, কেবল শব্দবিশেষে উচ্চারণগত বৈলক্ষণ্য মাত্রই হইয়া থাকে। ফলে এই স্থলে স্থিররূপে প্রণিধান করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে যদি অসরূপ হলবর্ণঘটিত উচ্চারণগত বৈলক্ষণ্যদোষ-পূর্ণ পদপুঞ্জ পরিহার পুরঃসর শুদ্ধস্বরূপ হলবর্ণঘটিত নানার্থ বাচক শব্দে কবিতা রচনা করা যায় তবে বোধ করি তাহা বুধ সমাজে সম্যগ্রূপেই সমাদৃতা হইতে পারে।"[৩৫]

"চিত্রকরে, চিত্র করে, করে তুলি তুলি।
কবিসহ তাহার, তুলনা কিসে তুলি॥
চিত্রকর দেখে যত, বাহ্য অবয়ব।
তুলিতে তুলিয়া রঙ্গ, লেখে সেই সব॥
ফলে সে বিচিত্র চিত্র, চিত্র অপরূপ।
কিন্তু তাহে নাহি দেখি, প্রকৃতির রূপ॥
চারুদৃশ্য করি দৃশ্য, চিত্রকর কবি।
স্বভাবের পটে লেখে, স্বভাবের ছবি॥
কিবা দৃশ্য, কি অদৃশ্য, সকলি প্রকট।
অলিখিত কিছু নাই কবির নিকট॥"[৩৬]

এর থেকেই তাঁর কাব্যতত্ত্ব পরিষ্কার বুঝা যায়। কবির প্রতিভাবলে দৃশ্য অদৃশ্য সবই প্রকট হচ্ছে এবং তাঁর কাছে অলিখিত কিছুই থাকছে না—এই কথা বলে গুপ্তকবি নিশ্চয়ই কল্পনা শক্তির প্রসঙ্গই বলতে চেয়েছেন। কিন্তু কবির বক্তব্যকে সুন্দর করার জন্য যে আঙ্গিক প্রয়োগের তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, তাতে কবিতার সহজ স্ফূর্তি বিকৃত হবে, এ বিষয়ে সন্দেহ কি? যমক যখন কবিতার প্রাণ বলে বর্ণিত হচ্ছে, তখন চিত্তবৃত্তির স্থলে বুদ্ধিবৃত্তিই প্রাধান্য অর্জন করছে। শেষোক্ত উদ্ধৃতিটি বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে, এই কবিতাটি একাধারে কবির কাব্যতত্ত্ব ও কাব্যতত্ত্বের কাব্যরূপ। এবং এই কাব্যরূপে স্বয়ং কাব্যই যে দেশছাড়া হোল, এ বিষয়ে সন্দেহ কি?

যমক অনুপ্রাস শুধু নয়, যে পয়ার ছন্দ তাঁর হাতে নতুন শক্তি অর্জন করছে, সেই পয়ার আদি রসের সমার্থক হয়ে পড়েছে। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁর সোমপ্রকাশে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যকে সম্বর্ধনা জানিয়ে বলেছিলেন, পয়ার

আদিরসের বাহন। পয়ারের হাত থেকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ কাব্যের মুক্তি আনল। কবিতা ব'লে তৎপূর্বে আর কিছু ছিল না। ছিল কিছু 'রূপক' আর 'তত্ত্বপ্রকরণ'। বঙ্কিমের অধিকাংশ আদিরসাত্মক কবিতা 'রূপক' শিরোনামায় প্রকাশিত। আর যখনই নীতিমূলক কবিতা প্রকাশিত হয়েছে, তার শিরোনামায় শোভা পেয়েছে 'তত্ত্বপ্রকরণ' ; অর্থাৎ নিরম্বু আদিরস, না হয় নিরম্বু নীতিকথা এই হোল কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু। এই ধরনের নির্দিষ্ট দুই চরণে কবিতার পদচারণা সম্ভব নয়—তাই অবিরতই পদস্খলন, এবং কাব্যের এত দুর্গতি !

"কতকগুলীন যুবক, যাঁহারা বিলিতি বিদ্যা অভ্যাস ও বিলিতি কবিতার চালনাপূর্বক কেবল বিলিতি রসিকতাই শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা বাঙ্গালা কবিতার রসজ্ঞ কিরূপে হইতে পারেন ?[৩৮]

কিন্তু এ ভৎ'সনা সম্পূর্ণ যথার্থ নয়। মোট কথা নব্যযুগ যে নীতিবোধ জীবনে আচরণীয় বলে মনে করতেন, তার সমর্থন এই কাব্যে ছিল না। যে আদর্শ বরণীয় মনে করতেন, তার প্রতিধ্বনি এই কাব্যে ছিল না। যে সাহিত্যবোধে ও সাহিত্যাদর্শে তাঁরা উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন, তার অনুসরণ ছিল না এই কাব্যসৃষ্টিতে। সংবাদ প্রভাকরে এক সময় নতুন আদর্শের সমর্থন ছিল ; কিন্তু কালে-কালে এই পত্রিকায় সনাতনপন্থীদের ভিড় হোল।

'Age of Reason'-এর অনুবাদ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তা শুধু মাত্র মিশনারীদের সঙ্গে পাঞ্জা লড়বার জন্য। এই অনুবাদের তাৎপর্য ধর্ম-যাজক আলেকজাণ্ডার ডাফের আতঙ্কের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে। খৃষ্টীয় মিশনারীরা হিন্দুধর্মের যুক্তিহীন বক্তব্যগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে দেশীয়দের খৃষ্টধর্মের প্রতি অনুকূল করার চেষ্টা করছিলেন। পেইনের যুক্তি ও তথ্য নির্বাচন থেকে রসদ সংগ্রহ করে দেশীয়দের সম্মুখে খৃষ্টীয় বুজরুকীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হোল। ঠিক অনুরূপ কাজ করেছিলেন শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় তাঁর Rational Analysis of Gospel গ্রন্থে। উক্ত গ্রন্থে তিনি পেইনের অনুসরণে বাইবেলের সমালোচনা করেছিলেন। অবশ্য এ গ্রন্থেরও প্রেরণাস্থল হোল রামমোহন রায়ের খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদবিরোধী গ্রন্থ। আর তাছাড়া সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক আর কবি ঈশ্বর গুপ্ত এক ব্যক্তি হলেও সর্বদা একই নীতি অনুসরণ করতেন না। গদ্যে পদ্যে শুধু আঙ্গিকগত বিরোধ নয়, তাঁর বক্তব্যেও বৈষম্য থাকত।

॥ ইংরেজী কবিতার অনুবাদ ও বাংলা কাব্যে আধুনিকতা ॥

কবিসমালোচক মোহিতলাল মজুমদার তাঁর "বাংলা কবিতার ছন্দ" গ্রন্থে ঈশ্বর গুপ্তের অনূদিত একটি কবিতায় স্তবক (Stanza)-রচনা-কৌশলের আদিতম রূপ দেখেছেন।[৩৯] কিন্তু এ কৃতিত্ব অনুবাদকের নয়, মূল রচয়িতার। তাঁরই স্তবক-বিন্যাস অনুবাদে অনুকৃত হয়েছে মাত্র। Pope-এর 'Universal Prayer'-এর 'সর্ববাদীসম্মত স্তোত্র' অনুবাদ প্রসঙ্গেও একথা সত্য।

সংবাদ প্রভাকরে বিভিন্ন ইংরেজী কবিতা অনূদিত হোত—গ্রে-র Elegy, গোল্ডস্মিথের Hermit এবং ক্যাম্পবেলের Pleasures of Hope এবং The Soldier's Dream-এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

১২৬৫ সালে ১লা বৈশাখ গ্রে-র Elegy থেকে কিয়দংশ অনূদিত হয়; সম্ভবতঃ এই অনুবাদটিই মোহিতলাল-উল্লিখিত অনুবাদ। আমরা মূলসহ অনুবাদটি উপস্থিত করছি—

> Then, Pilgrim, turn thy ears forego ;
> All earth-born cares are wrong ;
> Man wants but little here below,
> Nor wants that little long.
> ফেরো তবে, ত্যজ তব ভাবনা পথিক,
> লৌকিক ভাবনাচয় অলীক নিশ্চয় ;
> মহীজ অভাব মনুষ্যের অনধিক,
> সে কিঞ্চিৎ, তাও নাহি বহুদিন রয়।

এখানকার মিলের বৈচিত্র্য বাংলা কাব্যে অভিনব সন্দেহ নাই। লেখকের কৈফিয়ৎ কম উপভোগ্য নয় ; আমরা তা এখানে উদ্ধৃত করলাম। "আমি উক্ত কবিতা ইংরাজী মূলের ন্যায় গৌণ-পয়ারে অনুবাদ করিলাম, অর্থাৎ প্রচলিত পয়ার-ছন্দকে মুখ্য-পয়ার বলা যায়, কিন্তু প্রস্তাবিত কবিতায় এক চরণ অন্তর অর্থাৎ প্রথম ও তৃতীয়, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে মিল আছে, অতএব ইহার নাম গৌণ পয়ার বলা যাইতে পারে, এইরূপ ছন্দ সচরাচর ব্যবহার না থাকায় প্রথমতঃ কর্ণের সহিত কিঞ্চিৎ দ্বন্দ্ব হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু ক্রমে সেই দ্বন্দ্ব

অবশ্যই বন্ধ হইয়া কেবল আনন্দের হেতু হইবেক।" একে 'গৌণ পয়ার' বলতে আমাদের আপত্তি নেই। সংবাদ প্রভাকরের স্বাধীন রচনার ক্ষেত্রে এই ধরনের ছন্দ আদৌ প্রযুক্ত হয় নি। অর্থাৎ কি বিষয়, কি বিষয়-পরিবেশন-ভঙ্গী—কোনটিরই তাৎপর্য তিনি অনুধাবন করতে পারেন নি।

কাউপারের Alexander Selkirk-এর অনুবাদ পড়লে আরও কয়েকটি তথ্য নজরে পড়বে :

এখন যা দেখি আমি, রাজা হই তার।
আমার স্বত্বের অরি, কেহ নাই আর ॥
এ অবধি চারিদিগ, জলধির ধার।
ভূচর খেচর সব, অধীন আমার ॥
হে নির্জন! কোথা তব, সেরূপ এক্ষণে ॥
যা দেখেছে যোগিগণ, তোমার বদনে ? ॥
তবু ভাল কোলাহল, স্থানে অবস্থান।
এ দুর্গমে রাজভোগ, নহে সুবিধান ॥[৪০]

এখানে যমক শ্লেষ নেই; অপরের ভাব অনুসরণ করা হয়েছে বলে সেই আদিরস বা তথাকথিত "তত্ত্বপ্রকরণ" নেই। শ্লেষ যমক ব্যতীত যে কবিতা রচনা সম্ভব, তার খোঁজ এখানে পাওয়া যেতে পারত। চকোরের খেদ বা বর্ষা-সমাগমে বিরহিণীর আক্ষেপোক্তি ছাড়াও কবিতার বিষয় থাকতে পারে, এ সংবাদও এখানে রয়েছে। তবু তার তাৎপর্য সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদকের মাথার উপর দিয়ে স্খলিত হয়ে গেল, হৃদয়ে প্রবেশ করল না।

আলোচ্য অনুবাদে নানা প্রকার বিরতিচিহ্ন প্রয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু তবু তার সার্থকতা সম্পূর্ণ স্বীকার করা হয় নি। তাই জিজ্ঞাসার চিহ্ন-এর পরে দাঁড়ি দেবার আবশ্যকতা দেখা যায় :

"হে নির্জন! কোথা তব, সে রূপ এক্ষণে।
যা দেখেছে যোগিগণ, তোমার বদনে ? ॥"

কাজেই নানাবিধ নবীন প্রয়াস দেখা যে দিচ্ছে না, তা নয়; কিন্তু তার তাৎপর্য ঈশ্বর গুপ্ত অনুধাবন করতে পারেন নি। বাংলাভাষা যে কত ভদ্র ও মিষ্ট হতে পারে, শুধু কৌতুক নয়, করুণরসেরও যে বাহন হতে পারে, গদ্যে তারই পরিচয় বিদ্যাসাগর মহাশয় দিয়েছেন। আর জীবনের জিজ্ঞাসা যে

কত জটিল, অক্ষয়কুমার প্রভৃতির রচনায় এবং নব্যশিক্ষিতদের ইংরেজী ভাষায় লিখিত প্রবন্ধাদিতে তারও সুস্পষ্ট এবং নিশ্চিত প্রকাশ দেখা যাচ্ছে : নবীন ভাববস্তু দেশীয় ভাষায় প্রকাশের পথ না পেয়ে ইংরেজীর মাধ্যমে স্ফূর্ত হয়েছে। কিন্তু তবু নিধুবাবুর গীতি-প্রবচনই তো সত্য—

বিনে স্বদেশীয় ভাষা
পূরে কি আশা!

ঈশ্বর গুপ্তের এই সহজ সরল উক্তিও তো শ্রদ্ধেয়—"মাতৃসম মাতৃভাষা।" স্বদেশীয় ভাষায় নবীন যুগের কাব্য শীঘ্রই লেখা হবে। এবং সেজন্য ক্ষেত্র সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তবে তার উৎস পৃথক; কবিও অন্যগোত্রীয়। "যাঁরা বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাস অনুসরণ করেছেন তাঁরা নিঃসন্দেহে একটি কথা লক্ষ্য ক'রে থাকবেন যে, এই সাহিত্য দুইভাগে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এই দুই ধারা দুই উৎস থেকে নিঃসৃত। আধুনিক বাংলা কবিতার উৎপত্তি য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় তাতে সন্দেহ নেই।"[৪১]

কথাটা আমরা উদ্ধৃত করলাম এই কারণে যে, যাঁরা ঈশ্বর গুপ্তকে আধুনিক কাব্য আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড় করাতে চান, তাঁরা যেন তাঁদের পায়ের তলার মাটি পরীক্ষা ক'রে দেখেন।

॥ পাদটীকা ॥

১. Derozio—Edwards.

১ক. The Poetical Works of Derozio—B. B. Shah.
1907. ভূমিকা।

২. Calcutta Review—Vol XV, 1851.
January-July—পৃষ্ঠা—১৯১

৩. India and India Mission—Rev. Alexander Duff.
Edinburgh. 1840. Appendix.

৪. Calcutta Gazette—1829, 23rd November.

৫. Calcutta Review—Vol XV. 1851
Jan-July—পৃষ্ঠা—৯৭

৬. ঐ, পৃষ্ঠা—১২১

৭. ঐ, পৃষ্ঠা—৩১৪

৮. সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়—১৮৬৬, ৮ই জানুয়ারী।

৯. Shair and Other Poems—Kashi Prasad Ghose. 1830, ভূমিকা।

১০. Calcutta Review—Vol IX. 1849—Jan-June.

১১. মধুস্মৃতি—নগেন্দ্রনাথ সোম—১৩২৫, পৃষ্ঠা—৩৭১.

১২. Calcutta Review—Vol IX, Jan-June, 1849.

১৩. সংবাদ প্রভাকর, ১৮৪৮, ১লা বৈশাখ।

১৩ক. প্রেমগীতি—অবিনাশচন্দ্র ঘোষ সংগৃহীত, ১৩০৫ ; ২১০৮-২১০৯।

১৪ বাংলা সাহিত্য—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মন্মথনাথ ঘোষ অনূদিত। ১৩৩৫।

১৫. বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা—গঙ্গাচরণ সরকার, ১৮৮০, পৃষ্ঠা—৫২।

১৬. বঙ্কিম রচনাবলী—২য় খণ্ড, সংসদ সংস্করণ, পৃষ্ঠা—৮৪২।

১৭. Comparative Grammar—Beams—Vol I, পৃষ্ঠা—৮৬।

১৮. সাহিত্যের পথে—রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৩ খণ্ড—পৃষ্ঠা—৪০৭।

১৯. বঙ্কিম রচনাবলী—২য় খণ্ড, সংসদ সংস্করণ, পৃষ্ঠা—৮৫৮।

২০. বাসবদত্তা—৩য় সংস্করণ—১২৮৭ বঙ্গাব্দ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখিত ভূমিকা।

২০ক. অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত—মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ১ম সংস্করণ, ১২৯২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা—৬৬-৬৯।

২০খ. রহস্য সন্দর্ভ—৫ পর্ব, ৫ সংখ্যা।

২১. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন, ৭ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা—৫২০।

২২. মহারাজ নবকৃষ্ণদেবের জীবনচরিত—বিপিনবিহারী মিত্র, পৃষ্ঠা—৯০।

২৩. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন, পৃষ্ঠা—৫২০।

২৪. বঙ্কিম রচনাবলী—২য় খণ্ড, সংসদ সংস্করণ—পৃষ্ঠা—৮৪২।

২৫. অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনচরিত—নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস, ১২৯৪, পৃষ্ঠা—৪৭।

২৬. সংবাদ প্রভাকর—২রা বৈশাখ, ১২৫৪ বঙ্গাব্দ।

২৭. সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৩য় খণ্ড—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা—১০।

২৮. Table Talk—S. T. Coleridge. November 1—1853.
২৯. Cambridge History of English Literature—Vol X. Age of Johnson.
৩০. Augustan Satire—Ian Jack.
৩০ক. The Use of Poetry and the Use of Criticism—T. S. Eliot—পৃষ্ঠা—৮৩-৮৪।
৩১. বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ—অক্ষয়কুমার দত্ত—৩য় মুদ্রণ, ১৮৫৬, পৃষ্ঠা—৪।
৩২. চারুপাঠ—১ম ভাগ, ১৮৫৩, পৃষ্ঠা—৬২।
৩৩. সংবাদ প্রভাকর, ১৮৫২, ৫ই ফেব্রুয়ারী।
৩৪. ঐ, ১২৬০, ১লা চৈত্র।
৩৫. ঐ, ১৮৫৩, ১৯ আগষ্ট।
৩৬. ঐ, ১৮৫৪, ১১ ফেব্রুয়ারী।
৩৭. সোমপ্রকাশ—দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ১২৬৭, ২৩ শ্রাবণ।
৩৮. সংবাদ প্রভাকর, ১৮৫৪, ১৫ই নভেম্বর।
৩৯. বাংলা কবিতার ছন্দ—মোহিতলাল মজুমদার, পৃষ্ঠা—১৫১।
৪০. সংবাদ প্রভাকর, ১৮৫২, ২রা জুলাই।
৪১. বাংলা কবিতা পরিচয়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূমিকা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

"কাল সুপ্রসন্ন—ইউরোপ সহায়—সুপবন বহিছতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ শ্রীমধুসূদন।"

—বঙ্কিমচন্দ্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

নবীন কবিতার সূত্রপাত

যুগান্তরের কাব্য ও তার পর্যায়-বিভাগ

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্য প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশনার তারিখটি থেকে বাংলা কাব্যে আধুনিকতার সূত্রপাত ধরা হয়।

এই যুগান্তরের কাব্য একদিনেই পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠেনি; তারও একটা ক্রম-ইতিহাস আছে। রঙ্গলালে যার সূচনা, মাইকেলে তার শ্রীবৃদ্ধি; এবং রবীন্দ্রনাথে তারই অলোকসামান্য সৌন্দর্য-পূর্তি।

রঙ্গলাল কাহিনী-প্রধান কাব্যের নতুন রূপ দিলেন; মাইকেলের হাতে তারও হোল গোত্রান্তর! এবং মাইকেলই আবার গীতিকবিতারও জন্মান্তর ঘটালেন। সার্থকতার বিচার এখানে করছি না, কিন্তু ঘটনাগুলি উল্লিখিতব্য। মাইকেলের যুগে কাহিনী বা আখ্যায়িকা-ধর্মী কাব্য তার মহত্তর সংস্করণ এপিকে এক সুমহৎ সমুন্নতি লাভ করে। এই যুগ থেকেই আবার গদ্য সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের (creative literature) অন্যতম প্রধান বাহন হয়ে উঠে, বিশেষ করে কাহিনী-প্রধান সাহিত্যের।

লিরিক সর্বযুগেই প্রধান সাহিত্য-বাহন হতে পারে না; এপিকও যেমন পারে নি। 'লিরিক' একটি বিশেষ 'ফর্ম', ও কাব্য-রীতি; এবং একটি বিশেষ বক্তব্যের বাহন।

লিরিক এ যুগে জন্মেছে; কিন্তু তখনও সূতিকাগৃহের চৌকাঠ পেরুতে পারছে না; অন্যান্য কাব্য-বাহনের সঙ্গে এক পরিবারভুক্ত হয়েছে, কিন্তু হতে পারেনি প্রধান।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বিহারীলাল চক্রবর্তীর বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গসন্দর্শন, বন্ধুবিয়োগ, ও প্রেমপ্রবাহিণী—এই কাব্যচতুষ্টয় প্রকাশিত হয়। এই কাব্যচতুষ্টয় কাহিনী-প্রধান কাব্যের একাধিপত্যকে খর্ব করল; এবং একটা স্বতন্ত্র ধারার

উৎপত্তি না ঘটলেও এগুলি সেই ধারাকে পুষ্ট করল। যা ছিল মাইকেলের কাছে বিবিধ চেষ্টার একান্তই অন্যতম, তা হোল এখানে অনন্য চেষ্টা। ১৮৭০-১৮৮২— এই দ্বাদশ বৎসর ধ'রে গীতিকবিতা প্রধান হয়ে উঠবার চেষ্টা করেছে, প্রধান হ'তে পারে নি।

এই যুগে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন 'মহাকাব্যে'র প্রখ্যাত লেখক। খ্যাতির বিড়ম্বনায় অনেককে অনেক রকমে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যিক প্রয়াস তারই নজির।

গদ্যে বঙ্কিমের সফলতা তাঁদের কাছে আলেয়ার হাতছানি। গদ্য এই সময়ে কাহিনীর সর্ববিধ আবেগ বহন করার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। হেমচন্দ্র প্রভৃতি তাঁদের কালের বীণার ঝঙ্কার শুনতে পান নি। অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তাই বিহারীলাল এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি-ব্যক্তিত্ব। তিনিই প্রথম অনুধাবন করলেন আধুনিক কবিতা কী, এবং আগামীকালের কবিতাই বা কী! কাহিনীর নির্মোক ত্যাগ করে কবিতা অন্য-উদ্দীপক (stimulus) নিরপেক্ষ হচ্ছে। তিনি গীতিকবিতার আভাসকে স্পষ্টতর করলেন। পারলেন না তিনি শুধু অনুরূপ কাব্য-ভাষার চূড়ান্ত রূপ-নির্মাণে! তাই তাঁর বক্তব্য আর ভাষার মধ্যে একটা বিরোধ থেকে গেল।

গীতিকবিতার মুখ্য সুর (শুধু মুখ্যই বা কেন, অনন্য) যে আত্মমুখীনতা, তা বিহারীলাল ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন। আলংকারিক ভাষার পরিবর্তে আত্মমুখীন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাষা তিনি তৈরী করেছেন; তিনি তার চারুতা সম্পাদন ক'রে যেতে পারেন নি। কাজেই বঙ্গসুন্দরীর প্রকাশের ফলে যদিও আধুনিক বংলা কবিতার প্রথম পর্যায়ে বেশ কিছু পরিবর্তন সূচিত হোল, কিন্তু তাতে সম্পূর্ণ পৃথক এক নতুন স্তর সৃষ্ট হোল না। বিহারীলালের কাব্য তাই পরিবর্তন যুগের কাব্য, নতুন কালের যথার্থ কাব্য নয়।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যাসঙ্গীত প্রকাশিত হোল।

সন্ধ্যাসঙ্গীত বিহারীলালের কাব্য-প্রবাহের বহির্ভূত এই অর্থে যে, এই কাব্যে আধুনিক গীতিকবিতার নিজস্ব ভাষার অংকুর-উদ্গম ঘটল। এই কাব্যভাষার অভাবে গীতিকবিতার অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছিল।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দ থেকে আধুনিক গীতিকবিতার দ্বিতীয় পর্যায় সুরু হোল।

১৮৮২-১৮৯১—এই প্রায় দশ বৎসরকাল বাংলা গীতিকবিতা তার উপযুক্ত

কাব্য-বিষয়, মণ্ডন-কৌশল ও কাব্যভাষা সৃজন-সাধনায় মগ্ন থেকেছে। এবং পরিশেষে 'মানসী' কাব্যে সেই সকল "অকৃত কার্য, অকথিত বাণী, অগীত গান" সার্থকতা পেল। গীতিকবিতা শুধু প্রধান হয়ে উঠল না, তার প্রাধান্য স্বীকৃতি পেল। অন্যান্য কাব্য-রীতি তখন পুরাতন অভ্যাসের দুঃসহ রোমন্থন।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের পর গীতিকবিতা শুধু বাংলা কাব্যসাহিত্যের নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যেরই প্রধান সাহিত্য-ফসল।

॥ রঙ্গলাল ও আধুনিকতা ॥

॥ ১ ॥

"সিপাহী বিদ্রোহের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গদেশের ও সমাজের এক মহোপকার সাধিত হইল; এক নবশক্তির সূচনা হইল; এক নব আকাঙ্ক্ষা জাতীয় জীবনে জাগিল।"[১]

বিদ্রোহের অবসানে বিদ্রোহের তাৎপর্য শিক্ষিত বাঙ্গালীসমাজ উপলব্ধি করল। রাণী লক্ষ্মীবাই, তাঁতিয়া টোপী, ও বীর কুনওয়ার সিংহের অমর বীরত্ব-গাথা নব্যবঙ্গের স্বদেশাভিমানী চিত্তকে নাড়া দিল। মধ্যবিত্তসুলভ দ্বিধাগ্রস্ত বিবেক আন্দোলনে অংশ গ্রহণে বাধা দিতে পারে; কিন্তু তাই বলে দেশবাসীর লাঞ্ছনায় ব্যথিত হ'তে এবং তার আত্মত্যাগের গরিমায় আত্মপ্রসাদ লাভে বাধা কোথায়? আর ইংরেজী-শিক্ষায় বঞ্চিত সাধারণ মানুষ সিপাহী বিদ্রোহের বীরদের কি চোখে দেখত, তার প্রমাণ রয়েছে নীল-বিদ্রোহের ইতিহাসে। নীল-বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহের নেতাদের নামকরণ করা হোত সিপাহী বিদ্রোহের বীরবৃন্দের নাম অনুসারে।

১৮৫৮ সাল। মুদ্রাযন্ত্র সন্ত্রস্ত; ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রায় অবলুপ্ত। সেই সময় একখানি কাব্য প্রকাশিত হোল—যে কাব্যখানি বাঙ্গালীর সেই মৌন ব্যথার নিঃসংশয়িত দলিল। এ কাব্যেও বিদেশী আক্রমণের প্রসঙ্গ আছে, আছে দেশবাসীর পরাজয়ের বিবরণ। কিন্তু লেখক সমসাময়িক কাল থেকে প্রায় তিন শত বৎসর পিছনে স'রে গেছেন বা পালিয়ে গেছেন।

রাজস্থানের রাজলক্ষ্মীর অতুল রূপরাশির উপর বিদেশীর লুব্ধ দৃষ্টি পড়েছে; দর্পণে সেই অপরূপার প্রতিবিম্ব তাকে শান্তি দিতে পারে না; বরং ইন্ধন জোগালো হুতাশনে। রাজলক্ষ্মীকে অধিকার করতে চেয়েছে ভোগের বাসনায় পীড়িত সেই বিদেশী। শুরু হোল বিপুল প্রতিরোধ সংগ্রাম। বৃদ্ধ সেনাপতি, বালক সৈনিক বাদল, আরও বহু সেনানী এই দেশরক্ষার সংগ্রামে প্রাণ দিল। রাজার এগারটি সন্তান একে একে নিহত হল; তবু ত যুদ্ধের শেষ নাই। তখন পুরনারীরা জলন্ত অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন; রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মাহুতি দিলেন। রাজপুরী বিদেশীদের করতলগত হোল, কিন্তু রাজলক্ষ্মী নয়। সেখানে তখন শ্মশানের ভয়াবহতা ও নিঃস্তব্ধতা বিরাজ করছে।

এ কাব্য ইতিহাসকে আশ্রয় ক'রে শুনিয়েছে সমসাময়িক জীবনের কথা; শুনিয়েছে পয়ারের খঞ্জনী বাজিয়ে।

কাব্যখানির নাম "পদ্মিনী উপাখ্যান"; লেখক রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাব্যের ভূমিকায় কবি কয়েকটি কথা বলেছেন, তা উল্লেখযোগ্য —

"এতদ্দেশীয় অধিকাংশ ভাষা কাব্যনিচয়ের অশ্লীলতা ও অপবিত্রতা সত্বে সত্তাবৎ পাঠে এতদ্দেশীয় বালক, বৃদ্ধ, বণিতা প্রভৃতি সর্বপ্রকার অবস্থার লোকদিগের প্রগাঢ় অনুরক্তি দর্শনে পরিখেদিত হইয়া……কর্ণেল টড বিরচিত রাজস্থান প্রদেশের বিবরণ-পুস্তক হইতে এই উপাখ্যানটি নির্বাচিত করিয়া রচনারম্ভ করিয়াছিলাম।……সমাপ্তির পরে শ্রীযুত রেবরেণ্ড ডবলু ওব্রাএন স্মিথ তথা শ্রীযুত রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি কতিপয় মার্জিত-বুদ্ধি বন্ধুর নিকট ইহা প্রেরণ করি, তাহাতে তাঁহারা এবং……শ্রীযুত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর তথা বর্ণাক্যুলর লিটরেচর সোসাইটি নামক প্রসিদ্ধ সমাজের অধ্যক্ষবর্গ তৎপ্রকাশার্থ বিশেষ উৎসাহ প্রদানপূর্বক অনুরোধ করাতে আমি সেই কাব্য প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু যে রচনার প্রথমোদ্যোগ-পদবীতে আমি পদার্পণ করিলাম, তৎসিদ্ধিপক্ষে কতদূর পর্যন্ত কৃতার্থ হইয়াছি, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভস্থ।

কিশোর কালাবধি কাব্যামোদে আমার প্রগাঢ় আসক্তি, সুতরাং নানা ভাষায় কবিতাকলাপ অধ্যয়ন বা শ্রবণ করত অনেক সময় সম্বরণ করিয়া থাকি। আমি সর্বাপেক্ষা ইংলণ্ডীয় কবিতার সমধিক পর্যালোচনা করিয়াছি এবং সেই বিশুদ্ধ প্রণালীতে বঙ্গীয় কবিতা রচনা করা আমার বহুদিনের অভ্যাস।……

উপস্থিত কাব্যের স্থানে স্থানে অনেকানেক ইংলণ্ডীয় কবিতার ভাবাকর্ষণ আছে, সেই সকল দর্শনে ইংলণ্ডীয় কাব্যামোদিগণ আমাকে ভাবহারী জ্ঞান না করেন, আমি ইচ্ছাপূর্বকই অনেক মনোহর ভাব স্বীয় ভাষায় প্রকাশ কারণ চেষ্টা পাইয়াছি, যেহেতু তাহা করণের দুই ফল। আদৌ ইংলণ্ডীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ অনেক এতদ্দেশীয় মহাশয় এরূপ জ্ঞান করেন তদ্ভাষায় উত্তম কবিতা নাই ; সেই ভ্রমাপনয়ন করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডীয় বিশুদ্ধ প্রণালীতে যত বঙ্গীয় কাব্য বিবেচিত হইবে, ততই ব্রীড়াশূন্য কদর্য কবিতাকলাপ অন্তর্ধান করিতে থাকিবে, এবং তত্তাবতের প্রেমিক-দলেরও সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিবে। পরন্ত এই উপলক্ষ্যে ইহাও নিবেদ্য, আমি সকল স্থলেই যে ইংলণ্ডীয় মহাকবিদিগের ভাব গ্রহণ করিয়াছি, এমত নহে ; অনেক ভাব স্বতঃই আসিয়া অনেকের মনে একেবারে সমুদিত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগের অগ্র-পশ্চাৎ প্রকাশমতে কাব্যকারের প্রতি চৌর্যাভিযোগ প্রয়োগ করাকর্তব্য নহে।

হে স্বদেশীয় মহাশয়বর্গ, আপনারা ঘৃণিত উলঙ্গ আদিরসের কবিতায় প্রেম পরিহারপূর্বক বিমলানন্দদায়িনী কবিতার প্রীতিরসে প্রবৃত্ত হউন।" ৩

॥ ২ ॥

ভূমিকার এই বক্তব্য আক্ষরিক অর্থে সত্য। উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক কাব্যের পক্ষে এটি প্রথম জবানবন্দী। কবি প্রচলিত বাংলা কাব্যের অশ্লীলতা বিষয়ে অবহিত ; এবং তার প্রতি সুস্পষ্ট বিরূপভাব পোষণ করেন। কবি নিশ্চিত যে, বাংলাদেশে একদল 'মার্জিত-বুদ্ধি' কাব্য-পাঠকের আবির্ভাব হয়েছে ; যদিও তাঁরা সংখ্যাল্প। কবি নিঃসংকোচে স্বীকার করছেন যে, এই কাব্যে তিনি ইংলণ্ডীয় রীতি অনুসরণ করেছেন, শুধু প্রণালী নয়, ইংলণ্ডীয় ভাবসমূহও কবি "স্বীয় ভাষায় প্রকাশ করণের চেষ্টা" করেছেন।

ইতিপূর্বে লিখিত কোন কাব্যই এই ধরনের অভিনবত্ব দাবী করতে পারে না। 'মার্জিত-বুদ্ধি'-সম্পন্ন পাঠকের আবির্ভাব আগেই ঘটেছে—বেথুন সোসাইটি এবং অন্যত্র বাংলা কাব্যের প্রতি তাঁদের বিরূপ সমালোচনা হামেশাই শোনা যাচ্ছে। তাঁরা শ্লেষভরে বলছেন, বাংলা কাব্যে আদি রসের ছড়াছড়ি; পয়ারও

আদি রস সমার্থক ; রূপক যমক শ্লেষ ও অনুপ্রাসই হোল বাংলা কাব্যের প্রাণ। চকোর-চকোরী, চাতক-চাতকী, নলিনী বা কুমুদিনী-চন্দ্র, লতা-বৃক্ষ, বিরহিণী-বিয়োগী, রাধা-কৃষ্ণ বাংলাকাব্যের বাঁধাধরা প্রতীক। আধুনিক পাঠক এ কাব্য থেকে শতহস্ত দূরে থাকেন। হিন্দু কলেজ শুধু নয়, অন্যান্য আরও কয়েকটি কলেজ স্থাপিত হয়েছে ; হুগলি, শ্রীরামপুর, কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্ররা সমাজে কৃতবিদ্য হয়ে উঠছেন।

মুদ্রালয়ও অনেকগুলি স্থাপিত হয়েছে। উনিশ শতকের প্রথম পাদেই নিম্নলিখিত মুদ্রাযন্ত্রগুলির সংবাদ আমরা পাচ্ছি—কলুটোলার ভবানীচরণের চন্দ্রিকা আলয়, বহুবাজারের লেবেণ্ডর সাহেবের ছাপাখানা, মীরজাপুরের সম্বাদতিমির নামক ছাপাখানা, শাঁখারীটোলার মহেন্দ্রলাল ছাপাখানা, মীরজাপুরের মুনসী হেদাএতুল্লার ছাপাখানা, আড়পুলির হরচন্দ্র রায়ের ছাপাখানা, শাঁখারিটোলার বদন পালিতের ছাপাখানা, এনটালির পিয়ার্সন সাহেবের প্রেস, কলিকাতার বঙ্গদূত কার্যালয়, চোরবাগানের রামকৃষ্ণ মল্লিকের যন্ত্রালয়, মথুরানাথ মিত্রের যন্ত্রালয়, পীতাম্বর সেনের যন্ত্রালয়, মহিন্দিলাল যন্ত্রালয়, শ্রীরামপুরের "বঙ্গাল গেজেট" খ্যাত গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের প্রেস, শ্রীরামপুরের রত্নাকর যন্ত্রালয়, শ্রীরামপুরের নীলমণি হালদারের ছাপাখানা। এ ছাড়া শ্রীরামপুর মিশন ছাপাখানা, কলিকাতায় ব্যাপটিষ্ট মিশন ছাপাখানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতগুলি ছাপাখানা থেকে যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হোত, তার সবগুলিই নব্য ভাবাদর্শে উদ্দীপ্ত নয়। কিন্তু তবু এতগুলি ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ এক বিরাট পাঠকশ্রেণী তৈরী করছিল। কথকতা ও পাঁচালী গানের শ্রোতা নয়, গ্রন্থ পাঠ করার মত পাঠক বিপুল সংখ্যায় জন্মলাভ করছে। কানে শোনার 'পাঠকে'র থেকে চোখে পড়ার পাঠকের মূল্য অনেক বেশি। এর ফলে পাঠকের চরিত্র বদলাচ্ছে—রাজনৈতিক ভাষায় যাকে বলে democratisation—গণতন্ত্রীকরণ, তাই ঘটছে। বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এ তথ্য উল্লিখিতব্য।

এ সব ছাপাখানা শুধু গ্রন্থই ছাপছে না, সাময়িক পত্রও বের করছে। সাময়িক পত্রিকা নিয়মিত বের হ'য়ে একটা স্থায়ী পাঠক সমাজ গড়ে তুলছে ; এবং একটা রুচি ও মান তৈরী করছে। বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত, তথা নব্য বঙ্গের সৃষ্টিতে এই সাময়িক পত্রিকার গুরুত্ব আছে। সাময়িক পত্র মানুষেরই সংবাদ

নিত্য পরিবেশন করছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি এবং সংস্কৃতির নিত্য নবীন খবর প্রকাশিত হচ্ছে ; তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে পত্রিকা বিশেষের নিজস্ব অভিমত। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "দিগ্দর্শনে' "আমেরিকা ভ্রমণ"-এর সংবাদ, তত্ত্ববোধিনীর বিবিধ তাত্ত্বিক আলোচনা ও রহস্য সন্দর্ভের ভারত-বিদ্যা-চর্চা আর বিশ্বের বিবিধ রহস্যের উন্মোচন নিঃসন্দেহে বাঙ্গলার নবজন্ম সম্পাদনে সহায়তা করছে। এরাই নব্য বাঙ্গলার মন ও মেজাজ সৃজন করছে। বলা যেতে পারে নব্য পাঠকসম্প্রদায় তৈরী হয়ে গেছে।

পাঠক তৈরী, অথচ কবিতার দেখা নেই—এ এক দুঃসহ অবস্থা। নব্য শিক্ষিতদল বাঙ্গলা ভাষায় নবীন সাহিত্যের কোন সন্ধান না পেয়ে পাশ্চাত্ত্যের দিকে মুখ ফিরালেন।

আধুনিক বিষয় এদেশে হঠাৎ আসে নি। প্রথমে বিদেশী ভাষার মধ্য দিয়ে, পরে অনুবাদের মধ্য দিয়ে আধুনিকতার সূত্রপাত দেখা গেল। অনুবাদের ফলে বুঝা গেল যে, আদিরস ছাড়াও অন্য বিষয় ধারণ করার ক্ষমতা বাংলা ভাষার রয়েছে। নবীন আধারে, নবীন ছন্দে, অভিনব মিলে ও স্তবক-বন্ধনে পরিবেশিত হওয়ায় দেশীয় বিষয়বস্তুর বর্ণ-বিপর্যয় ঘটেনি। বহু ব্যবহৃত অলংকার উপমা উৎপ্রেক্ষা যমক শ্লেষ প্রয়োগ না করেও দেশীয় বিষয়ের প্রসাধনকলা নিষ্পন্ন হতে পারে, তা প্রমাণিত হোল। দেশীয় কাব্য-বিষয়বস্তুর এতদিনকার সংস্কার আজ দূরীভূত হোল—কাব্য কেবল রাধাকৃষ্ণ, বিদ্যাসুন্দর, হরগৌরীর গৃহগত বা গৃহবহির্ভূত প্রেমকে অবলম্বন করেই লিখিত হবে, এ নিয়ম বানচাল হয়ে গেল। কবিতা নিছক বিষয় বিশেষের দাস নয়, অলংকার ও ছন্দ বিশেষের উপর চিরনির্ভর নয়। এ তথ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ কাব্য রচনার অসীম সম্ভাবনার দ্বার মুক্ত করা।

বিদেশী ভাষার চর্চার মধ্য দিয়ে এই উপলব্ধি সঞ্চারিত হলেও পাঠক যেহেতু দেশীয় ভাষা ও বিদেশীয় ভাষা উভয় ক্ষেত্রেই একই সম্প্রদায়ভুক্ত, তাই এই উপলব্ধিকে এক ক্ষেত্র ও এক মাধ্যম থেকে অন্য ক্ষেত্র ও অন্য মাধ্যমে স্থানান্তরণে বেশি বেগ পেতে হোল না। এইভাবে বাংলা কাব্য পুরাতন বাংলা কাব্যের বহু দায়ভাগ বহন করেও রক্তের বিচারে পুরাপুরি কলংকহীন সন্তান নয়।

॥ ৩ ॥

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' সেই নবীন রস-পিপাসার

প্রথম পরিতৃপ্তি, পুরোপুরি নয়। এই কাব্যে যে-জাতীয় বিষয়বস্তু ব্যবহৃত হয়েছে, রঙ্গলাল-পূর্ব বাংলা কাব্যে তার সন্ধান মিলবে না। মহারাষ্ট্র-পুরাণ ইতিহাস-আশ্রিত রচনা, কিন্তু সেখানে ঐতিহাসিক কুশলীবেরাও দেব-অবতার। অর্থাৎ পৌরাণিক বিষয়-পরিকল্পনার সঙ্গেই এ কাব্যের ঐক্য। বিষয় ব্যবহার-রীতিতেও পুরানো রীতিরই অনুসরণ ; ভাষা ও ছন্দ সম্পূর্ণই মঙ্গলকাব্যধর্মী। এই কাব্যের ইতিহাস-চিন্তায় দেশপ্রেম বা স্বদেশানুরাগ বিন্দুমাত্র নেই। সম্ভবতঃ ইতিহাস-চিন্তা বলতে তখন কিছুই ছিল না।

আধুনিকতার অন্যতম বিশিষ্টতা হোল ইতিহাস-সচেতনতা। এই ইতিহাস-সচেতনতার উদ্ভব ও পরিপুষ্টির ইতিহাস ইতিপূর্বেই আমরা যত্নসহকারে পরিবেশন করেছি।

রঙ্গলাল বাংলা কাব্যে এই ইতিহাস-সচেতনতার প্রথম স্বাক্ষর রাখলেন। রঙ্গলাল ব্যক্তিগতভাবেও এই চিন্তার অন্যতম অংশীদার ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রত্নতত্ত্বে আগ্রহশীল, ইতিহাসের মর্মজ্ঞ পাঠক, আর জাতীয় জীবনের সমসাময়িক হৃদ্‌স্পন্দন সাময়িক পত্র সম্পাদনার মাধ্যমে আপন চিত্তে অনুভব করেছেন।

ইতিপূর্বে টডের রাজস্থানের ইতিহাস, ডাফের মারাঠা ইতিহাস, উইলফ-এর মহীশূর ইতিহাস প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছে।

রাজপুত ইতিহাসে সাফল্য ও ব্যর্থতা উভয় প্রকার ঘটনাই আছে। এখন কথা হচ্ছে এই যে, কবি কেন ব্যর্থতা ও পরাজয়ের কাহিনী নির্বাচন করলেন ? সিপাহী যুদ্ধের ব্যর্থতা কি তাঁকে ব্যর্থতার সঙ্গীত গাইতে প্রলুব্ধ করেছে ? সম্ভবতঃ সমসাময়িক জীবনের ব্যর্থতাই তাঁকে এই বিষয়বস্তু নির্বাচনে প্ররোচিত করেছে। আর কবি তাঁর দুই চক্ষু মেলে ইতিহাসের বক্ষোপুটে শুধু গৌরবচ্ছটাই অবলোকন করেন নি ; সৌন্দর্যচ্ছটাও অবলোকন করেছেন। ইতিপূর্বে রমণীদেহ ছিল কামের মন্দির। ভারতচন্দ্রের বিদ্যা তার প্রতিনিধি। রঙ্গলাল এই জাতীয় নারীচরিত্র সৃষ্টি-প্রয়াসের অবসান ঘটালেন। তাঁর ছেনিতে ক্ষোদিত হোল নতুন যুগের রমণীমূর্তি। সৌন্দর্য ও সতীত্বের যুগ্ম মিলনে পদ্মিনী সৃজিত। সৌন্দর্য যদিও তখনও অন্য-নিরপেক্ষ হতে চাইছে না বা পারছে না, তবু এই পরিবর্তনটুকুও অবহেলা করার মত নয়। কবি যেন এখানে সচেতনভাবেই নতুন নারী-জগতের দ্বারোদঘাটন করলেন ; দুর্গেশনন্দিনীর তিলোত্তমা ও মেঘনাথবধকাব্যের প্রমীলার অগ্রজাস্বরূপা এই পদ্মিনী। শিক্ষিত

সমাজ বোয়োডেসিয়া, ফিলিপ্পা, সেমিরেমিস, পান্না, দুর্গাবতী, জোয়ান অব আর্কের জীবনী পড়ে বিমুগ্ধ হচ্ছেন। ঝান্সীর রাণীর স্মৃতি এখনও অতীব সজীব।

তখনও নারী-মুক্তি-আন্দোলন শুরু হয়নি, কিন্তু কাব্যে তার হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মিকা সমাজ স্থাপনের পূর্বে কোন নারীসংঘ এদেশে ছিল না। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে মাঘোৎসবে ব্রাহ্মিকা সমাজের মহিলাসভ্যদের উপস্থিত থাকবার স্থযোগ দেওয়া হোল। ব্রাহ্ম সমাজের শুধু নয়, সমগ্র ভারতীয় সমাজের ইতিহাসে এই প্রথম মেয়েরা প্রকাশ্যে পুরুষদের পাশে বসবার অধিকার পেলেন!

রঙ্গলালের পদ্মিনী এই নব কল্লোলের পূর্বে ধীর পদক্ষেপে দেখা দিয়েছিল— পদ্মিনী প্রভাতী শুকতারা; প্রাতরুষার অগ্রদূতী।

পদ্মিনী প্রমীলার আত্মীয়া, কিন্তু (মাইকেলের) তিলোত্তমার অনাত্মীয়া। ক্লিওপেট্রা, উর্বশী আর তিলোত্তমা নারীত্বের বিশুদ্ধ ভাবনা। সতীত্ব নয়, বিশুদ্ধ নারীত্বই তাদের প্রতিপাদ্য। রঙ্গলালের আদর্শ নারী-ভাবনা নীতির সঙ্গে আলিঙ্গনাবদ্ধ।

'পদ্মিনী উপাখ্যান' স্কট ও মূরের আদর্শে রচিত গাথাকাব্য; 'metrical romance'। চারণের মুখে কবি বক্তব্যকে বসিয়েছেন। গল্পের স্থচনা হয়েছে আকস্মিকভাবে, এবং এক অনুকূল পরিবেশে। কবি ঘটনাবিশেষের উপর বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন—যেমন যুদ্ধ, জহরাব্রত। এগুলির উপরে গুরুত্ব আরোপের কারণ নিহিত রয়েছে কাব্যটির চরিত্রের মধ্যে। গাথাকাব্যে ইতিহাসের বিশেষ ঘটনাই কবির অধিকতর স্নেহলাভে ধন্য হয়, সমগ্র ঘটনা নয়। বাংলা দেশে এই প্রথম এমন এক সম্পূর্ণাঙ্গ কাব্য রচিত হোল, যে কাব্যে দেব-বন্দনা নেই, সৃষ্টিতত্ত্ব নেই, বংশলতিকা নেই এবং গল্প শুরু হয়েছে সরাসরি। এমন কি মৃত্যুর পর স্বর্গারোহণ বা পুনর্জন্মের প্রসঙ্গ নেই। নারীরূপ বর্ণনা আছে, অথচ কাঁচুলিপ্রসঙ্গ নেই। শহর, গ্রাম, অরণ্য—সবই আছে। অথচ বৃক্ষরাজির তালিকা বা পশুপক্ষীর সংখ্যাগণনা নেই। নারীপ্রসঙ্গ থাকল, অথচ আদিরসের আর্দ্রক্ষেত্র তৈরী না ক'রে বীর রসের রুক্ষতা আমন্ত্রণ করা হোল। নবীন জীবন-উপাসক মদনমোহন তর্কালংকারের পক্ষে যে প্রলোভন জয় করা কঠিন হয়েছিল, রঙ্গলাল সহজেই তার বেষ্টনী ডিঙ্গিয়ে গেলেন। মদনমোহনের কাব্য-জীবন ও কর্ম-জীবন দুই খাতে প্রবাহিত। রঙ্গ-

লালে আছে উভয়ের মধ্যে সাংগীকরণ। রঙ্গলালের লক্ষ্য ছিল ইংলণ্ডীয় কবিতার আদর্শে কাব্য রচনা। ইতিপূর্বে তিনি একাধিক বিদেশী কবিতার অনুবাদ করেছেন। ১২৬৫ খৃষ্টাব্দে সংবাদ প্রভাকরে পার্ণেল ও গোল্ডস্মিথের 'হার্মিট' শীর্ষক কাব্যদ্বয়ের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। পরে 'ভেক মূষিকের যুদ্ধ' প্রকাশিত হয়। এই কাব্য হোমার-লিখিত বলে কথিত আছে। অনূদিত কোন কবিতাই সেই যুগের হৃদ্‌স্পন্দনকে অনুধাবন করতে পারেনি। আছে শুধু প্রচলিত বাংলা কাব্য থেকে বিষয়ান্তর গমনের চিহ্ন।

॥ ৪ ॥

রঙ্গলাল বাংলা কাব্যের অঙ্গনে নতুনত্বের নানা আলিম্পনই দিয়েছেন, সে কথা আমরা বললাম। কিন্তু একটি প্রসঙ্গ অবশ্যই বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। এই প্রথম প্রকৃতি-বর্ণনায় দেখা গেল একটা নির্বাচন (selection) এবং গোছগাছ করার (organisation) চেষ্টা। কবি বুঝেছেন, বহির্বিশ্বে যা কিছু দেখছি তার সব কিছুই কাব্যের বিষয়ীভূত হতে পারে না—তার মধ্য থেকে বেছে নিতে হবে। আবার, যা লিখছি, তাই কাব্য নয়। বিষয়কে সাজিয়ে গুছিয়ে দিতে হবে, তবেই তা হবে কাব্য। রঙ্গলাল কাব্য রচনার একেবারে এই প্রাথমিক নিয়মকানুন অল্পবিস্তর জানতেন। তাঁর প্রকৃতি-বর্ণনায় তাই আছে নির্বাচনী দৃষ্টিভঙ্গী এবং গোছগাছের প্রয়াস। তাঁর কাব্যেই প্রথম সচেতন প্রকৃতিবোধ দেখা গেল। প্রকৃতি তাঁর কাছে দুজ্ঞের্য় রহস্য নয়। তাঁর মতে প্রকৃতির বিচিত্র লীলা থেকেই কেবল স্রষ্টার ক্ষমতা পরিমাপ করা যায়। কবির প্রকৃতি-বোধে রয়েছে তদানীন্তন জীবনদর্শনের জের। Paine, Tyland, Toland-এর মতে প্রকৃতি রটনা করে বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের সংবাদ। ভূমিকায় তিনি বলেছেন:

"কবিরা নিসর্গরূপ ধর্মের পুরোহিত। তাঁহারা জগতীস্বরূপ কার্যের ক্রম-প্রদর্শনপূর্বক তৎকর্তার সত্তা সংস্থাপন করেন, তাঁহারা মানুষের নিকট ঐশ্বিক ক্রিয়াপ্রণালীর যাথার্থ্য নিরূপণ করিয়া দেন। * বিজ্ঞান দ্বারা আকাশবিহারী জ্যোতির্গণের যেরূপ পরিধি, পরিমাণ ও সংখ্যাদি নিরূপণ করা যাইতে পারে, কবিতাদ্বারা সেইরূপ তাহাদিগের অনির্বচনীয় শোভা সৌন্দর্যাদি হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যিনি এই দৃশ্যমান বিশ্বকে অপরূপ শোভা-সৌদৃশ্যে আবৃত করিয়াছেন,

তিনি আমাদিগের তত্ত্বাবতের পরিমাণ ও সংখ্যা নিরূপণ করিতে নির্দেশ করিয়া সেই অপূর্ব প্রতিভাপুঞ্জের রসজ্ঞ হইতে যে নিষেধ করিয়াছেন, এমত কথা কখনই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব জগদীশ্বর কিরূপ নিয়মে ইহ-জগৎকে সৌন্দর্যরসে প্লাবিত করিয়াছেন, তাহা এতদ্দেশীয় লোকেরা ইংলণ্ডীয় এবং সংস্কৃত মহাকবিদিগের গ্রন্থাধ্যয়নপূর্বক অনুভব করেন।"[৪]

এ বক্তব্য Deism-এর শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা অক্ষয়কুমার দত্তের বক্তব্যের ভাষান্তর মাত্র।

"এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমাণ জগৎ নিরীক্ষণ করিয়া বিবেচনা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে যাবৎ জাতীয় প্রাণী ও যাবৎ জাতীয় জড়বস্তুর এক এক প্রকার নির্দিষ্ট প্রকৃতি আছে, ও অপরাপর বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধও নিরূপিত আছে। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি এই সমস্ত পরস্পর সম্বন্ধের বিষয় আলোচনা করিয়া অচিন্ত্য, অদ্বিতীয়, অনাদি পরমকারণ পরমেশ্বরের সত্তা স্পষ্ট উপলব্ধি করেন। তিনি বিশ্বকর্তার জ্ঞান শক্তি ও মঙ্গলাভিপ্রায় এই বিশ্বের সর্বস্থানে দেদীপ্যমান দেখিতে পান। * * এই সমস্ত সুকৌশলসম্পন্ন সুচারুনিয়ম অবগত হইলে, পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতির সঞ্চার হয় এবং তদনুযায়ী কার্য করিতে যত সমর্থ হওয়া যায়, ততই সুখ স্বচ্ছন্দতার আতিশয্য হয়।"[৫]

কাব্যে সেই নীতিরই প্রয়োগ দেখতে পাই :

ধরাধর অঙ্গে শোভে নানা তরুবর।
নয়নের প্রীতিকর ওষধি বিস্তর॥
কোন্ স্থলে মৃদু স্বর করি নিরন্তর।
উগরে নির্ঝরচয় মুকুতা নিকর॥
তরুণ অরুণ ভাতি জ্বলে কোন স্থলে।
প্রবালের বৃষ্টি যেন হয়েছে অচলে॥
কোথাও তটিনী কূল কুলকুল স্বরে।
শেখরের শ্যাম অঙ্গে চারু শোভা করে॥
যেন রঘুপতি-হৃদে হীরকের হার।
ঝলমল ভানুকরে করে অনিবার॥

আয় মন! চল যাই সেই সব দেশে।
যথায় প্রকৃতি সাজে মনোহর বেশে॥
দেখিবে বিচিত্র শোভা শৈল আর জলে।
শ্রবণ জুড়াবে তটিনীর কলকলে॥
কন্দরে কন্দরে ফুটে কুসুম অশেষ।
শরীর জুড়াবে যাবে সমুদায় ক্লেশ॥

॥ ৫ ॥

এ কাব্যের মূল ভাবনায় দেশ-প্রেম রয়েছে। কাব্যের ইতস্তত দেশপ্রেম-মূলক বিভিন্ন স্তুতি দেখা যায়; কবি এগুলির প্রতি একটু বেশি মমতা দেখিয়েছেন :

মানসে করেন চিন্তা কোথায় সেদিন।
যেদিনে ভারতভূমি ছিলেন স্বাধীন॥
অসংখ্য বীরের যিনি জন্ম-প্রদায়িনী।
কত শত দেশে রাজ-বিধি বিধায়িনী॥
এখন দুর্ভাগ্যে পরভোগ্যা পরাধীনী।
যাতনায় দিন যায় হয়ে অনাথিনী॥

* *

একে ইসলামের প্রতি দ্বেষ ঘোরতর।
তাহাতে স্বদেশ-প্রীতি পূর্ণিত অন্তর॥

* *

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়?
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গসুখ তায় হে,
স্বর্গসুখ তায়॥

দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে,
তুল্য তার নাই।
যদিও যবনে মারি চিতোর না পাই হে,
চিতোর না পাই।
স্বর্গসুখে সুখী হব, এস সব ভাই হে,
এস সব ভাই॥

Derozio-র "To India, My Native Land' আর ঈশ্বর গুপ্তের 'দেশ-প্রেম'—এই দুই কবিতার সুরই এখানে আছে; কিন্তু ডিরোজিও-র সুরই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। রঙ্গলালের নিম্নোক্ত পংক্তি

মানসে করেন চিন্তা কোথায় সেদিন।
যেদিনে ভারতভূমি ছিলেন স্বাধীন॥

যেন ডিরোজিওর নিম্নোক্ত চরণ চতুষ্টয়ের প্রতিধ্বনি:

My country! in the day of thy glory past,
A beauteous halo circled round thy brow.
And worshipped as a deity thou wast.
Where in that glory, where the reverence now?

॥ ৬ ॥

নারী-রূপ বর্ণনায় কবি বলেছেন,

মৃগপতি যূথপতি দ্বিজপতি গজমতি
তিলফুল কোকিল খঞ্জন।
এই সব উপমার, প্রয়োজন নাহি আর,
নব কবিজনের বাঞ্ছিত॥ (—৭৪)

কিন্তু তবু ভারতচন্দ্রকে তিনি পাশ কাটাতে পারেননি:

কোন মূঢ় চিত্রকরে, পদ্মদেহ চিত্র করে,
করিলে কি বাড়ে তার শোভা?
কিংবা সেই কোকনদে, মাখাইলে মৃগমদে,
অতিসুখ লোভে মধুলোভা?

কষিত কাঞ্চন কায় কিবা কার্য সোহাগায়,
কিবা কার্য রসানের ছটা ?
হেন মূর্খ আছে কে হে, দিব ইন্দ্রধনু দেহে,
অভিনব রূপরঙ্গ ঘটা।
জ্বালিয়ে ঘৃতের বাতি, প্রখর ভাস্কর ভাতি,
বৃদ্ধি করা দুরাশা কেবল।
কি কাজ সিন্দূরে মাজি, গজমুক্তাফল রাজি,
মাজিলে কি হয় সমুজ্জ্বল ?

কবি প্রচলিত অলংকারে তাঁর কাব্য-দেহ সাজাবেন না ব'লে শপথ বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, কিন্তু তা রক্ষা করতে পারেন নি। ভারতচন্দ্রের অলঙ্কারপুঞ্জ থেকে এগুলি কি খুব বেশি পৃথক ?

অলংকার-বাহুল্যে ও শব্দচ্ছটায় এই বর্ণনা মধ্যযুগের অমিতব্যয়ী সমাজের সঙ্গে খাপ খায়। তবু একথাও সত্য যে "তিনি আধুনিক কাব্যাভিমানিদিগের ন্যায় কএক শব্দালংকারকেই কবিত্ব স্বীকার করেন না।"[৬] কবি রঙ্গলাল সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর অলংকার-প্রয়োগে অতীত রীতির প্রতিধ্বনি থাকবে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আবার ঈশ্বর গুপ্তীয় অনুসরণও তাঁর কাব্যে অপ্রতুল নয়। কয়েকটি উপমা আমরা এখানে বিশ্লেষণ করছি।

পদ্মিনীর পক্ষ্মনেত্র, বিনোদবিহার ক্ষেত্র,
ব্রীড়া তাহে সদা ক্রীড়া করে।

এ অলংকার মাড়োয়ারী ললনার গহনা, দেহাংশ ছিঁড়ে নেবে এমনই তা ভারী। 'ব্রীড়া' 'ক্রীড়া'র মত প্রস্তরনিভ শব্দ নেত্রে বিরাজ করলে নেত্রপীড়ার সম্ভাবনা থাকে। মাইকেল-পূর্ব যুগে যুক্তাক্ষরের ধ্বনিসুষমা আবিষ্কৃত হয়নি।

ফলদল দলে দলে দলিত সঘনে।
অথবা কর্তনমুখী শস্যের ছেদন।
অথবা হেমন্ত শেষে পাতার ঝরণ॥

এখানে কবির পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এবং শব্দ-নির্বাচনে শক্তির চিহ্ন আছে। আর এই অলংকারমালার সৃজনের মধ্যে হোমারীয় রীতির আভাস আছে ; মাইকেল-উপমার ভূমিকা তৈরী হোল।

- "কি ঘন ঘনশ্রেণী ছাইল গগন"—এ ভাষা তো একেবারেই মাইকেলী ভাষা। 'ঘন' শব্দ এইরকম দ্বিবিধ অর্থে মাইকেল বারবার ব্যবহার করেছেন।

অলংকার সৃষ্টিতে কবির মৌলিকতার অভাব নেই ; যথা—

(১) তরুণ অরুণ ভাতি জ্বলে কোন স্থলে।
প্রবালের বৃষ্টি যেন হয়েছে অচলে॥
কোথাও তটিনীকূল কুলকুল স্বরে।
শেখরের শ্যাম-অঙ্গে চারু শোভা করে॥
যেন রঘুপতি-হৃদে হীরকের হার।
ঝলমল ভানুকরে করে অনিবার॥

(২) যথা শেফালিকা ফুল বিতরিয়া গন্ধ মনোহর।
প্রভাতে নিস্তেজ হয়ে ঝরি পড়ে ধরণী উপর॥

(৩) ছুটিল তুরঙ্গ-সেনা করবাল করে।
যেন উৎস বদ্ধ ছিল শেখর গহ্বরে॥
পর্বতের বক্ষভেদি ধাইল সত্বরে।
উড়ে পর শুভ্রতর টোপর উপর॥
স্রোতোমুখে ফেন রাশি যেন অগ্রসর।
কভু ঊর্ধ্বে কভু নীচে হয়চয় ধায়॥
তরল তরঙ্গ রঙ্গ শোভা হইল তায়।
কোষমুক্ত অসিপুঞ্জ ধক ধক জ্বলে॥
দিনকর কর যেন জাহ্নবীর জলে॥

(৪) ধুনিত কার্পাস-প্রায়, ফেন লাল শোভা পায়,
নবীন শ্যামল দূর্বাদল।

(৫) প্রবোধ-চন্দনে স্বীয় মন-পুষ্প মাখ॥

রঙ্গলাল যেখানে বিশেষ ভাবে ব্যর্থ, সে হোল ভাষা ও ছন্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে। মাঝে মাঝে তিনি হয়ত চিত্রঅঙ্কনে সফলতা দেখিয়েছেন। কিন্তু সঙ্গীত-সৃষ্টিতে তিনি কদাচিৎ সার্থক। তাঁর ব্যবহৃত একাধিক অলংকার নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে শুধু এই সঙ্গীত মাধুরীর অভাবে।

একদা ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তের পয়ার-পারদর্শিতা এবং সংস্কৃত ছন্দ-প্রয়োগ-কুশলতা কবিযশ-লোভীর অনুকরণীয় হয়েছিল। কিন্তু ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বরগুপ্তের এই ছন্দ পৌনঃপুনিকতার বন্ধনে আবদ্ধ। এই ছন্দে বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য কদাচিৎ উন্মুক্ত হতে পারে।

রঙ্গলাল পয়ারের সাবেকী চালই অনুসরণ করেছেন ; শুধু একবার বিলম্বিত চালের ব্যবহার ক'রে তার মধ্যে অভিনবত্ব সঞ্চারে প্রয়াসী হয়েছেন। এই অভিনবত্ব প্রাচীনের নবীন সাজবার ভান। এতে বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু নবীনত্ব নেই।

দুর্গের দ্বিতীয় দ্বারে। মহীপতি। আসি দেন বার।
বসিল ঘেরিয়া তাঁরে। তারা করে। এগার কুমার॥
সেই দিন রাজা তথা। পরিহরি। ছত্রসিংহাসনে।
রাজ্যপাটে যথা বিধি। বরিলেন। প্রথম নন্দনে॥

৮+৬=১৪ স্থলে ৮+৪+৬=১৮ ব্যবহার করা হয়েছে।

মালঝাঁপ

মুসলমান,। বেগবান,। হয়রান,। চাপে।
অনুক্ষণ,। নিয়োজন,। প্রহরণ,—। চাপে॥
সমুজ্জ্বল,। ঝলমল,। মুক্তাফল,। তাজে।
কত ঝল্ল,। কত মল্ল,। হাতে ভল্ল,। ভাঁজে॥

ভুজঙ্গ প্রয়াত

মহাঘোর যুদ্ধে। মুসলমান মাতে।
দিবারাত্র ভেদে। ক্ষমা নাহি তাতে॥
সহস্রেক যোদ্ধা। চিতোরের পক্ষে।
বিপক্ষে পক্ষে। যুঝে লক্ষে লক্ষে॥

একাবলী

মুকুট মুড়িছে। ধনুক। ধারী।
বেণী বিনাইছে। সুর ক্রু। মারী॥
বাজে বীর ঘণ্টা। কিরীট। মূলে।
করবী ফলিত। কর্ণিক। ফুলে॥

রঙ্গলাল সংস্কৃত রীতি অনুসারে দীর্ঘস্বরান্ত ধ্বনিকে গুরু ধরে বাংলায় সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগ করেছেন। দীর্ঘস্বরান্ত ধ্বনির এবম্বিধ দীর্ঘ-উচ্চারণ বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যের প্রথম সমালোচক ও আধুনিক বাংলা কাব্যের সুহৃদোত্তম রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র সমালোচনায় বিষয়টির প্রতি কবির মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "প্রচলিত রীত্যনুসারে গ্রন্থকার মহাশয় আপন প্রবন্ধ কল্পনায় ছন্দসকল অক্ষর গণনায় নির্দিষ্ট করিয়াছেন; তদন্যথায় সংস্কৃত বৃত্তিছন্দসকল বৃত্তি গণনা দ্বারা নির্দিষ্ট করিলে সংস্কৃতজ্ঞদিগকে বিরস হইতে হইত না। পরন্তু তন্নিমিত্ত আমরা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে অনুযোগ করিতে পারি না। বৃত্তের অবহেলায় তিনি ভারতাদি সমস্ত বাঙালি কবির অনুগামি মাত্র হইয়াছেন; তাতে আমাদিগের এস্থলে এ প্রসঙ্গ করায় এইমাত্র অভিপ্রায় যে তিনি এ বিষয়ে মনোযোগী হউন।"[৮]

রঙ্গলাল ব্যবহৃত শব্দপুঞ্জ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতমহাশয়দের ব্যবহৃত সমস্ত শব্দই ব্যবহার করেছেন; কিন্তু তাদের জন্মান্তর ঘটাতে পারেন নি। বরং তাঁর ব্যবহৃত শব্দপুঞ্জ অনেক ক্ষেত্রে মেঘপুঞ্জের মত বক্তব্যকে আড়াল ও অন্ধকার করে ফেলেছে। বিবিধার্থ সংগ্রহের সুবিজ্ঞ সমালোচক এই কাব্যে ভারতচন্দ্রের লালিত্য ও কবি-কঙ্কণের ওজোগুণ না দেখতে পেয়ে আক্ষেপ করেছেন। আধুনিক বাংলা কাব্যে ভারতচন্দ্র ও কবিকঙ্কণের আদর্শ অনুসরণীয় কিনা, তা তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু কবি রঙ্গলাল যে তাঁর কাব্যে মাধুর্য ও তেজ সঞ্চার করতে পারেন নি,এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রঙ্গলালের এই ব্যর্থতার জন্য ঈশ্বর গুপ্তীয় প্রভাব দায়ী ব'লে আমাদের অনুমান। সংবাদ প্রভাকরের সাকরেদী তাঁর কাব্য-প্রতিভার বিকাশে সহায়তা করেনি।

হারে রে নিদয় কাল   একি তোর কর্মজাল,
শোভা না রাখিবি ভব-বনে।
যথা কিছু দেখ ভাল,   না ঠাহর ক্ষণকাল,
জালে বদ্ধ কর সেই ক্ষণে॥

এই অংশটি 'পদ্মিনী উপাখ্যান' থেকে উদাহৃত, এই সংবাদ জানা না থাকলে অনেকেই এ রচনাকে ঈশ্বর গুপ্তের বলে ধ'রে নিতে পারতেন।

ওরে ধীবর কাল পাতিয়া বিশাল জাল,
সংসার সাগরে কর খেলা।
কিবা দিবা বিভাবরী, রোগ রজ্জু করে ধরি,
মোহানলে ভাসায়েছ ভেলা ॥

এই দুইটি অংশই জন্ম-বিচারে যে সহোদরা, তা কি বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে?

অধর ধরিয়া আদর করিয়া
কহেন মধুর বোলে,
"কহ হে প্রেয়সী রূপসী প্রেয়সি,
আপনার অনুযোগ।
কিবা দোষ তব, কথা অসম্ভব,
মম ভাগ্যে কর্মভোগ ॥
পাইলে রতন, করিয়ে যতন,
কেহ সুখে কাল হরে।
কেহ পদে পদে মজিয়ে বিপদে,
দস্যু-করে প্রাণে মরে ॥
তুমি হে আমার প্রাণের আধার,
প্রাণ দিব তব লাগি।
যাক রাজ্যধন, নাহি প্রয়োজন,
দুই হব দুঃখভাগী ॥

রাজদম্পতির এই কথোপকথনের পাশে আর একটি দাম্পত্য আলাপ উদ্ধৃত করা গেল—

প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায়রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে

চুম্বি নিমীলিত আঁখি) "ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী ঊষা তুমি, রূপসী, তোমারে
পাখী-কুল ! মিল, প্রিয়ে, কমল-লোচন !
উঠ চিরানন্দ মোর ! সূর্যকান্ত মণি—
সম এ পরাণ, কান্তা ; তুমি রবিচ্ছবি,—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।
(মেঘনাদবধকাব্য—৫ম সর্গ)

আমরা ইচ্ছা করেই ঈশ্বর গুপ্ত আর মাইকেল-রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিলাম। কারণ রঙ্গলালের এক দিকে ঈশ্বর গুপ্ত, অপর দিকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত। শুধু কালানুক্রমে নয়, কাব্য-সৃষ্টির বিচারেও। আধুনিকতার বিচারে সাহিত্যের অন্য আসরেও রঙ্গলাল আর মাইকেলের মধ্যবর্তী দ্বিতীয় কেউ নেই। নাটুকে রামনারায়ণের কুলীন-কুল-সর্বস্ব নাটকের প্রসঙ্গ আমরা বিস্মৃত হইনি। এই নাটকে (১৮৫৪) সমসাময়িক জীবন প্রকটভাবে ছায়া ফেলেছে, কিন্তু তাঁর রচনারীতি সম্পূর্ণ পুরাতন। সেই নান্দীমুখ, সেই ভাঁড় চরিত্র ও কৌতুকরসের নামে অসুস্থ ভাঁড়ামি ! কাব্যের উপসংহারে তিনি বলেছেন,

ভারতের ভাগ্য জোর, দুঃখ-বিভাবরী ভোর,
ঘুম ঘোর থাকিবে কি আর ?
ইংরাজের কৃপাবলে, মানস-উদয়াচলে,
জ্ঞানভানু প্রভায় প্রচার ॥
শান্তির সরসী-মাঝে, সুখ-সরোরুহ রাজে,
মনোভৃঙ্গ মজুক হরিশে।
হে বিভো করুণাময় ! বিদ্রোহ-বারিদচয়,
আর যেন বিষ না বরিষে ॥

"বিদ্রোহ বারিদচয়"—এখানে সিপাহী বিদ্রোহের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে। নব্য বাঙ্গালী ইংরেজ শাসনে শান্তি ও শৃঙ্খলার সন্ধান পেয়েছে। সে আশা করছে—

ভারতের ভাগ্য জোর দুঃখ-বিভাবরী ভোর
ঘুম ঘোর থাকিবে কি আর ?

যে জীবন-পিপাসা এযুগের চিত্তকে বিচলিত করছিল, তার এক অর্দ্ধস্ফুট চরিতার্থতা এই কাব্যে প্রকাশ পেল। চরিতার্থতা চূড়ান্ত নয়, কিন্তু পিপাসা বড়ই বাস্তব। "ভাব ও অর্থই তাঁহার পূজ্য; এবং ঐ দেব-সেবায় তিনি সিদ্ধকাম হইয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ সদ্ভাবের আকর, এবং সেই ভাবসকল মনোহর ভঙ্গীতে অলংকৃত হইয়াছে।"[৮]

॥ পদ্মিনী-পরবর্তী কাব্য-ধারা ॥

॥ ১ ॥

রঙ্গলাল হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাল্যবন্ধু; মধুসূদনের ভাষায় তাঁদের উভয়ের সম্পর্ক ছিল এইরূপ—"We were boys together at Kidderpur and he used to call my mother (God rest her Soul!) mother." এই কারণে কোন কোন সমালোচক অনুমান করেছেন যে, তাঁর কাব্যে মধুসূদনের "সংশোধন থাকা বিচিত্র নয়।" 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' এই সংশোধন ছিল কিনা তা বলা দুষ্কর। কারণ অনুমান ভিন্ন সত্যে উপনীত হওয়ার অন্য কোন পথ নাই। তবে প্রভাব ছিল, এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

রঙ্গলালের দ্বিতীয় খণ্ডকাব্য 'কর্ম্মদেবী' ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য ও ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হয়েছে। রঙ্গলালের কর্ম্মদেবীর ভূমিকায় এই প্রসঙ্গের ইঙ্গিত আছে: "পদ্মিনী-প্রকাশের পর গত বৎসর এর মধ্যে আমাদিগের দেশীয় ভাষায় ভাষিতা বিমলানন্দদায়িনী কবিতার প্রতি কথঞ্চিৎ দেশীয় লোকের অনুরাগ জন্মিয়াছে, কোন কোন প্রচুর মানসিক শক্তিশালী বন্ধু, যাঁহারা প্রথমোত্তমে ইংলণ্ডীয় ভাষায় কবিতা রচনা অভ্যাস করিতেন, তাঁহারা অধুনা মাতৃভাষায় উত্তমোত্তম কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, অতএব ইহাও সাধারণ আনন্দের বিষয় নহে।"

পদ্মিনী উপাখ্যান, কর্ম্মদেবী ও শূরসুন্দরীর মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে।

কবি একইভাবে কথক ব্রাহ্মণের মুখ দিয়ে তিনটি আখ্যানই বলিয়েছেন। আর তিনটি কাব্যেই ভারতীয় নারীত্বের শ্রেষ্ঠত্ব দেখান হয়েছে।

কর্মদেবীর কাহিনীও রাজপুত ইতিহাস থেকে সংগৃহীত। যশল্মীরের অন্তর্গত পুগল প্রদেশে ভট্টিজাতির অধিপতি হচ্ছেন আনন্দ দেব; তাঁর পুত্র সাধু হোল কাব্যের নায়ক। সাধু সাহসী, বীর, ও দেশপ্রেমিক—কাব্যের নায়কোচিত গুণাবলী তার আছে। নানা বীরত্ব দেখিয়ে সে ঔরিণ্ট নগরে গিয়ে পৌছাল, সেখানে গোহিল রাজপুতদের নেতা মানিক দেব হলেন অধীশ্বর। মানিক দেবের কন্যার নাম কর্মদেবী, কর্মদেবী তখন ষোড়শী; মন্দোরের রাঠোর ভূপতির পুত্র অরণ্যকমলের সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল। কিন্তু সাধুকে দেখে তার মনে অনুরাগ জন্মাল; এবং সাধুও এ ব্যাপারে পিছিয়ে থাকল না। পরে নানা ঘটনা-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে উভয়ের বিবাহ হোল। কিন্তু অরণ্যকমল ক্ষান্ত হোল না। সে প্রতিশোধ নিতে অগ্রসর হোল, এবং এক খণ্ডযুদ্ধে সাধু নিহত হোল। কর্মদেবী স্বামীর কৃপাণ দিয়ে নিজের বাহুদ্বয় ছেদন ক'রে বাম বাহু 'কুল-কবিবর,' ও দক্ষিণ বাহু 'হৃদয়নাথ-পিতা'র নিকট পাঠাল, এবং পরিশেষে স্বয়ং প্রাণত্যাগ করল।

শূরসুন্দরীকাব্যেও নারীত্বের গৌরব বর্ণিত হয়েছে। পার্থক্য এই যে প্রথমোক্ত কাব্য দুখানিতে যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে নারী-সৌন্দর্য অবলোকনের চেষ্টা করা হয়েছে; কিন্তু আলোচ্য কাব্যে কিভাবে লাম্পট্যের প্রমোদসভায় নারীর সতীত্ব রক্ষিত হোল, তাই বর্ণিত হয়েছে। কাব্যের প্রথমাংশে আকবর-প্রতাপ-মানসিংহ কলহ বর্ণিত হয়েছে, হলদিঘাটার যুদ্ধেরও একটি বিস্তৃত বর্ণনা আছে। বিকানীর রাজভ্রাতা পৃথ্বীসিংহের পত্নীর সৌন্দর্যের খ্যাতি শুনে আকবর তাকে করায়ত্ত ক'রতে চাইলেন। নওরোজের উৎসবে তাকে সহসা নিমন্ত্রণ করা হোল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সতীত্বের তেজের কাছে আকবর নতমস্তক হলেন।

আকবরের চিত্তচাঞ্চল্য অনেকটা 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র আলাউদ্দিন খাঁর চিত্তচাঞ্চল্যের অনুরূপ।

হলদিঘাটের যুদ্ধের আনুপূর্বিক বিবরণের সঙ্গে পরবর্তীকালে লিখিত 'রাজপুত-জীবন-সন্ধ্যা'র বর্ণনার মিল পাওয়া যাবে। তবে উভয়েরই মূল উৎস টডের 'রাজপুত ইতিহাস।'

উভয় কাব্যের ভাষা পুরাতন-পন্থী, ভারতচন্দ্র-অনুগত। তবে কাহিনীর বুনুনিতে (Plot Construction) মূর, স্কট ও বাইরণের প্রভাব আছে, বিশেষ করে মূর। এই সময়ে মূরের Lalla Rookh বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

কর্মদেবী কাব্যে কর্মদেবীর পূর্বরাগ এবং ভ্রমণ-বৃত্তান্ত Lalla Rookh-এর আদর্শে কল্পিত। Lalla Rookh পুরোপুরি প্রেম-ঘটিত রোম্যান্স, কর্মদেবী কাব্যে শৌর্য-বীর্যের স্থান আছে।

পুরুষচরিত্রগুলি মোটামুটি শৌর্যে বীর্যে মহৎ; একমাত্র পৃথ্বী সিংহ ব্যতীত। এই কারণেই শূরসুন্দরী কাব্যে নায়িকার শৌর্য যুদ্ধক্ষেত্রে পরীক্ষিত হয়নি, প্রমোদসভায় পরীক্ষিত হয়েছে। উভয় কাবেই ভাষা মঙ্গলকাব্যধর্মী; পয়ার, ত্রিপদী, একাবলী, মালঝাঁপ ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ছন্দের অন্ত্যানুপ্রাসে বিশেষ পারিপাট্য নেই; শুধু 'রে' দিয়েই ত্রিশ পংক্তির মিল দেওয়া হয়েছে। (চতুর্থ সর্গ—কর্মদেবী)

অনুপ্রাস ও উপমা-উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার আছে; কিন্তু সবই গতানুগতিক।

> পাণি পাতি প্রবাহের পয় পিয়ে চাষা।
> ভ্রমভরা এই ভবে মানুষের মন।
> এই শান্ত দান্ত ক্ষান্ত ভ্রান্তির প্রলোভে। ইত্যাদি।

রহস্যসন্দর্ভ-এর সম্পাদকও বলেছেন যে, বিলাপস্থলে ছন্দ যথাযোগ্য হয়নি।

কোন কোন উৎপ্রেক্ষায় মাইকেলী প্রভাব আছে। রঙ্গলালের শব্দচয়ন পুরাতনপন্থী এবং রূপ-বর্ণনা ভারত-অনুগত; বা কুমারসম্ভবের প্রথম সর্গে উমার রূপ-বর্ণনার অনুকরণ।

শূরসুন্দরীতেও বর্ণনাত্মক অংশ অধিক। এবং সে বর্ণনা আদৌ নতুন রীতির নয়।

রঙ্গলালের 'কাঞ্চীকাবেরীকাব্য' (১৮৭৯) রাজপুত-বিষয়-নির্ভর নয়। এ কাব্যের কাহিনী মধ্যযুগীয় বিখ্যাত ওড়িয়া কবি পুরুষোত্তম দাসের ওড়িয়া কাব্য থেকে সংগৃহীত। "ছত্রসংখ্যায় দুইটি কাব্য প্রায় সমাস-সমান। রঙ্গলাল কাব্যটি সাত সর্গে ভাগ করিয়াছেন। প্রথম ও পঞ্চম সর্গ সম্পূর্ণভাবে এবং তৃতীয় ও সপ্তম সর্গ অংশত মৌলিক। চতুর্থ সর্গ ঘনিষ্ঠভাবে মূলানুগত।"[১০] কবির নিজের বক্তব্য নিম্নরূপ:

"গত দুর্গোৎসবের বন্ধের পূর্বে তালপত্রে লিখিত ছন্দোভঙ্গ, পাদভঙ্গ প্রভৃতি নানা দোষ-দূষিত একখানি কাঞ্চীকাবেরী পুঁথি পাইয়া তাহাই সমাদরপূর্বক পাঠ করি এবং পাঠ সমাপন পরে এই কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কতিপয় দিবসে সমাপ্ত করিলাম। ফলতঃ আমার এ রচনা উক্ত উৎকল কাব্যের অনুবাদ নহে। আখ্যানটি মাত্র গৃহীত হইয়াছে, তাহাও সমগ্র নহে। শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার, দেশবর্ণন, উৎকল দেশের পৌরাবৃত্তিক ঘটনা প্রভৃতি কোন বিষয়েই আমি উক্ত মূলকাব্যের নিকট ঋণী নহি। দুই একস্থলে সাদৃশ্য থাকিবার সম্ভাবনা, কিন্তু এ প্রকার সাদৃশ্য অপরিহার্য।" (কাঞ্চীকাবেরী কাব্যের ভূমিকা)

ওড়িয়্যার রাজা পুরুষোত্তম দেবের সহিত কাঞ্চী রাজকন্যা পদ্মাবতীর বিবাহ হোল এ কাব্যের আখ্যানভাগ। রঙ্গলালের অন্যান্য কাব্যের মত যুদ্ধ-বিগ্রহ, পূর্বরাগ এই কাব্যেও আছে। তবে অন্য দুইটি কাব্য 'কর্মদেবী' ও 'পদ্মিনী উপাখ্যান' বিষাদান্তক, এই কাব্যটি মিলনান্তক। 'কাঞ্চীকাবেরী' কাব্য প্রকাশের পূর্বেই বঙ্কিম-প্রতিভার উন্মেষ ঘটে গেছে। 'কাঞ্চীকাবেরী'র ঘটনার নাটকীয়তা ও জটিলতা বঙ্কিম-প্রভাব জনিত হওয়া বিচিত্র নয়।

এরপর রঙ্গলাল আর মৌলিক আখ্যায়িকা-ধর্মী কাব্য লেখেন নি; কালিদাসের কুমারসম্ভব ও ঋতুসংহারের অনুবাদ করেছিলেন। এ ছাড়া 'নীতিকুসুমাঞ্জলি' নামে তাঁর ক্ষুদ্র কবিতাবলীর এক সংগ্রহ-পুস্তক প্রকাশিত হয়।

রঙ্গলালের কাব্যে সমসাময়িকতা ছিল না, তা নয়। ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করলেও তিনি এগুলির তদকালীন প্রাসঙ্গিকতার দিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন। নারী-মহিমা বর্ণনাই তাঁর কাব্য-রচনার প্রধান ধর্ম বলে মনে হয়। পুরুষের শৌর্য-বীর্য স্বদেশ ও নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্যই সর্বদা ব্যাপৃত। সমসাময়িক ক্লেদাক্ত পরিবেশের বিরুদ্ধে এই নারী-বন্দনা নিঃসন্দেহে নবীন মূল্যবোধের পরিচয় বহন করছে।

পরবর্তীকালে হেমচন্দ্রের সাহিত্য-কৃতির পিছনে রঙ্গলালের সাহিত্যবোধ সর্বাধিক কার্যকরী ছিল। রঙ্গলালের যাবতীয় সাহিত্য-সৃষ্টির পিছনে সক্রিয় ছিল সমাজ-হিতাকাঙ্খা। তাঁর এই হিতবোধ ইতিহাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতেও পিছপা হয় নি। রঙ্গলালের ছন্দ, কাব্য-ভাষাও হেমচন্দ্রের প্রতিবেশী। এসব সত্ত্বেও হেমচন্দ্রের কাব্যের মত রঙ্গলালের কাব্য দেশবাসীকে তত মাতাতে পারে নি। তার কারণ রঙ্গলালের কাব্যে সেই রকম উত্তপ্ত আবেগ ছিল

না। আবেগ-প্রচণ্ডতাই হেমচন্দ্রের কবিতাসমূহকে জনপ্রিয় করেছিল। এ ক্ষেত্রে রঙ্গলালের আবেগ অনেক মন্দ ও মন্থরগতি। মাঝে মাঝে দুই-একটি স্থলে উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রকাশ ঘটেছে, তাও কোন না কোন প্রভাবজনিত। 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' কাব্যে 'ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহ বাক্য' মূরের 'Glories of Brien the Brave' এবং 'From life without freedom' কবিতাদ্বয়ের অনুসরণে লেখা। শূরসুন্দরী কাব্যের 'কবিতাশক্তির প্রতি', অংশটি মিলটন-অনুসারী।

আবার 'কাঞ্চীকাবেরী' কাব্যের

হারে রে ইংরাজরাজ করিলি গর্হিত কাজ,
তোরা নাকি কীর্তির প্রহরী ?
তবে কেন করি চুর, সেই বারোরাটি পুর,
হিন্দুর গরিমা নিলে হরি ? (১ম সর্গ)

এই অংশটির সঙ্গে হেমচন্দ্রের 'হতাশের আক্ষেপ' কবিতাটির পংক্তি-বিশেষের সঙ্গে মিল আছে। কবিতাটি ১৮৭০ সালে প্রকাশিত হয়, এবং বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ডাঃ সুকুমার সেন ঐ পংক্তিটি সম্পর্কে বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথেরই ছত্র স্মরণ করাইয়া দেয়।"[১১] হেমচন্দ্র লিখেছেন :

আরে দুষ্ট দেশাচার, কি করিলি অবলার
কার ধন কারে দিলি, আমার সে হোল না।

'মানসী'তে রবীন্দ্রনাথ 'শ্রাবণের পত্র' কবিতায় লিখেছেন :

হা রে রে ইংরাজ রাজ, এ সাধে হানিলি বাজ,
শুধু কাজ শুধু কাজ, শুধু ধড়ফড়।

শুধু কৌতুকরস ঘনীভূত করার জন্যই রবীন্দ্রনাথ এই প্রকার কাব্য-ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন ; নইলে এই রীতি রবীন্দ্র-রীতির বিরোধী।

রঙ্গলাল সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রত্নতত্ত্বেও তাঁর অধিকার ছিল। এ ছাড়া কয়েকটি প্রাদেশিক ভাষাও তিনি জানতেন।

সংবাদ প্রভাকর, রহস্যসন্দর্ভ, বঙ্গদর্শনে তাঁর বহু খণ্ডকবিতা বা ক্ষুদ্র কবিতা বের হয়েছে। Wyatt, Cowper, Milton-এর কবিতার বা কবিতাংশের তিনি অনুবাদ করেছিলেন।

বাংলা ভাষায় নবীন কাব্য-চর্চার তিনি পথিকৃৎ। তা সত্ত্বেও তিনি নবীন যুগের কাব্য-প্রয়োজনটি ঠিক অনুধাবন করতে পারেন নি।

প্রথমতঃ নবযুগের কাব্যভাষা তাঁর অনধিগত ছিল। কাব্য-গুরু ঈশ্বর গুপ্তের ন্যায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে অবজ্ঞা প্রকাশ না করলেও এ ছন্দকে প্রথম দিকে স্বীকার করতে পারেন নি।

"I had a long talk with Rungolal, last evening, on the subject of versification in general and Blank Verse in particular : he said—"I acknowledge Blank Verse to be the noblest measure in the language, but I say that no one but men accustomed to read the poetry of England could appreciate it for years to come."[১২]

অবশ্য অমিত্রাক্ষর ছন্দই যে নবীন কবিতা রচনার পক্ষে অপরিহার্য, একথা আমরা বলছি না ;—কিন্তু কোন কোন যুগে ছন্দবিশেষ বক্তব্যের যোগ্যতম বাহন হয়। পাশ্চাত্য সাহিত্যে মিলটন, ভিক্টর হুগোর সাহিত্যকর্ম পর্যালোচনা করলে এ তথ্য হৃদয়ঙ্গম হবে।

এ-ছাড়া রঙ্গলালের সাহিত্যবোধও ছিল খণ্ডিত ঃ "I donot think Rungolal either reads or can appreciate Milton ; he reads Byron, Scott and Moore……"[১৩]

মাইকেলের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের মন্তব্য রঙ্গলাল মানস-বিচারের শেষকথা হতে পারে না। মিলটন যে তিনি পড়েছিলেন, তাঁর অনুবাদই তার প্রমাণ। তবে মানস-প্রকৃতির স্বাধর্ম্য বিচারে বাইরন, স্কট ও মূরের সঙ্গে তাঁর সহমর্মিতা ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

স্কট, বাইরন ও মূরের কাহিনী-ধর্মী কাব্যসমূহের সার্থকতা আজ বিতর্ক-মূলক। বিশেষ করে গদ্যে উপন্যাস-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় 'metrical romance'-এর আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে গেছে।

গদ্য ও পদ্যের পৃথক ধর্ম সম্পর্কে রঙ্গলাল যে অনবহিত ছিলেন, তা নয়। "পরন্তু কাব্যোপযুক্ত বিষয় কবিতাতেই গ্রথিত করা বিধেয়, পুরাবৃত্তি এবং ধর্মনীতি তথা বিজ্ঞান-বিদ্যা ঘটিত পুস্তক সকল গদ্যে লিখনের প্রয়োজন।" (কর্ম্মদেবীর ভূমিকা)। কিন্তু আর একটু অগ্রসর হলেই তিনি গদ্য-ধর্মের

সমগ্র রূপটি ধরতে পারতেন। বঙ্কিমের আবির্ভাবের পর তাঁর 'উপাখ্যান'-কাব্যসমূহের প্রয়োজনীয়তা আর কি থাকতে পরে? বস্তুত রঙ্গলাল কবিতাকারে বাংলাসাহিত্যের প্রথম রোমান্সজাতীয় উপন্যাস লেখক।

বাইরণের আবির্ভাবে স্কট যেমন পদ্য ত্যাগ ক'রে গদ্যে তাঁর ইতিহাস-প্রিয়তা ও স্বদেশানুরাগের চরিতার্থতা সাধন করেছিলেন, মধুসূদনের আবির্ভাবে রঙ্গলাল যদি তেমন পদ্য ত্যাগ ক'রে গদ্যে রোমান্স লিখতেন, তাহলে বাংলা সাহিত্যে তাঁর কীর্তি কেবল প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার বিষয়ীভূত হোত না। তিনি বহু খণ্ড কবিতা লিখেছেন; কিন্তু সেখানে তিনি তাঁর হৃদয়কে প্রকট করতে পারেন নি, শুধু মস্তিষ্ক চর্চা করেছেন। তাঁর ক্ষুদ্র নীতিমূলক কবিতা চাণক্যশ্লোকের সাবেকী সংস্করণ।

রঙ্গলাল যুগ-প্রয়োজন অনুধাবন করতে পেরেছিলেন; কিন্তু তাঁর সাহিত্য বাহনের যথার্থ রূপটি অনুমান করতে পারেন নি। তিনি মাইকেলের বড পক্ষপাতী ছিলেন না, এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন।[১৪]

রঙ্গলাল বাংলা-কাব্য আলোচনার অঙ্গনে কুণ্ঠিত প্রবেশকারী, স্বচ্ছন্দবিহারী নন। তিনি রোমান্স রসের প্রথম স্রষ্টা, বঙ্কিম সাহিত্যের অগ্রজ। রঙ্গলাল সম্পর্কে একখানি চিঠিতে মাইকেল বলেছিলেন, "My opinion of him is—that he has poetical feelings—some fancy, perhaps imagination but that his style is affected and consequently execrable."[১৫] আমাদের মনে হয় মাইকেলের এই বিশ্লেষণ মোটামুটি-ভাবে গ্রহণযোগ্য। ঐ চিঠির শেষাংশে একটি আশা মাইকেল ব্যক্ত করেছিলেন, "He may improve." আমাদের মতে এ আশা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর পরবর্তীকাব্যে রঙ্গলাল নতুন বিষয় এনেছেন, অলঙ্কার এনেছেন, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র সাফল্যের উর্ধ্বে উঠতে পারেন নি।

পরবর্তীকালের খ্যাতনামা কবি নবীনচন্দ্র সেন 'আমার জীবনে' রঙ্গলালের উৎকল-বাসের এক ঘরোয়া চিত্র দিয়েছেন।[১৬] রঙ্গলালের জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় তাঁর কাব্যজীবনের বহু বিবরণ দিয়েছেন; কিন্তু কেউ-ই রঙ্গলালের কবিপ্রকৃতির প্রকৃত বিশ্লেষণ দিতে পারেন নি এক্ষেত্রে বাল্য ও যৌবনের বন্ধু মধুসূদনই সফলতর।

পাদটীকা

১. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ—১৯৬
২. নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ- প্রমোদ সেনগুপ্ত। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী।
৩. পদ্মিনী উপাখ্যান—ভূমিকা
৪. ঐ
৫. বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার—অক্ষয়কুমার দত্ত। ১৮৫১, পৃ—১
৬. বিবিধার্থ সংগ্রহ—রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত, ৫ম খণ্ড, ৫৩ পর্ব।
৭. ঐ
৮. ঐ
৯. রহস্য সন্দর্ভ—১ম, ১ খণ্ড—১৯১৯ সংবৎ।
১০. বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস—২য় খণ্ড—সুকুমার সেন। পৃ—১১৭
১১. ঐ পৃষ্ঠা—১১৯
১২. মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু। পৃষ্ঠা—৪৭৩—৪৭৫
১৩. ঐ, পৃঃ—৪৭৭—৪৭৮
১৪. আমার জীবন—তৃতীয় ভাগ—নবীনচন্দ্র সেন। বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ—২১০
১৫. মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত—পৃঃ—৩১৭
১৬. আমার জীবন—নবীনচন্দ্র সেন। তৃতীয় ভাগ দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নবীন কাব্য ও মাইকেল মধুসূদন

"The artificial poetry dies of sheer exhaustion as last year's leaves fall off without waiting for the new buds to push them from their places. When Cowper and Crabbe, Wordsworth and Coleridge were ready to try their effects, there was no resistance to their music. They pited upon an empty stage whose audience waiting for long." [১]

ইংলণ্ডে নব্য-কাব্যের আবির্ভাব-মুহূর্ত্তটি বর্ণনাপ্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচক এডমণ্ড গস্ ঐ মন্তব্য করেছিলেন। ইংরেজী কাব্য-জগতে নবীনের আবির্ভাব এত নির্দ্বন্দ্ব কিনা, তা তর্কসাপেক্ষ। প্রখ্যাত সমালোচকের সালংকারা বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায় যে নবীন কাব্যকে সম্বর্দ্ধনা করার জন্য এক বিপুল সংখ্যক পাঠক তৈরী হয়েই ছিলেন। বাংলা কাব্যের জগতে উঁকি দিলে অনুরূপ তথ্যই মিলবে। ছাপাখানার সংখ্যা বাড়ছে; তারই সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা। এবং সাময়িক পত্রিকার সঙ্গে নিত্য নবীন জ্ঞানবিজ্ঞান সমৃদ্ধ গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হচ্ছে। নব্য যুক্তিবিজ্ঞান ও যন্ত্রসভ্যতার ধীর অথচ নিশ্চিত অগ্রগতি থেকে নবীন কাব্য রচনার বাস্তব ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। ইতিপূর্বেই বর্ণনা করেছি যে, নব্য কাব্যের পিপাসা দেশীয় বিষয় অবলম্বনে প্রথমে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে চরিতার্থতা খুঁজেছিল; কিন্তু—বিনে স্বদেশীয় ভাষা

পূরে কি আশা!

সেই আশা পূরণের প্রথম প্রচেষ্টা দেখা গেল রঙ্গলালে। কিন্তু রঙ্গলালের কাব্যে সমসাময়িক জীবনের সেই প্রচণ্ড ব্যাকুলতা ও সর্বব্যাপী অভীপ্সার প্রকাশ ঘটেনি—যে অভীপ্সা স্বর্গমর্ত্য সর্ব চরাচরকে গ্রাস করতে চায়।

ইতিপূর্বেও এই আকুলতা ছিল। কিন্তু ইতিহাসের অনিবার্য বিধানে এই সময়ই তা অধিকতরভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। "এই ১৮৬০ সাল হইতে ১৮৭০

সালের মধ্যে তাহা আরও ঘনীভূত আকারে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিল।"[২] এই কালের প্রথম ভাগে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় 'নবোদীয়মান রবির ন্যায় বঙ্গাকাশে'[৩] উঠ্‌তে লাগলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কিছুদিন সিমলা পাহাড়ে একান্তে ধ্যানধারণায় সময় অতিবাহিত ক'রে ১৮৫৮ সালে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন; তিনি এসে দেখলেন কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেছেন। মহর্ষি-কেশব সম্মিলনে ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্র ক'রে বাঙলা দেশে তুমুল আলোড়ন উপস্থিত হোল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নানা সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলনের পাশাপাশি কেশব সেন-সৃষ্ট আন্দোলন সম্মিলিত হ'য়ে দেশে এক বিচিত্র ও প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করল। কবির ভাষায় তরুণ সমাজের চিত্ত তখন 'তরুণ গরুড়সম কী মহৎ ক্ষুধার আবেশে' চঞ্চল। রঙ্গলালের কাব্যে সেই অভিলাষের সঙ্গে সহমর্মিতা আছে, কিন্তু তার আশানুরূপ কাব্যিক স্ফূর্তি নেই।

চরমভাবে জীবন যাপন ব্যতীত জীবনের চরম সত্যের প্রকাশ ব্যক্তির কাব্যে ঘটতে পারে না। মাইকেল সেই যুগন্ধর প্রতিভা, যাঁর মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর সেই চরম ক্ষুধার আশাতীত স্ফুরণ ঘটেছে— কি কাব্যে, কি জীবনে।

॥ শিক্ষানবীশার প্রথম পর্ব ॥

তাঁর কাব্য সমূহে, শুধু মেঘনাদবধকাব্যে নয়, অবশিষ্ট কাব্যসমূহেও সেই ক্ষুধার তৃপ্তি-সাধিনী প্রয়াস মূর্ত হয়ে উঠেছে।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ২য় সিনিয়র শ্রেণীর ছাত্র হিসাবে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে ইংরেজী নিবন্ধ রচনা ক'রে তিনি যে পুরস্কৃত হয়েছিলেন, তারপর থেকে তাঁর লেখনী ক্ষান্তি মানে নি। "সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টে পঠদ্দশায় তিনি বহু ইংরেজী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন; ইহার কিছু কিছু "জ্ঞানান্বেষণ" (ইংরেজী বাংলা), Literary Gazette, Literary Gleaner প্রভৃতি পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। * * * মধুসূদন বিলাতে Bentley's Miscellany ও Blackwood's Magazine প্রভৃতি পত্রেও কবিতা পাঠাইতেন। তিনি ইংরেজী কবিতা রচনায় ক্যাপ্‌টেন ডি. এল. রিচার্ডসনের নিকট বিলক্ষণ উৎসাহ লাভ করিয়াছিলেন।[৪] এর পর মধুসূদনের জীবনে এক আকস্মিক

পরিবর্তন আসে। তিনি খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করেন; এবং বিশপ্‌স কলেজে প্রবিষ্ট হন; বিশপ্‌স কলেজে তিন বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন। এখানে তিনি গ্রীক, সংস্কৃত, লাটিন প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার সুযোগ পান। তারপর তিনি মান্দ্রাজ গমন করেন। মান্দ্রাজে শিক্ষকতা কালে তাঁর বিভিন্ন কবিতা প্রকাশিত হয়। Captive Ladie ও Visions of the Past প্রকাশিত হোল ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে। আধুনিক সাহিত্যের শিক্ষানবীশীর প্রাথমিক পর্ব এইখানে শেষ হোল। মান্দ্রাজে ইঙ্গ-সমাজে এই প্রচেষ্টা অভিনন্দিত হোল। কিন্তু ভারত-হিতৈষী ইংরেজ এ প্রচেষ্টার প্রশংসা ক'রেও অভিনন্দন জানাতে পারলেন না। গৌরদাস বসাককে লিখিত ড্রিঙ্কওয়াটার বীটনের চিঠি উদ্ধৃত করা গেল: "As an occasional exercise and proof his proficiency in the language, such specimens may be allowed. But he could render far greater service to his country and have a better chance of achieving a lasting reputation for himself, if he will employ the taste and talents, which he has cultivated by the study of English, in improving the standard and adding to the stock of the poems of his own language, if at all events he must write."[৫]

কারণ পত্রলেখক জানেন সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি কেমন স্থূল ও অশ্লীল।

"By all that I can learn of your vernacular literature, its best specimens are defiled by grossness and inadequacy. An ambitious young poet could not desire a finer field for exertion than in taking the lead in giving his countrymen in their own language a taste for something higher and better. He might even do good service by translation. This is the way by which the literature of most European nations has been formed."[৬]

বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত ধারার কাব্যকে অনুসরণ ক'রে লাভ নেই; আবার ইংরেজী ভাষায় বাঙালী তরুণের কাব্য-চর্চাও অর্থহীন। বরং ইংরেজী

কাব্য বাংলা ভাষায় অনূদিত করলেও সুফল ফলবে ; এতে কাব্য বিষয়, কাব্য রচনারীতি ও ভাষার ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হবে। ড্রিঙ্কওয়াটার বীটনের এই অভিমতের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ইতিমধ্যেই আমরা ব্যাখ্যা করেছি।

গৌরদাস বসাক এই চিঠির সারমর্ম জানিয়ে মধুসূদনকে জানালেন :

"We do not want another Byron or Shelley in English ; what we lack is a Byron or a Shelley in Bengali literature."[৭]

ব্রজেন্দ্রবাবু লিখছেন, "বীটনের পত্রে মধুসূদনের মনের গতি ফিরিল ; তিনি অতঃপর মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বিভিন্ন ভাষা শিক্ষায় মনোযোগী হইলেন।" মধুসূদনের দৈনন্দিন কর্মসূচী নিম্নরূপ :

"Perhaps you do not know that I devote several hours daily to Tamil. My life is more busy than that of a school boy. Here is my routine : 6 to 8 Hebrew, 8 to 12 school, 12-2 Greek, 2-5 Talegu and Sanskrit, 5-7 Latin, 7-10 English. **Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers.**"[৮]

(গৌরদাসকে লিখিত মাইকেলের পত্র-১৮ আগষ্ট, ১৮৪৯—বড় হরফ আমার)।

"Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers ?"—এই ব্যক্তিই বালকবয়সে বন্ধু গৌরদাসকে লিখেছিলেন,

"Oh ! how should I like to see you write my "Life," if I happen to be a great poet, which I am almost sure I shall be if I can go to England."[৯]

ইংলণ্ডে যাওয়া তখনই হয়নি ; কিন্তু মাদ্রাজে যাওয়া ঘটল। বাংলা ভাষার প্রাদেশিক কবি এই প্রথম সর্বভারতীয় জীবনের সংস্পর্শে এসেছেন। অপরিমিত আত্মবিশ্বাস আর অপরিমিত সাধনার মধ্য দিয়ে আধুনিক কাব্যের ভগীরথের শিক্ষানবীশীর প্রথম পর্ব এইভাবে সুদূর মাদ্রাজে শেষ হোল। দ্বিতীয় পর্ব শুধু বিদ্যা-আহরণ নয়, শুধু হাতিয়ার (Tool) ব্যবহার কৌশলে দক্ষতা অর্জন করা নয় ; বাংলাভাষায় সাহিত্য-চর্চা শুরু হোল। "বালক বয়সে

একবার মাত্র গৌরদাস বাবুর অনুরোধে বর্ষাঋতু বর্ণনাচ্ছলে তিনি নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন। ইংরাজীতে যাহাকে acrostic বলে, কবিতাটি সেই শ্রেণীর। ইহাতে যে কয়টি পংক্তি আছে, তাহার প্রথম বর্ণগুলি একত্র করিলে 'গউরদাস বসাক' এইরূপ হইবে।

বর্ষাকাল

গভীর গর্জন করে সদা জলধর।
উথলিল নদ-নদী ধরণী উপর॥
রমনী রমন লয়ে, সুখে কেলি করে।
দানবাদি দেব, যক্ষ সুখিত অন্তরে॥
সমীরণ ঘন ঘন ঝন ঝন রব।
বরুণ প্রবল দেখি প্রবল প্রভাব॥
সাধীন হইয়া পাছে পরাধীন হয়।
কলহ করয়ে কোন মতে শাস্ত নয়॥"[১০]

পরিষদ-প্রকাশিত গ্রন্থাবলী সংস্করণে বর্ষাকাল ও হিমঋতু পদ্য দুটিকে তাঁর বাল্য রচনা বলে অনুমান করা হয়েছে। এবং সে অনুমান ভ্রান্ত নয়। কারণ কবিতা দুটিতে আদি রসের আধিক্য। মধুসূদনের পরবর্তী লেখার সঙ্গে তার কোন সঙ্গতি নেই। মধুসূদনের এই বাল্য লেখা ঈশ্বর গুপ্তীয় পদ্য-চর্চা মাত্র। মধুসূদনের যথার্থ রচনা হোল এই লেখার প্রতিবাদ। কালেজীয় কবিতা যুদ্ধের সুর মাইকেলী সুর নয়। বরং ভাষা পৃথক হলেও ইংরেজী কাব্য-চর্চার ক্ষেত্রে মাইকেলী রচনার বিবিধ সুর ঠিক গলা সেধেছে। শুধু বহিরঙ্গ সুর নয়, অন্তরঙ্গ সুরও ঠিক ধরতে পেরেছে। তাঁর অপ্সরী (Upsory) কবিতায় স্পেনসরীয় স্তবক অনুসৃত হলেও (ক খ ক খ গ ঘ গ ঘ ঙ ঙ) বাইরন-ই সে কবিতার প্রাণপুরুষ। তাঁর কলেজীয় বাল্যবন্ধু বঙ্কুবিহারী দত্ত বলেছেন যে এই সময়ে তাঁর প্রিয় কবি ছিলেন বাইরন, "he read his Don Juan with avidity."[১১]

॥ শিক্ষানবীশীর দ্বিতীয় পর্ব ॥

মাদ্রাজগমন আর স্বদেশপ্রত্যাবর্তন—দীর্ঘ আট বৎসরের ব্যবধান। তিনি তখন অনেক প্রবীন। দেশে তখন নবীন নাট্য আন্দোলন চলছে—সে নবীনত্ব গোপাল উড়ের যাত্রা থেকে পৃথক, কিন্তু সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ থেকে উন্নততর কিছু নয়। "নিমন্ত্রিত ইংরেজ দর্শকগণের অভিনয় উপভোগের সুবিধার জন্য উদ্যোক্তাগণ "রত্নাবলী" নাটক ইংরাজীতে' অনুবাদ করাইবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন। গৌরদাস বসাকের পরামর্শে রাজারা এই অনুবাদ কার্যের ভার মধুসূদনের উপর অর্পণ করেন। ·· ··· ··· ··· ··· এই রত্নাবলী নাটকের মহলা দেখিয়াই মধুসূদনের মনে নাটক লিখিবার সঙ্কল্প জাগে। ··· ··· ··· ··· ···

"What a pity the Rajas should have spent such a lot of money on such a miserable play. I wish I had known of it before, as I could have given you a piece worthy of your theatre."[১২]

এই সঙ্কল্প থেকে জন্ম লাভ করল শর্মিষ্ঠা নাটক (১৮৫৮-৫৯); বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শে নাটকের পাণ্ডুলিপি পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের কাছে পাঠান হোল। কিন্তু

"Ram Narayon's "Version," as you justly call it, disappoints me. I have at once made up mind to reject his aid. **I shall either stand or fall by myself. I did not wish Ram Narayon** to recast my sentences—most assuredly not.

I have no objection to allow a few alterations and so forth; but recast all my sentences—the Devil! I would sooner burn the thing."[১৩]

নব্য বাঙ্গালার প্রাণের ভাষা রামনারায়ণের কলমের ডগায় ফোটে না। কাজেই তাঁর বাক্যের স্বকীয়তা তিনি বিসর্জন দিতে পারেন না। "বাক্যের স্বকীয়তা!" যে দেশে গায়েনের কবলে প'ড়ে এক কবির লেখা অন্য কবির লেখা থেকে পৃথক করা যায় না—সেখানে বাক্যের স্বকীয়তা! "Style

is the man"-এ কথার দুন্দুভি সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার নিনাদিত হোল।

শুধু কি ভাষা?—বিষয়?

"I am aware, my dear fellow, that there will, in all likelihood, be something of a foreign air about my drama: but if the language be not ungrammatical, if the thoughts be just and glowing, the plot interesting, the character well-maintained, what care you if there be a foreign air about the thing? Do you dislike Moore's poetry because it is full of Orientalism; Byron's poetry for its Asiatic air, Carlyle's prose for its Germanism?......

In matters literary, old boy, I am too proud to stand before the world, in borrowed clothes. I may borrow a necktie, or even a waistcoat, but not the whole suit."[১৪]

এ কী যুগান্তকারী ঘোষণা! এ কী আত্মপ্রত্যয়! বাঙলার পল্লী-আশ্রিত বা সদ্য নাগরালিবিমুগ্ধ নিতান্ত প্রাদেশিক সাহিত্যকে এ কোন্ আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় উপস্থাপন! কাশীপ্রসাদ ঘোষ আধুনিক বিদ্যায় পারদর্শী হ'য়ে বাংলা কাব্যের স্থবিরত্বের সমালোচনা করেছেন; কিন্তু বাংলা কাব্যের জন্মান্তর সাধনে তাঁর কোন ভূমিকা থাকল না। তাঁর বাংলা রচনা পুরাতনের অনুবর্তন মাত্র। হরচন্দ্র দত্তের সমালোচনা নিতান্তই সমালোচনা। কবি রঙ্গলাল সমালোচনার জবাবে শুধু পুরাতনের স্তুতি নয়, নবীনের আবির্ভাবও সম্ভব করালেন। কিন্তু রঙ্গলালের বিশ্ব-বীক্ষা বৃটিশ বীক্ষা মাত্র, তাও সঙ্কীর্ণতম অর্থে। এই প্রথম বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে আন্তর্জাতিক সাহিত্য-দৃষ্টির প্রণিপাত ঘটল।

মাইকেল জানতেন যে, নবীন মানুষের আবির্ভাব ইতিপূর্বেই ঘটে গেছে। সেই নবীন পাঠকের রসপিপাসা আজিও অচরিতার্থ।

"Besides, remember that I am writing for that portion of my countrymen who think as I think, whose minds have been more or less imbued with Western ideas and modes of

thinking and that it is my in tention to throw off fetters forged for us by a servile admiration of every thing Sanskrit."[১৪]

ভারতের ইতিহাস থেকেই নাটকের বিষয় সংগৃহীত ; কিন্তু বিষয়ের রূপান্তর ঘটল। নাটকের ভাষা ও গঠন-পদ্ধতি সম্পূর্ণ নতুন।

শর্মিষ্ঠা নাটকের গদ্য রচনার প্রসঙ্গ না হয় বাদ দিলাম, পদ্যেও মাইকেলের অভিনবত্বের প্রারম্ভিক চিহ্ন আছে।

মরি হায়, কোথা সে সুখের সময়,
যে সময় দেশময় নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময়।
শুন গো ভারতভূমি
কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ ত্যজ ঘুম ঘোর
হইল, হইল ভোর,
দিনকর প্রাচীতে উদয়।
কোথায় বাল্মীকি ব্যাস,
কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্য রঙ্গে,
মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সুধারস অনাদরে,
বিষবারি পান করে,
তাহে হয় তনু মনঃ ক্ষয়।
মধু বলে জাগ, মা গো,
বিভু স্থানে এই মাগ,
সুরসে প্রবৃত্ত হউক তব তনয় নিচয়।

রাগিনী ও তালসহ এই গানটি প্রথম সংস্করণের পুস্তকের প্রারম্ভে ছিল। এই সঙ্গীত একেবারে বিদ্রোহ-সূচক ; সমসাময়িক নাট্যসাহিত্যের বিরুদ্ধে কবির সুস্পষ্ট নিন্দা। ত্রিপদীর প্রচলিত কাঠামোতে সঙ্গীতটি রচিত ; তবে

মধুসূদনের ছায়া আছে। শর্মিষ্ঠা নাটকে পয়ারের অংশও আছে—স্বগতোক্তির ক্ষেত্রে পয়ার ব্যবহৃত হয়েছে—পরবর্তীকালে দীনবন্ধু মিত্র তাঁর নাটকে এই জাতীয় পয়ার ব্যবহার করেছেন।

সুলোচনা মৃগী ভ্রমে নির্জন কাননে ;
গজমুক্তা লোভে গুপ্ত শুক্তির সদনে ;
হীরকের ছটা বদ্ধ খনির ভিতর ;
সদা ঘনাচ্ছন্ন হয় পূর্ণ শশধর ;
পদ্মের মৃণাল থাকে সলিলে ডুবিয়া ;
হায়, বিধি, এ কুবিধি কিসের লাগিয়া ? ২/২

এখানে ভাষার মধ্যে যে বাক-সংক্ষিপ্তির পরিচয় আছে, তাতে প্রবচন-মূলক সংস্কৃত শ্লোকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এ ছাড়া

উদয় হইল সখি, সরস বসন্ত।
মোহিত দশদিশ পুষ্পগণে,—
আর বহিছে সমীর সুশান্ত ॥
পিককুল কুজিত, ভৃঙ্গ বিগুঞ্জিত,
রঞ্জিত কুঞ্জ নিতান্ত।
যত বিরহিণীগণ, মন্মথ তাড়ন,
তাপিত তনু বিনে কান্ত ॥ ২/২

কিম্বা

আমি ভাবি যার ভাবে, সে ত তা ভাবে না।
পরে প্রাণ দিয়ে পরে, হলো কি লাঞ্ছনা।
করিয়ে সুখেরি সাধ, এ কি বিষাদ ঘটনা।
বিষম বিবাদী বিধি, প্রেমনিধি মিলিলো না !
ভাব লাভ আশা করে, মিছে পরেরি ভাবনা !
খেদে আছি ম্রিয়মান বুঝি প্রাণ রহিল না। ৩/৩

কিম্বা

এই তো সে কুসুম-কানন গো,
পাইয়েছিলাম যথা পুরুষরতন।

সেই পূর্ণ শশধরে, সেইরূপ শোভা ধরে,
সেই মত পিকবরে, স্বরে হরে মন।
সেই এই ফুল বনে, মলয়ার সমীরণে,
সুখোদয় যার সনে, কোথা সেই জন ?
প্রাণনাথে নাহি হেরি, নয়নে বরিষে বারি,
এত দুঃখে আর নাহি ধরিতে জীবন ॥ ৪/৩

এই গানগুলিতে নিঃসন্দেহে ভারতচন্দ্রের ও নিধুবাবুর ছায়া আছে। অবশ্য মধুসূদনের ভাষার স্বকীয়তাও খুঁজলে পাওয়া দুষ্কর নয়। এগুলির ভাষায় যৌন-প্রতীকের ছড়াছড়ি নেই; অযথা অনুপ্রাস ব্যবহার করা হয়নি। এই সঙ্গীতগুলির ভাষা নিঃসন্দেহে মধুসূদনের পরিবর্তন-যুগের ভাষা। ব্রজাঙ্গনা কাব্যের দূরাগত অস্পষ্ট ধ্বনি এখানে শোনা যাচ্ছে। 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৫৯) প্রহসনে একটিমাত্র সঙ্গীত আছে; তার ভাষা পুরোপুরিই বটতলার ভাষা। ছন্দে অবশ্য অভিনবত্ব আছে; মাত্রাবৃত্তের ক্ষীণ ধ্বনি। নাট্যবস্তুর বাস্তবতার খাতিরে ঐ জাতীয় গান সন্নিবিষ্ট না ক'রে উপায় ছিল না। দ্বিতীয় প্রহসন 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ'-তে ভারতচন্দ্রের পথ অনুসরণ করা হয়েছে। এটাও বিষয়-কৌলীন্যের ফলে ঘটেছে।

পদ্মাবতী নাটক ও তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য প্রায় সমসাময়িক রচনা—এক মাস আগে পরে সুরু। (১৮৬০)

পদ্মাবতী নাটকে সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছিল—এই কারণে এ নাটকটির সবিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। দ্বিতীয় কারণও তুচ্ছ নয়—এই নাটকে সর্বপ্রথম গ্রীক প্রভাব কার্যকরী হোল। জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন,—

"Discordia অথবা কলহদেবী, অন্যান্য দেবীগণের মধ্যে বিবাদ উৎপাদন করিবার জন্য, একটি সুবর্ণময় "আপল" (Apple) নির্মাণপূর্বক, তাহাতে ইহা "সর্বোত্তম সুন্দরীর জন্য" এইরূপ লিখিয়া, তাহাদিগের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। জুপিটরের (Jupiter) পত্নী জুনো (Juno), জ্ঞান ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভিনস্ (Venus), প্রত্যেকেই আপনাকে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী স্থির করিয়া, তাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য একান্ত উৎসুক হন। তাঁহারা ট্রয়পুত্র প্যারিসকে (Paris) আপনাদিগের মধ্যস্থ স্থির করিয়া, প্রত্যেকেই তাঁহাকে আপন

কার্যোদ্ধারের জন্য, পুরস্কার প্রদানে স্বীকৃতা হন। জুনো তাঁহাকে সাম্রাজ্য, প্যালাস তাঁহাকে সংগ্রামে বিজয়লক্ষ্মী, এবং ভিনস্ তাঁহাকে সর্বোত্তম সুন্দরী প্রদান করিতে প্রতিশ্রুতা হন। প্যারিস সর্বাপেক্ষা সুন্দরী বোধে ভিনস্‌কেই সুবর্ণ আপল প্রদান করেন। অপরা দেবীদ্বয় ইহাতে ঈর্ষায় ও অভিমানে, প্যারিসের সর্বনাশের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ইহাই সুপ্রসিদ্ধ ট্রয়নগর ধ্বংসের কারণ। মধুসূদন এই গ্রীক উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া, তাঁহার পদ্মাবতী রচনা করিয়াছিলেন। গ্রীক কবির ন্যায় তিনিও তাঁহার গ্রন্থ দেব ও মানব অভিনেতার কার্যে পূর্ণ করিয়াছেন। গ্রীক কাব্যেও যেমন, পদ্মাবতীতেও তেমনই, মানব অভিনেতাগণ দেব অভিনেতাগণের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলির ন্যায় পরিচালিত হইয়াছিলেন। পদ্মাবতী নাটকের শচী, রতিদেবী, নারদ, রাজা ইন্দ্রনীল এবং রাজকুমারী পদ্মাবতী যথাক্রমে গ্রীক পুরাণের জুনো, ভিনস্, ডিসকরিডিয়া, প্যারিস এবং হেলেনের আদর্শে কল্পিত হইয়াছেন। পার্থক্যের মধ্যে এই যে, গ্রীক কাব্যের জ্ঞান ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী প্যালাসের পরিবর্তে মধুসূদন পদ্মাবতী নাটকে যক্ষরাজমহিষী মুরজাদেবীর অবতারণা করিয়াছেন।"[১৫]

মধুসূদন নিজেও লিখেছিলেন, "I am sure I need not tell you that in the First Act you have the Greek story of the golden apple Indianised." (রাজনারায়ণ বসুর নিকট মধুসূদনের চিঠি—১৫ মে, ১৮৬০)

শুধু গ্রীক গল্পের ভারতীয়করণ নয়, এই প্রথম নিয়তি প্রসঙ্গের অবতারণা করা হোল। বাংলা সাহিত্যে এই সংবাদটি উল্লিখিতব্য।

পদ্মাবতী নাটকে ছয়টি সঙ্গীত আছে; এগুলি মিত্রাক্ষরে লেখা। এবং শর্মিষ্ঠার পুরাতন রীতিতে লেখা। কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দ চারবার ব্যবহৃত হয়েছে। বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর লিখেছিলেন, "Where the sentiment is elevated or idea is poetical there only should short and smooth flowing passages in Blank Verse be attempted, so that the audience may be beguiled into the belief that they are hearing the self-same prose to which they are accustomed,—only sweetened by a certain inherent music pleasing and agreeable to the ear. But care must be taken

that they may, in the first instance, be not scared away by the rugged grandeur of this form of versification nor disgusted by the rounded periods, replete with phrases, which are jargon to the untutored ears of many; for that would make the thing at once unpopular and injure the cause for many years to come."[১৬]

মধুসূদন এইসব পরামর্শের অনেক কিছুই গ্রহণ করেছিলেন, যদিও তিনি নিজে লিখেছেন, "I am of opinion that our drama should be in Blank Verse and not in prose, but the innovation must be brought about by degrees." (রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্র, জীবনচরিত—৩১৬-৩১৭)।

পদ্মাবতী নাটকে কলির উক্তি উল্লেখযোগ্য :

"আমি কলি; এ বিপুল বিশ্বে কে না কাঁপে
শুনিয়া আমার নাম? সতত কুপথে
গতি মোর। নলিনীরে স্বজেন বিধাতা—
জলতলে বসি আমি মৃণাল তাহার
হাসিয়া কণ্টকময় করি নিজবলে।
শশাঙ্ক যে কলঙ্কী—সে আমার ইচ্ছায়!
ময়ূরের চন্দ্রক-কলাপ দেখি, রাগে
কদাকারে পা-দুখানি গড়ি তার আমি!
জন্ম মম দেবকুলে; অমৃতের সহ
গরল জন্মিয়াছিল সাগর-মথনে।
ধর্মাধর্ম সকলি সমান মোর কাছে।
পরের যাহাতে ঘটে বিপরীত, তাতে
হিত মোর; পরদুঃখে সদা আমি সুখী।" ৪।১

আধুনিক যুগের দ্বন্দ্ব-সংকুল জীবন-ভাষা যেদিন আবিষ্কৃত হয় নি, তুলনা করুন সেই পূর্ববর্তী যুগের বাংলা কাব্যের কলিচরিত্রের বর্ণনা।

"কলিতে একভাগ ধর্ম অনুরাগ
তিনভাগ হবে পাপ।

* * *

না বুঝিয়া তত্ত্ব পরদারে মত্ত
মজাইবে মাংস মদে।

* * *

মহতের দায় মিছে দিবে রায়
দ্বিজে নাহি ধর্ম লেশ।
কানে দিয়ে মন্ত্র করে কত তন্ত্র
কেবল কড়ির উদ্দেশ॥
বসিয়া বাজারে যবন আচারে
ব্রাহ্মণ বেচিবে ঘি।
দেখিয়া উত্তমা কত নরাধমা
হরিবেক বধূ ঝি॥
সুরাপানে বেশ্যা গমন তপস্যা
করিবেক কত নর।
যে যার সহিতে মজিবে পিরীতে
হাতে হাতে হবে ঘর॥
ত্যজি নিজপতি সতী কুলবতী
যুবতী অসৎ হবে।
মদন-আবেশে পরপতি আশে
পথ আগুলিয়া রবে॥
যতেক অবলা সে হবে প্রবলা
কথা কবে হাত নেড়ে।
স্বামীর বচন করিবে লঙ্ঘন
গঞ্জনায় দিবে তেড়ে॥
হইয়া বহুড়ি হিংসিবে শাশুড়ি
কোন্দলে মারিবে ঝাঁটা।
হেন ছার নারী তার আজ্ঞাকারী
হইবে কলির বেটা॥"[১৭]

কাব্যটি বিশেষ পুরানো নয়; কবি ঘনরাম অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে এই কাব্য রচনা করেন।

"নলিনীরে সৃজেন বিধাতা
জলতলে বসি আমি মৃণাল তাহার
হাসিয়া কণ্টকময় করি নিজ বলে।"

এ ভাষা সম্পূর্ণই আধুনিক ভাষা। "হাসিয়া কণ্টকময় কবি নিজ বলে"—উক্তির মধ্যে যে বৈপরীত্য রয়েছে, যে আপাতবিরোধিতা রয়েছে, তা ঈশ্বর গুপ্তীয় অলংকার থেকে পৃথক। এ ধরণের অর্থালংকার-ব্যবহার বাংলা কাব্যে অভিনব। এখানে বক্তব্যের মধ্যে এমন ভাষা-সংক্ষিপ্তি ও গাঢ়তা সঞ্চারিত হয়েছে, যা ইতিপূর্বে দুর্লভ। এ ভাষা শুধু পদ্মাবতী নাটকের প্রয়োজন সিদ্ধ করেনি, ভবিষ্যৎ কাব্য-ভাষারও পূর্বাভাস দিয়েছে—

রথে যবে তুলি দোঁহে উঠিনু আকাশে,
কত যে কাঁদিল ধনী, করিল মিনতি,
সে সকল মনে হ'লে—হাসি আসে মুখে। (৪/২)

হরিণীরে মৃগেন্দ্রকেশরী
ধরে যবে, শুনি তার ক্রন্দনের ধ্বনি,
সদয় হইয়া সে কি ছাড়ি দেয় তারে। (৪/২)

এই ভাষণ মেঘনাদবধ কাব্যের সীতার এই ভাষণটি স্মরণ করিয়ে দেয়—

রক্ষঃ-কুল-পতি,
সেই শার্দূলের রূপে ধরিল আমারে।
কিন্তু কেহ না আইল বাঁচাইতে ধনি,
এ অভাগা হরিণীরে এ বিপত্তিকালে।
পুরিনু কানন আমি হাহাকার রবে।

(মেঘনাদবধ-কাব্য—চতুর্থ সর্গ)

পদ্মাবতী নাটকের উপসংহারে পদ্মাবতীকে সম্বোধন ক'রে দেবর্ষি নারদ বলেছেন—

যশঃসরে চিররুচি কমলিনীরূপে
শোভ তুমি পদ্মাবতি—রাজেন্দ্রনন্দিনি,

যযাতির প্রণয়িনী দৈত্যরাজবালা
শর্মিষ্ঠা যেমতি। তার সহ নাম তব
গাঁথুক গৌড়ীয়জন কাব্যরত্নহারে,
মুকুতা সহ মুকুতা গাঁথে লোক যথা।”

আপন সৃষ্টি সম্পর্কে এইরূপ আস্থা কবির অন্যান্য কাব্যেও ধ্বনিত হয়েছে।

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পদ্মাবতী নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভাষায়: “Where the sentiment is elevated or idea is poetical there only should short and smooth flowing passages in Blank Verse be attempted.” ফলে অমিত্রাক্ষর ছন্দ-প্রযুক্ত অংশগুলিতে লিরিসিজ্‌মের তরঙ্গ সুস্পষ্ট হয়েছে। পদ্মাবতী নাটকের অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করলে এদের কাব্যরসের স্বয়ংসম্পূর্ণতা না-ও থাকতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এদের গীতিরসোচ্ছলতা অস্বীকার করা যায় না।

পদ্মাবতী নাটকে ব্যবহৃত অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত অংশগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাংলা কাব্যের ছন্দ-এককতার অবসান ঘটাচ্ছে পয়ারের মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়ে তার নবজন্ম সম্ভবায়িত করছে। এতে শুধু এক অভিনব ছন্দেরই সৃষ্টি হচ্ছে না, পুরাতন ছন্দের এতদিনকার অবহেলাকৃত শিথিল রূপের অবসান ঘটছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের সম্পূর্ণ প্রতিশ্রুতি পদ্মাবতী নাটকেই যে বাস্তবায়িত হয়েছে, একথা বলা চলে না। তবে সেই প্রতিশ্রুতির প্রধান প্রধান ধ্বনিগুলি এখানে ফুটে উঠেছে, একথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে। পদ্মাবতী নাটকে ব্যবহৃত অমিত্রাক্ষর ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য এবং বীরাঙ্গনা কাব্যের ব্যবহৃত অমিত্রাক্ষর ছন্দের মিল আছে।

পদ্মাবতী নাটকে ব্যবহৃত অমিত্রাক্ষর ছন্দ গম্ভীর কঠিন, রুক্ষ নিনাদে ভয়ঙ্কর নয়; শান্ত, নম্র। স্বর্ণকিঙ্কিনীর বোলীতে সুধীর ও মধুর।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য ও বীরাঙ্গনা কাব্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দ পদ্মাবতী নাটকে ব্যবহৃত অমিত্রাক্ষর ছন্দকে অনুসরণ করেছে বললে বেশি বলা হবে। তবে বিষয়-কৌলীন্যে ছন্দ-স্বর নম্র ও শান্ত বোলীকে আশ্রয় করেছে।

পদ্মাবতী নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথম প্রযুক্ত হয়েছে। এবং সম্ভবতঃ

প্রথম প্রয়োগের কারণে এর চলনে দ্বিধা-সংকোচ ও ইতস্ততবোধ আছে। এই দ্বিধা-সংকোচই এইখানে নম্রতা ও শান্তভাবের কারণ।

কিন্তু তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য ও বীরাঙ্গনা কাব্যের নম্র শান্ত সুর প্রভৃত অনুশীলনসঞ্জাত। পদ্মাবতী নাটক রচনাকালে কবি "একেই কি বলে সভ্যতা" এবং "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" এই প্রহসন দুটি রচনা করেছিলেন। এবং এ দুটি রচনা করেছিলেন, এমন একজন কবি যিনি অতিশয় আত্মসচেতন। এই আত্মসচেতন কবি প্রহসন দুটির রচনামুহূর্তে ব্যবহৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবশ্যই ওয়াকিবহাল ছিলেন। শুধুমাত্র বিষয়কে পরিবেশনের জন্য ঐ ভাষা অবলম্বিত হয়েছে, এই কথা বললে সবটুকু বলা হবে না। কারণ "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" প্রহসনে অন্ত্যজ ভাষা ব্যবহার করেছেন সেই লেখক, যিনি প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালী ভাষা প'ড়ে বলেছিলেন, "It is the language of fishermen, unless you import largely from Sanskrit."[১৮] বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রহসনে মধুসূদন সেই উপহসিত ভাষাই প্রায় ব্যবহার করলেন। কারণ কি? মধুসূদন দত্ত বাংলাভাষার সমস্তপ্রকার শব্দসম্পদ ও বাক্য-রচনা-প্রণালীর সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করছিলেন। পরবর্তীকালে যা তিনি রচনা করবেন, তা কোন বিশেষ শব্দভাণ্ডারের বিশেষ বাক্যরচনা প্রণালীর প্রয়োগ নয়। তাঁর আদর্শ সমগ্র বাংলা ভাষার পিঞ্জরাস্থি নিয়ে এক নতুন কাব্যভাষা তৈরী করা।

একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রহসন-দ্বয়ের বিষয়-বর্ণনা-পদ্ধতিরও তাৎপর্য আছে। একেই কি বলে সভ্যতায় নাট্যকার নব্য সম্প্রদায়ের ব্যর্থতার উদ্দেশ্যে সমালোচকের তর্জনী তুলেছেন, আর বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ-তে পুরাতন সমাজের পঙ্গুতার প্রতি মোহশূন্য হ'তে আহ্বান জানিয়েছেন। এই দুটি বক্তব্যই তাঁর পরবর্তী কবি-জীবনের অন্তঃপরিচয়ে ও মর্মানুসন্ধানে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। ভাষা ও বক্তব্যের এই তাৎপর্যটুকু ধরতে না পারার ফলেই রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিস্ময়বোধ করেছিলেন, "It is a wonder to me how the author could paint so humorous a picture with one hand, while the other was busy with depicting the Miltonic grandeur of Tilottama." (জীবনচরিত, পৃ—১২৬)

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মে মাসেই "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য" প্রকাশিত হোল। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ভাষায়, "How the author could paint so humorous a picture with one hand, while the other was busy with depicting the Miltonic grandeur of Tilottama." "আমরা মাইকেলের তিলোত্তমাসম্ভব প্রকাশ হইতে নূতন সাহিত্যের উৎপত্তি ধরিয়া লইব।"[১৯]

শাস্ত্রীমহাশয় এই প্রবন্ধেই বলেছেন যে, "যদি ইহার পূর্বে এরূপ নূতন সাহিত্যের কিছু থাকে, কেহ আমাদের সেই অন্ধকার দূর করিয়া দিলে একান্ত বাধিত হইব।" শাস্ত্রীমহাশয় যে রঙ্গলাল-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, তা নয়। তবু তিনি তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য থেকেই আধুনিক যুগের সূত্রপাত বলে মনে করেছেন। বস্তুতঃ রঙ্গলাল-সাহিত্য বিশ্লেষণ ক'রে ইতিপূর্বেই আমরা দেখিয়েছি যে, পদ্মিনী উপাখ্যান বিষয়-গৌরবে আধুনিক, কিন্তু তার ভাষায় মঙ্গলকাব্যের অর্থাৎ মধ্যযুগীয় সাহিত্যের প্রভাব প্রবল, অর্থাৎ এ কাব্যের ভাষা অনাধুনিক।

বিষয়-নির্বাচনে এবং কবি-দৃষ্টিতে আধুনিক হওয়া সত্ত্বেও পদ্মিনী উপাখ্যান শাস্ত্রীমহাশয়ের কাছে আধুনিক কাব্য বলে পরিগণিত হোল না—যেহেতু তার কাব্য-ভাষা অনাধুনিক, ও মধ্যযুগীয়। আধুনিক ভাষা ব্যতীত আধুনিক বিষয় পরিবেশন চূড়ান্ত হতে পারে না, সার্থক হতে পারে না ব'লে সমসাময়িক পাঠকদের দৃঢ় ধারণা ছিল।

তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যের বিষয়, ভাষা, ও কাব্য-গঠন-প্রণালী বিশ্লেষণ ক'রে আমরা দেখাবো যে শাস্ত্রীমহাশয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য কিনা।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের বিষয়বস্তু হচ্ছে নিম্নরূপ: দেবদ্রোহী সুন্দ-উপসুন্দ ভ্রাতৃদ্বয়কে বিনাশ নিমিত্ত ব্রহ্মা বিশ্ব-সৌন্দর্য ও অপার্থিব সৌন্দর্যের তিল তিল নিয়ে তিলোত্তমা নাম্নী অলোকসম্ভবা রমণীমূর্তি তৈরী করলেন। সুন্দ-উপসুন্দ দুই ভাই পরস্পরের প্রতি সর্বদা অনুরক্ত; এই অনুরাগই তাদের দেবপরাক্রম থেকে রক্ষা করছিল। এই অপূর্ব রমণীরত্নকে নিয়ে দুই ভাই মোহমদে মাতলেন। চক্রান্তটি দেবতাদের; উভয়ে উভয়ের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হলেন। ফলে একে অপরের দ্বারা নিহত হলেন। তাঁরা নিহত হলেন, কিন্তু স্বর্গ রক্ষা পেল। মাইকেল এই পৌরাণিক কাহিনীটুকুর

মধ্যে আধুনিক জীবনের তাৎপর্য প্রয়োগ করেছেন। এখানেও দেবকুলের দুর্দশা, বিশেষ করে দেবরাজ ইন্দ্রের দুর্দশার কারণ তার নিয়তি।

নিদারুণ বিধি
আমা সবা প্রতি বাম অকারণে সদা। (দ্বিতীয় সর্গ, ৩৭)
বিধির নির্বন্ধ কে পারে খণ্ডিতে? (দ্বিতীয় সর্গ, ৩৮)

আর সুন্দ-উপসুন্দের পতনের কারণ ভ্রাতৃবিভেদ।

তবে যদি অমর না কর, পিতামহ,
আমা দোঁহে, দেহ ভিক্ষা, তব বরে যেন
ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য কারণে না মরি।

এবং তারপর সুরু হোল বিভ্রান্তির মধুর নিদারুণ লীলা।

হেথা মীনধ্বজ সহ মীনধ্বজ রথে
বসন্ত-সারথি—রঙ্গে চলিল সুন্দরী;
দেবকুল—আশালতা।

কাম-মদে রত যে দুর্মতি
সতত এ গতি তাঁর বিদিত জগতে। (৪।৮৪)

ভ্রাতৃভেদে ক্ষয় আজি দানব দুর্জয়। (৪।৮৬)

এই তিনটি তত্ত্বই সে-যুগের পরিপ্রেক্ষিতে অশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সুন্দ-উপসুন্দের প্রচলিত কাহিনীর মধ্যে এই তিনটি তত্ত্বের প্রাধান্য দান নিতান্তই তৎকালিক ঔচিত্যহেতু। এবং যেহেতু কবি প্রচলিত কাহিনীর কাঠামোর অভ্যন্তরে তাঁর বিশেষ ব্যাখ্যাত্রয় প্রয়োগ করতে চান, সেই হেতু ঘটনাতরঙ্গের মধ্যে কোন কোন তরঙ্গ অতিশয় বর্ণিত। বিবরণ বিশেষের উপর গুরুত্ব আরোপ ক'রে তিনি প্রচলিত কাহিনীর জন্মান্তর ঘটিয়েছেন। রঙ্গলাল 'পদ্মিনী উপাখ্যান' রচনাকালে পুরাতন বিষয়কে (পৌরাণিক নয়, ঐতিহাসিক) নতুন বর্ণে বিবৃত করেছিলেন, এবং তিনিও স্থানবিশেষে কাহিনীরমধ্যে রঙ ফলিয়েছেন। কিন্তু বর্ণ-গাঢ়তা সত্ত্বেও রঙ্গলালের কাহিনী টডের ইতিহাসের গরিমা-দীপ্ত বর্ণনা অপেক্ষা অতিরিক্ত কিছু হয়নি। কিন্তু মধুসূদন রঙ্গলাল অপেক্ষা অধিকতর অগ্রসর; পৌরাণিক কাহিনীর স্থবিরত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছেন।

পুরাণের কাহিনীতে দেবলাঞ্ছনাই ছিল প্রধান; এবং দেবচক্রান্তই ছিল মুখ্য ঘটনা। তিলোত্তমা সেই চক্রান্তের অংশ মাত্র। কিন্তু মধুসূদনের কাব্যে তিলোত্তমা শুধু চক্রান্ত-জালের তন্তুরাজি বিস্তৃত ক'রে ক্ষান্ত হয়নি; কবি এই কারণে তিলোত্তমার জন্মবৃত্তান্ত ও তিলোত্তমার অরণ্য-ভ্রমণ-পর্ব এত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করেছেন। সমগ্র কাব্যে তিলোত্তমার এই চলাফেরাটুকুর মাধুর্য সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে, এবং মুখ্যরস হয়ে উঠেছে,—কবিও এবিষয়ে সচেতন। তাই কাব্যের নাম তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য।

"You are unjust to Indra. He is a very heroic fellow, but he connot resist 'Fate'. Perhaps, your partiality for the two brothers has slightly embittered your feelings against the poor king of the Gods. I myself like those two fellows and it was once my intention to have added another Book to place them more conspicuously before the reader."…[২০]

সুন্দ-উপসুন্দকে যথেষ্ট স্পষ্টতর ক'রে উপস্থাপিত করতে পারেন নি বলে কবি দুঃখ করেছেন। এবং আর একটি সর্গ সংযোজন করে এই অপূর্ণতা পোষণ করার অভিলাষ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু মূল কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্যক পরিচিত হলে দেখা যায় যে, কবির প্রধান লক্ষ্য সুন্দ-উপসুন্দের দুর্ভাগ্য কীর্তন করা নয়, প্রধান লক্ষ্য হোল তিলোত্তমাসম্ভব বর্ণনা করা। সুন্দ-উপসুন্দের দুর্ভাগ্য বড় হ'য়ে দেখা দিলে এ কাব্য তার চরিত্র বদলাতো, 'সুন্দ-উপসুন্দ বধ কাব্য' হোত।

"You must not, my dear fellow, judge the work as a regular 'Heroic Poem'. I never meant it as such. It is a story, a tale, rather heroically told." (ঐ পত্র)

বন্ধুর ভ্রম অপনোদনে কবি বলেছেন, "You must not judge the work as a regular 'Heroic Poem'. কবি তারপর বলেছেন, "It is a story, a tale, rather heroically told." আমাদের মতে "rather heroically told" এই অংশটি পরিবর্তনসাপেক্ষ। "It is story, a heroic tale, rather romantically told." বীররসাশ্রিত কাহিনীকে রোম্যানটিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে পরিবেশন করা হয়েছে। রোম্যানটিক

দৃষ্টিভঙ্গী প্রাধান্য পেয়েছে বলেই তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে সুন্দ-উপসুন্দের বীরত্বব্যঞ্জক কার্যকলাপ থেকে তিলোত্তমার আত্মরতি ও অভিসার প্রাধান্য পেয়েছে। পদ্মিনী উপাখ্যানে রঙ্গলাল সতীরমণীর চরিত্র উদ্‌ঘাটন ক'রে তাঁর আদর্শ-নারী বর্ণনা সার্থক করেছেন। অপর ক্ষেত্রে মাইকেল—

"ক্ষণকাল বসি বামা চাহি সর পানে
আপন প্রতিমা হেরি—ভ্রান্তি-মদে মাতি,
একদৃষ্টে তার দিকে চাহিতে লাগিলা
বিবশে।"

—এমনই এক রহস্যময়ী রমণীমূর্তি আঁকতে চেয়েছেন। নিছক সৌন্দর্য-পূজাই তাঁর লক্ষ্য। ইতিপূর্বে রমণী-রূপ যে বাংলাকাব্যে বাণত হয়নি, তা নয়। বরং অতিশয়ই বর্ণিত হয়েছে। খুল্লনা, লহনা, রঞ্জাবতী, বিদ্যার বর্ণনার মধ্যে শরীরী ভোগ-বাসনার অংশটাই ছিল বেশি। শুধু সৌন্দর্য-সম্ভোগ বাংলা কাব্যে অনুপস্থিত। বিশেষ ক'রে মধুসূদন অব্যবহিত পূর্ববর্তী যুগের স্থূল দেহবিলাসের পঙ্কে পড়ে সৌন্দর্যবোধ লালসার নামান্তর হ'য়ে পড়েছিল। মধুসূদন সেই ক্লেদাক্ত পরিবেশ থেকে সৌন্দর্য-পূজাকে উদ্ধার করলেন, তাকে শুচিময় করলেন।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে সুন্দ-উপসুন্দ প্রসঙ্গ বিপুলতর বা বিস্তৃততর না হওয়ায় এ কাব্য 'heroically told' হতে পারে নি, 'romantically told' হয়েছে। এদিক থেকে তিলোত্তমাসম্ভব বাংলাসাহিত্যে প্রথম আনুষ্ঠানিক রোমান্স। সুন্দ-উপসুন্দের মৃত্যুজনিত যেটুকু বেদনা আছে, তা এই কারণে তত চিত্ত-আলোড়নহেতু নয়। অর্থাৎ এ কাব্যে দেবতাদের পরাজয় এবং পরিশেষে সুন্দ-উপসুন্দের পতন-কাহিনী থাকলেও এ কাব্যে বিষাদরস প্রাধান্য পায় নি, মধুর বা সম্ভোগ রসই প্রধান।

তিলোত্তমাসম্ভবের ভাষায় এবং ছন্দেও এই সম্ভোগের আনন্দকণা জড়িয়ে রয়েছে। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের ভাষায় কাঠিন্য ও দৃঢ়তার ভাগ কম ; লালিত্য ও পেলবতার অংশ বেশি। এ কাব্য আদিতে লিখিত বলে কবির লেখনীতে দৃঢ়তা স্ফূর্ত হয়নি, এ কথা সত্য নয়। কারণ শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতীর গদ্য-ভাষাতেও ওজোগুণের অভাব নেই। বিষয়-মাহাত্ম্যই ভাষার এই চরিত্র গ'ড়ে পিটে দিয়েছে।

পদ্মাবতী নাটকে কবি যে-ভাষায় নান্দীমুখ গেয়েছেন—এখানে তার শিক্ষানবিশীর পর্ব সমাপ্ত হচ্ছে। এখানে শুধু আর "where the sentiment is elevated or idea is poetical, there only should short and smooth flowing passages in Blank Verse be attempted"—নয়। এখানে সমগ্র কাব্যই Blank Verse-এ লেখা। এবং সমসাময়িক যুগে এ একটি বড় ঘটনা, তা বিভিন্ন সমালোচকই বলেছেন। "পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী প্রভৃতি যে সমস্ত পদ্য আছে, তাহা মিত্রাক্ষর। কোন প্রগাঢ় বিষয়ের রচনায় তাহা উপযোগী নহে। দেশের দোষে হউক, অথবা অভ্যাসদোষে হউক, আমাদিগের দেশের লোকেরা আদিরসপ্রিয়। পয়ারাদি ছন্দ সেই আদিরসাশ্লিষ্ট রচনারই প্রকৃত উপযোগী। এতদ্বারা প্রগাঢ় রচনা হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রগাঢ় রচনা বিষয়ে সংযুক্ত ও প্রযত্নোচ্চারিত বর্ণাবলী আবশ্যক; কিন্তু পয়ারাদি ছন্দে তাদৃশ বর্ণাবলী বিন্যাস করিলে উহার শোভা এক কালে দূরে প্রস্থান করে। কোমল মধুর ও অসংযুক্ত অক্ষর দ্বারা বিরচিত হইলেই উহার শোভা হয়। অতএব প্রগাঢ় রচনার্থ ভিন্নবিধ পদ্য সৃষ্টি নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য রচয়িতা তাহারা নবাবতার করিলেন।"[২০ক]

"It is the first and a most successful attempt to break through the jigling monotony of the *payar*, and as a poem the best we have in the language."[২১]

কাজেই পয়ারের (সমিল পয়ারের) আধিপত্য হরণে মাইকেলের কৃতিত্ব বিশেষভাবে স্বীকৃত। সেযুগে পূর্বতন বাংলা কাব্যের প্রকৃতি মধুসূদন অপেক্ষা কেউ অধিকতর ও ঘনিষ্ঠতরভাবে অনুধাবন করেন নি। তাই তাঁরই হাতে বাংলা ছন্দের গোত্রান্তর ঘটলো।

"I began the poem in a joke, and I see I have actually done something that ought to give our national poetry a good lift, at any rate, that will teach the future poets of Bengal to write in a strain very diffrent from that of the man of Krishnagar—the father of a very vile school of poetry, though himself a man of elegant genius."[২২]

"যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য; কেন না এরূপ পরীক্ষা বৃক্ষের ফল সদ্যঃ পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয়তো সে শুভকালে এ কাব্যরচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মোহনিদ্রায় মোহাচ্ছন্ন থাকিবেক, যে কি ধিক্কার, কি ধন্যবাদ, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক না।"[২৩]

আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ কবি তাই বললেন,—

"Blank Verse is the 'go' now. As old Ranjit Sing used to say, when looking at the map of India,—Sub lal ho jaga, I say "Sub Blank Verse ho jaga."[২৪]

অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যতীত বাংলা কাব্যের প্রচলিত ভাষার কখনই পরিবর্তন সাধিত হোত না। বাংলাকাব্যের ঘুম ভাঙ্গাবার জন্য বড় রকমের আঘাতের প্রয়োজন ছিল—যাকে বলে 'shock treatment' তাই। প্রচলিত কাব্যের শব্দভাণ্ডার, ছন্দ ও বাক্য-গঠন-পদ্ধতির আমূল বিপরীত পথ থেকে যাত্রা করেছেন বিদ্রোহী মধুসূদন। রঙ্গলালের মতো কোথাও রফা করার চেষ্টা করেন নি। অমিত্রাক্ষর ছন্দে ভাষার অন্তঃধর্ম রক্ষার জন্য কবিকে বিবিধ প্রকার শব্দ ও বাক্য-রচনা-প্রণালী আয়ত্ত এবং প্রয়োগ করতে হয়েছে। বাংলা কাব্যে পয়ারের বেড়ির মধ্যে যে ধরণের বাক্যাংশ স্থান পেত, অমিত্রাক্ষর ছন্দ তদপেক্ষা বিচিত্রতর ও ভিন্নতর বাক্যাংশ ধারণের ক্ষমতা রাখত। ভারত-চন্দ্রীয় পয়ারের নমনীয়তার প্রসঙ্গ আমরা বিস্মৃত হচ্ছি না। সেই ছন্দো-বন্ধের মধ্যে নিতান্ত কোন্দল-মান-অভিমান আশ্রয় পেয়েছে। কোন বড় রকমের ক্রোধ ক্ষোভ উল্লাস বা শোকের তুফান বহন-ক্ষমতা তার নেই। মাইকেল এরই জন্য নানাবিধ শব্দ ব্যবহার করেছেন; চলিত ও অচলিত—কোন শব্দই তিনি বাতিল করেননি।

"I am afraid you think my style hard, but believe me, I never study to be grandiloquent like the majority of the "barren rascals" that write books in these days of literary excitement. The words came unsought, floating in the

stream (I Suppose I must call it) Inspiration! Good Blank Verse should be sonorous and the best writer of Blank Verse in English is the toughest of poets—I mean old John Milton! and Virgil and Homer are anything but easy."[২৫]

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে ব্যবহৃত বিচিত্র শব্দপুঞ্জ থেকে কয়েকটি আমরা সঙ্কলিত করছি: বিশদবসনা (শুভ্র বসনা অর্থে), নবীনা-মালিকা (নব অর্থে) কারণ-কিরণে, গরুত্মন্ত-কুলপতি, প্রতিসরে (বৃত্তাকার অর্থে), তুরাসহ ও সুনাসীর (ইন্দ্র অর্থে), সুনাদিনী, মণিকুন্তলা, বিযাকর; কর্ণদান, ফুলকুলপতি, খড়্গী (খড়্গধারণকারী), পাশী, জলদল, সুবিম্বঅধরা, সুখিনী, বহুবাহু তরু, বিলাপিনী, গরলকণ্ঠ, নিনাদবাহিনী, হাস্যাবলী, বিভাসা, জিতেন্দ্রিয়া, পুট, পাপী, সদাগতি (বায়ু অর্থে) ভবপ্রমোদিনী, পুষ্পলাবী, কামী, বিগ্রহ-প্রয়াসী. সতী, শুচি (অগ্নি) ইত্যাদি।

এ সমস্ত শব্দ ব্যবহারের পশ্চাতে একটা প্রচণ্ড তেজ আছে, যে তেজ পুরাতনকে ভস্মীভূত করার জন্য প্রয়োজন, যে তেজ নতুন পথ রচনায় অনিবার্য। বিচিত্র বাক্যপুঞ্জ থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

(১) ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণ-দর্শন;
সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল;
যেন উর্ধ্ববাহু সদা, শুভ্রবেশধারী,
নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী—
যোগীকুলধ্যেয়যোগী! (১।১)

(২) ভঙ্গ দিয়া বিমুখ হইলা সবে রণে—
আকুল! পাবক যথা, বায়ু যাঁর সখা,
সর্বভুক, প্রবেশিলে নিবিড় কাননে,
মহাত্রাসে উর্ধ্বশ্বাসে পালায় কেশরী;
মদকল নগদল, চঞ্চল সভয়ে,
করভ করিণী ছাড়ি পালায় অমনি

আশুগতি ; মৃগাদন শার্দুল, বরাহ,
মহিষ, ভীষণ খড়্গী—অক্ষয়শরীরী,
ভল্লুক বিকটাকার, দুরন্ত হিংসক
পালায় ভৈরবরবে, ত্যজি বনরাজি ;—
পালায় কুরঙ্গ রঙ্গরসে ভঙ্গ দিয়া,
ভুজঙ্গ, বিহঙ্গ, বেগে ধায় চারি দিকে ;—
মহাকোলাহলে চলে জীবন-তরঙ্গ,
জীবনতরঙ্গ যথা পবনতাড়নে। (১/৬)

(৩) মৃদুহাসি শশী সহ নিশি দিলা দেখা,
তারাময় সিঁথি পরি সীমন্তে সুন্দরী ;
বন, উপবন, শৈল, জলাশয়, সরঃ,
চন্দ্রিমার রজঃকান্তি কান্তিল সবারে।
শোভিল বিমল জলে বিধুপরায়ণা
কুমুদিনী ; স্থলে শোভে বিশদবসনা
ধুতুরা চির যোগিনী, অলি মধুলোভী
কভু না পরশে যারে। উতরিলা ধীরে,
বিরাম-দায়িনী নিদ্রা—রজনীর সখী—
কুহকিনী স্বপ্নদেবী স্বজনীর সহ। (১/৯)

(৪) ……কে আছয়ে, হে দিকপালগণ,
এহেন নির্দয় ? রাহু শশী গ্রাসিবারে
ব্যগ্র সদা দুষ্ট, কিন্তু রাহু,—সে দানব।
আমরা দেবতা,—একি আমাদের কাজ ?
কে ফেলে অমূল মণি সাগরের জলে
চোরে ডরি ? যদি প্রিয়জন যে, সে জনে
গ্রাসে রোগ, কাটারীর ধারে গলা কাটি
প্রণয়ী-হৃদয় কি গো নীরোগে তাহারে ?
আর কি কহিব আমি, দেখ ভাবি সবে।
যদিও মতের সহ মতের বিগ্রহে
(শুষ্ক কাষ্ঠ সহ শুষ্ক কাষ্ঠের ঘর্ষণে

যেমনি) জনমে অগ্নি, সত্যদেবী যাহে
জ্বালান প্রদীপ ভ্রান্তি-তিমির নাশিতে ;
কিন্তু বৃথা-বাক্যবৃক্ষে কভু নাহি ফলে
সমুচিত ফল ; এতো অজানিত নহে। (২/৪০)

প্রথম উদ্ধৃতাংশে শুধু শব্দ-গাম্ভীর্য প্রণিধানযোগ্য নয় ; বাক্য ও বাক্যাংশের মধ্যেও একটা প্রশান্তির ভাব আছে। বাক্যাংশ স্বভাবতই দীর্ঘ ; এবং যখন ছেদসংকুল তখন সেই ছেদবিশিষ্ট বাক্যাংশ বক্তব্যের স্থৈর্যকে বহন করার অর্থেই ব্যাপৃত। অচল ও অটল শব্দদ্বয় শুধু শব্দমাত্র নয়, বাক্যাংশও বটে, এবং তারাও হিমাদ্রির মহিমা রক্ষার জন্য ঊর্ধ্ববাহু। হিমাদ্রির স্থৈর্য ও গাম্ভীর্য রক্ষার জন্য তৎসম শব্দের স্থিরিত্ব আমন্ত্রণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতাংশ প্রথমটির বিপরীত। এখানে স্থিতি নাই, আছে গতি। বাক্য ও বাক্যাংশগুলি ত্বরিতগতি, শুধু তৎসম শব্দের প্রস্তরখণ্ড নিয়ে যাত্রা করছে না, চলতি শব্দের নুড়িও সঙ্গে নিচ্ছে ; তারা পরস্পরে ঠুন ঠুন ক'রে বেজে-বেজে তার তাল বৃদ্ধি করেছে। বিরতি বা ছেদের এখানে ছড়াছড়ি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যাংশ সব সময়ই দীর্ঘ বাক্যাংশ অপেক্ষা ত্বরিতগতিসম্পন্ন।

তৃতীয়াংশে হিমাদ্রির অচলত্ব অটলত্ব নাই, কিন্তু সন্ধ্যার প্রশান্তি আছে। বাক্য বা বাক্যাংশগুলি তাই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর, অন্তত পূর্বোক্ত দ্বিতীয়াংশের মত একটি বাক্যে একাধিক বিরতি নাই। এবং কবি ইচ্ছা ক'রেই মৃদু, দিলা, দেখা, বন, জলাশয়, মধু, দায়িনী নিদ্রা, বিমল, বিধু প্রভৃতি কোমল বর্ণবহুল শব্দ ব্যবহার করেছেন। ব্যাকরণেও এদের নাদবর্ণ বা 'soft sounds' বলে। শশীসহ নিশির হাসির কোমল মৃদুত্বটুকু সমস্ত উদ্ধৃতাংশে ছড়িয়ে পড়েছে। শব্দ-বাক্য ও বাক্যাংশ এইভাবে বক্তব্যকে পরিস্ফুট করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে।

চতুর্থ উদ্ধৃতাংশে সংলাপের ধর্ম অবহেলা করা হয়নি এবং শব্দ নির্বাচনে সংলাপীর মেজাজ রক্ষিত হয়েছে। বাক্য-গঠনে যুক্তি-তর্ক বিস্তারের অনিবার্য তাগিদ রক্ষা করা হয়েছে। সক্রেটিস-প্রদর্শিত সত্যে উপনীত হওয়ার তর্ক-শাস্ত্রীয় পদ্ধতি এখানে অনায়াসে বাক-ভঙ্গির মধ্যে বন্দী হয়েছে। ভাষার এক আশ্চর্য নমনীয়তা এখানে প্রত্যক্ষ করা গেল।

চারিটি উদ্ধৃতির বিশ্লেষণ থেকে একটি তথ্য অপরিহার্য হ'য়ে উঠছে যে, ভাষা মাইকেলের হাতে অনুগত হাতিয়ার মাত্র। বিষয়ের প্রয়োজনে তাকে তিনি

অবলীলাক্রমে ব্যবহার করতে পারেন। তাঁর মত দক্ষ কলাবিদই কেবল এ যুগের নব্য কাব্য-ভাষার ভূমিকা তৈরি করতে পারেন। গম্ভীর বিষয় বর্ণনায়, মধুর অনুভূতির রূপায়ণে, বীর্যবান কর্মের প্রশস্তিতে এবং সংলাপীর কূট যুক্তির রেখাঙ্কনে তাঁর ভাষা অবিচলিত সফলতার অধিকারী। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য মাইকেল-সৃষ্ট কাব্য-ভাষার সর্ববিধ প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর বহন ক'রে এনেছে। কয়েকটি অলংকার এখানে উপস্থিত করছি :—

যথা প্রলয়ের কালে, রুদ্রের নিশ্বাস
বাতময়, উথলিলে জল সমাকুল,
প্রবল তরঙ্গদল, তীর অতিক্রমি,
বসুধার কুন্তল হইতে লয় কাড়ি
সুবর্ণ-কুসুম-লতা-মণ্ডিত মুকুট ;—
যে সুচারু শ্যামঅঙ্গ ঋতুকুলপতি
গাঁথি নানা ফুলমালা সাজান আপনি
আদরে, হরে প্লাবন তার আভরণ। (১ম সর্গ, পৃষ্ঠা—৬)

যথা পক্ষরাজ বাজ, নির্দয় কিরাত
লুটিলে কুলায় তার পর্বত-কন্দরে,
শোকে অভিমানে মনে প্রমাদ গণিয়া,
আকুল বিহঙ্গ, তুঙ্গ-গিরি-শৃঙ্গোপরি,
কিম্বা উচ্চশাখ বৃক্ষশাখে বসে উড়ি। (১/৭)

শূন্য তূন, বারিশূন্য সাগর যেমনি। (১/৮)

বিধবা দুহিতা যেন জনকের গৃহে। (১/৯)

আচম্বিতে পূর্বভাগে গগনমণ্ডল
উজ্জ্বলিল, যেন দ্রুত পাবকের শিখা,
ঠেলি ফেলি দুই পাশে তিমির-তরঙ্গ,
উঠিল অম্বর রথে ; কিম্বা ত্বিষাম্পতি
অরুণ সারথি সহ স্বর্ণচক্র রথে
উদয় অচলে আসি দরশন দিলা। (১/১৩)

কিম্বা বিহঙ্গিনী যথা বিপদের কালে
বহুবাহু তরু-কোলে। (১/২২-২৩)

কিম্বা যথা যবে
রজনী শ্যামাঙ্গী ধনী আইসে মৃদুগতি,
খুলিয়া অযুত আঁখি গগন কৌতুকে
সে শ্যাম বদন হেরে—ভাসি প্রেম-রসে (১/২৩)

তোরণ-সম্মুখে
দেখিলা দেবদম্পতি দেবসৈন্য-দল,—
সমুদ্র-তরঙ্গ যথা, যবে জলনিধি
উথলেন কোলাহলি পবন-মিলনে
বীরদর্পে ; কিম্বা যথা সাগরের তীরে
বালিবৃন্দ, কিম্বা যথা গগনমণ্ডলে
নক্ষত্র-চয়—অগণ্য। (২/৩০)

যদিও মতের সহ মতের বিগ্রহে
(শুষ্ক কাষ্ঠ সহ শুষ্ক কাষ্ঠের ঘর্ষণে
যেমনি) জনমে অগ্নি, সত্যদেবী যাহে
জ্বালান প্রদীপ ভ্রান্তি-তিমির নাশিতে ;
কিন্তু বৃথা-বাক্য বৃক্ষে কভু নাহি ফলে
সমুচিত ফল ; এতো অজানিত নহে। (২/৪০)

যথা ঘোর বনে
মহা মহীরুহব্যূহ বিস্তারিয়া বাহু
অযুত, রক্ষয়ে সবে ব্রততীর কুল,
অলকে ঝলকে যার কুসুম-রতন
অমূল জগতে, রাজ-ইন্দ্রাণী-বাঞ্ছিত। (২/৪৩)

যথা সপ্তসিন্ধু বেড়ে সতী বসুধারে,
জগৎজননী, ত্রিদিবের সৈন্যদল
বেড়িলা ত্রিদিবদেবী অনন্ত-যৌবনা
শচীরে ; (২/৪৩)

কিন্তু নাহি জানি
চালাইতে লেখনী, পশিতে শব্দার্ণবে
অর্থরত্ন-লোভে—যেন বিদ্যায় ধীবর। (৩/৫৩)

ভুলিলে কি গো, আমরা সকলে
দীন, পত্রহীন তরু হিমানীতে যথা
আজি। (৩/৫৫)

ঘন ঘনাকার ধূম উড়ে হর্ম্যোপরি,
তাহার মাঝারে হৈম গৃহাগ্র অযুত
জ্যোতে, বিদ্যুতের রেখা অচঞ্চল যেন
মেঘাবৃত আকাশে, বা বাসবের ধনু
মণিময়। (৩/৬০)

এক প্রাণ দুই ভাই—বাগর্থ যেমতি (৪/৮১)

মরিল দানব-শিশু, দানব-বনিতা।
হায় রে, যে ঘোর বাত্যা দলে তরু-দলে
বিপিনে, নাশে সে মূঢ় মুকুলিত লতা,
কুসুম-কাঞ্চন-কান্তি। (৪/৮৭)

উচ্চ তরু—সেই ভস্ম ইরম্মদে। (৪/৮৩)

অবচয়িত অলংকারগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এর মধ্যে অনেকগুলি উপমা আছে, যেগুলি হোমারীয়—অর্থাৎ সেগুলি শুধু বক্তব্য বলেই ক্ষান্ত নয়, ময়ূরের মত কেকা-ধ্বনিসহ আপন কলাপ মেলে। তাদের সৌন্দর্য অবহেলা করা কষ্টকর। এই অলংকারগুলি থেকে কবির মনোজগতেরও একটা চিত্র উদ্ঘাটিত হয়। বিরহিণী চক্রবাকী তরুর কোলে দিবা অবসানে আশ্রয় নিল; কবি তার এই একাকী আশ্রয় গ্রহণকে উপমিত করেছেন "বিধবা দুহিতা যেন জনকের গৃহে।" এখানে যে বেদনাবোধ আছে, তা স্মরণীয়। এ উপমা এ যুগেরই একান্ত সম্পদ।

'যদিও মতের সহিত মতের বিগ্রহ' প্রভৃতি উক্তিতে তর্কশাস্ত্রের যে বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে, তা সক্রেটিসীয়। এমন কি উপমাটি পর্যন্ত। হিন্দু

কলেজের নব্য লজিক-পড়া ছাত্রের পক্ষেই কেবল এই উপমা প্রয়োগ সম্ভব। কিম্বা—

"ভুলিলে কিগো আমরা সকলে
দীন, পত্রহীন তরু হিমানীতে যথা
আজি।"

"পত্রহীন তরু হিমানীতে"—এ পরিবেশ বাংলাদেশের কবির পক্ষে সহজ-পরিজ্ঞাত তথ্য নয়, বিদেশী কাব্যের সঙ্গে পরিচিত ধুরন্ধর পাঠকের কাব্যেই এই প্রসঙ্গ থাকতে পারে। হিমানীতে পত্রহীন তরুর ছায়া সেই বৈদেশিক আকাশ থেকেই এখানে প্রলম্বিত হয়েছে। আর অন্যান্য উপমা যথা,—বাজ, কিরাত, সমুদ্র বা সমুদ্রতরঙ্গ, অরণ্য, পশুরাজ, সর্প, আকাশ বারবার লেখনী মুখে ছুটে এসেছে। উপমা-উৎপ্রেক্ষার এই জগৎ হোমারের জগৎ। স্থানিক ও কালিক সীমাবদ্ধতা ও সঙ্কীর্ণতা হোমার এইভাবে বিলুপ্ত করেছেন। ব্রহ্মাণ্ড দৃষ্টির (cosmic view) আনুকুল্যে তাঁর হাতে ব্রহ্মাণ্ড উপমা (cosmic simile) গ'ড়ে উঠেছে। আমরা এগুলির ব্যাপকতর ও গভীরতর ব্যবহার দেখবো মেঘনাদবধ কাব্যে। কাজেই সেখানেই তাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করা যুক্তিসঙ্গত হবে। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যেই মধুসূদনের কবি-প্রতিভার সমস্ত বৈশিষ্ট্য উদ্গত হয়েছে, এ সিদ্ধান্ত সম্ভবতঃ তর্কাতীত হোল।

তবে মাইকেলের কাব্য-ভাষায় পূর্বতন বাক্-প্রতিমার সংখ্যাও কম নয়।

"You censure the erotic character of some of the allusions. Perhaps that is owing to a partiality for Kalidasa."[২৬]

"You will find that your criticism on Tilottama has not fallen on barren ground. In the present work (মেঘনাদবধ কাব্য) you will see nothing in the shape of erotic similes; no silly allusions to the loves of the Lotus and the Moon; nothing about fixed lightnings, and not a single reference to the "incestuous love of Radha".[২৭] রাজনারায়ণ বসুর সমালোচনার জবাবে কবি তাঁর ভবিষ্যৎ কাব্যে আদি রসাত্মক বাক্-প্রতিমা ব্যবহারে

অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমরা তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে এই আদিরসাত্মক উপমা ব্যবহারের পরিমাণ ও উদ্দেশ্য আলোচনা করব।

পৃষ্ঠে মন্দ দোলে
বেণী, কামবধূ রতি যে বেণী লইয়া
গড়েন নিগড় সদা বাঁধিতে বাসবে। (১/২৪)

যথা বরিষার কালে
শৈবলিনী, বিরহ-বিধুরা ধায় রড়ে
কলকল কলরবে সাগর উদ্দেশে,
মজিতে প্রেমতরঙ্গ-রঙ্গে তরঙ্গিনী! (১/২৩)

কুমুদিনী, বিধুপ্রিয়া, তপন উদিলে
মুদয়ে নয়ন যথা। (২/৩৯)

কার রে না কাঁদে প্রাণ, শরদের শশি,
হেরি তোরে রাহুগ্রাসে? তোরে, রে নলিনি,
বিষণ্ণবদনা, যবে কুমুদিনী-সখী
নিশি আসি, ভানুপ্রিয়ে, নাশে সুখ তোর! (২/৪৩)

তরুরাজী-মাঝে
শোভে পদ্মরাগমণি-উৎস শত শত
বরষি অমৃত, যথা রতির অধর
বিম্বময়, বর্ষে, মরি, বাক্য-সুধা, তুষি
কামের কর্ণকুহর। (৩/৪৬)

শশী যথা কৌমুদী সেখানে (৩/৫২)

শিখিবর যথা
হেরি তোরে কাদম্বিনি, অনম্বর-তলে। (৩/৬৬)
কৌমুদিনী-প্রমদায় হেরি মেঘ যথা
শরদে! (৩/৬৬)

কাঁপে বামা কমলিনী যথা,
পবন-হিল্লোলে। (৪/৭৫)

মাতঙ্গিনী-প্রেম-লোভে কামার্ত যেমতি
মাতঙ্গ যুঝয়ে। (৪।৮৪)

উদাহরণ আরও বাড়ান যেতে পারে। প্রণয়-প্রধান বা আদিরসাত্মক উপমা (erotic similes) শুধুমাত্র চাঁদ-চকোর, চাঁদ-নলিনী, মরাল-কমল, মাতঙ্গিনী-মাতঙ্গকে কেন্দ্র করে রচিত হয়নি।

পৌরাণিক প্রসঙ্গ-ভিত্তিক বহু প্রণয়-প্রধান উপমা কবি ব্যবহার করেছেন।

গোপিনী শুনি যেমনি মুরলীর ধ্বনি,
চাহে গো নিকুঞ্জপানে, যবে ব্রজধামে,
দাঁড়ায়ে কদম্বমূলে যমুনার কূলে,
মৃদুস্বরে সুন্দরীরে ডাকেন মুরারি! (১।১৬)

যথা বাজে মুরারির বাঁশী,
গোপিনীর মন হরি, মঞ্জু কুঞ্জবনে। (২।৩৭)

ত্যজি ব্রজ ব্রজকুলপতি
অক্রুরের সহ চলি গেলা মধুপুরে,—
শোকিনী গোপিনীদল, যমুনা-পুলিনে,
বেড়িল নীরবে সবে রাধা বিলাপিনী। (২।৪৫)

(বরগুঞ্জমালা যথা গাঁথে ব্রজাঙ্গনা
দোলাইতে কুঞ্জবিহারীর বর গলে।) (৪।৭৫)

তরুমূলে বামাকুল, ব্রজবালা যথা
শুনি মুরলীর ধ্বনি কদম্বের মূলে। (৪।৭৮)

পৌরাণিক উপমা কবি আরও ব্যবহার করেছেন; এবং সবগুলিই তার প্রণয়-প্রধান নয়।

কিম্বা মাধবের বুকে কৌস্তুভ রতন। (১।১৪)

যথা যবে প্রলয়ের কালে,
টংকারি পিনাক রোষে পিনাকী ধূর্জটি
বিশ্বনাশী পাশুপত ছাড়েন হুঙ্কারে। (৩।৫৭)

মৃগরাজ কেশরী সুন্দর
নিজ পৃষ্ঠাসন বীর সঁপিলা প্রণমি—
হে জগদ্ধাত্রী আদ্যাশক্তি মহামায়ে ! (৪।৭৫)

কিম্বা যথা পঞ্চবটী-বনে
রাম রামানুজ,—যবে মোহিনী রাক্ষসী
সূর্পণখা হেরি দোঁহে, মাতিল মদনে। (৪।৮১)

যথা যবে ভোজরাজবালা
কুন্তী, দুর্বাশার মন্ত্র জপি সুবদনা,
হেরিলা নিকটে হৈম-কিরীটি ভাস্করে ! (৪।৮২)

মেঘের আড়ালে পশি মেঘনাদ যথা
প্রহারয়ে সীতাকান্ত উর্মিলাবল্লভে। (৪।৮৩)

কিম্বা চলে যথা
প্রমথনাথের সাথে প্রমথের কুল। (৪।৮৬)

যথা দেবী কেশব-বাসনা
ইন্দুবদনা ইন্দিরা—জলধির তলে। (৪।৪৮)

সম্ভবত এই দ্বিবিধ অলংকার হেতু এই কাব্য পণ্ডিতমহলের কোন কোন অংশের প্রশংসা পেয়েছিল। স্বয়ং মধুসূদন এইপ্রকার রসগ্রাহিতায় বিদ্রূপ ক'রে লিখেছিলেন,—"Some other pundits, literary stars of equal magnitude say—হাঁ উত্তম উত্তম অলংকার আছে। মন্দ হয়নি।" [২৮]

আদিরসাত্মক বা প্রণয়-প্রধান উপমার (erotic similes) আধিক্য কেবল কালিদাস-প্রভাবজনিত নয়। সমসাময়িক বাংলা কাব্য বা তাঁর অব্যবহিত-পূর্ব বাংলা কাব্যে যৌনপ্রতীকের ছিল ছড়াছড়ি। কবি মধুসূদনের কাব্য-দেহে যে এদের দুই-একটি লেগে থাকবে, তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে! মাইকেলের সৃষ্টিতে প্রচলিত কাব্য-ভাষা অপেক্ষা ভবিষ্যতের কাব্য-ভাষাই প্রবলতর। আদিরসাত্মক বা তার উল্টা অপ্রণয় প্রধান উপমা নয়, বিষয়-উচিত উপমাই প্রধান হ'য়ে উঠেছে।

আদিরসাত্মক, অ-প্রণয়মূলক, পৌরাণিক বা অ-পৌরাণিক বিবিধ

অলংকার তিনি ব্যবহার করেছেন। ঠিক যে কারণে নানাবিধ শব্দ ব্যবহার ক'রে, নানাবিধ বাক্য-কাঠামো প্রয়োগ ক'রে তিনি যেমন নতুন শব্দভাণ্ডার ও বাক্য-গঠন-প্রণালী তৈরি করতে চেয়েছিলেন; ঠিক সেই একই কারণে উপমার বৈচিত্র্য ঘটিয়ে তিনি কাব্য-ভাষাকে নবীন এবং শক্তিসম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন। লক্ষ্য একই—পুরাতন কাব্য-ভাষার বিলোপ সাধন করা।

তিনি বলেছিলেন, "I have used more 'অনুপ্রাস' and 'যমক' than I like, but I have done so to deceive the ear, as yet unfamiliar with Blank Verse."[২৯]

কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। শুধু অমিত্রাক্ষর ছন্দের অভিনবত্বের কারণে তিনি অনুপ্রাস-যমক ব্যবহার করেন নি। এ কথা সত্য যে অনুপ্রাস-যমক কবি-সংগীতে, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় আধিপত্য করেছিল। কিন্তু এ কথা বলা ঠিক হবে না যে, ঈশ্বর গুপ্তীয় কাব্য-রীতির বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সংগ্রাম করলেও এগুলিকে মাইকেল পুরোপুরি বর্জন করতে পারেন নি, যেমন পারেন নি তিনি আদিরসাত্মক উপমাসমূহকে একেবারে বাতিল করতে। মাইকেল অনুপ্রাসকে শোধন করেছেন, তার দেহের পুরাতন কলঙ্কচিহ্ন ধৌত করে তাকে দিব্যাঙ্গনায় রূপান্তরিত করেছেন। অনুপ্রাস ব্যতীত কবিতা রচিত হতে পারে না—মিলেরই অপর নাম অন্ত্যানুপ্রাস। মিলনহীন কবিতায় অনুপ্রাস অন্তে স্থান লাভে বঞ্চিত হ'লেও এখানে-ওখানে থমকে দাঁড়িয়ে কাব্যের সুষমা সৃষ্টি করেছে। মধুসূদনের ব্যবহৃত যমকের সংখ্যা খুব বেশী নয়।

মহাকোলাহলে চলে জীবন-তরঙ্গ,
জীবনতরঙ্গ যথা পবনতাড়নে। (১/৬)

তোমার এ বিধি, বিধি, কে পারে বুঝিতে,
কিবা নরে, কি অমরে? (১/৭)

অধমে, মা, অধমের গতি। (৪/৬৮)

অনুপ্রাসের অবশ্য ছড়াছড়ি। তবে এ অনুপ্রাস ঈশ্বর গুপ্তের অনুপ্রাস থেকে মূলতঃ পৃথক্। ঈশ্বর গুপ্তের অনুপ্রাস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত এবং এই চমৎকারিত্ব সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্যও হ'ল কৌতুকরস সৃষ্টি। যেখানে কৌতুক নেই, সেখানে শুধুই চমৎকারিত্ব সৃষ্টি।

কর্তাদের গালগল্প, ওড়ুক টানিয়া,
কাঁটালের গুঁড়ি প্রায়, ভুঁড়ি এলাইয়া।

(পৌষপার্বণ)।

নিশা যোগে নলিনী যে রূপ হয় ক্ষীণা।
বঙ্গভাষা সেইরূপ দিন দিন দীনা॥

(বঙ্গভাষা)

আর মধুসূদন অনুপ্রাস ব্যবহার করেছেন প্রধানতঃ ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টির জন্য। এখানে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি প্রধান উদ্দেশ্য নয়; কৌতুকরস তো আদৌ নয়!

শিমুল—বিশাল
বৃক্ষ, ক্ষত-দেহ যেন রণক্ষেত্রে রথী
শোণিতার্দ্র। (১/১৯)

খর্জ্জর, কুম্ভীরনিভ ভীষণ মূরতি,
তবু মধুরসে পূর্ণ। (১/১৯)

বকুল—আকুল অলি যার সুসৌরভে (১/২০)

কামিনী—যামিনী-সখী, বিশদ-বসনা
ধুতুরা যোগিনী যথা। (১/২১)

(ধাতার কনক-পদ্ম-আসন যে স্থলে,
সে স্থল ব্যতীত,) বিশ্ব কাঁপিয়া উঠিল!
ভাঙ্গিল পর্বতচূড়া; ডুবিল সাগরে
তরী; ডরে মৃগরাজ, গিরিগুহা ছাড়ি,
পলাইলা দ্রুত বেগে; গর্ভিনী রমণী
আতঙ্কে অকালে, মরি, প্রসবি মরিলা! (২/৩৭)

"I have done so to deceive the ear, as yet unfamiliar with the Blank Verse." কিন্তু যে সাহিত্যে Blank Verse "unfamiliar" নয়, সে সাহিত্যেও অনুপ্রাস ব্যবহৃত হয়েছে অবিরত—

Of mans first Disobedience, and the Fruit
Of that Forbidden Tree, whose mortal taste

Brought Death into the world, and all our Woe,
With loss of Eden, till one greater Man
Restore us, and regain the blissful Seat.[৩০]

Nine times the Space that measures Day and Night
To mortal men, he with his horrid crew
Lay vanquist, rowling in the feary gulf
Confounded though immortal.[৩১]

উদাহরণ যত্রতত্র থেকেই তোলা যেতে পারে। ভাব ও বিষয়ের গাম্ভীর্য মহাকাব্যের গাম্ভীর্য হলেও, শব্দের গাম্ভীর্যের ওপরই তা নির্ভরশীল; কারণ সব সাহিত্যই শব্দ-নির্ভর।

কে কবি—কবে কে মোরে? ঘটকালি করি,
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,
সেই কি সে যম-দমী?[২০]

অবশ্য মাইকেলের 'তিলোত্তমাসম্ভবে' অনুপ্রাস-সাহায্যে যে ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি করা হয়েছে, সর্বত্র তা গম্ভীর নয়। এমন কি, প্রধানতঃ গম্ভীর নয়। আমরা ইতঃপূর্বে অনুপ্রাস-সমৃদ্ধ যে উদ্ধৃতিগুলি পরিবেশন করেছি, সেগুলির ধ্বনি-গত প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এখানে সমুদ্রের তরঙ্গনিনাদ, ঝঞ্ঝার সংঘাতজনিত কলরব, পর্বতগুহার দীর্ঘ গম্ভীর প্রতিধ্বনি শ্রুত হচ্ছে না। এখানে কোমল মধুর টুংটাং ধ্বনির সমারোহ। মিলটনের ধ্বনিতরঙ্গ তত শ্রুত নয়, যত শ্রুত হয়েছে সেক্সপীয়রের ধ্বনিতরঙ্গ। সেক্সপীয়রের Midsummer Night's Dream বা Love's Labour Lost বা Tempest-এর অমিত্রাক্ষর ছন্দের যে প্রকৃতি, এখানে তার অনুসরণ আছে, বা সাদৃশ্য আছে। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের সঙ্গে উল্লিখিত নাট্যসমূহের আন্তরিক মিল আছে।

"If Indra had spoken Bengali he would have spoken in the style of the poem. The author's extraordinary loftiness and brilliancy of imagination, his minute observation of nature, his delicate sense of beauty, the uncommon splendour

of his diction, and the rich music of his versification charm us in every page. It was an intellectual treat of the first description compared to it what are "Luscent syrups tinct with cinnamon."[৩৩]

এই সমালোচনায় অতিশয়োক্তির এবং চরম কথা বলার ঝোঁক আছে। তবু লেখক এ কাব্যের ভাষার অভিনবত্ব ঠিকই প্রণিধান করেছেন।

এখন কথা হচ্ছে এ কাব্যের ভাষার অভিনবত্ব কোথায়? প্রথমতঃ এই কাব্যে কবি এই প্রথম এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করছেন, যা কোন দিনই বাংলা কাব্যে ব্যবহৃত হ'ত না। দ্বিতীয়তঃ এমন অনেক পদ রচনা করা হ'ল, যার রচনাপ্রণালী প্রচলিত বাংলা পদবন্ধের সঙ্গে বড় বিশেষ মিলে না। অর্থাৎ ভাষা ব্যবহারে ও বাক্য রচনায় কবি নতুন পথ কাটলেন। আলালী ভাষা ও বিদ্যাসাগরী ভাষা কোনটিই তাঁর আদর্শ ভাষা নয়—অথচ উভয় ভাষারই যা কিছু সদ্‌অভিপ্রায় তা তিনি গ্রহণ করেছেন।

মাইকেল নতুন কাব্য-ভাষা তৈরি করতে বসেছেন, অ-সচেতনভাবে নয়; যথেষ্ট সচেতন ভাবে। এবং এই সচেতনতার প্রমাণ তাঁর নানা চিঠিপত্রে ছড়িয়ে আছে—আমরা প্রয়োজন বোধে সেগুলি উদ্ধৃত করব। কিন্তু তাঁর কাব্য-বিশ্লেষণ করলেও একই তথ্য পাওয়া যাবে। তৎসম, তদ্ভব এবং দেশী বা অন্ত্যজ শব্দ তিনি বহু ব্যবহার করেছেন। কোন বিশেষজাতীয় শব্দের উপরে তাঁর নির্ভরতা কম, কাউকে তিনি বাতিলও করেন নি। এমন কি পুরাতন বাংলা কাব্যে ব্যবহৃত বহু শব্দ তিনি গ্রহণ করেছেন। মঙ্গলকাব্য ও পদাবলী সাহিত্যের ভাষা তাঁর কাছে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়নি। কবিওলাদের ভাষা বা ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা তাঁর পছন্দমাফিক ভাষা নয়। কিন্তু 'ইডিয়ম' ব্যবহারে তিনি আদৌ ছুঁৎ-মার্গীয় মনোভাবের পরিচয় দেননি। কথ্য ভাষার 'ইডিয়ম' তাঁর শালীন কাব্যে স্থান পেয়েছে। আমরা কয়েকটি উদাহরণ এখানে তুলছি :

.........নীচ সহ যদি মহতের খাটে
তুলনা।" (২/৩৪)

কাটারীর ধারে গলা কাটি
প্রণয়ী-হৃদয়ে কিগো নীরোগে তাহারে? (২/৪০)

চিরধীর শৃঙ্গবরে বজ্রসম চোটে
অধীরিতে। (৩/৫৪)

ঐরাবত শুঁড়ে
চোক চোক হানি শর অস্থিরিনু তারে। (১৪/৩)

নীরবে এ ওঁর পানে লাগিলা চাহিতে। (৪/৮১)

এখানে ব্যবহৃত সমস্ত 'ইডিয়ম'ই যে সুপ্রযুক্ত হয়েছে, এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু কবি যে প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলে কাব্য-ভাষার প্রচলিত বাগ্‌ধারা ও শব্দ-সীমাকে লঙ্ঘন করেছেন বা বিস্তৃত করেছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অন্যান্য 'রিফর্ম' আন্দোলনের সঙ্গে কাব্য-ভাষার এই সংস্কার আন্দোলনও উপমিত হতে পারে। অমিত্রাক্ষর ছন্দ যেন যুগের মুক্তির হাওয়ার মুক্ত ছন্দ। যেন এই ছন্দ ব্যতীত এই মুক্তির গান সম্পূর্ণ উচ্চারিত হতে পারত না, বা পরিপূর্ণ স্ফুট হ'ত না। মুক্তির গান মুক্ত ছন্দেই গেয় হ'তে পারে। নতুবা কথা ও সুরের বিরোধে গায়কের উদ্দেশ্যই পণ্ড হ'ত। তবু তিলোত্তমা সম্ভবের অমিত্রাক্ষর ছন্দ অপেক্ষাকৃত পেলব ; তাই ঐ ছন্দের সমগ্র সম্ভাবনার দ্বার মুক্ত করতে পারে নাই। তার কারণ, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য বস্তুতঃ তৎকালীন শিক্ষিত বাঙ্গালীর একটি বিশেষ ও খণ্ড পিপাসাকে মাত্র রূপদান করেছে ; সমগ্র জীবন-পিপাসাকে ধরতে পারেনি। অভ্যস্ত জীবনের অকিঞ্চিত-করতার মধ্যে সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর ধ্যান, আদর্শ-নারী কল্পনা বা রূপ-সম্ভোগ সমসাময়িক জীবনের নব চেতনার অংশীভূত। কিন্তু সেইটাই সমগ্র চেতনা নয়। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' কবি শ্রীমধুসূদন সেই ত্রুটি সংশোধনে প্রয়াসী হবেন। নিছক খণ্ড সৌন্দর্য-সম্ভোগ অপেক্ষা অখণ্ড পরিপূর্ণ জীবন-সম্ভোগ অধিকতর কাম্য, হোক না তা বেদনার রঙে নীল, বা আশাভঙ্গের দীর্ঘনিঃশ্বাসে দীর্ণ বিদীর্ণ।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের নিছক কারিগরী কুশলতাও পুরোপুরি ফুটে উঠতে পারে নি। ছেদ বা বিরতির মুহূর্ত অনেক ক্ষেত্রে বিচলিত : কবি যুক্তাক্ষরের বা সমাসবদ্ধ শব্দ ও অনেকানেক শব্দের রূঢ়তাকে শাসনাধীন আনতে পারছেন না। সাধারণ ভাবে পয়ারের ৮।৬ পর্ব-ভাগ মেনে

নিয়ে কবি তাঁর ছন্দ-প্রবাহ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে তার ব্যত্যয় ঘটেছে এবং ছন্দপতন ঘটেছে—

সুন্দ উপসুন্দাসুর, সুরে পরাভবি,
লণ্ড ভণ্ড করিল অ/খিল ভূমণ্ডল। (১/৭)

হায় রে, যে রতির মৃ/ণাল ভুজপাশ,
(প্রেমের কুসুম-ডোর,)/ বাঁধিত সতত
মধুসুখে... ... ... (১/৭)

কিম্বা উচ্চশাখ বৃক্ষ/শাখে বসে উড়ি। (১/৮)

ফুটিল এক মৃণালে/ক্ষীর-সরোবরে। (১/১৩)

আইস হে, লাবণ্যবতি,/দুহিতা যেমতি,
আইসে নিজ পিত্রালয়ে/নির্ভয় হৃদয়ে। (১/১২)

গিরি যথা, স্কন্ধে কেশ/রাবলীর শোভা। (১/৩০)

এখানে সর্বত্রই যে ছন্দ-পতন ঘটেছে, তা নয়; কিন্তু ছন্দের সাবলীলতা নষ্ট হয়েছে; এ কথা বলব। এখানে পর্বের অভ্যন্তরে মূল শব্দ আমরা গোটা পাচ্ছি না; ফলে ছন্দোলিপি স্বচ্ছন্দ হচ্ছে না, এবং তার ফলে যাকে বলে 'phrasal music', তার হানি ঘটছে। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য পরীক্ষামূলক যুগের সর্বশেষ কাব্য। ইংরেজী-বাংলায় দ্বিবিধ ভাষার মাধ্যমে তিনি সাহিত্য চর্চা করেছেন, এবং নানা কাব্য-কাঠামো ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছেন। প্রস্তুতি-পর্বের সাহিত্যে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য নিঃসন্দেহে প্রধানতম সৃষ্টি। কিন্তু এ কাব্যের বক্তব্য ও বক্তব্য-পরিবেশন ভঙ্গী এ যুগের প্রধানতম বাণীকে বহন করতে পারেনি। কবি বলেছিলেন,

"I myself like those two fellows (সুন্দ-উপসুন্দ-লেখক), and it was once my intention to have added another Book to place them more conspicuously before the reader."

এ কথায় কবির মোহান্ধতার পরিচয় ফুটে বেরুচ্ছে। রাজনারায়ণ বসু সুন্দ-উপসুন্দ চরিত্রের নিকট যতটা দাবী করেছিলেন, তা পূরণ করা সমালোচক মধুসূদনের পক্ষে সম্ভব হলেও কবি মধুসূদনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ এ কাব্যের নায়ক সুন্দ-উপসুন্দ নয়; ইন্দ্রও নয়। এ কাব্যের

'নায়ক' হ'ল তিলোত্তমা। ভাগ্য-বিড়ম্বিত মানবজাতির সম্মুখে সে হ'ল এক অপ্রাপনীয় প্রলোভন, সে এক বিদেহ সৌন্দর্য, যাকে উদ্দেশ্য করে বলা যায়, "মুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গি দেয় পদে তপস্যার ফল।" এ কাব্যে সুন্দ-উপসুন্দ নায়কোচিত মর্যাদা পেতে পারে না, এবং তাদের প্রসঙ্গ বিস্তৃততর হতে পারে না; কারণ তাদের আশাভঙ্গ বা পরাজয় বর্ণনা কবির লক্ষ্য নয়। শুদ্ধ সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষিত অভিসারের লীলাচাঞ্চল্য বর্ণনা করাই তাঁর উদ্দেশ্য। 'ইন্দ্রের স্বর্গোদ্ধার' বা 'সুন্দ-উপসুন্দবধ কাব্য' কবি লিখতে বসেন নি। কাব্যের মূল ভাষণে মর্ত্য-মাধুরীর প্রতি অপরিসীম আর্তি প্রকাশ পেয়েছে। কাব্যের শেষ সর্গে কবি বলেছেন,

চল ফিরে যাই যথা কুসুম-কুন্তলা
বসুধা।

এতকাল কবি কাব্যলক্ষ্মীর প্রসাদে স্বর্গপরিভ্রমণ করেছেন। আজ তিনি মর্ত্যে অবতরণ-প্রয়াসী। এ যেন উনবিংশ শতকের জন্য লিখিত এক স্বতন্ত্র 'স্বর্গ হতে বিদায়' কাব্য। বিদায়ের ইচ্ছা ঐকান্তিক; কিন্তু স্বর্গ-স্মৃতিই এখানে প্রবল। মর্ত্যের মানুষ এখনও ছায়াসদৃশ!

"The want of what is called human interest will no doubt strike you at once, but you must remember that it is a story of gods and Titans, I could not by any means shove in men and women."

এর জন্য কবিকে আবার একখানি কাব্য লিখতে হ'ল, যে কাব্য বাংলা ভাষার একমাত্র মহাকাব্য। কবি যে সত্যই সেদিন "কুসুম-কুন্তলা বসুধা"য় ফিরে এলেন। কৌতুকের হচ্ছে এই, দেবতা বা রাক্ষস কুশীলবের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও এখানে মানবিক অনুভূতির উদ্বোধনে কবি আদৌ কোন বিপত্তি বোধ করেন নি!

॥ ৪ ॥

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য আর মেঘনাদবধ কাব্যের মাঝখানে যদি ব্রজাঙ্গনা কাব্য লিখিত হ'ত, তবে সমালোচকের পক্ষে কাব্য-ধারার স্তর নির্ণয় সহজতর হ'ত। মধুসূদন এমনই এক প্রতিভা, যা নিয়মকে স্বচ্ছতর না করে'

জটিলতর করে। কারণ তিলোত্তমায় নারীত্বের ছিল জয় নিনাদ; শুধু প্রলোভনেরই চিত্তহারী হাতছানি। ব্রজাঙ্গনায় সেই নারীত্ব নানা বন্ধন সংশয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে করেছে অস্থির দাপাদাপি। তিলোত্তমাসম্ভব আর ব্রজাঙ্গনার জীবন-রস একই পাত্র থেকে উৎকলিত; তাদের মধ্যে কুলগত সাদৃশ্য আছে। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্য গোত্রান্তরের কাব্য।

পূর্বোক্ত কাব্য দু'খানিতে প্রকাশ পেয়েছে জীবনের খণ্ডিত রূপ, মেঘনাদবধ কাব্যে সম্পূর্ণ রূপ। অবশ্য 'সম্পূর্ণ' শব্দটিই আপেক্ষিকতার দায় বন্ধনে আবদ্ধ। যে মানব অনুভূতি উক্ত কাব্য দু'খানিতে মাত্র আভাষিত হয়েছিল, মেঘনাদবধ কাব্য সেই জগৎকে বাস্তবতর ও বিস্তৃততর করেছে। পদার্থবিজ্ঞানের বিচারে যাই বলা হোক, রসশাস্ত্রের রসানে ক'ষলে এ জগৎ নতুন, মৌলিক অর্থেই নতুন।

॥ যুগ-মানস ও মেঘনাদবধ কাব্য ॥

॥ ১ ॥

"বলিতে গেলে রামমোহন রায়ের অভ্যুদয়, হিন্দু কালেজের প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্ম সমাজের স্থাপন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের আবির্ভাব, মধুসূদন দত্তের প্রভাব প্রভৃতি ঘটনাপরম্পরা দ্বারা বঙ্গ সমাজে নব অকাঙ্ক্ষার উচ্ছ্বাস হইয়াছিল, তাহা এই কয়েক বৎসর আপনার কাজ করিয়া আসিতেছিল। এই ১৮৬০ সাল হইতে ১৮৭০ সালের মধ্যে তাহা আরও ঘনীভূত আকারে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিল।"[৩৩] (ক)

মেঘনাদবধ কাব্য সেই "ঘনীভূত প্রকাশের" সার্থকতম দলিল।

পূর্বেই বলেছি যে, এসিয়াটিক সোসাইটির গবেষণায় ও হিন্দু কলেজের শিক্ষায় আত্ম-আবিষ্কার ঘ'টে গিয়েছিল। এবং আত্ম-সম্প্রসারণের বাসনাও দেখা দিয়েছে।

অথচ পরদেশী শাসন ব্যবস্থায় দেশীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হ'তে পারে না।

মেঘনাদবধ কাব্যে এই দ্বিবিধ তাৎকালিক প্রতিক্রিয়ারই সার্থক রূপায়ন ঘটেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর এই বিশেষ পর্বে তাই ব্যক্তির কণ্ঠ অপেক্ষা সমাজ-

কণ্ঠই অধিকতর সরব ও কলমুখর। সেই কালে (অন্ততঃ কিছুকালের জন্যও) ব্যক্তি আর সমাজ পরস্পরের কণ্ঠসংলগ্ন হ'য়ে পড়েছিল; এমন মিলন কদাচিত ঘটে।

"পদ্মিনী উপাখ্যান" এই মিলনের মন্ত্র কাব্যে উচ্চারণে প্রয়াসী হয়েছে; কিন্তু প্রয়াস মাত্রেই সফলতার ভাগী হয় না। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যেও কবি সেই কর্তব্য পালন করতে পারেন নি। সুন্দ-উপসুন্দ প্রসঙ্গ স্ফীততর করলেও সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ত না। তার জন্য প্রয়োজন তৃতীয় পৃথক্ কাব্যের; শুধু কাব্যও নয়, মহাকাব্যের।

রামায়ণের একটি বিশেষ অংশ তখনই কেবল অনন্য তাৎপর্যে ধনী হ'য়ে পড়ল—"it was then and neither earlier nor later, it was vitalised with its symbolic meaning."[৩৪]

সামন্ততান্ত্রিক ধর্মকেন্দ্রিক আচারসর্বস্ব নীতিবাদের স্থলে এক নতুন নীতিশাস্ত্র তখন প্রতিষ্ঠিত হবার মুখে। রামমোহন-ডিরোজিও-দেবেন্দ্রনাথ-বিদ্যাসাগর-কেশবচন্দ্রের জীবনে সে নীতিবোধ বিকশিত হয়ে উঠেছে, তাকে অবলম্বন ক'রে নতুন পুরাণ রচনার লগ্ন উপস্থিত।

"Every myth of the great style stands at the beginning of an awakening spirituality."—মেঘনাদবধ কাব্য বাংলাদেশের সেই স্ফুটনোন্মুখ নব্যনীতিবোধের প্রথম শিল্পরূপ ধারণ। পদ্মিনী উপাখ্যানে তার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ইচ্ছার সাফল্য নেই। মেঘনাদবধ কাব্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ইচ্ছাপূরণ।

॥ ২ ॥

মিলটন ইচ্ছা করেছিলেন "to be an interpreter of the best and sagest things among mine own citizens throughout this island in the mother dialect that what the greatest and choicest wits of Athens, Rome or modern Italy, and those Hebrews of old did for their country. I in my proportion with this over and above of being a Christian might do for mine."[৩৫] মাইকেলও কি এ কথা বলতে পারতেন না?"

আমরা ইতঃপূর্বেই বলেছি, ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশেষ বাণী ঐ শতাব্দীর দ্বিতীয় স্তরের শুরুতে দানা বাঁধতে থাকে। এটা সাহিত্য সমালোচকের স্বকপোলকল্পিত তথ্য নয়, ঐতিহাসিকদের সাক্ষ্য। অথচ দেশ ছিল তখন পরপদানত ও পিষ্ট, কিন্তু আত্মনিয়ন্ত্রন-অভিলাষী ; শুধু বস্তুজীবনে নয়, ভাবজীবনে। "And while political greatness was one of the sources of the inner expansion, in Germany, on the contrary, the intellectual energies of those years created fruitful soil out of which political greatness was finally, by the hands of a mighty tiller, to be won."[৩৭]

উক্তিটি জার্মানীর মানস-প্রকৃতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে প্রযুক্ত হলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশ সম্পর্কেও তুল্যভাবে ব্যবহৃত হতে পারে, অবশ্য শেষাংশটুকু আপাতত মুলতুবী রেখে।

রাজনারায়ণ বসু যথার্থই বলেছিলেন :

"বস্তুত এই কাব্য এসিয়া-রূপ জনিতা ও ইউরোপীয় জনয়িত্রীর সন্তান স্বরূপ।"

আমরা ইতঃপূর্বে অনৈক্য-জর্জর জার্মানীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছি। গ্যয়টে সেই দুর্গত জার্মানীর মহাকবি। রাজনারায়ণ বসুর উল্লিখিত প্রবন্ধে গ্যয়টের সঙ্গেই কবি মধুসূদনকে তুলনা করা হয়েছে।

"গেটে যেমন অসম্পূর্ণ জর্মন ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপ বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন।"[৩৮]

॥ ৩ ॥

মেঘনাদবধ কাব্যের মর্মোদ্ঘাটনে অনেকেই দেশপ্রেমের প্রসঙ্গ প্রাধান্য দিয়েছেন। গোটা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যই জাতীয় জাগরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মেঘনাদবধ কাব্য এই জাতীয় জাগরণ-পর্বের বৃহত্তম রচনা। কিন্তু তাই ব'লে শুধু দেশপ্রেম প্রসঙ্গ দিয়ে এ কাব্যের চরিত্র বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ হয় না।

মেঘনাদবধ কাব্য নতুন মহাকাব্য ; অর্বাচীনযুগে Epic of growth আর কোনদিনই রচিত হবে না। মাইকেলও তা জানতেন। তাই তাঁর

হোমার আদর্শ হলেও রচনা-নিয়ম নিয়ন্ত্রণ করেছেন মিলটন, যিনি সাহিত্যিক মহাকাব্যই রচনা করেছেন মাত্র, অকৃত্রিম মহাকাব্য নয়। বীরজন-জীবনী-ভূষিত সমস্ত কাব্যই মহাকাব্য নয়; 'Heroic poem' মহাকাব্য হবেই, এমন কোন কথা নেই। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েও যদি কোন কাব্য কোন সুমহৎ জীবন-চেতনায় উদ্বুদ্ধ না হয়, তবে সেই কাব্য শেষ পর্যন্ত একটি ব্যালাড বা গাথা কবিতায় পরিসমাপ্তি লাভ করবে।

অর্থাৎ মহাকাব্যের প্রাণভোমরা লুকিয়ে আছে ঐ জীবন-চেতনার সোনার কৌটার অভ্যন্তরে। কবিকে এখানে এসেই তাঁর কাব্যের জীবন-রস আহরণ করতে হবে।

এই কারণে মহাকাব্যের কবিকে বিশেষ দেশের অপেক্ষা বিশেষ কালের কবি বলাই অধিকতর সঙ্গত; দান্তে ইতালীয় নন, তিনি মধ্যযুগীয়; মিলটন ইংলণ্ডীয় নন, তিনি রেনেসাঁসীয়। মধুসূদনও বাংলার নন, তিনি উনিশ শতকীয়।

কোন কোন সমালোচক তাই বলেন, মহাকাব্য-জিজ্ঞাসায় দেশপ্রেম প্রসঙ্গ আদৌ উত্থাপনযোগ্য নয়। এ বক্তব্যও এক ধরণের অতিশয়োক্তি। দেশপ্রেম অন্যতম মহান চেতনা; কিন্তু এই চেতনা অন্য নিরপেক্ষ নয়; অন্য কোন মহৎ চেতনার উপর নির্ভর ক'রে তবে কুসুমিত হয়। অন্য-চেতনা-নিরপেক্ষ দেশপ্রেম কুসুমিত হয় না, হয় কণ্টকিত।

অথচ মহাকাব্য যুগ-জিজ্ঞাসারই সদুত্তর। "The epic must communicate of what it was like to be alive at the time." মেঘনাদবধ কাব্য উনিশ শতকীয় জীবন-জিজ্ঞাসার সদুত্তর।

ওথেলো আর মেঘনাদবধ কাব্য—দুই-ই বিয়োগান্ত। কিন্তু ওথেলো কোন্ যুগে লিখিত হয়েছিল, সে সংবাদ কেউ মনে রাখতে চায় না। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যের জন্ম-তারিখ তার বিচারের পক্ষে অপরিহার্য। ওথেলো নাটকে সে যুগের যে কোন চিহ্ন নেই, তা নয়। কিন্তু নাটকটির লক্ষ্য যুগের পরিচয় রটনা নয়, যুগহীনতার ঘোষণা। মেঘনাদবধ কাব্যে যুগহীনতার চিহ্ন যে নেই, তা নয়। মেঘনাদবধ কাব্যের মহত্ত্ব এইখানে যে তার বক্ষে যুগের ছাপই সযত্নে রক্ষিত, নারায়ণ বক্ষে মনুষ্যভৃগুর পদচিহ্নের মতই। তবু মেঘনাদবধ কাব্য 'ক্রনিকল' হ'ল না, হ'ল 'এপিক'।"

অথচ মহাকাব্যের বিষয়-বস্তু নিরূপণে কবি কত অ-সচেতন—"The subject you propose for a national epic (সিংহল বিজয়) is good —very good indeed. But I don't think I have as yet acquired a sufficient mastery over the "Art of Poetry" to do it justice. So you must wait a few years more. In the meantime I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit. Do not be frightened, my dear fellow. I won't trouble my readers with *Vira rasa* (বীর রস). Let me write a few epiclings and thus acquire a pucca fist."[৩৯]

মধুসূদনকে লিখিত এক পত্রে রাজনারায়ণও 'সিংহল বিজয়' কাহিনীর মহাকাব্যিক উপযোগিতা বর্ণনা ক'রে উপসংহারে লিখেছেন, "An epic poem like the one suggested above is much required to infuse patriotic zeal and a warlike spirit into the breasts of degenetate countrymen. It is sure that a hundred far more powerful agencies are required to bring about that mighty change, but the poet also must lend his aid to the good work."[৪০]

'সিংহল বিজয়'-এ দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখান যাবে, সত্য। কিন্তু তবু 'সিংহল বিজয়' নিয়ে মহাকাব্য লিখিত হ'ল না। এবং এটাই হ'ল অবিসংবাদিত ঘটনা। সে কি শুধু কবির অমনোযোগ বা অবসর-অভাব ? আমার মনে হয়, কবি শুধু দেশপ্রেম সম্বল করার ফলে 'সিংহল বিজয়' কাহিনীতে সেই বড় নীতিবোধ খুঁজে পাননি, যার প্রয়োজন মহাকাব্যে সর্বাগ্রে। পরবর্তী-কালে যোগীন্দ্রনাথ বসু (মেঘনাদবধ কাব্যকারের জীবনী লেখক) 'পৃথ্বীরাজ' ও 'শিবাজী' নামে দু'খানি মহাকাব্য লিখেছিলেন ; গ্রন্থ দু'খানিতেই প্রচুর বীররস ও দেশপ্রেম ছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি, প্রচুর বীররস ও দেশপ্রেম সত্বেও তাদের রক্ষা করা গেল না ; মহাকাব্য হিসাবে তারা স্বীকৃতি পেল না।

"I tell you what ; —if a great poet were to rise among the Mussulmans of India, he could write a magnificent Epic

on the death of Hossen and his brother. He could enlist the feelings of the whole race on his behalf. We have no such subject." বিষয় যদি কাব্য-চরিত্র নির্ণয় করতে পারত, তাহলে কবি-কর্মের অনেক রহস্য-জালই উন্মোচিত হোত।

পরবর্তীকালের কোন কোন সমালোচক বৃত্রসংহারের কাহিনী-মাহাত্ম্যের স্তুতি করেছেন; ঐ কাব্য-বর্ণিত ঘটনাটির মধ্যে সমালোচকমহাশয়েরা মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু এতটা বিষয় গৌরব সত্ত্বেও সে কাব্য কেন মহাকাব্য হোল না? সে কি শুধু ভাষার দুর্বলতার জন্য? ছন্দ-অকৃতার্থতার জন্য? সমালোচকগণ বিষয়ের মতই কাব্যরীতির উপর, আঙ্গিক কুশলতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিষয়, ভাষা ও ছন্দের যোগফল মহাকাব্য নয়। তা যদি হ'ত তবে বৃত্রসংহার না হয় ব্যর্থ হ'ল, রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস না হয় ব্যর্থ হ'ল, কিন্তু স্বয়ং মাইকেলের "তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য" সে সাফল্য অর্জন করল না কেন? শুধু বিষয় নয়, শুধু ভাষা নয়, শুধু ছন্দ নয়, এ-গুলি ব্যতীত আরও এক অনন্যকুশলতার প্রয়োজন।

মেঘনাদবধ কাব্য সেই অনন্যকুশলতার অধিকারী হ'য়ে বিষয়, ভাষা, ও ছন্দের অপূর্ব সম্মিলনে দিব্যদেহ ধারণ ক'রে আবির্ভূত হয়েছে। "It was then and neither earlier nor later than it was vitalised with its symbolic meaning."

উনবিংশ শতাব্দীর যুগ-মানস দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই সাবালক হয়ে উঠতে থাকে,—উৎসাহে নৈরাশ্যে, আনন্দে বেদনায় তার চিত্তের পরিপূর্ণ স্ফূর্তি ঘটতে থাকে, বিস্ফারণ ঘটতে থাকে। সেই তো হ'ল যথার্থ "awakening of spirituality."

॥ মেঘনাদবধ কাব্য ও তার মৌলিকতা ॥

॥ ১ ॥

তৎসত্ত্বেও প্রশ্ন থাকবে কবির হাতে বিষয়ের নবজন্ম ও রূপান্তর ঘটল কি করে?

"I despise Ram and his rabble; but the idea of Ravana

elevates and kindles my imagination; he was a grand fellow."

এ কথা কি শুধু তাঁরই?

রামমোহন যেদিন 'বেদান্ত গ্রন্থ'-এর ভূমিকাতে (১৮১৫) বললেন, "He is the only object of worship", সেদিন পুরাণের দেবদেবী থেকে শিক্ষিতদের দৃষ্টি অন্য পথে ধাবিত হ'ল। সেকালের শিক্ষিত অন্যতম দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন বললেন, "পরকাল নাই, মনুষ্য ঘটিকা যন্ত্রের ন্যায়;" রসিককৃষ্ণ মল্লিক যেদিন আদালতে দাঁড়িয়ে তুলসীপত্র স্পর্শ ক'রে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করলেন, বললেন, আমি গঙ্গা মানি না, সেদিন তাঁরাও কি একই কথা বলেন নি?[৪১] অক্ষয়কুমার দত্ত যেদিন বেদের অপৌরুষেয়তা অস্বীকার করলেন, সেদিনও তো সেই একই কথা উচ্চারিত হয়েছিল! সে তো ১৮৫০ সালের কথা।[৪২ক]

লক-এর "Reasonableness of Chirstianity" সপ্তদশ শতকে প্রকাশিত হয়। তারপর থেকেই ধর্মগ্রন্থের মধ্যে যুক্তির প্রবেশাধিকার প্রশস্ত হ'ল। অষ্টাদশ শতকের তৃতীয় দশকের মধ্যেই টোল্যাণ্ড, টিন্ড্যাল, কলিন্স প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে ও ধর্মীয় উপাখ্যানসমূহের বিরুদ্ধে বই লিখতে লাগলেন। প্রথম ইংলণ্ডে এই মতাবলম্বীদের আবির্ভাব ঘটলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এঁরা প্রভূত প্রতিপত্তি অর্জন করলেন। এই মতবাদকে Deism বলা হয়। ডেভিড হার্টলির হাতেই আবার ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে এক পবিত্র সন্ধি (Holy Alliance) সংঘটিত হোল।[৪২খ] আঠার শতকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই জাগরণকে বলা হয় 'Enlightenment.' "Tendency of the Englightenment was towards establishing the universal "True" Christianity by means of philosophy identical with the religion of reason, or natural religion."[৪৩] এই নবীন ভাবাদর্শ ফ্রান্সে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে, এবং সেখানকার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জীবনের বিশিষ্টতাহেতু এই মতাদর্শ অধিকতর উগ্র ও ধর্মবিদ্বেষী হ'য়ে ওঠে। ফরাসী বিপ্লব লকের মতাদর্শের জয়; কিন্তু প্রত্যক্ষত, টম পেইনের প্রভাবজনিত।

ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে এই ধর্মীয় মুক্তি-আন্দোলন সমগ্র দুনিয়া জুড়ে

ঘুম ভাঙানিয়ার কাজ করে। বা বলা যেতে পারে, নব্যশিক্ষা আর ধর্মীয় যুক্তিবাদ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হ'ল। "The movement continued driven forward by its own momentum and by forces deeper than political' Locke and Newton rules from their graves.[৪৪] যুগের ক্রমবিকাশমান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দাবী উঠছিল যে, খৃষ্টধর্মের যুক্তিগ্রাহিতা প্রমাণিত করতে হবে এবং অলৌকিকত্বের অবসান ঘটাতে হবে। এমন কি নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বও ঐশ্বরিক মহিমা প্রমাণে ব্যবহৃত হ'ল।

Nature, and Nature's law lay hid in night,
God said, let Newton be! and all was light. —Pope

এই যুগ-মানস পরিক্রমা ক'রে ট্রিভেলিয়ান বলেছেন,

"In previous centuries religion had been first and foremost dogma. Now it was fashionable to preach it as morality with a little dogma apologetically attached".[৪৫]

বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীতে বেকন লক ও পেইনের জনপ্রিয়তার সংবাদ আমরা পূর্বেই সরবরাহ করেছি। নিউটনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অক্ষয়কুমার দত্তের লেখনীমুখে কেমন প্রচারিত হয়েছিল, সে খবরও আমরা বিস্তারিতভাবে বলেছি।

জীবনে যে-পরিবর্তন সাধিত হতে চলেছে, কাব্যেও তা সার্থক হ'তে চলল। বরং জীবনে যে বাণী অর্ধস্ফুট ছিল, কাব্যে তাই পূর্ণ প্রস্ফুটিত হ'ল।

॥ ২ ॥

মেঘনাদবধ কাব্য রামায়ণ কাহিনীর বেষ্টনীর মধ্যে নতুন তাৎপর্য আরোপ করেছে। কিন্তু সে তাৎপর্য কি রকম? কবি প্রচলিত কাহিনীকে নবীনভাবে রূপায়িত করেছেন। সে নবীন রূপায়ন কি রকম?

কোন মহৎ কাব্যই কবির ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার অভিব্যক্তি মাত্র নয়। সকল কবিকর্মই কবির নিজস্ব সৃষ্টি—সেই অর্থে কবির ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু মহত্তম সাহিত্যে কখনও কবির ব্যক্তিগত ইচ্ছা-

অনিচ্ছার প্রতিফলন মাত্র নয়; সেখানে সমাজের ইচ্ছা-অনিচ্ছারও প্রতিফলন ঘটে। সেই অর্থে মেঘনাদবধ কাব্যেও সমাজসত্তার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত।

অদ্যাবধি সমালোচকগণ সকলেই একবাক্যে মেঘনাদবধ কাব্যে কবির ভাষার ও ছন্দের অভিনবত্বের জয়ধ্বনি দিয়েছেন। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যের কবি-কল্পনার মৌলিকতা তেমন স্বীকৃতি পায় নি।

রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের মৌলিকতা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, "মেঘনাদবধ কাব্য কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙ্গিয়াছেন, এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেকদিন হইতে আমাদের মনে যে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহার শাসন ভাঙ্গিয়াছেন। এই কাব্যে রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড় হইয়া উঠিয়াছে। যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোনটা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ দৈন্য আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবিহৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দ-বোধ করিয়াছেন। এই শক্তির চারিদিকে প্রভুত ঐশ্বর্য, ইহার হর্ম্যচূড়া মেঘের পথরোধ করিয়াছে। ইহার রথ-রথী-অশ্ব-গজে পৃথিবী কম্পমান; ইহা স্পর্ধাদ্বারা দেবতাদিগকে অভিভূত করিয়া বায়ু-অগ্নি-ইন্দ্রকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে; যাহা চায় তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের বা কোন কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে। এতদিনের সঞ্চিত অভ্রভেদী ঐশ্বর্য চারিদিকে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, সামান্য ভিখারি রাঘবের সহিত যুদ্ধে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয়তর পুত্র-পৌত্র-আত্মীয়স্বজনেরা একটি একটি করিয়া সকলেই মরিতেছে, তাহাদের জননীরা ধিক্কার দিয়া কাঁদিয়া যাইতেছে, তবু যে অটল শক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোন মতেই হার মানিতে চাহিতেছে না, কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে-শক্তি অতি সাবধানে সমস্ত মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া যে-শক্তি অতি সাবধানে স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায়

না—বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।”[৪৬]

অপর একখানি নাটকের ভাববস্তুর ব্যাখ্যাচ্ছলে কবি আরও পরিণত বয়সে লিখছেন—“আমার পালায় একটি রাজা আছে। আধুনিক যুগে তার একটার বেশী মুণ্ড ও দুটোর বেশী হাত দিতে সাহস হল না। আদি কবির মতো ভরসা থাকলে দিতেম। বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষের হাত পা মুণ্ড অদৃশ্যভাবে বেড়ে গেছে। আমার পালার রাজা যে সেই শক্তি বাহুল্যের যোগেই গ্রহণ করেন, গ্রাস করেন, নাটকে এমন আভাস আছে। ত্রেতাযুগে বহুসংগ্রহী বহুগ্রাসী রাবণ বিদ্যুৎবজ্রধারী দেবতাদের আপন প্রাসাদদ্বারে শৃঙ্খলিত ক'রে তাদের দ্বারা কাজ আদায় করত। * * * হঠাৎ মনে হ'তে পারে, রামায়ণটা রূপক কথা। বিশেষত যখন দেখি, রাম রাবণ দুই নামের দুই বিপরীত অর্থ। রাম হ'ল আরাম, শান্তি; রাবণ হ'ল চীৎকার, অশান্তি। একটিতে নবাঙ্কুরের মাধুর্য, পল্লবের মর্মর; আর একটিতে শান-বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শৃঙ্গধ্বনি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রামায়ণ রূপক নয়, আমার রক্তকরবীর পালাটিও 'রূপকনাট্য' নয়। রামায়ণ মুখ্যত মানুষের সুখদুঃখ বিরহমিলন ভালোমন্দ নিয়ে বিরোধের কথা; মানবের মহিমা উজ্জ্বল ক'রে ধরবার জন্যেই চিত্রপটে দানবের পটভূমিকা। এই বিরোধ একদিকে ব্যক্তিগত মানুষের, আর একদিকে শ্রেণীগত মানুষের। রাম ও রাবণ একদিকে দুই মানুষের ব্যক্তিগত রূপ ও আর একদিকে মানুষের দুই শ্রেণীগত রূপ।”[৪৭] আবার অন্যত্র এই প্রসঙ্গে লিখছেন—“যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন ক'রে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত ক'রে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে, সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশী; ভুলেছে প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস ক'রে রাখবার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে।”[৪৮]

উভয় বক্তব্য মিলিয়ে পড়লে দেখা যায় এদের মূলে ইঙ্গিত এক। দ্বিতীয়টি প্রথমটির অনুগমন করেছে মাত্র। অর্থাৎ রক্তকরবী নাটকের মূল কল্পনায় মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণচরিত্রের অনুসরণ আছে। কবি বলেছেন এ-যুগের

রাবণের দশমাথা বিশখানা হাত প্রয়োজন করে না। আমাদের মেঘনাদবধ কাব্যকারও রাবণকে মানুষ ক'রেই এঁকেছেন। যদিও দশানন নামটি তিনি একাধিকবার ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তা শুধু নাম হিসাবেই। ঐ শব্দের বিকল্প বা দ্বিতীয় কোন অর্থ নেই।

কনক আসনে বসে দশানন বলী (১ম সর্গ—পৃষ্ঠা-১)

কেমনে নাশিলা
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ? (১.৩)

উত্তর করিলা তবে দশানন বলী। (১।৬)

বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি! (৪।৩৪)

বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে! (৪।৩৮)

কনক আসনে যথা দশানন রথী (৭।৬৫)

কবি রাবণকে ঐশ্বর্যের প্রতীক হিসাবে দেখেছেন। সুসভ্য, প্রজাবৎসল শাসক হলেন রাবণ।

বহুকালাবধি
পালিয়াছি পুত্রসম তোমা সবে আমি;
জিজ্ঞাসহ ভূমণ্ডলে, কোন্ বংশখ্যাতি
রক্ষোবংশখ্যাতিসম? (৭।৬৯)

'রক্তকরবী'র উপসংহার এ কাব্যের উপসংহারের মত নয়। রক্তকরবীর রাজা আপন ঐশ্বর্যের কারাগার থেকে নিজেই আপন মুক্তি ক্রয় করলেন। কিন্তু রাবণ ঐশ্বর্যকে তখনও অভিশাপ মনে করছেন না। অভিশাপ আসছে অন্য জগৎ থেকে। রাবণ পুত্রপরিজনসহ এই ঐশ্বর্য উপভোগ করতে চান; ঐশ্বর্য ও ক্ষমতাজনিত পাপ সম্পর্কে তিনি উদ্বিগ্ন নন। কারণ তখনও "প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই" এই প্রকার উপলব্ধি জন্মাবার মত অবস্থার উদ্ভব ঘটে নি। মেঘনাদবধ কাব্য উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সুরুতে বিরচিত হয়; আর রক্তকরবী বিংশ শতাব্দীর প্রায় তৃতীয় পাদের সূচনায় রচিত। ঐশ্বর্য আর ক্ষমতা-সম্ভোগ তখন আর আকাঙ্ক্ষার স্তরে নেই; তখন অভিজ্ঞতার, মর্মান্তিক

অভিজ্ঞতার বিষয়ীভূত ; আর সে যুগে ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার দেহে মারীগুটিকার মত পাপ আত্মপ্রকাশ করেছে।

"যক্ষপুরে অঙ্কের পর অঙ্ক সার বেঁধে চলেছে, কোনো অর্থে পৌছায় না।"

* * *

বাঘকে খেয়ে বাঘ বড়ো হয় না, কেবল মানুষই মানুষকে খেয়ে ফুলে ওঠে।"

ঐশ্বর্যের এই পরিণতির সঙ্গে মধুসূদনের রাবণের পরিচয় ছিল না। তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "কবিকেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্র-তীরের শ্মশানে বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন।" আর রক্তকরবীতে "রাজা নিজের পরে নিজে বিরক্ত হয়ে উঠেছেন।"

—আজ আমাকে তোমার সাথি করো নন্দিন!

—কোথায় যাব।

—আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমারই হাতে হাত রেখে।

—আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক, সম্পূর্ণ মারুক, তাতেই আমার মুক্তি।"

দুই যুগের ঐশ্বর্য-অনুরাগ ও বৈভব-লালসাকে দুই কবি দুই পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তবু রাবণ-চরিত্রর এই আধুনিক ভাষ্য-রচনার আদি গৌরব মেঘনাদবধ কাব্যকারেরই প্রাপ্য।

মধুসূদনের রাবণ রক্তকরবীর রাজার মত বলতে পারেন নি—"আমারই শক্তি দিয়ে আমাকে বেঁধেছে"। মধুসূদনের রাবণের দুর্গতির কারণ—

বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে। (১।৩)

হায়, বিধি বাম মম প্রতি। (১।১২)

প্রাক্তনের গতি, হায়, কার সাধ্য রোধে। (৫।৫৫)

নিজবলে দুর্বল সতত
মানব ; সুফল ফলে দেবের প্রসাদে। (৬।৬৩)

রাবণ নিয়তির দুর্নিরীক্ষ্য কারাগারে বন্দী। নিয়তি বা প্রাক্তনের এই পরিকল্পনায় ভারতীয় কর্মফল বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে নি। স্বপক্ষীয়দের

মধ্যে পত্নী চিত্রাঙ্গদা রাবণের দুর্গতির জন্য তাঁর কর্মফলকে দায়ী করেছিল, কিন্তু এ উদাহরণ একবারই মাত্র পাওয়া গেল।

হায়, নাথ, নিজ কর্মফলে
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি। (১।৭)

কিন্তু রাবণ এ যুক্তি মানেন নি। কারণ সীতাহরণ তাঁর পাপ নয়। এ শুধু তাঁর কূটনীতির অঙ্গ। তিনি ভগ্নী-অপমানের প্রতিশোধমাত্র নিয়েছেন। তাই রাবণ বলেছেন,

গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরী? (১।৬)

রাবণের বিরুদ্ধপক্ষীয়রা রাবণের কূটনীতির চাল স্বীকার করেনি। তারা একের পর এক আঙ্গুল উঁচিয়ে রাবণকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছে।

পাতালে রমা বলছেন:

নিজ কর্মদোষে
মজিয়ে স্ববংশে পাপী। (১।১৫)

বিভীষণ:

যথা ধর্ম জয় তথা।
নিজ পাপে, হায়, মজে রক্ষঃকুলপতি। (৩।৯৯)

লক্ষ্মণ:

অধর্ম আচারী এই রক্ষঃকুলপতি;
তার পাপে হতবল হবে রণভূমে
মেঘনাদ; মরে পুত্র জনকের পাপে। (৩।৯৯)

বিভীষণ:

নিজ কর্মদোষে, হায়, মজাইলা
কনক লঙ্কা, রাজা, মজিলা আপনি। (৬।৬১)

ইন্দ্র:

নিজ কর্মদোষে
মজে রক্ষঃকুলনিধি; কে রক্ষিবে তারে। (৭।২০১)

সরমা :

নিজ কর্মদোষে মজে লঙ্কা-অধিপতি। (৯।৯২)

কর্মদোষ বলতে অন্যত্র (মূল রামায়ণে) যাই থাক, এখানে কেবল সীতাহরণজনিত দোষ আছে। কিন্তু সীতাহরণকে কবি অন্যায় আচরণ বলতে রাজী নন। রাবণের মুখ দিয়ে কবি বারবার এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক ক'রে দিয়েছেন—সীতাহরণ তাঁর রাজনীতির সামান্য প্রকাশ মাত্র।

॥ ৩ ॥

রাবণ-ভাবিত নিয়তি তত্ত্বের সঙ্গে কর্মফলের কোন সম্পর্ক নেই। কর্মফল কর্তার কৃতকর্মজনিত। কিন্তু নিয়তি এ সবার উর্ধ্বে। রাবণের ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য তাই রাবণ অপেক্ষা বৃহত্তর শক্তির খেয়াল খুসী দায়ী।

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে কেন মধুসূদন এইপ্রকার কার্যকারণ-সম্পর্ক-শূন্য ও মানবশক্তির উর্ধ্বচারী এই নিয়তি-তত্ত্বকে স্বীকার করলেন? সম্ভবতঃ সমসাময়িক যুগে এই প্রকার নিয়তি-তত্ত্বের অপরিহার্যতা ছিল।

যে শক্তি আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে, অথচ আমার সর্ববিধ দুর্গতির হেতু, তা আমার মন্দভাগ্য ব্যতীত আর কি? এই সহজ সত্যের উপর দুর্জ্ঞেয়তার রাঙতা মুড়ালেই তা ব্যাখ্যা-অতীত নিয়তি হয়ে দাঁড়ায়।

"মধুসূদনের কাব্যে যে অদৃষ্টবাদের একটি প্রবল ভাবধারা প্রায় আদ্যোপান্ত রহিয়াছে দেখা যায়, তাহার নজীর সম্ভবত গ্রীক কাব্য হইতেই কবি লইয়াছিলেন; এবং ট্রাজেডি কল্পনায় ইহার উপযোগিতা বিষয়ে তিনি পাশ্চাত্য কবিদিগের নিকটেই ঋণী। কিন্তু ইহাও দেখা যায় যে, তাঁহার অদৃষ্টবাদ প্রাচ্য সংস্কার ও বিশেষ করিয়া হিন্দু মনোভাবের ফল; এই অদৃষ্টবাদে খ্রীষ্টিয়ান পাপ-তত্ত্ব অথবা আদি গ্রীক চিন্তার অহেতুক দৈব স্বেচ্ছাচার—এ'দুইয়ের কোনটিই-নাই।[৪৯]

খৃষ্টীয়ান পাপ-তত্ত্ব নাই, বুঝলাম; কিন্তু গ্রীক অদৃষ্টবাদ? মোহিতলাল দু'টিকে এক করেই বিপথগামী হয়েছেন। শশাঙ্কমোহন সেনও একই প্রকার ভ্রমে পড়েছেন। (শশাঙ্কমোহন সেন—মধুসূদন, পৃঃ ১১৯)

রক্তকরবীর রাজা আপন মৃত্যুবাণের সন্ধান নিয়তির মধ্যে করেনি; কারণ তখন দুর্গতির কারণ যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে পড়েছে। সমাজে যা ছিল সুপ্ত, তা আজ

প্রকট। সমাজবিজ্ঞানীয় ভাষায় "The monopoly of capital becomes a fetter upon the mode of production, which has sprung up and flourished along with, and under it. Centralisation of the means of production and socialisation of labour at last reach a point where they become incompatible with their capitalist integument. This integument is burst asunder. The knell of capitalist private property sounds. The expropriators are expropriated."[৫০]

মেঘনাদবধ কাব্যে কার্যকারণ-সম্পর্কশূন্য এক শক্তিকে কবি কল্পনা করেছেন। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে তার বীজ নিহিত ছিল। কিন্তু তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে সুন্দ-উপসুন্দের পরিণতি অপেক্ষা তিলোত্তমার অভিসার বর্ণনা কবির মুখ্য উদ্দেশ্য; সেই কারণে নিয়তিতত্ত্বকে কবি তত প্রস্ফুটিত করেন নি।

নিদারুণ বিধি
আমা সবা প্রতি বাম অকারণে সদা। (২।৩৭)

বিধির নির্বন্ধ কে পারে খণ্ডাতে। (২।৩৮)

—এ সমস্ত উক্তিই দেবরাজ ইন্দ্রের। ইন্দ্রই এখানে মানবিক গুণসম্পন্ন। মৃত্যু-পথযাত্রী সুন্দ আক্ষেপ ক'রে বলেছিল,

কামমদে রত সে দুর্মতি
সতত এ গতি তার বিদিত জগতে। (৪।৮৪)

সুন্দ এখানে তার পতনের কারণ অনুমান করতে পেরেছে। নিয়তি-কল্পনার প্রধান ডানা এখানে ছিন্ন। এবং এই খণ্ডিত ধারণার কারণে কবি সুন্দ-উপসুন্দের পতনের মধ্যে কাহিনীর সার্থকতা খোঁজেন নি। কবি যে এই কাব্যে "human element"-এর অভাবের কথা কবুল করেছিলেন, তারও হেতু এইখানে। মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণের ভাগ্য-বিড়ম্বনার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। এবং এই সূত্রেই ঐ কাব্য বেদনা-রসে আপ্লুত এবং মানবিক

বোধে উদ্বেলিত হয়েছে। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য থেকে বেদনার হেতু এখানে অধিকতর মহাকাব্যিক। কবি-মানসের অন্যান্য সৃষ্টির মত এ খবরটিও উল্লেখযোগ্য।

মেঘনাদবধ-কাব্য-পরিকল্পনায় এই দুর্জ্ঞেয় নিয়তিতত্ত্বের অশেষ মূল্য আছে; এই যুক্তি-অতীত নিয়তিতত্ত্ব ব্যতীত এই কাব্য মহাকাব্য হ'ত না—একখানি একটানা সাধারণ বীর-রসাশ্রিত বিষাদান্ত কাব্য মাত্র হ'ত; দ্বিতীয় বা কুশলতর পদ্মিনী উপাখ্যান হ'ত। দুর্নিরীক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে, দুর্ভাগ্যকে বরণ ক'রে রাবণ বাঙ্গালী মানসের ভৌগোলিক সীমানা সম্প্রসারিত করলেন, বাঙ্গালী মানসের এক নবীন মানচিত্র তিনি অঙ্কন করলেন। বাংলা কাব্যে তাঁকে দেখেই প্রথম বলা গেল, "That life had naver been lived so intensely before."

॥ ৩ ॥

আর নিরাপদ নিশ্চিন্ত জীবন কামনা করেছিল বিভীষণ। তার জাতি-দ্রোহিতার ও রাজদ্রোহিতার কারণ তাই। মাইকেলের বিভীষণ এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি—বাল্মীকির আলোকে তার বিশিষ্টতা ধরা যাবে না। সে যে "ধর্মনিষ্ঠ" একথা কবি ইন্দ্রজিতের মুখ দিয়েও বলেছেন। ধর্মনিষ্ঠার সঙ্গে দেশদ্রোহিতার কোন বিরোধ ঘটেনি, এমনই এক বিচিত্র ধর্ম সে পালন করত। রাজা নবকৃষ্ণ, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ প্রভৃতির কলঙ্কিত বৈষয়িক জীবন ও প্রশংসিত (কারও কারও দ্বারা) অধ্যাত্ম জীবনের গাঁটছড়া বাঁধার দিব্য কাহিনী মধুসূদনের কাব্যে কি রূঢ় ভাষণেই না কথিত হোল! গরমিল আছে যেটুকু, সেটুকু সাহিত্য আর ইতিহাসের চিরন্তন গরমিল। রাবণ যদি হন উনবিংশ শতাব্দীর নব্য নীতির প্রবক্তা, তবে বিভীষণ অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষ্ণচন্দ্রীয় নবকৃষ্ণীয় পচনশীল নীতির ধিকৃত ধারাবাহী। ধিকৃত করেছেন কবি সর্বদা, যখনই বিভীষণ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। লঙ্কার বন্দনাগীত গাইছে বন্দীরা, তারাও বিভীষণকে দিচ্ছে ধিক্কার—

ধন্য লঙ্কা, বীর ধাত্রী তুমি!
আকাশ-দুহিতা ওগো শুন প্রতিধ্বনি;

কহ সবে মুক্তকণ্ঠে, সাজে অরিন্দম
ইন্দ্রজিৎ। ভয়াকুল কাঁপুক শিবিরে
রঘুপতি, বিভীষণ রক্ষঃকুল কালি,
দণ্ডক-অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত। (১।৭৭৮-৮৩)

প্রমীলার সহচরীরা বলছে,

নাগপাশ দিয়া
বাঁধি লব বিভীষণে রক্ষঃকুলাঙ্গারে। (৩।৮৭)
রাক্ষস-কুল-কলঙ্ক ডাক বিভীষণে! (৩।৮৯)

ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে যাবে, এই আনন্দে গায়কেরা গাইছে; তাদের সঙ্গীতেও বলা হয়েছে—

আনিবে বাঁধিয়া
বিভীষণে। (৪।১০৭)

ইন্দ্রজিৎ জননী মন্দোদরীর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় শপথ নিচ্ছেন—

বাঁধি দিব আনি তাত বিভীষণে,
রাজদ্রোহী। (৫।৬৩৭)

মন্দোদরী তাঁর মাতৃহৃদয় ও পত্নীহৃদয়ের সহজ অনুভবে বিভীষণকে স্পষ্টভাবে চিনেছেন,

কাল-সর্প-সম
দয়া-শূন্য বিভীষণ! মত্ত লোভ-মদে,
স্ববন্ধু-বান্ধবে মূঢ় নাশে অনায়াসে,
ক্ষুধায় কাতর ব্যাঘ্র গ্রাসয়ে যেমতি
স্বশিশু! কুক্ষণে, বাছা, নিকষা শাশুড়ী
ধরেছিলা গর্ভে দুষ্টে, কহিনু রে তোরে,
এ কনক-লঙ্কা মোর মজালে দুর্মতি। (৫।১৪৭)

আর যে মুহূর্তে বিভীষণ ও ইন্দ্রজিতের মুখোমুখি দেখা হোল, তখন ইন্দ্রজিৎ একটির পর একটি যুক্তি অবতারণা ক'রে তার রামপক্ষ অবলম্বনের অসারতা প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন। রাজদ্রোহ, ভ্রাতৃদ্রোহ, স্বজাতিবিদ্বেষ,

প্রভৃতির বিরুদ্ধে লৌকিক ধর্মের সারবত্তা প্রমাণিত করার চেষ্টা ইন্দ্রজিৎ করলেন। বিভীষণ কিন্তু এত যুক্তির আঘাতেও বিচলিত হ'ল না। সে চায় নিশ্চিত সৌভাগ্য, নিরুপদ্রব জীবন।

এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী ; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে।
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি। পরদোষে কে চাহে মজিতে ?

সত্যই তো, সমাজ বা দেশের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে, এই নীতি তো তার নীতি নয়, তার আদর্শ নয় !

ইন্দ্রজিৎ সরোষে বললেন,

ধর্মপথগামী
হে রাক্ষস রাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি ; কোন ধর্মমতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি, এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা। (৬।১৭৬)

ইন্দ্রজিতের এই নীতি নবীন সামাজের নীতি ; বিভীষণ তার শরিক নয়। বিভীষণ সিংহাসন-লোভী ; রক্ষঃকুল রাজলক্ষ্মী স্বপ্নে তাকে আশীর্বাদ জানিয়েছেন :

তোর পূর্ব কর্মফলে
সুপ্রসন্ন তোর প্রতি অমর, পাইবি
শূন্য রাজসিংহাসন, ছত্রদণ্ড সহ,
তুই।— (৬।১৫৬)

রাবণ ইচ্ছা করলেই নিশ্চিত আরাম ও বিলাসের জীবন যাপন করতে পারতেন—রামের সঙ্গে সন্ধি ক'রে। কিন্তু তিনি সে পথ পরিত্যাগ ক'রে

বিপদকে বরণ করেছেন। "I despise Ram and his rabble"—এ কি শুধু মেঘনাদবধ কাব্যকারের উক্তি? রাবণেরও উক্তি! আর বিভীষণ এই 'র‍্যাব্‌ল'দের শীর্ষদেশে। "He (Ravan) was a noble fellow, but for that scoundrel Bibhishan, would have kicked the monkey-army into the sea." (জীবন চরিত, পৃ-৩২৫)

* * *

রাম দৈবশক্তিতে বিশ্বাসী; দেববলে বলী। 'দেবকুলপ্রিয়' এই বিশেষণটি কবি প্রায়ই ব্যবহার করেছেন।

সুরনাথ সহায় যাহার
কি ভয় তাহার, প্রভু, এ ভবমণ্ডলে। (৩।৯৮)

দেবকুলদাস দাস, দেবকুলপতি।
কত যে করিনু পুণ্য পূর্ব জন্মে আমি
কি আর কহিব তার! (৭।২০০)

অনুকূল তব প্রতি শুভধাতা বিধি। (৯।২৪৫)

রাম দেব-নির্ভর, তাঁর মধ্যে মানবিক ব্যথার চরম স্ফূর্তি ঘটান অসম্ভব। যে মানুষ আপন পৌরুষকে নির্ভর ক'রে জীবন যুদ্ধে আগুয়ান, অথচ বারংবার পরাজিত, সেই—সেই ত মানবিক বোধের কেন্দ্র। তা ছাড়া স্বদেশ রক্ষা ও পর-রাজ্য আক্রমণ—এই দুই ঘটনা দুই মূল্যবোধের উৎস। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বিভীষণ। বিভীষণ রাবণ-বক্তব্যকে স্পষ্টতর করেছে, রাবণ চরিত্রকে দীপ্ততর করেছে, বিভীষণ ব্যতীত মেঘনাদবধ কাব্য অসম্পূর্ণ, রাবণ-চরিত্র নিষ্ফল।

ইন্দ্রজিৎ কাব্যের নায়ক; শাস্ত্র মিলিয়ে তাকে মহাকাব্যের নায়ক বলতে কোন বাধা নেই। বীরবাহুর মৃত্যু ও ইন্দ্রজিতের সৈনাপত্য বরণে কাব্যের শুরু, আর কাব্যের উপসংহার ইন্দ্রজিতের মরদেহের সংকারে। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, এ কাব্যে ইলিয়াদের কাহিনীর মত বিস্তৃতি নেই। এ কাব্যে বিস্তৃতি না থাকলেও গভীরত্ব আছে। অর্বাচীন মহাকাব্য কোনকালেই ইলিয়াদের অনুরূপ বিস্তৃতির অধিকারী হয় না। তাই বলে গভীরত্ব অর্জনে বাধা কোথায়? এই গভীরতাই কাব্যকে শেষ পর্যন্ত একটা বিশালতা দান করেছে।

ইন্দ্রজিৎ পিতৃভক্ত, পত্নীপ্রেমিক, মাতৃভক্ত, স্বজনবৎসল, স্বদেশপ্রেমিক ও ঈশ্বর-অনুরাগী। স্বজনবৎসল ও স্বদেশপ্রেমিক এই দুই পরিচয়ই বড় পরিচয় শুধু নয়। রামায়ণ বা অন্য পুরাণের বীর পুরুষের গুণাবলী নিয়ে কেবল তিনি আত্মপ্রকাশ করেন নি। তাঁর স্বাদেশিকতা ও একপত্নীপ্রেম তাঁকে নবযুগের একটিমাত্র মহাকাব্যের নায়ক হবার অধিকার দিয়েছে। তাঁর গর্ব, তাঁর অহংকার ও তেজের উৎস এইখানে।

বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামাদল মাঝে। (১/১৪)

নগর-তোরণে অরি ; কি সুখে ভুঞ্জিব,
যতদিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে। (৫/১৫)

বিরত কি কভু
রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ ! অতিথির সেবা,
তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে—
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে। (৬/৬০)

ক্ষুদ্রমতি নর, শূর লক্ষ্মণ, নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে। (৬/৬১)

কোন ধর্ম-মতে, কহ দাসে, শুনি
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি ?

ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
বেঁধেছ যে দৃঢ়বাঁধে, কে পারে খুলিতে
সে বাঁধে ? (১/৯১

কবির হাতে যে তুলি, তা বড় ক্ষিপ্রচালিত, কিন্তু তাতে বড়ই স্পষ্ট মূর্তি ধরা পড়ে। এই স্পষ্টতাই বড় কথা ; ইন্দ্রজিৎ রাবণের ছায়া নয়। ইন্দ্রজিৎ আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল ; অথচ রাবণ যে-জগৎ সৃষ্টি করেছেন, ইন্দ্রজিৎ তারই সম্পূর্ণতা দান করেছেন। রাবণের রাজপুরী ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের আকর ; কিন্তু ইন্দ্রজিৎ এই খনির মণিশ্রেষ্ঠ। সুন্দ-উপসুন্দের সঙ্গেও উপমিত

তিনি হতে পারেন না; মঙ্গলকাব্য-জগতের কালকেতু বা লাউসেন, বৃত্র-সংহারের বৃত্র বা জয়ন্ত তাঁর তুলনায় অপরিণত ও খর্ব। কালকেতু ও লাউসেন মধ্যযুগীয় কাব্যের বীরত্বের বিরল নিদর্শন; কিন্তু স্ববিরোধিতার ফলে তাদের ব্যক্তিত্ব অস্ফুট। মধ্যযুগে ব্যক্তিত্বের বিকাশ দ্বিধাগ্রস্ত। তারা পরিপূর্ণ বীর হয়েছে কিনা জানি না, কিন্তু পরিপূর্ণ মানুষ হয় নি, তা বিনা দ্বিধায় বলা যায়। বৃত্র ও জয়ন্ত নিতান্তই ঘটনার বাহক, ঘটনার নিয়ন্ত্রণকারী নয়। এরা মানুষ হ'তে গিয়ে খর্ব হ'য়ে গিয়েছে আদর্শের চাপে। খর্ব মানুষ মানুষ নয়, বামন। অনুকম্পার পাত্র।

ইন্দ্রজিতের কাহিনী শুধু বীররসের প্রস্রবন নয়; মহাকাব্যে বীররস-সমৃদ্ধ কাহিনী থাকবে, কিন্তু বীররসই মহাকাব্যের একমাত্র রস নয়। ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের ভাষায় মহাকাব্য 'বিশাল রস'-ভিত্তিক। ইন্দ্রজিৎকে কবি শুধু বীর ক'রে যে আঁকেন নি, তাতে ক্ষোভ করার কিছু নেই। এতে চরিত্রের অঙ্গে এক বিশালত্বের ও ব্যাপ্তির ছোঁয়া লেগেছে। মাঝে মাঝে ইন্দ্রজিৎকে মহাভারতের এক অনন্যবীরের নিকট আত্মীয় বলে মনে হয়। সে বীর অর্জুন!

* * *

প্রমীলা, নৃমুণ্ডমালিনী আর সীতা—এই তিনটিই এই কাব্যের বিশিষ্ট নারীচরিত্র। প্রমীলা, নৃমুণ্ডমালিনী রাক্ষসকুলনারী; সীতা অন্য জগতের। এ কাব্যে সীতার কোন সক্রিয় ভূমিকা নেই; অথচ এ কাব্যের যাবতীয় ঘটনার পিছনে সর্বদাই তিনি বিরাজ করছেন। সীতাহরণই রাম-রাবণ সংঘর্ষের হেতু। রামায়ণ-পাঠকের কাছে সীতার যে চিত্রখানি চিরকালের মত মনোগ্রাহী, কবি তারই উপর লিরিকের রঙ লাগিয়েছেন। সীতা ও সরমার আলাপন কাব্যের পক্ষে অপরিহার্য ছিল না, কিন্তু কবির পক্ষে অপরিহার্য ছিল। এই অবকাশে ব্যথাহত নারীত্বের প্রতি কবি তাঁর নিরুদ্ধ আবেগ ব্যক্ত করতে পেরেছেন। যৌবনে এঁরই তো কাব্য "Captive-Ladie"। আজ মধ্যবয়সে মহাকাব্য রচনার ফাঁকে যৌবনের সেই হৃদয়কে কবি যাচাই করে নিলেন। পরবর্তীকালে নানাভাবে এই বেদনাহত নারীমূর্তি কবির সঙ্গীতের আকর্ষণী-শক্তিরূপে কাজ করবে—ব্রজাঙ্গনায়, বীরাঙ্গনায়, বা চতুর্দশ পদাবলীতে। ব্যক্তি মধুসূদনকে বুঝবার পক্ষে সীতা চরিত্র চাবিকাঠি।

প্রমীলা প্রথম আত্মসচেতন নারী বাংলাকাব্যে। ইতঃপূর্বে 'পুণ্যবতী' বা অসামাজিক মহিলারা কাব্যের নায়িকা হয়েছেন। উভয় জাতীয় চরিত্রে 'আতিশয্য' শব্দটি বেমানান নয়। বেহুলা, খুল্লনা, ফুল্লরা ও রঞ্জাবতী পুণ্যবতী মহিলা; এঁরা দেবী ও সতী বলেই পূজিতা, নারী রূপে আদৃতা নন। বর্তমান যুগের মূল্যবোধে দেবীত্ব অপেক্ষা নারীত্ব অধিকতর সমাদৃত। প্রমীলা সেই নারীত্বের প্রতীক, অথচ প্রমীলা সতীকুলচূড়ামণিও বটে। প্রমীলার মধ্যে এই নারীত্বের জয়ধ্বনি তখনকার জাগ্রত তরুণ-চিত্তের অভিনন্দন লাভ করেছিল।

"মেঘনাদবধ কাব্য যখন লিখিত হয়, তখন বঙ্গসমাজে সবেমাত্র পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চায় উন্নতি আরম্ভ হইতেছিল। সুশিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক, হৃদয়ে যে সাম্যভাব ধারণ করিলেন, গৃহে তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই অবগুণ্ঠনবতী ব্রীড়াসঙ্কুচিত বঙ্গ নারীকে প্রমীলার বেশে দেখিয়া কৃতবিদ্য যুবক তখন মোহিত হইয়াছিলেন।

অধরে ধরিলা মধু, গরল লোচনে
আমরা, নাহি কি বল হে ভুজ মৃণালে?

বড় মধুর, বড় ভাবব্যঞ্জক আর বড় সাম্যসংস্থাপক! যখন পড়ি, যতবার পড়ি, মিষ্ট লাগে! প্রথমে বুঝি আরও মিষ্ট লাগিয়াছিল। দার্শনিকপ্রবর জন ষ্টুয়ার্ট মিল স্ত্রীজাতির সাম্য প্রতিপাদন করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; আর আমাদের মধুসূদন "প্রমীলা"-চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, উদ্দেশ্য উভয়েরই এক। প্রমীলা-চরিত্রের আর একটি ভঙ্গী দেখ। ইহা ইন্দ্রজিতের মত বীরত্বময়। ......প্রমীলা-চরিত্র সন্ধান করিয়া প্রবন্ধ বিস্তৃত করিতে চাহি না। তবে সে চরিত্র ইন্দ্রজিতের মত বীরত্বময় তাহা কেহ বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না। এই চরিত্রসাম্য, এই রাক্ষস দম্পতির অতুল মোহময় প্রেমের কারণ। যাঁহারা সাম্যকে প্রেমের কারণ বলিতে প্রস্তুত নহেন, এ কথাটি তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিবেন।"[৫০ক]

প্রমীলা বাংলা সাহিত্যের আধুনিক নায়িকাকুলের অগ্রজা। প্রমীলার মধ্যে বেহুলার সতীত্বনিষ্ঠার সঙ্গে তিলোত্তমার নারী-মাধুর্যটুকু সম্মিলিত হয়েছে।

নৃমুণ্ডমালিনী তিলোত্তমার শুধু চাঞ্চল্যটুকুই গ্রহণ করেছে; চরিত্র-মর্যাদার সঙ্গে বিন্দুমাত্র সঙ্গতি নেই। তার চলনে-বলনে অতি রস-চটুলতা।

যুদ্ধক্ষেত্রের শ্বাস-রোধকারী পরিবেশে একটু ভিন্ন দ্বীপের হাওয়া ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত কবির উদ্দেশ্য ছিল একটু 'রিলিফ' সৃষ্টি করা। নৃমুণ্ডমালিনীর উপস্থিতি নিতান্তই ক্ষণকালিক।

মধুসূদনের কাব্য-পরিকল্পনার গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ-অধিকার না পেলেও উপরের জগতে এ্যারিওষ্টো (Ariosto) ও ট্যাসোর হস্তাবলেপ খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়, তার প্রমাণ নৃমুণ্ডমালিনী। হোমার-ভার্জিল-দান্তে-মিলটনের কাব্য-কানন থেকে নৃমুণ্ডমালিনীর তরল বিলাস-বিভ্রম বহির্গত হয়নি।

* * * *

সীতা ও সুভদ্রা—উভয়েই মাইকেলের প্রিয় নারী-চরিত্র। সীতা ও সরমা যেন ভিন্ন যুগের দ্বিবিধ নারী-ব্যক্তিত্বের প্রতিনিধি। সীতা অতীত নারী সমাজের প্রতিনিধি, তাই চিরনিগৃহীতা; ভারতীয় নারীর নিরুদ্ধ পুঞ্জীভূত বেদনার গাঢ়তম ভাষা। সুভদ্রা ভাবী সমাজের নারী-চরিত্র। রথের রজ্জু তাই তার আপন করে। সীতা বিনম্রা; আর সুভদ্রা দীপ্তিময়ী। কবি 'সুভদ্রাহরণ' নামে পৃথক কাব্য লিখে এই পৌরাণিক-আধুনিকাকে চিরস্মরণীয় এবং কাব্যের অঙ্গনে এক স্বতন্ত্র ভূখণ্ডের অধীশ্বরী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার আর সময় পান নি। কবি-মানসের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে সেই অপারগতাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। কারণ সুভদ্রা কবির আয়ত্তীভূত কাব্য-ভাবনা নয়, উদ্ভিন্নমান কাব্য-ভাবনা।

সীতার প্রতি কবির মমত্ব অসামান্য; এমন কি সীতাপ্রসঙ্গের খাতিরে তিনি তাঁর সৃষ্টির দেহকে স্থূলতর করতেও ইতস্তত করেন নি।

সীতা চিরকালের বন্দিনী নারী; Captive Ladie কাব্যে সেই মুখের আদল ধরারই প্রথম প্রচেষ্টা। পরে Queen Sita নাম দিয়ে তিনি এক পূর্ণাঙ্গ কাব্য রচনা করতে চেয়েছিলেন। সঙ্কল্প অপূর্ণ, কিন্তু কবির মানসিক প্রবণতা পূর্ণ প্রস্ফুটিত। অধিকন্তু সীতা তাঁর পৌরাণিক ভারত-প্রীতির পরিচয়-পত্রিকা। সুভদ্রাও পৌরাণিক; কিন্তু সেই মহাভারতীয় ভদ্র-মহিলার সঙ্গে কবির প্রণয় ভিন্ন কারণে, ভারত-প্রীতি হেতু নয়। কিশোর বয়সে নাবালিকা বিবাহে আপত্তি জানাতে গিয়ে মধুসূদন খৃষ্টান হয়েছিলেন ব'লে প্রবাদ আছে। প্রবাদটি সত্য কি মিথ্যা আপাতত তা আমরা যাচাই

করতে উদ্‌গ্রীব নই। কিন্তু প্রবাদটি সুভদ্রা-পক্ষপাতী কবির মনোজগতের একটি রুদ্ধ বাতায়ন খুলে দেয়। একটি প্রবন্ধে জীবন-সঙ্গিনীর যে ভাষ্য তিনি দিয়েছেন, সুভদ্রা তারই যেন কাব্য-সংস্করণ।

"The happiness of a man who has an enlightened partner is quite complete···In India, I may say in all the Oriental countries, women are looked upon as created merely to continue to the gratifiacation of the animal appetites of men. This brutal misconception of the design of the Almighty is the source of much misery to the fair sex, because it not only makes them appear as of inferior mental endowments, but no better than a sort of speaking brutes. The people of this country do not know the pleasure of domestic life, and indeed they cannot know until civilisation shows them the way to attain it"[৫১]

প্রমীলা সুভদ্রার সহোদরা। সম্পদে-বিপদে, মিলনে-বিরহে, জীবনে-মরণে তার তেজ ও মহিমা কণামাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা বলেছিল :

> দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
> পূজা করি রাখিবে মাথায়, সে-ও আমি
> নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
> পিছে সে-ও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখো
> মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
> যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি করো
> কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
> যদি সুখে দুঃখে মোরে করো সহচরী,
> আমার পাইবে তবে পরিচয়।

ভাষান্তরিত করলে কথাটি তো প্রমীলারও; শুধু যদি এই কাব্যভাষা তখন তৈরি হোত! শব্দ-গত ও বাক্য-রচনাগত বৈশিষ্ট্য বাদ দিলে প্রমীলা মোটামুটি চিত্রাঙ্গদার ভাষাতেই কথা বলেছে!

দানব-কুল-সম্ভবা আমরা দানবি ;
দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষৎ শোণিত-নদে নতুবা ডুবিতে।
অধরে ধরিলো মধু, গরল লোচনে
আমরা ; নাহি কি বল এ ভুজ মৃণালে ?

*　　　*　　　*

ভেবেছিনু যজ্ঞ গৃহে যাব তব সাথে ;
সাজাইব বীর-সাজে তোমায় ! কি করি ?
বন্দী করি স্ব মন্দিরে রাখিলা শাশুড়ি।

তিলোত্তমা মাইকেলের নায়িকা-কল্পনার বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র ; ব্রজাঙ্গনার শ্রীরাধাও তাই। তাঁর নায়িকা-ভাবনার প্রদেশবিশেষকে ওরা প্রতিনিধিত্ব বা আলোকিত করেছে মাত্র। সীতা ও সুভদ্রা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবনা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুভদ্রাই জয়ী, সুভদ্রাই প্রধান।

মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশ পদাবলীতে সুভদ্রার আত্মীয়ারাই প্রধান হয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন, আধিপত্য অর্জনের প্রয়াসী হচ্ছেন। মাইকেল-কাব্যের ক্লাসিক কাঠামোতে সুভদ্রার সমুন্নত মূর্তিই অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। ব্যক্তিত্বময়ী প্রমীলা মহাভারতীয় সুভদ্রার সহোদরা, বা একই জগতে ভূমিষ্ঠা।

*　　　*　　　*

রাবণের ঐশ্বর্য-সম্ভোগ-ইচ্ছা নবীন যুগের অনিবার্য আকাঙ্ক্ষা। "এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য, ইহার হর্ম্যচূড়া মেঘের পথরোধ করিয়াছে ; ইহার রথ-রথী অশ্ব-গজে পৃথিবী কম্পমান ! ইহা স্পর্ধা দ্বারা দেবতাদিগকে অভিভূত করিয়া বায়ু-অগ্নি-ইন্দ্রকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে ; যাহা চায় তাহার জন্য এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের বা কোন কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে।" ঐশ্বর্যের প্রতি কবির উদগ্র আসক্তি প্রকাশিত হয়েছে লঙ্কাপুরী, রাজসভা, শোভাযাত্রা ও যুদ্ধ-বর্ণনার মধ্যে। কবি লঙ্কাকে সমুদ্র-মেখলা বলেছেন, কিন্তু সমুদ্র, পর্বত বা অরণ্য তাঁর বর্ণনায় আধিপত্য করেনি ; আধিপত্য করেছে হর্ম্য, রাজপথ, দেবালয়, রথ ও অস্ত্রশস্ত্র। অর্থাৎ যা কিছু মনুষ্য-সৃষ্ট তাই কবির বন্দনা-স্থল। লঙ্কা রাবণের সৃষ্টি ;

মেঘনাদবধ কাব্যের সেই হ'ল দ্বিতীয় তিলোত্তমা। নানা ভাষায় লঙ্কার বন্দনা-লেখা হয়েছে :

জগত-বাসনা তুই সুখের সদন। (১।৩৬)

কৌস্তুভ রতন যথা মাধবের বুকে। (১।৩৯)

সাগরের ভালে, সখি, এ কনক-পুরী
রঞ্জনের রেখা। (৪।১২৮)

জগতের অলঙ্কার তুই স্বর্ণময়ী! (৬।১৬৪)

এ হেন বিভব, আহা, কার ভবতলে। (৬।১৬৭)

আর কবি বন্দীদের মুখ দিয়ে যখন লঙ্কা-বন্দনা গেয়েছেন, তখন সে আর ইঁট-পাথরের নগরী মাত্র থাকে নি।

নয়নে তব হে রাক্ষস-পুরি,
অশ্রুবিন্দু, মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি ;
ভূতলে পড়িয়া হায়, রতন মুকুট,
আর রাজ আভরণ, হে রাজসুন্দরি,
তোমার। উঠগো শোক পরিহরি, সতি!
রক্ষঃ-কুল-রবি ওই উদয়-অচলে!
প্রভাত হইল তব দুঃখ-বিভাবরী! (১।৫৭)

রাবণ লঙ্কার স্মৃতি-মন্থন করেছেন :—

কুসুম-দাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে নিবিছে দেউটি ;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী! (১।৩১)

লঙ্কা শুধু নগরী মাত্র নয়, লঙ্কা নাগরী! লঙ্কা এই কাব্যের অন্যতম চরিত্র, অন্যতম নায়িকা। বাংলা কাব্যে নগর-প্রসঙ্গের অভাব নেই। প্রতি মঙ্গলকাব্যেই নতুন রাজবংশের মহিমা-স্তুতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নগর

পরিকল্পনা আছে। কিন্তু সে-নগর পরিকল্পনা ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক তথ্যের পাষাণ-ফলকে মুখ থুবড়ে প'ড়ে থাকে। সমগ্র কাব্যের ঘটনা-প্রবাহে তাদের কোন ভূমিকা নেই। ঘটনা অন্যত্র ঘটলেও সেই নগরের নির্বিকারত্ব বিন্দুমাত্র টুটত না। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যের ঘটনা লঙ্কা ব্যতীত অন্যত্র অভিনীত হতে পারত না। লঙ্কা আর মেঘনাদবধ কাব্য এমনই ওতপ্রোতভাবে জড়িত, পরস্পরের কণ্ঠলগ্ন। লঙ্কা ব্যতীত রাবণের দম্ভ শুধু স্পর্ধিত বাক্য-বিন্যাসে পর্যবসিত হ'ত। আবার লঙ্কার ঐশ্বর্য-মুখরিত পটভূমিকাতেই রাবণের দুর্ভাগ্যের ডঙ্কা এত মর্মান্তিক বিষন্ন সুরে নিনাদিত হয়েছে। পরিপূর্ণ সৌভাগ্যের মুহূর্তেই রাবণের দুর্ভাগ্যের কৃষ্ণমেঘ পক্ষ বিস্তার করেছে; লঙ্কা রাবণেরই ভাগ্যের প্রতীক। রাবণ পট্টমহিষী মন্দোদরী অপেক্ষাও সে জীবন্তা, বা সে-ই স্ফুটতর মন্দোদরী।

লঙ্কার এই অনন্যামূর্তি বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। মহাকাব্য ব্যক্তির জীবন আলেখ্য নয়, সমাজের জীবন্ত আলেখ্য। শুধু 'সমাজ' শব্দটি উচ্চারণ করলেই দেশ ও কাল একসঙ্গে ব্যঞ্জিত হয়। মেঘনাদবধ কাব্যে ব্যক্তির ক্রন্দন বড় কথা নয়, সমসাময়িক যুগ ও দেশের আর্তধ্বনিই বড় কথা। ব্যক্তি সমাজের বাঙ্ময় সত্তা।

লঙ্কার এই বিশাল ব্যাপক অপ্রতিহত বিস্তৃতি এই কাব্যকে এক ঐকতানের যোগ্যতা দিয়েছে—'choric quality বললে যা বোঝায়, তাই। মহাকাব্যের প্রাথমিক প্রতিজ্ঞা হ'ল এই 'choric quality' রক্ষা করা—ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের ভাষায় 'বিশাল রস' রক্ষা করা। লঙ্কার এই বিপুল ব্যাপ্তি কবির মহাকাব্য-পরিকল্পনার সার্থকতায় আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছে। বাল্মীকির রামায়ণে লঙ্কার এই ব্যাপ্তি ছিল না; যোজন-মাইলের বিচারে নয়, অন্তঃধর্মের বিচারে। বাল্মীকির লঙ্কা ব্যক্তি হয়ে ওঠেনি; নগর-পরিকল্পনাকারীদের চোখে নগর কদাচ নাগরী হতে পারে না।

॥ মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা ও ছন্দ ॥

কাব্যে ভাষার একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে, কিন্তু তার কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা তার অনন্যবিষয়কে ফুটিয়ে তুলেছে তার স্বতন্ত্র মর্যাদা না হারিয়ে।

এ কাব্য মঙ্গলকাব্য নয়; এ কাব্য পূর্বতন কাব্য-রীতি ও কলা-বিধির অনুকারী নয়—বিষয়ের বিদ্রোহ ভাষার বিদ্রোহে যেন স্পষ্টতর। বরং বলা যেতে পারে কবির ক্ষেত্রে ভাষার বিদ্রোহ-ই হ'য়ে পড়েছিল মুখ্য।

"I began the poem in a joke, and I see I have actually done something that ought to give our national poetry a good lift, at any rate, that will teach the future poets of Bengal to write in a strain very different from that of the man of Krishnagar—the father of a very vile school of poetry, though himself a man of elegant genius.

* * *

My motto is, "Fire away, my boys!" The Namby-Pamby-wallahs—the imitators of Bharat Chunder—our Pope, who has—

"Made poetry a mere mechanical art,
And every warbler has his tune by heart."

May frown or laugh at us, but I say—"Be hanged" to them!

* * *

Besides, my position, as a tremendous literary rebel, demands the consolation and the encouraging sympathy of friendship. I have thrown down the gauntlet, and proudly denounced those whom our countrymen have worshipped for years, as impostors, and unworthy of the honours heaped upon them. I ought to rise higher with each poem."

* * *

মাইকেল-বিদ্রোহের এক বড় অধ্যায় হ'ল এই কাব্য-ভাষার বিদ্রোহ।

মাইকেল-পূর্ব কাব্যভাষা কি ছিল—তা আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। অনুপ্রাস-যমকের অর্থহীন বাহুল্যে কাব্যের তখন নাভিশ্বাস উঠেছিল। কবিতা রচনা তখন অলংকার-পটুত্বের নামান্তর হ'য়ে পড়েছিল। আর

পয়ার ছিল তখন আদিরসের বাহন ;. সোমপ্রকাশের শ্রদ্ধাভাজন সম্পাদক পয়ার আর আদিরস অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ ব'লে মন্তব্য করেছিলেন।

উপমা-উৎপ্রেক্ষার জগত তখন ছিল সংকীর্ণ। চাঁদ-চকোর, নলিনী-মরাল, ভৃঙ্গ-কুসুম বা শতরঞ্চ খেলার বিবিধ উপাদান—এই ছিল রূপক, উপমা, উৎপ্রেক্ষার উপজীব্য। এগুলি ছিল সংস্কৃত সাহিত্যের ভুক্তাবশেষ ; এবং মধ্য-যুগীয় বাংলা সাহিত্যের চর্বিত চর্বন।

মাইকেলের মত বিদ্রোহী প্রতিভা ভাষার এই ক্লিষ্ট দুঃস্থ এবং বিকৃত বেশ বরদাস্ত করতে পারে না। তিনি প্রথমেই এই সংকীর্ণতার অবসান ঘটালেন।

আর তিনি জানতেন শুধু অলংকার তো কাব্যভাষা নয়, কাব্যভাষার চারুত্ব সম্পাদনের জন্যই অলংকারের আবশ্যকতা। অলংকার ব্যতীত কাব্য-ভাষার অস্তিত্ব আছে। মাইকেল-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে এ সংবাদ অপরিজ্ঞাত ছিল। মাইকেল এই সংবাদ রটনা ক'রে বাংলা কাব্য-ভাষার মৌলিক পরিবর্তন সাধন করলেন।

মাইকেল-পূর্ব কাব্যে যে সমস্ত শব্দ ব্যবহৃত হ'ত, তাদের অধিকাংশই ছিল প্রণয়-মূলক ; যেগুলি প্রণয়মূলক নয়, সেগুলি স্থূল বৈষয়িক বা দেহতত্ত্বমূলক শব্দ। মাইকেল আরও লক্ষ্য করলেন ক্রিয়াবাচক শব্দের শিথিলতা। বাংলাসাহিত্যে নামধাতুর বিরল উদাহরণগুলি তাঁকে করল অনুপ্রাণিত ; এবং "as a tremendous literary rebel" এক্ষেত্রেও তিনি অকুতোভয়ে এগিয়ে গেলেন ; সমসাময়িকদের বিদ্রূপরাশি তাঁর উৎসাহ-বহ্নিতে বারি নিক্ষেপে ব্যর্থ হোল।

॥ ১ ॥

প্যারীচাঁদ মিত্রকে একদা মাইকেল বলেছিলেন, "বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার থেকে অবিরতই শব্দসংগ্রহ করতে হবে" ; সে কথা প্রায় 'prophetic'-ভবিষ্যদ্বাণী তুল্য শোনাল! এই সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারের শরণ নেওয়া প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহাত্মক মনোভাবজাত। আরবী-ফারসী শব্দ বৈদেশিক বলে পরিত্যক্ত নয়, সমসাময়িক বা তৎপূর্ব আদিরসাত্মক কাব্যের সঙ্গদোষে জাতিচ্যুত। "With the growth of literature, however, these words have a tendency to disappear, and the Bengali

language is gradually approximating to the Sanskrit in various ways, this process is specially observable in the present. Whoever has taken pains to compare the best works of the present age with the works of the last century must have observed that the Sanskrit element has greatly increased in the Bengali of the present day."[৫২] আরবী-ফারসী শব্দের অন্তর্ধান ও সংস্কৃত শব্দের ক্রম-আধিপত্য কেবল মুসলীম রাজশক্তির পতনের মধ্যে ব্যাখ্যা করা চলে না।

কোন কোন সমালোচক বলেছেন, মাইকেল তাঁর ভাষায় ওজোগুণ সৃষ্টির জন্য তৎসম শব্দ অবচয়ন করেছেন। কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নয়; ভাষার বুকে মধুর রস সঞ্চারের জন্যও তৎসম-শব্দ তাঁর সঙ্গে কুটুম্বিতা করেছে। শুধু তৎসম বা তদ্ভব শব্দ নয়, দেশী আঞ্চলিক আটপৌরে শব্দ তিনি বহু ব্যবহার করেছেন। ভাষার 'কৌলীন্য' রক্ষা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি ছিলেন ভাষার সৌন্দর্য উদ্ধার-ব্রতী।

বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক সেনেকা-র (Seneca) মত তিনিও বিশ্বাস করতেন, "A fit word is better than a fine word."

ইদানীং ব্যবহৃত বাংলা কাব্যের মিষ্ট শব্দে তাঁর অরুচি ধ'রে গিয়েছিল। তাই তিনি এক পাল্টা শব্দভাণ্ডার (vocabulary) তৈরি করলেন; এবং এই শব্দভাণ্ডার প্রাক্- রবীন্দ্র-যুগ পর্যন্ত অপ্রতিহত প্রতাপে রাজত্ব করবে, মাঝখানে বিহারীলাল একটু পরিবর্তন সাধনের প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু বিহারীলালের কাব্যবোধের সঙ্গে কাব্য-ভাষার সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়নি। অর্থাৎ তাঁর কাব্য-চেতনা যদনুপাতে মৌলিক, কাব্যভাষা তদনুপাতে নবীন নয়; অর্থাৎ পরস্পরের সমগোত্রীয় নয়।

কাব্য-বোধ ও কাব্য-ভাষার মধ্যে মাইকেল সমন্বয় সাধনে সফল হয়েছিলেন।

শুধু শব্দ সংগ্রহের ফলে মাইকেলের কাব্যভাষা গ'ড়ে ওঠে নি। শব্দ সামাজিক সৃষ্টি। কিন্তু ব্যক্তিও তার নব রূপায়ণ ঘটাতে পারে।

মাইকেল বহু নতুন শব্দ তৈরি করেছেন; এগুলির সংখ্যা নিতান্ত কম নয় এবং এগুলি বহুদিন পর্যন্ত বাংলা ব্যাকরণবিদ্‌দের উপহাসের লক্ষ্যস্থল ছিল।

মাইকেল-সৃষ্ট শব্দগুলির একটি মোটামুটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হ'ল :

উজ্জ্বলিত—উজ্জ্বল। উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী (১।১০৮)

রজঃ—রজত। উৎস রজঃ ছটা। (১।২১০)

রজঃ কান্তি ছটা বিভ্রম। (১।৪৮৫)

বারুণী—বরুণাণী। বারুণী রূপসী বসি মুক্তাফল দিয়া
কবরী বাঁধিতেছিলা। (১।৪০৭)

শশিপ্রিয়া—রাত্রি। উতরিলা শশিপ্রিয়া ত্রিদশ আলয়ে। (২।১৪)

রুচি—শোভা। মৃণালের রুচি
বিকচ কমল গুণে। (২।১১৩)

অমূল—অমূল্য। একটি রতন মাত্র আছিল অমূল। (২।১৮২)

রসানে—স্বর্ণোজ্জ্বল কারী প্রস্তরে।
রসানে মার্জিত
হেমকান্তি সম কান্তি দ্বিগুণ শোভিল। (২।২৯৫)

বোলী—বোল। কিঙ্কিণীর বোলী। (৩।৯৫)

নিমিষে—নিমেষ। বাঁধিয়া নিমিষে
পৃষ্ঠে তূন, মোর পানে চাহিয়া কহিলা। (৪।৩০৯)

ভৈরবে—ভয়ঙ্কর কোলাহলে। লঙ্কা পূরিল ভৈরবে। (৪।৫৩০)

সন্থোজীবী—ক্ষণস্থায়ী। কিম্বা জলবিম্ব যথা সদা সন্থোজীবী (৫।৩১০)

নিকষে—কষ্টিপাথর। মধুসূদন অসির আবরণ অর্থে ব্যবহার করেছেন।
নিকষে যথা অসি, আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে। (৫।৩৫২)

পর্শে—স্পর্শে। দেখো, মা, কুঠার যেন না পর্শে উহারে। (৫।৫৯৫)

অবরোধে—অন্তঃপুরে। অবরোধে কুলবধূ। (৩।১৭২)

উচ্চ অবরোধে
কাঁদিলা উর্মিলাবধূ। (৬।১৩২)

অজাগর—অজগর। গরজিলা অজাগর বিজয়ী সংগ্রামে। (৬।১৭৩)

হীনগতি—মন্দগতি। ত্রাসে হীণগতি
পথিক। (৬।৪৩৫)

প্রতিবিধিৎসিতে—প্রতিবিধান ক'রতে।

তবে যে বাঁচিছি
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার। (৭।৩৪১)

অনম্বর—আকাশ।

অনম্বর পথে
চলিল কনক-রথ মনোরথ গতি। (৭।৬২৬)
অনম্বর আঁধারি ধাইল। (৭।৬৯২)

পতাকীদল—পতাকাবহনকারীদল।

আইল পতাকীদল উড়িল পতাকা। (৭।১৭৫)

('পতাকী' শব্দের আদর্শে নিষাদী, গজারোহী, সাদী, অশ্বারোহী, দম্ভোলি-নিক্ষেপী, বিলাপী, নায়কী, লম্ফী, তপসী, শোকী, বিচারী, গায়কী, গীতী ইত্যাদি শব্দ তৈরি করেছেন।)

অন্তরিত—অন্তর্নিহিত। অন্তরিত পরাক্রমে (২।৫৬০)

ইরম্মদ—বজ্রাগ্নি। দেখেছি দ্রুত ইরম্মদে, দেব,
ছুটিতে পবন পথে (১।১৫১)
ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল মৃগীরে (৪।৩৫৩)
ইরম্মদে ধাঁধি বিশ্ব (৭।৩৯৭)
ইরম্মদরূপে অগ্নি ধাইলা ভূতলে (৯।৪২৩)

উরজ—স্তন। উরজ-কমলযুগ প্রফুল্ল সতত (৫।২৮৯)

কামধুক—কামী। (কামধুকে যথা)
কামলতা, মহেশ্বাস, সন্ত ফলবতী (৮।৫১৭)

কৌমুদিনী—জ্যোৎস্না। সরসী হরষে পূজে কৌমুদিনী-ধনে (৪।৬৬০)

গীতী—গায়ক	অকরুণ গীতে গীতী গাইছে কাঁদিয়া	(৯।২৫২)
জগদম্বা—লক্ষ্মী !	আচম্বিতে অদৃশ্য হইল জগদম্বা	(৬।৯৪)
	দেখ চেয়ে জগদম্বে, অম্বর প্রদেশে।	(৭।২৯৫)
জগন্মাতা—পৃথিবী।	কি হেতু কাতরা আজি কহ জগন্মাতঃ বসুধে।	(৭।৪২৪)
নশ্বর—বিনাশক।	মরে নর কাল ফণী নশ্বর দংশনে	(৫।২৭৫)
	হত এ নশ্বর রণে	(৮।১২২)
পয়োবহ—মেঘ।	আলোকাগারে কেন লো উদিছে পয়োবহ	(৫।৫৬৫)
বল্লভ—প্রিয় পুত্র অর্থে।	কৃত্তিকা-কুল-বল্লভ সেনানী।	(২।৪৯৪)
রড়ে—দ্রুতবেগে	কৃত্তিকা-বল্লভ দেব কার্ত্তিকেয় বলী।	(৮।৪৫২)
	দড়ে রড়ে জড় সবে হয়ে স্থানে স্থানে।	(৩।২৫৮)
	রাক্ষসবৃন্দ পলাইল রড়ে	(৭।৬৬৫)
রূপস—সুন্দর।	রূপস পুরুষদল আর এক পাশে বাহিরিল মৃদুহাসি।	(৮।৪৫০)
হেষিল—হ্রেষা ধ্বনি করিল।	হয়ব্যূহ হেষিল উল্লাসে	(১।৪৪০)

বৈয়াকরনিকরা এগুলির ব্যাকরণ দোষ ধরবেন; কিন্তু এগুলির মধ্যে যে গীতি-মাধুর্য সৃষ্টির প্রয়াস আছে, তাকে আমরা তাচ্ছিল্য করতে পারি না। পর্শে যে স্পর্শে, অজাগর যে অজগর, তা বর্ণপরিচয়ের ছাত্রদেরও অপরিচিত নয়। নিমেষ যে নিমিষ হতে পারে না, তা কি জ্ঞানবৃদ্ধির অপেক্ষা রাখে? যিনি প্রতিবিধান করতে অর্থে প্রতিবিধিৎসিতে লিখতে পারেন, তাঁর আর যাই হোক বাংলা শব্দধাতুর পরিচয়-পর্ব অসম্পন্ন নেই। বারুণী শব্দ সৃজনে তিনি যে যুক্তির অবতারণা করেছিলেন, আমরা তাই এখানে উদ্ধৃত করছি।

"The name is বরুণানী, but I have turned out one

syllable. To my ears this word is not half so musical as বারুণী, and I do not know why I should bother about Sanskrit rules."—জীবনচরিত, পৃঃ ৩৩১।

অন্যত্র ঠিক একই প্রকার যুক্তি :

"How if you throw out তারাকুন্তলা and substitute সুচারু-তারা you improve the music of the line, because the double syllable ন্ত mars the strength of লা. Read

আইলা সুচারুতারা, শশী সহ হাসি

শর্বরী

And then

সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,

and the passage assumes quite a different tone of music."[৬৩]

পদবন্ধের সংগীত সৃষ্টির জন্য শুধু শব্দপুঞ্জ নয়, বাক্যাংশগুলিও তিনি অভিনবভাবে গ'ড়ে তুলেছেন। বাংলা কাব্যে তিনি এই 'phrasal music' পত্তন করলেন; ভারতচন্দ্রে তার উদ্যোগ ছিল; তাঁর হাতে বাংলা পদ্য সুর ক'রে পড়ার দায় থেকে মুক্ত হোল এবং গীতিধর্মিতায় দীক্ষিত হোল। ঈশ্বর গুপ্ত এই নবোদ্ভিন্ন 'phrasal music'-কে দেশছাড়া করেছিলেন। কবিওয়ালারা সমস্ত শব্দেই কিঞ্চিত সুর লাগাতেন; শব্দের নিজস্ব যে সুর বা ধ্বনি সুষমা আছে, এঁরা তার মর্ম উপলব্ধি করতে পারতেন না। সংগীত-জগত থেকে তাঁরা সুর ধার করলেন। একটি উদাহরণ দিচ্ছি—

প্রাণনাথো মোরো সেজেছেন শঙ্করো।
দেখসিয়ে প্রিয়ে ললিতে। অপরূপ দরশনো আজু প্রভাতে॥
বুঝি কারো কাছে, রজনী জেগেছে, নয়নো লেগেছে ঢুলিতে।

(রাসু নৃসিংহ, সংবাদপ্রভাকর, ১লা মাঘ, ১২৬১। ১৩ই জানুয়ারী, ১৮৫৫)

এই ধরনের উদাহরণ অজস্র সংগৃহীত হতে পারে। মাইকেল তাঁর কাব্যে গীতিময়তার সৃষ্টির জন্য সুরের দাক্ষিণ্য ভিক্ষা করেন নি। মাইকেলের কাব্যে শব্দাবলী পাশাপাশি ব'সে নিজেরাই ধ্বনি সৃষ্টি করে; তার জন্য সুরের প্রলেপ অনাবশ্যক।

ধ্বনি সৃষ্টি করা ছাড়াও মাইকেল-ব্যবহৃত শব্দের অর্থগত তাৎপর্য আছে। তিনি বহু নতুন শব্দ সৃষ্টি করেছেন, যেহেতু সেগুলি গভীরতর ব্যঞ্জনা বহন করে। যেমন অবরোধে। কবি যখন লেখেন

"উচ্চ অবরোধে
কাঁদিলা উর্মিলা বধূ।"

তখন নিঃসন্দেহে তিনি অন্তঃপুর অপেক্ষা গভীরতর অর্থদ্যোতক শব্দ খুঁজছিলেন। শুধু 'অন্তঃপুর' প্রয়োগ উর্মিলার অসহায়তা ও নিঃসঙ্গত্ব এত নির্মমভাবে ফুটত না। আর একটি শব্দ 'অনম্বর'। যখনই কবি 'অনম্বর' শব্দটি ব্যবহার করেন, তখনই তাতে ব্যাপকতার আভাস থাকে। প্রচলিত 'আকাশে' সেই বিশেষ আভাসটুকু প্রতিফলিত হ'ত না। কবি তাই নতুন শব্দটি ব্যবহার ক'রে বিশেষণ প্রয়োগের দায় থেকে মুক্তি নিয়েছেন। কবি 'ভয়ঙ্কর কোলাহল' অর্থে 'ভৈরব' শব্দটি পরিবেশন করেছেন। কান কত সজাগ থাকলে ও মর্মজ্ঞান কত প্রখর থাকলে এই জাতীয় শব্দ সৃষ্টি করা যায়, তা কেবল সাহিত্যের সংস্কারমুক্ত পাঠকই অনুধাবনসক্ষম। বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শব্দ কারিগর জেমস জয়েস তাঁর একদা-বিখ্যাত 'ইউলিসিজ' উপন্যাসে অভিনব শব্দ সৃষ্টির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন ; তন্মধ্যে একটি এখানে আমরা উল্লেখ করব। তিনি 'voice' ও 'noise' এই শব্দদু'টি মিলিয়ে 'voise' শব্দ সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন কর্কশ ভাষণের ধ্বনিবহ একটি সার্থক শব্দ আবিষ্কার করতে। জয়েস যদি মাইকেলের 'ভৈরব' শব্দটির খোঁজ জানতেন, তবে তিনি যে তাঁর এই পূর্বসূরীর প্রতি সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাতেন, তা আমরা বাজি রেখে বলতে পারি। মাইকেল নতুন যুগের আদিতম শব্দ-শিল্পী। সমালোচকেরা বিভ্রান্ত হয়েছেন 'রূপস' শব্দ দেখে। কবি কেন 'রূপবান' শব্দের পরিবর্তে 'রূপস' শব্দ প্রয়োগ করলেন। 'রূপস' শব্দে রূপ-জনিত যে সচেতনতা আছে, 'রূপবান' শব্দের সাহায্যে তা ধরা যেত না। কবি ইচ্ছা ক'রেই রূপবিলাসী পুরুষের বর্ণনায় 'রূপস' শব্দ প্রয়োগ করেছেন। শব্দটির মধ্যে একটু হীনতাবোধ লালন করা হয়েছে ; নরকের পরিবেশে এই স্বতন্ত্র অর্থ যথাযথ হয়েছে। শব্দশিল্পী হিসাবে ভারতচন্দ্রের পর মাইকেল, তারপর রবীন্দ্রনাথ।

এইভাবে মাইকেল তৎসম শব্দসমূহকে পর্যন্ত ভেঙ্গেচুরে আপন প্রয়োজন

অনুযায়ী ব্যবহার করেছেন ; এ যেন লৌহকে কামারশালে পিটিয়ে যুদ্ধের প্রয়োজনে বিবিধ আয়ুধ তৈরি করা।

এ-গুলি তো অভিজাত শব্দ।

অনভিজাত আটপৌরে শব্দও মাইকেল কম ব্যবহার করেন নি ; তাঁর আভিজাত্যপূর্ণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী কাব্যে এই অন্ত্যজ শব্দগুলি আবর্জনাস্বরূপ হয় নি, নোংরা কীটের মতো সৌন্দর্যহানি ঘটায় নি। বরং মাঝে মাঝে এ-গুলি এক অভিনব শক্তি সঞ্চার করেছে।

The word though rather
unrefined
Has yet an energy we
ill can spare.
—La Fontaine.

কবি লা ফঁতেন মাইকেলের অপরিচিত নন।

অন্ত্যজ শব্দগুলি তিনি আঞ্চলিকও কথ্যভাষা থেকে সংগ্রহ করেছেন ; এগুলি অনভিজাত, কিন্তু অশ্লীল নয়। ভদ্র না হতে পারে, কিন্তু ইতর নয়।

পাকশাট মারি কেহ **খেদাইছে** দূরে
সমলোভী জীবে। (১।২৪৭)

বীরবলে এ **জাঙ্গাল** ভাঙ্গি
দূর কর অপবাদ। (১।৩১২)

দীন আমি **থুয়েছিনু** তারে
রক্ষা হেতু তব কাছে। (১।৩৪৮)

বরজে সজারু পশি **বারুইর** যথা
ছিন্নভিন্ন করে তারে (১।৩৬৩)

যেয়ো না গো আর তাঁর কাছে
মোর **কিরে** প্রাণেশ্বর। (২।৪৬২)

আমি কি **ডরাই** সখি ভিখারী রাঘবে? (৩।৮০)

তাহার উপরে কৃষী জাগে সাবধানে
খেদাইয়া মৃগ যূথে। (৩।৫৬৮)

এয়ো তুমি তোমার কি সাজে
এ বেশ? (৪।৮০)

ফাঁকর হইয়া সখি, খুলিনু সত্বরে
কঙ্কন বলয় (৪।৩৭৯)

যেমতি
তস্কর আইসে ফিরি, ঘোর নিশাকালে
পুঁতি যথা রত্নরাশি রাখে যে গোপনে
পরধন (৪।৪৪৪)

নয়নের তারা হারা করি রে **থুইলি**
আমার এ ঘরে তুই। (৫।৫৩০)

চোক্ চোক্ শরে শূর অস্থিরিলা শূরে। (৭।৬৬৭)

জল যথা **জাঙ্গাল** ভাঙ্গিলে
কোলাহলে। (৭।৯৬৯)

পিতা দশরথ দিবে তারে **কয়ে**
কি উপায়ে ভাই তার জীবন লভিবে,
আবার। (৮।৪০৬)

হ্যাদে দেখ হেথা—
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে। (৯।১৯৬)

যে স্তর থেকেই শব্দগুলি সংগৃহীত হোক, বক্তব্যকে পরিস্ফুট করেছে। A fit word is better than a fine word. (Seneca)

দেশীয় সূত্র পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার অন্তে তিনি বিদেশী সূত্র আকর্ষণ করেছেন। বহু শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন, যার মৌল ভাবনা বিদেশীয়। কারাবদ্ধবায়ুদল, ভবিতব্যদ্বার, জলদলপতি—গ্রীক চিন্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত। শ্বেতভুজা, দেবকুলপ্রিয়, ভয়ঙ্করী শূলচ্ছায়া, দেবাকৃতি, রাক্ষস-ভরসা, কেশব-

বাসনা, ঊর্মিলা-বিলাসী, বাসব-ত্রাস, অমর-ত্রাস, হৈম-লঙ্কা-অলংকার, দম্ভোলি-নিক্ষেপী, ভীমবাহু, মহাবাহু, বিশালাক্ষি, রক্ষঃকুলকালি, ভীমশূলপাণি, বীরযোনি, জগত-কামনা প্রভৃতি ভারতীয় আদর্শের প্রতিকূল বা প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, কিন্তু নবীন। বাল্মীকির রামায়ণে এই জাতীয় শব্দ অল্প হলেও আছে। অযোধ্যাকাণ্ডে রাম 'মহাবাহু' বলে ভরত কর্তৃক অভিহিত হয়েছেন; অরণ্যকাণ্ডে সীতাকে 'বিশালাক্ষি' বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। অরণ্যকাণ্ডে সীতা লক্ষ্মণকে একবার মহাবাহু বলেছেন। এই প্রকার সম্বোধন থেকে বুঝা যায় রামায়ণকার এই শব্দগুলিকে স্বষ্ট-চরিত্রসমূহ বুঝবার পক্ষে অপরিহার্য মনে করতেন না। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যে উদ্দিষ্ট বিভিন্ন চরিত্র বুঝবার পক্ষে ঐ-শব্দগুলি অপরিহার্য। ব্যক্তিবিশেষ প্রসঙ্গে এই ধরনের এক একটি শব্দ কর্ণের কবচকুণ্ডলের ন্যায় অচ্ছেদ্য হয়ে আছে। এই শব্দগুলিকে সিদ্ধ বা নিত্য-বিশেষণ বলা যেতে পারে।

"They (recurrent epithets) are a marked feature of Homer's style······I think that, whether used for ornamental or for deitic purposes, they too were a legacy from the past. But the genius has a way of its own with traditional material; and Homer not only added to his legacy but extended its use in several interesting and subtle ways,······ Homer does a great deal with his adjectives and does not always use them in a conventional manner. In his handling of the principal epithets, in particular, we can see how Homer the novelist truimphed over Homer the traditional bard. Just as 'noisy' dogs do not always bark, and all 'fast' ships are not cleppers, so 'prudent' Penelope, the 'wise' Telemachus, and the 'stalwart' or 'resourceful' Odysseus are often found, as their characters evolve in the hands of their maker to behave in a manner far removed from exemplary wisdom, patience and sagacity. Indeed they are much too human and too well-drawn for such dull

and uniform perfection. And I feel that Homer often leaves them their epithets in cases where they do not apply, because their use will actually sharpen his hearers' perception of the characters he is building up. Nor, curiously enough, does his apparently inconsequent use of the epithets on inappropriate occasions detract from their effect when more partinently used.[৫৮]

মাইকেল এই বিশেষণগুলি সর্বদা সুসঙ্গতভাবে বসিয়েছেন, তা নয়। কিন্তু 'বাসব-ত্রাস' ও 'অমর-ত্রাস' যে মেঘনাদের ক্ষেত্রে বিঘ্ন উৎপাদন করে নি, তা অস্বীকার করবে কে?

হোমারের পূর্বোল্লিখিত অনুবাদকের সঙ্গে একমত হ'য়ে বলা চলে যে, পূর্ববর্তীদের, অনুসরণ করেও মাইকেল এখানে তাঁর স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। রাম 'দেবকুলপ্রিয়', একথা ব'লে কবি প্রথম থেকেই রামকে দৈবশক্তিতে নির্ভরশীল বক্তিরূপে প্রচার করলেন। 'রাক্ষস-ভরসা' বলে মেঘনাদকে অভিহিত করার সার্থকতা বুঝতেও কষ্ট হয় না। নায়ককে সাধারণ বীর ক'রে আঁকলে কাব্যের মর্যাদা রক্ষিত হ'ত কি ক'রে?

শব্দ-উদ্ভাবনে ও শব্দ-ব্যবহারে কবির বিশিষ্টতা স্মরণীয়। তার সঙ্গে বাক্য গঠনে কবির অভিনবত্বও উল্লেখযোগ্য। বাক্য গঠনে কবি নতুন রীতির প্রবর্তন করেছেন; ইংরেজী বাগ্‌-বিধির আদর্শ এখানে অবলম্বিত। ভারতচন্দ্র বলেছিলেন, "যে হোক সে হোক ভাষা কাব্য রস লয়ে।" মাইকেলও একথা বলতে পারেন; ভাষা ব্যবহারে শুধু নয়, বাক্য ব্যবহারেও তিনি ছিলেন নিরঙ্কুশ।

জগত-বাসনা তুই সুখের সদন। (১।২১৭)

বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম। (১।৩৭৩)

উল্লাসে দেব চলিলা অমনি,
ভাঙিলে শৃঙ্খল লম্ফী কেশরী যেমতি,
যথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত
গিরিগর্ভে। (২।৫৫৪)

কিন্তু ভেবে দেখ, বীর, যে বিদ্যুৎ-ছটা
রমে আঁখি, মরে নর, তাহার পরশে। (৩।২৪৩)

অনন্ত বসন্ত জাগে যৌবন উদ্যানে। (৫।২৮৮)

পলাইলা তমঃ
দ্রুতে; (৫।৩৩৯)

লজ্জায় মলিনমুখী পলাইলে দূরে
খদ্যোৎ— (৫।৪৪৩)

ভ্রান্তিমদে মত্ত নিশি, তোমারে ভাবিয়া
উষা, পলাইছে, দেখ, সত্বর গমনে; (৫।৫৬৪)

কালমেঘ সম
দেব ক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা
চারিদিকে। (৬।৭৪)

কি হেতু
হে দূত, রসনা তব বিরত সাধিতে
স্বকর্ম? (৭।১০১)

চলেছে প্রতাপ আগে জগৎ কাঁপায়ে
পশ্চাতে শব্দ চলে শ্রবণ বধিরি। (৭।৪৪৩)

নয়ন তা কহিল নয়নে। (৭।৪৬৪)

বাক্য-শিল্পী হিসাবেও ভারতচন্দ্রের পরে মাইকেল; তারপর রবীন্দ্রনাথ

এর উপরে রয়েছে মাইকেল-সৃষ্ট অলংকারসমূহ। মাইকেল-ব্যবহৃত অলংকারসমূহের সংখ্যা-প্রাচুর্য ও রূপ-বৈচিত্র্য উভয়ই পর্যালোচনার যোগ্য। শুধুমাত্র অলংকার সৃজনের দক্ষতার জন্যই মাইকেল অমর শিল্পী রূপে বন্দিত হবার যোগ্য। বাক্যের ধ্বনিকে শ্রুতিমধুর ও অর্থকে হৃদয়গ্রাহী করার অভিপ্রায়ে মাইকেল অজস্র অলংকার সৃষ্টি করেছেন।

উপমা, উৎপেক্ষা, যমক ও অনুপ্রাস—এই চতুর্বিধ অলংকার মাইকেল বেশী ব্যবহার করেছেন। এগুলির মধ্য আবার উপমা ও অনুপ্রাসের ব্যবহারই বেশী। উপমা কালিদাসের কাব্যের প্রধান অলংকার; তাই বলা হয়, 'উপমা কালিদাসস্য'। 'মেঘনাদবধ কাব্য' কাব্যেরও প্রধান অলংকার উপমা। এখন যদি কেউ বলেন 'উপমা শ্রীমধুসূদনস্য', তবে খুব বেশী অবাক্ হবার থাকবে না! মাইকেলের বহু উপমার পিছনে হয়ত প্রাচীনতর কাব্যে ব্যবহৃত উপমার প্রতিধ্বনি আছে। কোন্ মহাকবির ব্যবহৃত উপমায় এই প্রকার অনুরণন নেই? এই শ্রেণীর উপমাকে বলা হয়ে থাকে 'a part of epic tradition' মহাকাব্য-ঐতিহ্যের অংশ। মাইকেল-সাহিত্যে সমস্ত উপমাই আর এই প্রতিধ্বনি নয়। মাইকেলের উপমার চরিত্র-স্বাতন্ত্র্য আছে, জগৎ-স্বাতন্ত্র্য আছে।

কবি নানাবিধ উদ্দেশ্য সাধনে উপমা ব্যবহার করেছেন; আমরা কয়েকটি এখানে বিশ্লেষণ করছি। কবি যে বিষয়াস্তরে যাচ্ছেন, তা বুঝা যায় হঠাৎ উপমা প্রয়োগে।

> যথা ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র পশে গোষ্ঠগৃহে
> যম দূত, ভীম বাহু লক্ষ্মণ পশিলা
> মায়াবলে দেবালয়ে। (৬।৪১৩)

কখনও দৃশ্যের উপসংহার ঘটাচ্ছেন উপমা দিয়ে—

> মুছিয়া আঁখি, গেলা চলি সতী
> যমুনা পুলিনে যথা, বিদায়ি মাধবে,
> বিরহ বিধুরা গোপী যায় শূন্য-মনে
> শূন্যালয়ে। (৫।৬০৪)

কখনও বা একটু বিরতি বা বিরাম সৃষ্টির জন্য উপমা ব্যবহৃত হয়—

> লঙ্কার পঙ্কজ রবি গেলা অস্তাচলে।
> নির্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
> শান্ত রশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে। (৬।৬৬৭)

কখনও বা বিষয়েরই রং গাঢ়তর করার জন্য বর্ষিত হয়েছে উপমার

পরে উপমা; হেমচন্দ্র এই বিষয়টি উপলব্ধি না করতে পেরে রাশি রাশি উপমা প্রয়োগে দোষ ধরেছিলেন।

সভয় হইল আজি ভয় শূন্য হিয়া।
প্রচণ্ড প্রতাপে পিণ্ড, হায়রে, গলিল!
গ্রাসিল মিহিরে রাহু, সহসা আঁধারি
তেজঃপুঞ্জ! অম্বনাথে নিদাঘ শুষিল!
পশিল কৌশলে অলি নলের শরীরে! (৬।৪৩৭)

একাধিক উপমা ব্যবহৃত হয়েছে কখনও বা বৈপরীত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। এতে বক্তব্য অধিকতর স্পষ্ট হয়েছে।

সুশীতল ছায়া-রূপ ধরি,
তপন-তাপিতা আমি, জুড়ালে আমারে।
মূর্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দয় দেশে
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম! ভুজঙ্গিনী-রূপী
এ কাল কনক-লংকা-শিরে শিরোমণি। (৫।৬৬৭)

মেঘনাদবধ কাব্যের আখ্যানভাগের জগৎ আর উপমার জগৎ এক নয়। ইন্দ্রজিৎ নিধন কাহিনীর জগৎ শুধুমাত্র লংকা নগরীতে সীমাবদ্ধ নয়, মর্ত্য, স্বর্গ ও নরক অন্তর্ভুক্ত। এই ব্যাপক পরিধি সম্পর্কে অবহিত হয়েও বলা যায় যে, তাঁর উপমার জগৎ ব্যাপকতর।

পূজনীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর সাবিত্রী লাইব্রেরীতে পঠিত প্রবন্ধে বলেছিলেন, "কবি আমাদিগকে তাঁহার প্রথম দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে স্বর্গ-নরক, ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, সব দেখাইয়াছেন; উন্মত্ত কল্পনা উদ্দামভাবে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে।"[৫৯]

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। আখ্যান অংশে কবির ব্রহ্মাণ্ড পর্যটন প্রসঙ্গ আপাতত স্থগিত থাক; কিন্তু উপমা অংশে তিনি যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে বেড়িয়েছেন, তা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়। অসংখ্য ঊর্মি-উদ্বেল মাইকেল-উপমা-সাগর থেকে বিষয়-বৈচিত্র্য অনুযায়ী সংখ্যাবদ্ধ কয়েকটি উপমা তুলছি সমুদ্রের অগুন্তি শুক্তির কয়েকটি মাত্র। এবং

এ-গুলিকে বিভিন্ন জগতে ভাগ করে পরিবেশন করছি। এগুলি অবশ্য একে অপরের জগতে মাঝে মাঝে হানা দিয়েছে ; তাতে সৌন্দর্যহানি ঘটেনি।

॥ শিলাজগৎ ॥

কনক আসনে বসে দশানন-বলী
হেমকুট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃ পুঞ্জ। (১।৩৩)

সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গবর ; স্বর্ণফুল শ্রেণী
শোভে তাহে, আহা মরি পীতধড়া যেন!
নির্ঝর-ঝরিত-বারি-রাশি স্থানে স্থানে
বিশদ চন্দনে যেন চর্চিত সে বপুঃ। (২।১২৮)

অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে কভু নহে ভূধর অধীর
সে পীড়নে। (৯।১২৫)

গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা
বজ্রাঘাতে। (১।৭৫৪)

তরুরাজি যথা গিরি শিরে (২।৩৮৮)

পর্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে
কার হেন সাধ্য সে যে রোধে তার গতি। (১।৭৫)

সপন্নগ গিরিসম পড়িলা সুমতি। (৭।৭৪৩)

॥ উদ্ভিদজগৎ ॥

যথা তরু,-তীক্ষ্ম শর সরস শরীরে
বাজিলে, কাঁদে নীরবে। (১।৬৫)

বনের মাঝারে যথা শাখাদল আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে (৯।৯১)
নাশে বৃক্ষে।

হায়রে যেমতি
স্বর্ণচূড় শস্য ক্ষত কৃষিদল বলে,
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষস নিকর,
রবিকুল রবি শূর রাঘবের শরে। (১।২৬০)

আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা
কুসুম-রতন-হীন বন-সুশোভিনী (১।৩২৮)
লতা।

অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির-
পূর্ণ পদ্ম-পত্র যেন। (১।৩৩০)

হায়, দেবি, যথা বনে বায়ু
প্রবল শিমুল শিম্বী ফুটাইলে বলে
উড়ি যায় তুলারাশি, এ বিপুল-কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল সমরে। (১।৩৬৯)

রহিলা দেবী সে বিজন বনে
একটি কুসুম মাত্র অরণ্যে যেমতি। (৪।৬৮৬)

প্রভঞ্জন-বলে
ত্রস্ত তরুকুল যবে নড়ে মড় মড়ে
কে পায় শুনিতে যদি কুহরে কপোতী। (৪।৩৭৬)

রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে, যেন তরু তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ। (৪।৫৯-৬১)

পড়ে তরুরাজ যথা প্রভঞ্জন বলে
মড়মড়ে। (৬।৫০৫)

বনসুশোভন শাল ভূপতিত আজি ;
চূর্ণ তুঙ্গতম শৃঙ্গ গিরিবর শিরে ;
গগন রতন শশী চিররাহু গ্রাসে। (৭।৩৪৯)

যথা প্রভঞ্জন বলে উড়ে তুলা রাশি
চৌদিকে। (৭।৬৬৪)

প্রফুল্ল হায়। কিংশুক যেমতি
ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে। (৭।৬৩৫)

যথা তরু হিমানী বিহনে
নবরস। (৯।৬৪)

কিম্বা পদ্ম নিশা-অবসানে

সহসা পূরিল
ভৈরব আরবে বন, পলাইল রড়ে
ভূতকুল, শুষ্কপত্র উড়ি যায় যথা
বহিলে প্রবল ঝড়। (৮।৩৮৪)

চেড়ীবৃন্দ মাঝারে বডবা
শূন্যপৃষ্ঠ, শোভাশূন্য কুসুমবিহনে
বৃন্ত যথা। (৯।২৩৭)

অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্যক্ষ, সরোষে
কড়মড়ি ভীমদন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্ধে। (১।১৭৯)

॥ প্রাণিজগৎ ॥

সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে
কে রাখে এ মৃগপালে ? (৩।৪৩৯)

হীনপ্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে। (৪|৫০)

মধুর স্বরে, হায়রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা (৫|৩৭৩)

শিশুশূন্য নীড় হেরি যথা
আকুল কপোতী, হায়! (৭|৩৩৫)

পক্ষিরাজ যথা
গরুড়, হেরিয়া দূরে সদা-ভজ্য ফণী
হুঙ্কারে। (৭|৪৫১)

বারণারি সিংহ যথা হেরি সে বারণে! (৭|৫২৯)

রোষে যথা সিংহশিশু হেরি
মৃগদলে। (৭|৫৩৫)

বৃষপালে সিংহ যথা, নাশিছে রাক্ষসে
শূরেন্দ্র। (৭|৬৫০)

যথা হেরি দূরে
কপোত বিস্তারি পাখা, ধায় বাজপতি
অম্বরে। (৭|৬৫৫)

কিন্তু দন্তী কবে, দেবি, আঁটে মৃগরাজে? (৫|৩৫)

সিংহ যেন আনায় মাঝারে! (৫|৭১)

যথা ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র পশে গোষ্ঠগৃহে
যমদূত। (৬|৪১২)

যথা পথে সহসা হেরিলে
ঊর্ধ্বফণা ফণীশ্বরে, ত্রাসে হীনগতি
পথিক। (৬|৪৩৪)

লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী সহসা বেড়িল
সবিস্ময়ে রঘুনাথে, মধুভাণ্ডে যথা
মক্ষিক। (৮।৩৫২)

হেরি রঘুনাথে,
রোষে, অভিমানে দোঁহে চলি গেলা দূরে
বিষদন্তহীন অহি হেরিলে নকুলে
বিষাদে লুকায় যথা। (৮।৩৮০)

মৃগপাল যথা
ধায় যথা ক্ষুধাতুর সিংহের তাড়নে
ঊর্ধ্বশ্বাস। (৮।৩৯৪)

কোন নারী খেদে
কুড়িছে নয়নদ্বয় (নির্দয় শকুনি
মৃতজীব আঁখি যথা) (৮।৪০৮)

মহামন্ত্রবলে যথা নম্রশিরঃ ফণী। (৮।৫৬৮)

বাঘিনী যেমনি
(জালাবৃত) ব্যাধবর্গে হেরিয়া অদূরে। (৯।২৩২)

হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি। (১।১৩৫)

চৌদিকে এবে সমরতরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ
নির্ঘোষে। (১।১৮২)

উৎস রজঃছটা (১।২১০)

দুইপাশে তরঙ্গনিচয়
ফণাময়, ফণাময় যথা ফণিরব
উথলিছে নিরন্তর গম্ভীর নির্ঘোষে। (১।২৭৭)

যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে। (১।৫৩৩)

হায়, বরিষার কালে বিমল-সলিলা
সরসী-সমলা যথা কর্দম-উদ্গমে,
পাপে পূর্ণ স্বর্ণলঙ্কা! (১।৬০৫)

পশিয়া ধনী অরি-দল মাঝে
নির্ভয়ে, চলিলা যথা গরুৎমতী তরি,
তরঙ্গ-নিকরে রঙ্গে করি অবহেলা,
অকুল সাগর-জলে ভাসে একাকিনী। (৩।২৪৮)

বরিষার কালে, সখি প্লাবন,পীড়নে
কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি,
বারি-রাশি দুই পাশে। (৪।১৬৯)

সাগরের ভালে, সখি, এ কনক-পুরী
রঞ্জনের রেখা। (৫।৬২৯)

(ভূধর শরীরে
বহে বরিষার কালে জলস্রোতঃ যথা) (৬।৫৯৭)

ঊর্মিকুল সিন্ধুমুখে যথা
চির-অরি প্রভঞ্জন দেখা দিলে দূরে। (৭।৪৪৮)

সহজে প্লাবন যথা ভাঙে ভীমাঘাতে
বালিবন্ধ। (৭।৫৭১)

জল যথা জাঙাল ভাঙিলে
কোলাহলে। (৭।৬৯৯)

পশ্চাতে সমুখে রাখি আলোকের রেখা
লঙ্কাপানে। সিন্ধুনীরে তরী যথা চলিলা রূপসী
কতক্ষণে রঘুবর শুনিলা চমকি (৮।১২৯)

কল্লোল, সহস্র শত সাগর উথলি
রোষে কল্লোলিছে যেন। (৮।১৬২)

॥ নভোজগৎ ॥

ক্ষণপ্রভা সম মুহুঃ হাসে
রতনসম্ভবা বিভা ঝলসি নয়ন। (১।৪৬)

মেঘশ্রেণী যেন
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল বাঁধে
দৃঢ় বাঁধে। (১।২৮৮)

নিষঙ্গের সঙ্গে হেন ফলক দুলিল
রবির পরিধি হেন ধাঁধিয়া নয়নে। (৩।১২৩)

যথা বায়ুসখা সহ দাবানল-গতি
দুর্বার। (৩।১৬০)

যে বিদ্যুৎ ছটা
রমে আঁখি, মরে নর, তাহার পরশে। (৩।২৪৪)

মধ্যে লঙ্কা, শশাঙ্ক যেমনি
নক্ষত্র-মণ্ডল মাঝে স্বচ্ছ নভঃস্থলে। (৩।৫৬২)

সিন্দুর-বিন্দু শোভিল ললাটে
গোধূলি-ললাটে, আহা! তারারত্ন যথা (৪।৮৪)

দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি। (৪।১৯৫)

দেখিলা সম্মুখে বলী, কুসুম-কাননে
বামাদল, তারাদল ভূপতিত যেন। (৫।২৫৮)

শয়ন-মন্দির হতে বাহিরিলা দোহে
প্রভাতের তারা যথা অরুণের সাথে। (৫।৪০১)

গ্রাসিল মিহিরে রাহু, সহসা আঁধারি
তেজঃপুঞ্জ। (৬।৪৩৯)

সৌন্দর্য তেজে হীনতেজাঃ রবি,
সুধাংশু নিরংশু যথা সে রবির তেজে। (৭।৮২)

রবি পরিধি জিনি তেজোগুণে,
ঝকঝকে বর্ম। (৭।৩১২)

চলিলা সৌরকর রূপে
নীলাম্বর পথে দূতী। (৭।৬০১)

ভীমাঘাতে পড়িল ভূতলে
লক্ষ্মণ, নক্ষত্র যথা। (৭।৭৪০)

ছায়াপথে ছায়া পলাইলা দূরে
রূপের ছটায় যেন মলিন! হাসিল
তারাবলী—মণিকুল সৌরকরে যথা! (৮।১২৬)

॥ নরজগৎ ॥

ফুলকুল—চক্ষুঃ বিনোদন
যুবতী যৌবন যথা। (১।২১১)

শত প্রসরণে,
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণলঙ্কাপুরী,
গহন কাননে যথা ব্যাধদল মিলি
বেড়ে জালে কেশরী কামিনী। (১।২৩৭)

ক্লান্ত শিশুকুল
জননীর ক্রোড়-নীড়ে লভয়ে যেমতি
বিরাম, ভূচর সহ জলচর আদি
দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লভিলা। (২।১০)

আসে যথা প্রবাসে প্রবাসী
স্বদেশ-সঙ্গীত-ধ্বনি শুনি রে উল্লাসে। (২।৩০৩)

কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু-প্রসারণে,
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হতে
করপদ্ম-সঞ্চালনে। (৬।৬০৭)

বাহিরিলা আশুগতি দোঁহে,
শার্দূলী অবর্তমানে, নাশি শিশু যথা
নিষাদ, পবন বেগে ধায় ঊর্ধ্বশ্বাসে
প্রাণ লয়ে, পাছে ভীমা আক্রমে সহসা
হেরি গতজীব শিশু, বিবশা বিষাদে। (৬।৭০৪)

যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ বিঁধিলে
মৃগেন্দ্র নশ্বর শরে, গর্জি ভীমনাদে
পড়ে মহীতলে হরি, পড়িলা ভূপতি
সভায়। (৭।১২১)

গহন কাননে যথা বিঁধি মৃগবরে
কিরাত অব্যর্থ শরে, ধায় দ্রুতগতি
তার পানে। (৭।৭৪৪)

স্থানে স্থানে পত্রপুঞ্জ ছেদি প্রবেশিছে
রশ্মি, তেজোহীন কিন্তু, রোগী হাস্য যথা। (৮।৩৫০)

বিদেশে যথা স্বদেশীয়জনে
দেখিলে জুড়ায় আঁখি, তেমনি জুড়াল
আঁখি মম, হেরি তোমা। (৮।৭০৩)

॥ পৌরাণিক জগৎ ॥

আহা

হর কোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান যে সভাতলে ছত্রধর রূপে (১।৫০)

মনোহর যথা
বাঁশরী স্বরলহরী গোকুল বিপিনে। (১।৫৭)

ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ মূরতি,
পাণ্ডব শিবির দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি। (১।৫২)

কিম্বা, রে যমুনে,
ভানুসুতে, বিহারেন রাখাল যেমতি
নাচিয়া কদম্ব-মূলে মুরলী অধরে,
গোপ-বধূ সঙ্গে রঙ্গে তোর চারু কূলে।

কিম্বা যথা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রথী
মারি সুপ্ত পঞ্চ শিশু পাণ্ডবশিবিরে
নিশীথে, বাহিরি, গেলা মনোরথগতি
হরষে তরাসে ব্যগ্র, দুর্যোধন যথা
ভঙ্গ উরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্র রণে!

নিনাদেন যথা
দানব দলনী দুর্গা দানব নিনাদে।

শূন্য করি পুরী, আঁধারে রে এবে
গোকুল ভবন যথা শ্যামের বিহনে।

হায় রে মরি যথা
হস্তিনায় অন্ধরাজ সঞ্জয়ের মুখে
শুনি ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে
শত শত প্রিয়পুত্র কুরুক্ষেত্র-রণে।

পড়েছিল যথা
হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড়
ঘটোৎকচ, যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী
এড়িলা একাঘ্নী বাণ রক্ষিতে কৌরবে (১।২৬৫)

কৌস্তুভ রতন যথা মাধবের বুকে। (১।৩১০)

হাতে গদা, গদাধর যথা মুরারি। (১।৫৮৬)
হৈমবতী সুত যথা নাশিতে তারকে
মহাসুর। (১।৬৯০)

কিম্বা যথা বৃহন্নলারূপী
কিরীটি, বিরাট পুত্রসহ, উদ্ধারিতে
গোধন, সাজিলা শূর শমীবৃক্ষমূলে। (১।৬৯১)

তার শিরে ভবের ভবন
শিখি-পুচ্ছ-চূড়া যেন মাধবের শিরে। (১।১২৬)

কভু ব্রজ-কুঞ্জ-বনে, হায় রে, যেমনি
ব্রজবালা, নাহি হেরি কদম্বের মূলে
পীতধড়া পীতাম্বরে, অধরে মুরলী। (৩।৪)

যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী,
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি, উতরিলা
নারী দেশে, দেবদত্ত শংখ-নাদে রুষি
রণরঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে। (৩।৮৫)

হৈমবতী যথা
নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে। (৩।১২৯)

যথা অভিমন্যু রথী নিরস্ত্র সমরে
সপ্তরথী অস্ত্রবলে, কভু বা হানিলা
রথচূড়, রথচক্র, কভু ছিন্ন অসি,
ছিন্ন চর্ম ভিন্ন বর্ম যা পাইলা হাতে। (৬।৬০৩)

কাঁদিলা যেমতি
ব্রজে ব্রজকুলশিশু যবে শ্যামমণি
আঁধারি সে ব্রজপুর গেলা মধুপুরে। (৬।৬৩৯)

অভিমন্যু যথা
হেরি সপ্তশূরে শূর তপ্ত লৌহাকৃতি
রোষে। (৬।৪৯১)

॥ বর্তমান জগৎ ॥

যথা ঝোলে
পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। (১।৪৪)

বসেন যেমতি
বিজয়া দশমী যবে বিরহের সাথে
প্রভাতয়ে গৌড় গৃহ। (১।৫০৩)

সুবর্ণ দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল উজলি
দশদিশ। (৪।৮৮)

কিম্বা দীপাবলী
অম্বিকার পীঠতলে শারদ-পার্বণে,
হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েরে
চিরবাঞ্ছা। (৫।৪৯)

কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙ্গে পদাঘাতে। (৬।৮৩)

বঙ্গগৃহে যথা
দেব-দোলোৎসবে বাদ্য, দেবদল যবে,
আবির্ভাবি ভবতলে, পূজেন মহেশে। (৬।৭৪)

শূন্য কান্তি যথা
প্রতিমা পঞ্জর, মরি, প্রতিমা বিহনে
বিসর্জন অন্তে। (৯।২৫৪)

যথা মহানবমীর দিনে
শাক্ত ভক্ত গৃহ, শক্তি, তব পীঠতলে। (৯।৩৭৫)

করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে
বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে। (৯।৪৪০)

॥ বিবিধ ॥

ফণীন্দ্র যেমতি
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে। (১।৪১)

যথা যবে
বারিদ-প্রসাদে পুষ্ট শস্য-কুল বাড়ে
দিন দিন, উচ্চ মঞ্চ গড়ি ক্ষেত্রপাশে,
তাহার উপরে কৃষী জাগে সাবধানে,
খেদাইয়া মৃগযূথে, ভীষণ মহিষে,
আর তৃণজীবী জীবে। (৩।৫৬৪)

ঘন বনে, হেরি দূরে যথা
মৃগবরে, চলে ব্যাঘ্র গুল্ম আবরণে
সুযোগ প্রয়াসী ; কিম্বা নদীগর্ভে যথা
অবগাহকেরে দূরে নিরখিয়া বেগে
যমচক্ররূপী নক্র ধায় তার পানে
অদৃশ্যে। (৬।২৯৬)

যথা গৃহমাঝে বহ্নি জ্বলিলে, উত্তেজে
গবাক্ষ-দুয়ার-পথে বাহিরায় বেগে
শিখাপুঞ্জ (৭।৪৮৭)

ধীরে ধীরে রঘুবর চলিলা পশ্চাতে,
সুবর্ণ-দেউটি সম অগ্রে কুহকিনী
উজ্জ্বলি বিকট দেশ। (৮।১৭৮)

মাইকেলের সৃষ্টির এই বিচিত্র জগতে প্রবেশ করলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। এত বিপুল ও বিচিত্র যাঁর সৃষ্টির পরিধি, তিনি যে বিধাতার প্রতিদ্বন্দ্বী, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি ? ড্রাইডেনের ভাষায়—"Here is God's plenty." কবির "উন্মত্ত কল্পনা উদ্দামভাবে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে।" 'উন্মত্ত কল্পনা' শব্দটি সম্ভবতঃ সমালোচকের কাব্যিক ভাষণ, নইলে উন্মত্ত কল্পনার সাধ্য কি যে এত বিচিত্র ঐশ্বর্যের দুয়ার উদ্ঘাটিত করতে পারে ? শিলাজগৎ, সলিলজগৎ, নভোজগৎ, প্রাণিজগৎ, নরজগৎ—এই বিবিধ জগতের সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য তিনি পাঠকের চোখের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করেছেন। প্রচলিত কবি-প্রসিদ্ধি ও অলংকারকে তিনি যে ব্যবহার করেন নি, তা নয়। আমরা এতক্ষণ বহু উপমা উদ্ধার করলাম। সন্দেহ নেই যে এর মধ্যে এমন বহু বাক-প্রতিমা আছে, যা পূর্বতন কবিরা ব্যবহার করেছেন। বহুল প্রয়োগের ফলে কোন কোনটি বা হৃতদীপ্তি; ইংরেজীতে এই ধরণের বাক-প্রতিমাকে 'dead imagery' বলে। মধুসূদনের কৃতিত্ব এই, তিনি মৃত প্রতিমাতেও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

"রহিলা দেবী সে বিজন বনে,
একটি কুসুম মাত্র অরণ্যে যেমতি।"

এই উপমার বিষয়বস্তু বা মূল কাঠামো বহু ব্যবহৃত; কিন্তু এখানে সীতাপ্রসঙ্গে নবীন মাধুর্য সঞ্চার করল।

পুরাতন বাক-প্রতিমার নবীন জীবন দানের সঙ্গে সঙ্গে কবি বহু নতুন বাক-প্রতিমা নিজে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির ব্যাপকতার সঙ্গে তার সৌন্দর্যের অনিন্দ্যতাও স্বীকৃতি পাবে। কবির এই বিচিত্র বাক-প্রতিমার দুইটি জগতের প্রতি দৃষ্টি দিতে আমরা বিশেষ ক'রে অনুরোধ করছি। এক পৌরাণিক জগৎ, দুই স্বদেশীয় বা বঙ্গীয় জগৎ। পৌরাণিক জগতে চণ্ডীপুরাণ, ভাগবত,

রামায়ণ ও মহাভারতের প্রসঙ্গ আছে। ডাঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "মেঘনাদবধে যে-সকল কৃষ্ণলীলার উৎপেক্ষা আছে, তাতে রাধার নামগন্ধ নাই।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—২য় খণ্ড—সুকুমার সেন। পৃ—১৩৫)। কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নয়; নাম নাই, কিন্তু গন্ধ আছে। একাধিক উপমা-উৎপ্রেক্ষায় রাধার প্রসঙ্গ রয়েছে। কোথাও রাধা 'ব্রজবালা' (৩।৪), কোথাও 'গোপবধূ' (১।৬৫০) রূপে বর্ণিত হয়েছেন। যাই হোক, ভাগবত প্রসঙ্গ আদিতে প্রধান, কিন্তু ধীরে ধীরে মহাভারতপ্রসঙ্গ প্রাধান্য অর্জন করছে। মহাভারত প্রসঙ্গের মধ্যে অর্জুন ও অভিমন্যুপ্রসঙ্গই অধিকতর সমাদর পাচ্ছে। বিষয়টি কবির মনোজগতের এক অনুদ্ঘাটিত প্রকোষ্ঠের দ্বার মুক্ত করল।

দ্বিতীয়ত স্বদেশীয় জগৎ। এই জগতে কবির দেশ ও কাল তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাঙলা দেশের উৎসব ব্রত ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদির ওপরে কবির আন্তরিক অনুরাগের প্রকাশ এখানে অকপট। খৃষ্টান কবিই যে সমসাময়িক যুগের ঘনিষ্ঠতম বাঙালী, তা আর একবার তর্কাতীতভাবে প্রমাণিত হ'ল। এই বাক-প্রতিমার স্নিগ্ধ অন্তর্দেশ থেকেই চতুর্দশপদী কবিতার শত নির্ঝর কলকল্লোল তুলবে।

॥ ৩ ॥

মেঘনাদবধ কাব্যের ছন্দগত কারুকার্য পূর্বতন কাব্য অপেক্ষা অধিকতর সার্থক, বা ভিন্নমুখী। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে কবি পুরোপুরি অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে আর মেঘনাদবধ কাব্যে ব্যবহৃত অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যে যোজন-ব্যবধান। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে কবির কাব্য-আবেশ প্রধানতঃ সম্ভোগমূলক, সৌন্দর্য-সম্ভোগমূলক। 'য়্যাবষ্ট্রাকট্' সৌন্দর্যের স্তুতি রচনাই লক্ষ্য। স্বভাবতই কবির মৌল পরিকল্পনার সঙ্গে সাহচর্য ক'রে ঐ কাব্যের ছন্দ-রূপ নির্ণীত। কাব্য-রীতি বা কলাবিধি সর্বত্র এক জাতীয় হ'তে পারে না। ছন্দ-চরিত্র কাব্যের বিষয়ভেদে পরিবর্তিত হয়।

মেঘনাদবধ কাব্য বীররসাত্মক, কি করুণরসাত্মক—এ তর্কে বহুকাল

কেটে গেছে। কাব্যের নান্দীমুখে কবি মধুকরী কল্পনাকে সম্বোধন ক'রে বলেছিলেন :

"গাইব মা বীররসে ভাসি
মহাগীত।"

কিন্তু কাব্যের উপসংহারে যেহেতু রাবণের শোকোচ্ছ্বাস প্রবল, সমালোচকেরা বলেছেন 'মেঘনাদবধ কাব্যে' বীররস অপেক্ষা করুণরস প্রধান হয়ে উঠেছে। (কবি শ্রীমধুসূদন—মোহিতলাল মজুমদার, পৃষ্ঠা—২৫-২৬) এবং কোন কোন সমালোচক এই করুণরস প্রাধান্যের জন্য বলেছেন, মেঘনাদবধ কাব্যের চরিত্র লিরিক-ধর্মী, এপিক-ধর্মী নয়। (ডাঃ সুশীল কুমার দে) তাঁদের বক্তব্য কখনও কখনও এইরূপ : মধুসূদনের মহাকাব্য কয়েকটি লিরিকের কেবল সমষ্টি, এ কাব্য 'এপিক' নয়। শেষোক্তদলের মতে এই কাব্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দও লিরিক-ধর্মী, এপিক-ধর্মী নয়।

আমরা এতক্ষণ মেঘনাদবধ কাব্যের বিষয়বস্তু ও তার কাব্যরূপ-নির্মিতি নিয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা করেছি, এবং সে আলোচনায় মেঘনাদবধ কাব্যের মহাকাব্য-মর্যাদার দাবী স্বীকার করেছি। কেউ কেউ মেঘনাদবধ কাব্যের মহাকাব্যিক সম্মান স্বীকার করেন না, কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দের এপিক-কৌলীন্য স্বীকার করেন। কেউ কেউ আবার উভয় ক্ষেত্রেই লিরিক-ধর্মের বিজয় দেখেছেন।

এই দুইটি মতের সঙ্গেই আমাদের বিরোধিতা আছে।

প্রথমতঃ আমাদের বিচার করতে হবে, কবির তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, মেঘনাদবধ কাব্য ও বীরাঙ্গনা কাব্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দ একজাতীয় কিনা। যদি একজাতীয় না হয়, তবে কোনটির প্রকৃতি কি, তা বিশ্লেষণ করতে হবে।

কোন কোন সমালোচক বলেছেন, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে কবি যেখানে ঘটনা বর্ণনা করেছেন, সেখানে ব্যর্থ; যেখানে আবেগের ভাষা দিয়েছেন, সেখানে সফল। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের ভাষার কতটুকু অংশ আখ্যান-মূলক, আর কতটুকু অংশ আবেগমূলক, এ বিচার সহজ ব্যাপার নয়। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের কেন্দ্রীয় ঘটনা হচ্ছে তিলোত্তমার আবির্ভাব। সমগ্র

কাব্যের সার্থকতাই নির্ভর করছে তিলোত্তমার আবির্ভাবের মাধুর্য কতটুকু ফুটল তার ওপর!

প্রবেশিলা কুঞ্জবনে কুঞ্জর-গামিনী
তিলোত্তমা, প্রবেশয়ে বাসরে যেমতি
শরমে, ভয়ে কাতরা নবকুল-বধূ
লজ্জাশীলা। মৃদুগতি চলিলা সুন্দরী
মুহুর্মুহুঃ চাহি চারিদিকে, চাহে যথা
অজানিত ফুলবনে কুরঙ্গিনী; কভু
চমকে রমণী শুনি নূপুরের ধ্বনি;
কভু মরমর পাতাকুলের মর্মরে;
মলয়-নিশ্বাসে কভু; হায় রে, কভু বা
কোকিলের কুহুরবে! গুঞ্জরিলে অলি
মধু-লোভী, কাঁপে বামা, কমলিনী যথা
পবন-হিল্লোলে। এইরূপে একাকিনী
ভ্রমিতে লাগিলা ধনী গহন কাননে।

* * *

ভ্রমিতে ভ্রমিতে দূতী—অতুলা জগতে
রূপে—উতরিলা যথা বনরাজী মাঝে
শোভে সর, নভস্তল বিমল যেমতি।
কলকল স্বরে জল নিরন্তর ঝরি
পর্বত-বিবর হতে, সৃজে সে বিরলে
জলাশয়। চারিদিকে শ্যাম তট তার
শত রঞ্জিত কুসুমে। উজ্জ্বল দর্পণ
বনদেবীর যে সর—খচিত রতনে।

* * *

ক্ষণকাল বসি বামা চাহি সর পানে
আপন প্রতিমা হেরি—ভ্রান্তি-মদে মাতি,
একদৃষ্টে তার দিকে চাহিতে লাগিলা
বিবশে।

এই অমিত্রাক্ষর আর যাঁরই হোক মিলটনের নয়। এ সমুদ্রের গম্ভীর নিঃসঙ্গ গর্জন নয়, এ নির্ঝরের কুলুকুলু ধ্বনি; চলেছে লোকালয়ের কোল ঘেঁষে— অথচ দিকচক্রবালের নিমন্ত্রণ নিয়ে। ইউরোপীয় সাহিত্যে এই অমিত্রাক্ষর ছন্দের একমাত্র উদাহরণস্থল সেক্সপীয়র। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের ছন্দ অনেক শান্ত, অনেক নম্র—এর উজ্জ্বলতাও রুদ্রের তৃতীয় নেত্রের দৃষ্টি-কিরণ নয়।

ওবিদ-এর মেজাজই এখানে ফুটে উঠেছে, Metamorphosis-এর Narcissus কি এই প্রকার আত্ম-রতির মোহকুণ্ডে আত্ম-প্রতিচ্ছায়া দেখেনি? ওবিদ-এর ভাষাতেও সেই আত্মমুখীনতা এবং গীতিসুধারস আছে, যা তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষার মাঝখানে যে গীতিসুধারস নেই, তা নয়। প্রমীলার করপদ্ম আকর্ষণ ক'রে যখন প্রেমিক মেঘনাদ বলছেন,

> প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
> রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায়রে, যেমতি
> নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
> প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
> চুম্বি নিমীলিত আঁখি) "ডাকিছে কূজনে,
> হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
> পাখী-কুল! মিল, প্রিয়ে, কমল-লোচন!
> উঠ, চিরানন্দ মোর! সূর্য-কান্তমণি-
> সম এ পরাণ, কান্তা; তুমি রবিচ্ছবি;—
> তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।
> ভাগ্যবৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
> আমার। নয়ন-তারা! মহার্হ রতন।
> উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
> চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
> কুসুম।" (৫ম সর্গ)

কিন্তু এ গীতি-সুধারস কি মিলটনে নেই—যে মিলটন সম্পর্কে স্বয়ং কবি মধুসূদন বলেছেন:

"I don't think it impossible to equal Virgil, Kalidasa

and Tasso. Though glorious, they are mortal poets! Milton is divine.

*   *   *

We hear the sound of his ethereal voice with awe and trembling. He is the deep roar of a lion in the silent solitude of forest."

মিল্টন যখন লেখেন:

Not distant far from thence a murmuring sound
Of waters issu'd from a Cave and spread
Into a liquid Plain, then stood unmov'd
Pure as th' expanse of Heav'n ; I thither went
With unexperienc't thought, and laid me downe
On the green bank, to look into the clear
Smooth lake, that to me seemd another Skie.
As I bent down to look, just opposite,
A shape within the watry gleam appeerd,
Bending to look on me, I started back,
It started back, but pleasd I soon returnd,
Pleas'd it returnd as soon with answering looks
Of sympathie and love, there I had fixt
Mine eyes till now, and pin'd with vain desire,
Had not a voice thus warn'd me, What thou seest,
What there thou seest fair Creature is thy self,
With thee it came and goes : ৬০

তখন কি তাতে মধুর রসের স্পর্শ নেই? এই উদাহরণের আরও সংখ্যাবৃদ্ধি করা যেতে পারে। তা সত্ত্বেও যখন মাইকেল বলেন, "He is the deep roar of a lion in the silent solitude of the forest." তখন মনে রাখতে হবে যে মাইকেল মিলটনের প্রধানতম স্বরটি অনুধাবন করার চেষ্টা করছেন।

মেঘনাদবধ কাব্যে গীতিময়তার তরঙ্গ ইতস্তত আন্দোলিত হয়েছে ; কিন্তু কথা হচ্ছে মুখ্য ভঙ্গীটা কি ? কাব্যের বিশাল রূপ ধ'রে রেখেছে এক বিচিত্র সুর।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের একমেটে চেহারায় বিবিধ সঙ্গীতের সৃষ্টি কি ক'রে সম্ভব, তা সমসাময়িক অন্যান্য কবি অনুধাবন করতে পারেন নি।

রঙ্গলাল মিত্রাক্ষরের উপাসক ছিলেন। তদুপরি তিনি মনে করতেন, ভাব-অনুযায়ী ছন্দপরিবর্তন অত্যাবশ্যকীয়। তাঁর কর্মদেবী, কাঞ্চী কাবেরী, এমন কি কুমারসম্ভবের অনুবাদেও ছন্দ-বৈচিত্র্য লক্ষ্যণীয়। কুমারসম্ভবের অনুবাদের বিজ্ঞাপনে তিনি বললেন, "মহাকবি কালিদাসের নিয়মে আমি সমুদয় সর্গ এক ছন্দোবিশেষে রচিত না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ছন্দোবন্ধের অনুসরণ করিয়াছি। অনবরত এক ছন্দ শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হইলে জড়তার প্রাদুর্ভাব হয় ; জল-যন্ত্র-নির্গত অনর্গল একাকার ধারাপাত শব্দ নিদ্রাকর্ষণের উপযোগী বটে, কিন্তু কাব্যশাস্ত্র নিদ্রাকর্ষণের জন্য নহে, তাহা চিত্তকে অনবরত সচেতন রাখিবার সহকারী, ইহা সর্ববাদী-সম্মত।"

হেমচন্দ্র একই কথা বলেছেন, "নিরবচ্ছিন্ন একই প্রকার ছন্দঃ পাঠ করিলে লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিবার সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া পয়ারাদি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দঃ প্রস্তাব করিয়াছি। এই গ্রন্থে মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয়বিধ ছন্দঃই সন্নিবেশিত হইয়াছে।" (বৃত্রসংহার কাব্য—বিজ্ঞাপন)।

এর পর অবশ্য হেমচন্দ্র তাঁর নিজস্ব ছন্দ-ধারণা ব্যাখ্যা করার প্রয়াসী হয়েছেন। আমরা যথাস্থানে তার সমালোচনা করব। আপাতত আমরা একই ছন্দ যে সুর-বৈচিত্র্য সৃজনে সক্ষম এই প্রসঙ্গ আলোচনা করব।

মিলটনের কাব্যে বিষয়ভেদে, ঘটনাভেদে, আবেগ ও অনুভূতিভেদে ছন্দঃ নানা সুরে আলাপ করেছে ;—কখনও চটুল, কখনও উদাস ; কখনও উচ্ছল, কখনও গম্ভীর ; কখনও পরাজিতের নৈরাশ্য, কখনও জয়ীর তেজো-দৃপ্ততা ; কখনও করুণ, কখনও হাস্যমুখর, কখনও অশ্রুসজল, কখনও ক্রোধবহ্নি-দীপ্ত। ছন্দের সাতরঙা ইন্দ্রধনু এইভাবে বারবার জ্বলে উঠেছে।

ইংরেজ সমালোচকেরা যাকে বলেছেন verse paragraph মাইকেলে তার আছে সার্থক প্রয়োগ। এ-বিষয়ে মোহিতলালের সুদৃঢ় মত অনেক দিনের সংশয় বিদূরিত করেছে।

আধুনিক সমালোচকবর্গ মেঘনাদবধ কাব্যে শুধু করুণরসেরই প্রাধান্য দেখেন। কিন্তু প্রাচীন সমালোচকেরা ভিন্নমত পোষণ করতেন।

"মধুসূদনের গ্রন্থে বীররস, বিস্ময়রস, সৌন্দর্যরস, এবং মাঝে মাঝে মাধুর্যরস, যেরূপ উত্তাল ঊর্মিমালায় উদ্বেলিত হইয়াছে, করুণরস সেরূপ হয় নাই।" ৬১

"মধুসূদন বীর রস ও রৌদ্ররসে পারদর্শী ; শুধু আদিরসে নহে।"৬২

কেউ কেউ আবার মেঘনাদবধ কাব্যে রসবিশেষের স্ফূর্তির উপরে গীতিময়তার প্রতিষ্ঠা-ভূমি খুঁজেছেন। এ অন্বেষণও বিভ্রান্তির পথে পরিশ্রান্ত।

মেঘনাদবধ কাব্যে কোন রসবিশেষ প্রাধান্য লাভ করে নি বলেই আমাদের বিশ্বাস। কবির লেখনী সমস্ত জাতীয় আবেগেরই একটা সুসমঞ্জস কাব্যরূপ দিয়েছে। ভাষা এখানে সর্ববিধ আবেগ বহনক্ষম হয়েছে।

শুধু করুণরস নয়, বীভৎসরস, বীররস, হাস্যরস প্রভৃতি সৃষ্টিতেও কবির লেখনী সমান সার্থক।

তুলনায় অনুরূপ সফলতা আমরা তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে দেখি না। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে বীররসাত্মক বর্ণনায় কবির লেখনী তত পটুত্ব অর্জন করে নি।

সম্ভবত কবি তখনও বাংলা শব্দের প্রকৃতি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি। বাংলা শব্দের ধ্বনি-সুষমা তখনও তিনি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারেন নি। যুক্তাক্ষরপূর্ণ তৎসম শব্দ ও যুক্তাক্ষরবর্জিত চলতি শব্দ উভয়ের মজ্জার মধ্যে সে ধ্বনি-সুধারস লুকিয়ে রয়েছে, মাইকেল তখনও তার সম্পূর্ণ সন্ধান পান নি, যদিও তাঁর চেষ্টা অবিচ্ছিন্ন গতিতে চলেছে।

সমাসবদ্ধ শব্দ বা বাক্যাংশ তখন বাক্যের অভ্যন্তরে ঢুকে প'ড়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে, পর্ববিভাগে উৎপাত সৃষ্টি করেছে। মেঘনাদবধ কাব্যে শব্দের প্রকৃতি অনুধাবন-দক্ষতা কবির বহুলাংশে বেড়েছে, প্রায় নিখুঁত তাকে বলা চলে (সাহিত্যে নিখুঁত কিছু যদি বলা চলে !)। আর পর্ব-বিভাগ প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিরুদ্বিগ্ন। পর্ব (৮+৬) বিভাগ মোটামুটি সুনির্দিষ্ট থাকায় কবির যতি সংস্থাপনের স্বাধীনতা আদৌ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে নি। এই পর্ব-বিভাগ যদি শিথিল হত, তবে কবির অমিত্রাক্ষর ছন্দ গদ্যের নামান্তর হত বা গৈরিশ ছন্দের মত কাব্যমূল্যবিহীন ও

গীতিমাধুর্যবঞ্চিত এক শাব্দিক অনুপ্রাসে মাত্র পর্যবসিত হ'ত। মাইকেলের হাতে অমিত্রাক্ষর ছন্দ এই একবারই মাত্র এপিক-বাহনোচিত সমুন্নতি লাভ করেছে।

পর্ব-বিভাগে স্পষ্ট ত্রুটি কয়েকটি দেখা যায় :

মৃত্যুঞ্জয়,। যথা মৃত্যুঞ্জয়,। উমাপতি। (১।১৯)
কাটিলা কি বিধাতা। শাল্মলী তরুবরে ? (১।৮৫)
বীর ভীমাকার। ভিন্দিপাল,। বিশ্বনাশী (১।৪৩৩)
পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষ। বক্ষোনিবাসী (২।৩৭)
শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্দ্র। জিতের নিধনে (২।২০৫)
ভীম মূর্তি প্রমত্তা। হ্রেষিল অশ্বাবলী (৩।৪৯৩)
ভীষণ-মূরতি ভেক ;। চীৎকারি গম্ভীরে। (৮।৫৩৬)
কে দাসে, বিজয়ীরথ। চূড়ায় যেমতি
বিজয়-পতাকা লোক উড়ায় কৌতুকে। (৩।৩৮)
কি কহিলি, বাসন্তি ? এ পর্বতগৃহ-ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী। কার সাধ্য রোধে
তার গতি ? (৩।৮০)
মরে নর কাল-ফণী।—নশ্বর-দংশনে। (৫।২৭২)
তারা কিরীটিনী নিশি। সদৃশী আপনি (৫।৪৫৪)

কিন্তু পর্ব-বিভাগ-জনিত এই ত্রুটিগুলি ছন্দের তুমুল কল্লোলে কোথায় ভেসে গেছে।

"মৃদঙ্গ এবং তবলার বাদ্যে নটীদিগেরই নৃত্য হয়, কিন্তু রণতরঙ্গবিলাসী প্রমত্ত যোদ্ধগণের উৎসাহবর্ধন জন্য তুরী, ভেরী এবং দুন্দুভির ধ্বনি আবশ্যক।" (হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ভূমিকা-মেঘনাদবধ কাব্য) এবং বিদ্যাসুন্দর কাব্যে হেমচন্দ্র তুরী ভেরী দুন্দুভির ধ্বনি শুনতে পান নি ; পেয়েছিলেন মাইকেলে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের ও মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে তুলনামূলক ব্যাখ্যাচ্ছলে তিনি বলেছেন, "তাঁহার কবিতাস্রোতঃ কুঞ্জবন-

মধ্যস্থিত অপ্রশস্ত, মৃদুগতি প্রবাহের ন্যায়; বেগ নাই, গভীরতা নাই; তরঙ্গ গর্জন নাই;

* * *

সরল সুকোমল বাক্যলহরী মেঘনাদবধে নাই, কিন্তু উহার শব্দপ্রতিঘাতে দুন্দুভিনিনাদ এবং ঘনঘটা-গর্জনের গম্ভীর প্রতিধ্বনি শ্রবণগোচর হয়।" ৬৩

জীবনের অনেক ক্ষেত্রের মত মাঝে মাঝে পিছনে স'রে গেলে হয়ত সত্যের সাক্ষাৎ মেলে। সাম্প্রতিক কালে মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষ্যকারগণ প্রায় প্রত্যেকেই এই কাব্যের বক্ষোদেশে শুধু গীতিময়তার সৌগন্ধ্যই পেয়েছেন, লিরিকের আবেশই প্রত্যক্ষ করেছেন। এই কাব্যের গম্ভীর মেঘমন্দ্রধ্বনি তাঁদের শ্রবণপথ পরিত্যাগ করেছে।

সম্ভবতঃ এ-কালের লিরিক-পুষ্ট কাব্য-জগতের অধিবাসীরা রঙিন চশমা 'কানে' দিয়ে এই সুর শুনেছেন। অর্থাৎ তাঁদের আত্মগত ভাবোন্মত্ততা কাব্যব্যাখ্যা ব'লে গৃহীত হচ্ছে।

অবশ্য এই ব্যাখ্যা-ভ্রান্তির জন্য কবিও অংশত দায়ী। তিনি একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন,

I fancy the versification more melodious and Virgilian and the language easy and soft.

ভর্জিলের কাব্য-কলাবিধি আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর জনৈক সাম্প্রতিক অনুবাদক লিখেছেন:

The words themselves throughout the poem are chosen and filled according to many subtle principles. Their vowels, consonants, and rythms had to be right in relation not only to the other words in the same line but to the words in other lines in the same passage. Words are chosen because they begin with the right letter, and with the right sound and otherwise fit the designed patterns of both music and meaning."৬৪

ভাষা সম্পর্কে মাইকেলকেও একই রকম যত্নবান দেখা যায়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, মাইকেল মুখ্যতঃ ভর্জিল-ধর্মী। ভর্জিলের কাব্য

শ্রেয়োবোধে উদ্বুদ্ধ, মাইকেলের কাব্যেও শ্রেয়োবোধ আছে। কিন্তু সে শ্রেয়োবোধ অসন্তোষের আগুনে ঝলসানো। য়্যাডিসন ঠিকই বলেছিলেন, "Virgil was of a quiet, sedate temper." হোমার সম্পর্কে য়্যাডিসন বলেছিলেন, "Homer was violent, impetuous and full of fire." মেঘনাদবধ কাব্যকারের কবি-প্রকৃতির সঙ্গে শেষোক্ত ব্যাখ্যাই সঙ্গতিপূর্ণ নয় কি?

"You never cool while you read Homer."—

উনবিংশ শতাব্দীর মাইকেল-পাঠকের অভিজ্ঞতাও অনুরূপ। তাই ত এই কাব্য-প্রকাশে বাংলা সাহিত্য-জগতে এত আলোড়ন!

* * *

ব্রজাঙ্গনা কাব্য ও মেঘনাদবধ কাব্য সমসাময়িক রচনা। কৃষ্ণকুমারী নাটক, মেঘনাদবধ কাব্য ও ব্রজাঙ্গনা কাব্য—এই তিনখানি গ্রন্থ ছয়মাসের মধ্যে লিখিত। ১৮৬১ সালের জুলাই মাসে ব্রজাঙ্গনা কাব্য প্রকাশিত হয়।

রাধা-বিরহ প্রসঙ্গ ব্রজাঙ্গনা কাব্যে নতুন ভাষায় ও ছন্দে উপস্থাপিত হয়েছে। কবি নিধুগুপ্ত, রামবসু, হরুঠাকুরের গীতি-কবিতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তিনি আর নতুন ক'রে কবি-সঙ্গীত রচনা করতে বসেন নি।

শ্রীমতি রাধিকা এখানে ননদিনী জটিলা-কুটিলা ও শাশুড়ী-স্বামী পরিবৃতা হ'য়ে আবির্ভূত হয়নি। পরিচিত পরিবেশ রাধিকাপ্রসঙ্গ বহুজনহস্তাবলেপে স্থূল ও কর্কশ হ'য়ে পড়েছে। তিনি তাই 'Poor old Lady of Braja'-কে বিশ্ব-প্রকৃতির বিভিন্ন চিত্রের মধ্যে সংস্থাপিত করলেন। কথা হচ্ছে, কবি কেন রাধাকে পরিচিত মানবিক পরিবেশ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অপরিচিত অ-মানবিক পরিবেশে সংস্থাপিত করলেন? কবি ব্যক্তির মনোবেদনাকে এক বৃহত্তর পটভূমি-কায় সংস্থাপন করেছেন, তার অভ্যন্তরে করেছেন এক উদারতার সুর সংযোজন। কাব্য শুরু হয়েছে বংশীধ্বনিতে; তারপর জলধর, যমুনাতট, ময়ূরী, পৃথিবী প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বসন্তে গিয়ে শেষ হয়েছে। সখি আর বংশীধ্বনি—মানব-জগৎ ও প্রকৃতি-জগতের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করেছে। কবির নাকি পরিকল্পনা ছিল আরও কয়েক সর্গে কাব্যখানিকে সম্পূর্ণ করা। দ্বিতীয় সর্গের রচনা শুরুও করেছিলেন, কিন্তু শেষ করতে পারেন নি।

আমাদের মতে শ্রীরাধার বিরহ-ভাবনাই কবির সমগ্র কাব্য-আচরণের সঙ্গে সুসংবদ্ধ, মিলন-ভাবনা নয়। ব্রজাঙ্গনার ভিত্তি হোল বিরহ-ভাবনা; নারী-দুর্গতির চিত্র অন্যত্রও আছে, ব্রজাঙ্গনা সে চিত্রেও বর্ণাঢ্যতা সম্পাদনে সহযোগী হোল।

ব্রজাঙ্গনা কাব্যে কাহিনীর সূত্র সামান্যই, বৈষ্ণব ভাব-জগৎ এখানে পটভূমিকা হিসাবে কাজ করেছে। গীতিকবিতাতে কাহিনীর সূত্র অনাবশ্যক; আবেগ বা ভাবনার রস-রূপেই গীতিকবিতার দেহ-নির্মিতি। মাইকেলের ব্রজাঙ্গনা কাব্য আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যের সূচনা-যুগের প্রথম নিদর্শন। কাহিনীর জের এতে যেটুকু আছে, তা আদিযুগের দায়ভাগ। আগাগোড়া একটি সুনিরূপিত সুপ্রতিষ্ঠিত ভাব-পরিমণ্ডল বিরাজিত থাকায় সেইটিই অন্তরাল থেকে কাহিনীসূত্র হিসাবে সূক্ষ্মভাবে কাজ করছে।

রাধা বাংলা কাব্যের বীজ-প্রতীক; প্রেমের সাধন-যজ্ঞের অন্যতম নারী ঋত্বিক, তন্ত্রসাধনার ভৈরবী নয়। কবি এই বীজ-প্রতীক ব্যবহারের সময় এর প্রচলিত বর্ণ-বিকৃতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কবিওয়ালাদের ব্যবহৃত ছলনা ও অভিমানকে তিনি আদৌ গ্রহণ করেন নি। কেউ কেউ এ কাব্যে নিধুবাবু, রামবসু ও হরুঠাকুরের কাব্য-ভাবনার অনুরণন দেখতে পেয়েছেন। রাম বসু রাধাবিরহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকার। কিন্তু রাম বসুর রাধাবিরহের গীতিগুচ্ছ থেকেও ছলনা-অভিমান পরিত্যক্ত নয়।

ব্রজাঙ্গনার কাব্য-পরিমণ্ডল বৈষ্ণব অনুমোদিত কাব্য-পরিমণ্ডল; তবু তারই মধ্যে নানা চিত্রকল্প-রচনায় কবির মৌলিকতা ফুটেছে। কবি শুধু পুরাতন চিত্রকল্প নতুন ভাষায় পরিবেশন করেন নি।

(১) তব অপরূপ রূপ হেরি, গুণমণি,
অভিমানে ঘনেশ্বর যাবে কাঁদি দেশান্তর,
আখণ্ডল-ধনু লাজে পালাবে অমনি। (জলধর, পৃ—৪)

(২) তবে যে সিন্দুব বিন্দু দেখিছ ললাটে,
সধবা বলিয়া আমি রেখেছি উহারে।
কিন্তু অগ্নিশিখা সম হে, সখি, সীমন্তে মম
জ্বলিছে এ রেখা আজি কহিনু তোমারে—
গোপিলে এসব কথা প্রাণ যেন ফাটে। (যমুনাতটে, পৃ—৬)

(৩) কেন এত ফুল তুলিলি, স্বজনি—
ভরিয়া ডালা ?
মেঘাবৃত হলে, পরে কি রজনী
তারার মালা ? (কুসুম, পৃ—১৫)

ব্রজাঙ্গনা কাব্যে চিত্র-কল্পের ঐশ্বর্য তত বিপুল নয়। মিল-প্রধান এই কাব্যে মিলের বৈচিত্র্য এবং স্তবক রচনার পটুত্বই সমধিক লক্ষণীয়।

কবিসমালোচক মোহিতলাল মজুমদার লিখেছেন, "মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনার পদবন্ধে যেমন ছন্দগৌরব নাই, তেমনই অন্যত্রও তিনি ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে কেবল পদ্য প্যারাগ্রাফ রচনা করিয়াছেন, পংক্তিসংখ্যা নির্দিষ্ট রাখিয়া কবিতাগুলিকে ভাগ করিয়াছেন মাত্র।"[৬৪]

ডাঃ সুকুমার সেনের মতে "ব্রজাঙ্গনার ছন্দে মধুসূদন যে স্বাধীনতা দেখাইয়াছেন—যতি-সংখ্যায়, ছত্র-সংখ্যায়, মিলে এবং মাত্রাবৃত্তের ব্যবহারে—সে স্বাধীনতা অমিত্রাক্ষর পয়ার প্রবর্তনের অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।"[৬৬]

দুইটি মতের মধ্যে আমরা শেষোক্ত মতই গ্রহণীয় ব'লে মনে করি। তবে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমাদের একমত হওয়া কষ্টকর। তিনি বলেছেন যে, তিন মাত্রামূলক ছন্দের এই প্রথম প্রকাশ (বংশীধ্বনি ৬+৫, কুসুম ৬+৬+৫) বাংলা গীতিকবিতার ভাবী সম্ভাবনার দ্বার খুলল। (সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ—পৃষ্ঠা—১৪৮) ভাবী সম্ভাবনার দ্বার খুলতে পারেনি, তার কারণ এই কাব্যের ছন্দ-গুরুত্ব বহু কালাবধি বা আদৌ অনুধাবিত হয় নি। মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ও তিন মাত্রামূলক ছন্দ যেদিন সৃষ্টি হোল, সেদিনও মাইকেলের অনুসরণ আদৌ ছিল না। ছন্দের ক্ষেত্রে মাইকেলের মিলহীনতা ও যতিস্থাপনের স্বাধীনতাই কেবল স্বীকৃতি পেয়েছিল। মাত্রাবৃত্তের পদধ্বনি তখন কেউ কান পেতে শুনতে চায় নি।

নাই বা শুনুক, অন্তত আদি উদাহরণ হিসাবে এগুলির ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

আধুনিক বাংলা কাব্যে নায়ক-নায়িকা কল্পনায় রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হ'লে মাইকেল-আদর্শ অনুসৃত হবে। মাইকেল রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গের অঙ্গ থেকে আদিরসের নির্মোক অনেকখানি ছিঁড়ে ফেলেছেন। ব্রজাঙ্গনা কাব্য

কাব্য-কলাবিধির ক্ষেত্রে যতটুকু সফলতা অর্জন করেছে, সে অনুপাতে এই কৃতিত্বের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত অধিকতর।

* * * *

ব্রজাঙ্গনা কাব্যের সমালোচনাকালে কেউ কেউ বলেছিলেন যে, রাধার শাড়ির মধ্য থেকে গাউনের আভাস দেখা দিচ্ছে। অর্থাৎ ব্রজাঙ্গনা যথেষ্ট ভারতীয় নয় বা পুরাণসম্মত নয়। রাধিকার অবৈধ প্রেম বহুকালাবধি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় বিশ্লেষিত। ব্রজাঙ্গনায় রাধিকা হয়েছে মানবিকতায় ধনী, আধ্যাত্মিকতায় নয়। কবির মনে এই কারণে নবীন সমাজের পক্ষ থেকে বিরূপতার ভয় ছিল। কারণ নবীন ব্রাহ্মবন্ধুরা রাধাপ্রসঙ্গ আর অশ্লীলতাকে একই পল্লীর অধিবাসী বলে মনে করতেন। তবু ব্রজাঙ্গনাকাব্য ততটা বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হয় নি। বীরাঙ্গনা কাব্য ব্রজাঙ্গনা কাব্যের মূল সুরকেই ফুটিয়ে তুলেছে। কিন্তু এ কাব্যের বিষয়-ব্যবহার-রীতি তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে।

বীরাঙ্গনা কাব্য ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হলেও ১৮৬১ সালের মধ্যেই লিখিত হয়েছিল। রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের নানা নারী চরিত্রের তিনি এখানে জন্মান্তর ঘটিয়েছেন। একুশখানি পত্র লিখে মধুসূদন কাব্যখানি শেষ করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু মাত্র এগারখানি পত্র রচনা ক'রে তিনি বীরাঙ্গনা কাব্য প্রকাশ করেন। তিনি দ্বিতীয়খণ্ডের জন্য আরও পাঁচখানি পত্র রচনা শুরু করেছিলেন; কিন্তু স্বাস্থ্য তখন ভেঙ্গে পড়েছে, মনোবল নিম্নঅভিমুখী হয়েছে। তাই রচনায় সেই পারিপাট্য নেই, এবং রচনা অসমাপ্ত। অথচ অবহেলা নামক শব্দটি মধুসূদনের সাহিত্য থেকে বিতাড়িত। বীরাঙ্গনা কাব্য নতুনের বিজয়-তোরণ।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রামমোহন সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করিয়েছিলেন। ১৮৬১ সালেও কিন্তু প্রমীলাকে চিতায় আরোহণ করতে হয়েছিল। ১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহ আইনসঙ্গত হোল!

তখনও নারী মুক্তি-আন্দোলনে পুরুষেরই নেতৃত্ব।

১৮৫০ সালে বীটন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; ১৮৫৮ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়ায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে বেড়াচ্ছেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে 'বিধবা বিবাহ' নাটক অভিনীত

হয়েছে। কিন্তু তবু ব্রাহ্ম আন্দোলনের এক বিশেষ স্তরে, ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের আগ্রহে নারী মুক্তি-আন্দোলন শুধু পুরুষের সদিচ্ছা নয়, বাস্তব ঘটনা হবে।

১৮৬২ সালে বীরাঙ্গনা কাব্যে বিভিন্ন ভদ্রমহিলা যে দাবী তুললেন তা শুধু বাঁচার দাবী নয়, নারীত্বের দাবী, সমান অধিকারের দাবী। এঁরা প্রত্যেকেই এক একজন Mary Wollstonecraft! কন্যা, স্ত্রী, জননী রূপে নারী-সমাজের বিবিধ দায়িত্ব ও সদ্‌গুণের তাঁরা ছিলেন প্রবক্তা। তাঁদের মনে স্বাধীনতাবোধ আছে, এবং সাহস আছে। চরিত্রগুলি যাদুঘরের 'একজিবিট' নয়, জীবন্ত প্রতিমা—Elemental force. গ্রন্থখানি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে উৎসর্গীকৃত; ঘটনাটি কি দৈবাৎ? এগারখানি পত্র বিচার করলে দেখা যাবে, এগুলি দুই শ্রেণীর রচনা। প্রথম পর্যায়ে পড়ে—

(১) সোমের প্রতি তারা;
(২) লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখা;
(৩) পুরূরবার প্রতি উর্বশী;
(৪) দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী।

দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনা হচ্ছে—

(১) দশরথের প্রতি কৈকেয়ী;
(২) অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী;
(৩) দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী;
(৪) জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা;
(৫) নীলধ্বজের প্রতি জনা;
(৬) শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী;
(৭) দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা।

প্রথম পর্যায়ের পত্রগুলির ভিত্তি বিবাহ-বহির্ভূত প্রেম-পিপাসার উপরে। ঊনবিংশ শতাব্দীর জীবন-পিপাসার বিদ্রোহাত্মক রূপায়ণ এই পত্রগুলি। দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্রপুঞ্জে প্রেম-পিপাসা যা দেখা যাচ্ছে, তা সমাজসম্মত। এ-ছাড়া নারীর অন্য ক্ষুধার কথাও এখানে রয়েছে—মাতৃত্ব। বিবিধ পর্যায়ের পত্রপুঞ্জই মিলিত হ'য়ে বীরাঙ্গনা কাব্য-তরুকে ছায়াস্নিগ্ধ করেছে। আমরা দুই পর্যায়ের পত্রপুঞ্জ থেকে দুইটি বিশিষ্ট পত্র উদ্ধার ক'রে আলোচনা করব।

'সোমের প্রতি তারা' মহাভারতীয় কাহিনীর উপরে প্রতিষ্ঠিত। এ-কথা পুনরায় বলার কোন সার্থকতা নেই যে এ কবিতার মেজাজ মহাভারতীয় মেজাজ নয়।

মহাভারতীয় মেজাজ তো নয়-ই, অনেকে বলবেন ভারতীয় মেজাজও নয়। "কবি সেই কামোন্মত্তা পাপীয়সীকে কোন্ মুখে 'বীরাঙ্গনা' আখ্যা দিলেন। এবং কোন লজ্জায় পতিব্রতাপতাকা শকুন্তলা ও রুক্মিণীর সহিত একাসনে উপবেশন করাইলেন? ছি ছি! কী লজ্জার কথা। ৬৭

বিয়েত্রিচের নয়, ক্লিওপেট্রার ভগিনী এই রমণী যৌবনের বেদনা নিয়ে দাবানল সৃষ্টি করতে চায়। কামনার এমন নিরংকুশ প্রকাশ ভারতীয় সাহিত্যের প্রাচীন যুগে অবারিত ছিল; আজ মধুসূদন সেই অপ্রকাশিত uninhibited কামনাকে দ্বিতীয়বার প্রকাশ করলেন। পত্ররচনায় মেয়েদের মন (মেয়েলি মন নয়) সহজেই কবাট খোলে; কোনরূপ প্রতিনিষেধ হৃদয়-কবাট উদ্‌ঘাটনে প্রতিবন্ধকতা করে না। নীলধ্বজের প্রতি জনাতে মাতৃত্বের বুকফাটা হাহাকার শুধু নয়, প্রতিহিংসার দুর্জয় ক্রোধও প্রকাশ পেয়েছে। প্রতিশোধ-ব্যাকুলা জনা স্বামীকে উত্তেজিত করেছে। যে তার পুত্রকে হত্যা করেছে, জনা তাকে ক্ষমা করতে পারে না। শাবকহীন বাঘিনীর মতই তাই সে গর্জন করেছে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'জনা' নাটকের জনা চরিত্রের সঙ্কেত-লিপি এখান থেকেই সংগৃহীত হয়েছে।

মাইকেলের বীরাঙ্গনা ওবিদের Heroides কাব্যের আদর্শে রচিত। ওবিদের (খৃষ্টপূর্ব ৪৩—জন্ম; খৃষ্টপর ১৭—মৃত্যু) প্রভাব ইংলণ্ডে রেনেসাঁস আন্দোলনে বিশেষভাবে অনুভূত হয়। "কাণ্টেরবেরী টেলস্"-এ ওবিদের বহু গল্প গৃহীত হয়েছে; রচনা-শৈলীতেও ওবিদের অনুসরণ আছে। কবি, চিত্রশিল্পী, ভাস্কর সকলেই ওবিদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। দান্তে, বোকাচিও, সার্ভেনটিস, স্পেনসার, মিলটন—সকলেই ভালভাবে ওবিদ পড়েছিলেন, তার প্রমাণ আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর রোম্যানটিক যুগেও শেলী, কীটস, বাইরন ওবিদের দ্বারা প্রভূত প্রভাবিত হয়েছিলেন।

বাংলাকাব্যের নবজন্ম-মুহূর্তে ওবিদকে অপাংক্তেয় ক'রে রাখা হয় নি। মাইকেলের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটল। হেরোইদ-এ ওবিদ

চরিত্র-চিত্রণের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, বিশেষ ক'রে নারী-চরিত্র বিশ্লেষণে তাঁর অশেষ দক্ষতা দেখতে পাই। অতীত যুগের মধ্যে অনুপ্রবেশ, মৃত চরিত্রকে জীবন্ত করার অনন্যদক্ষতা তিনি দেখিয়েছেন। এ এক অপূর্ব জাতিস্মর প্রতিভা!

মাইকেল যে শুধু ওবিদের আদর্শে ভারতের পৌরাণিক চরিত্রগুলির নবজন্ম ঘটিয়েছেন, তা নয়। তাঁর অনেকগুলি পত্রের প্রেরণাও হোল ওবিদের কোন না কোন পত্র।

যথা 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা' পত্রের সঙ্গে Phyllis to Demophoon পত্রের মিল আছে। ফিলিপ্‌সের পত্র-রচনার হেতু হোল নিম্নরূপ: এথেন্সের রাজা থিসিউস (তখন বিতাড়িত) ও ফিড্রা পুত্র ডেমোফোওন ট্রোয়ান যুদ্ধের শেষে বাড়ি ফিরছিল; ঝঞ্ঝা তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলল থ্রেসের উপকূলে। থ্রেসের তখন শাসনভার লাইকারগাস ও ক্রুসটুমেনার কন্যা ফিলিস-এর ওপর পড়েছে। ফিলিস ডেমোফোওনকে প্রচুর আদর আপ্যায়ন করল; আদর আপ্যায়নের সঙ্গে আরও কিছুও দিল;—দিল দেহ ও মন। এদিকে এথেন্সে পিতৃশত্রু মনেসথিউসের মৃত্যু হয়েছে: এথেন্স পুনরুদ্ধারের এই সুবর্ণ সময় মনে ক'রে ডেমোফোওন স্বদেশযাত্রা করল; ফিলিসকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল যে সে এক মাসের মধ্যেই ফিরবে। দেশে ফিরে সে কিন্তু তার এই প্রতিশ্রুতির কথা একেবারেই ভুলে গেল। কয়েক মাস কেটে গেলে অধীর হ'য়ে ফিলিস এই চিঠিখানি লিখল। তবে এই দুই খানি চিঠির উপসংহার ভিন্নতর। ফিলিস বলেছে—

"There is a boy, bending slightly like a drawn bow; the promontories at its extremities are rugged with lofty rocks; hence have I intended to hurl my body into the waves below: and since thou dost persist in deceiving me, so it will be."[৬৮]

আর শকুন্তলা বলেছে—

বনচর চর নাথ! না জানি কিরূপে
প্রবেশিবে রাজপুরে, রাজসভা তলে?

কিন্তু মজ্জমান জন, শুনিয়াছি, ধরে
তৃণে, আর কিছু যদি না পায় সম্মুখে!
জীবনের আশা হায়, কে ত্যজে সহজে। (পৃষ্ঠা—১৪)

শকুন্তলা ভারতীয় নারী বলেই কি ফিলিসের মত দুর্জয় অভিমান দেখাতে পারল না? শকুন্তলা তখন অন্তঃসত্ত্বা, এ কথা কিন্তু কবি ঘুণাক্ষরেও বলেন নি। কাজেই আসন্ন মাতৃত্ব তার মৃত্যু-ভয়ের কারণ নয়।

দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী পত্রখানির Hermione to Orestes পত্রখানির সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া কষ্টকর নয়। হারমিওন মেনিলাস ও হেলেনের কন্যা। সে গোপনে ওরিসটেসকে ভালো বাসত। কিন্তু প্রতিপালক ঠাকুর্দা এ খবর জানতেন না; তিনি তাকে এ্যাকিলিসের পুত্র পাইরাসের সঙ্গে বিয়ে দিলেন। পাইরাস তাকে বিয়ে করে নিয়ে চলে গেল। কিন্তু সে পাইরাসকে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারল না। হারমিওন তখন ওরিসটেসকে একখানি চিঠি পাঠাল; চিঠির সঙ্গে একখানি তরবারিও।

দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতীর পত্রখানির সঙ্গে Laodamia to Protesilaus পত্রখানির সাদৃশ্য আছে।

লাওডামিয়া প্রটেসিলাউসের স্ত্রী। স্বামী যুদ্ধযাত্রা করলে শঙ্কাকাতরা একখানি চিঠি লেখেন। "The end of my epistle shall be closed with this short injunction : 'If thou hast any care for me, have a care for thyself'[৬৯]

তুলনায় ভানুমতীর উক্তি অনেক যান্ত্রিক--

এসো তুমি, প্রাণনাথ, রণ-পরিহরি!
পঞ্চখানি গ্রাম মাত্র মাগে পঞ্চরথী।
কি অভাব তব, কহ? তোষ পঞ্চজনে;
তোষ আজ্ঞ বাপ-মায়ে; তোষ অভাগীরে;—
রক্ষ কুরুকুল, ওহে কুরুকুলমণি! (পৃ—৪৯)

আমাদের যৌথ একান্নবর্তী পরিবারে ব্যক্তির নিরংকুশ অধিকার নেই; তাই অধিকার বিলুপ্তিজনিত এইরূপ নির্মম হাহাকারও নেই।

সন্দেহ কি ওবিদের রচনায় মানুষী কামনার উগ্রতর প্রকাশ ঘটেছে!

বীরাঙ্গনাকাব্যের ভাষা সুধীজনের প্রশংসা পেয়েছে। মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা অপেক্ষা এ-ভাষা উন্নততর ব'লে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁরা এ প্রশ্নের জবাব দেননি যে বীরাঙ্গনার কাব্য-ভাষায় কি মেঘনাদবধ কাব্য আদৌ রচিত হতে পারত ?

মেঘনাদবধ কাব্য বীরাঙ্গনাকাব্যের মত কেবল এক বিশেষ ভাবনার বাহন নয়, একক অনুভূতি-ভিত্তিক নয়। অপূর্ণতা ও ব্যর্থপ্রেমের শোকোচ্ছ্বাসের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা আছে, বীরাঙ্গনার কাব্য-ভাষা তার অনুকূল। বীরাঙ্গনার কাব্য-ভাষা আত্মমুখী, তার কাব্য-প্রকৃতি লিরিকধর্মী। মেঘনাদবধ কাব্যের কাব্য-প্রকৃতি এখন আমরা বহুদূরে ফেলে এসেছি। বীরাঙ্গনার কাব্য-ভাষা মসৃণ; এই মসৃণতা লিরিকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ছন্দ 'নিরর্গল'; এই নিরর্গলতার কারণ বিষয়-বৈচিত্র্য অনুসারে এখানে ছন্দের প্রকৃতি-পরিবর্তনের প্রয়োজন ঘটেনি।

বীরাঙ্গনার অপূর্ব সাংগীতিক অখণ্ডতা,—ছন্দ ও ভাষার আত্যন্তিক নিবিড়তা কাব্যামোদীদের অকুণ্ঠ স্তুতির সুভাজন হয়েছে। এ যুগেও বিপরীত ধর্মী সমালোচকেরা এ কাব্যের প্রশংসায় একমত হয়েছেন—প্রমথনাথ বিশী ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এ কাব্যের সমজদার।

বীরাঙ্গনা কাব্য গীতিকবিতার আগমনী। 'ব্রজাঙ্গনা'তেও কাহিনী নেই : কিন্তু প্রতিটি কবিতায় একটি বিশেষ পটভূমিকা সর্বক্ষণ বিরাজিত থাকায় একটি সূক্ষ্ম কাহিনী-সূত্র আবিষ্কার করা কষ্টকর নয়। কিন্তু আলোচ্য কাব্যে মধুসূদন কোন বিশেষ কাহিনীর সূত্রে কবিতাগুলিকে গাঁথেন নি। প্রতিটি কবিতায় পৃথক্ বিষয়বস্তু অবলম্বিত হয়েছে। এবং এই পার্থক্য সত্ত্বেও বীরাঙ্গনা কাব্যের মূল সুরটি এখান থেকে পরিপুষ্ট। গীতিকাব্যের ঐক্যের সূক্ষ্ম স্বর্ণসূত্র বিষয়-ভিত্তিক নয়, ভাব-ভিত্তিক বা রস-ভিত্তিক হতে চলল। গীতিকবিতার প্রাদুর্ভাব-যুগে এই উত্তরণও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

* * *

বীরাঙ্গনা কাব্য থেকে চতুর্দশপদী কবিতাবলী—এই চারি বৎসর কবির ব্যক্তিজীবন নানা কারণে বিপর্যস্ত। আবার এই দুই কাব্যের মধ্যবর্তীকালে শুধু জীবন নয়, বহু রচনাও বিপর্যস্ত!

মধুসূদনের কবিসত্তার মধ্যে একটি বৈপরীত্য ছিল, একদিকে মিলটন আর

একদিকে পেত্রার্কা। আর এই দুয়ের ওপর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উপ-জগৎ সৃষ্টি করেছেন হোমার ও সেক্সপীয়র। মধুসূদনের দ্বৈত সত্তা বাংলা কাব্যকে নানা পথের নিশানা দিয়েছে; এবং কবি মধুর কাব্য-কীর্তির সম্পূর্ণতা দান করেছে। আবার এর মধ্যে একটা অপূর্ণতাও আছে। এবং এই অপূর্ণতা ঢাকতে সমালোচকেরাও কবিসুলভ মন্তব্য করেছেন, মধুসূদন অলিখিত মহাকাব্যের কবি। 'নীরব কবি' তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ভৎর্সিত, তবু তা এখনও উৎপাত করছে (সম্ভবত প্রেতযোনি থেকে?)। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনার মুহূর্তেই কবি সুভদ্রাহরণ, সিংহল-বিজয় প্রভৃতি কাবা রচনার প্রয়াসী হন। কোন রচনাই সমাপ্ত হয়নি। প্রকাশক বলেছেন সময়াভাব। যে কবি চতুর্দশপদীর ১৪২৮ (১০২ × ১৪) পংক্তি পদ্য লিখেছেন, হেকটরবধ, মায়াকানন সমাপ্ত করেছিলেন, তাঁর সম্পর্কে এই কৈফিয়ৎ খুব মজবুত কি? "...তিনি সুভদ্রাহরণ-বৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করিয়া সময়াভাবে শেষ করিতে পারেন নাই।......তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য আদ্যন্ত সংশোধিত করিবার এবং বিদ্যালয়োপযোগী আর একখানি নীতিগর্ভ পুস্তক রচনা করিবারও মানস করিয়াছিলেন; কিন্তু সময়াভাবে সে গুলিও শেষ করিতে পারেন নাই, সকলেরই কিয়দংশ মাত্র লিখিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন।"[৬৯]

সময়াভাব কথাটি অগ্রাহ্য করার মত নয়; শরীর যে ব্যাধিজর্জর হয়ে পড়ছিল, তাও বাস্তব সত্য। কিন্তু সময়াভাব ও স্বাস্থ্যহীনতা সকলের ক্ষেত্রে দুর্জয় দুর্দমনীয় আবেগের সাহিত্য-রূপ দানের প্রতিবন্ধক হতে পারে না। যদি ঐ সকল কারণ থাকা সত্ত্বেও চতুর্দশপদী কবিতাবলী লিখিত হতে পারে, মায়াকানন, বিষ না ধনুর্গুণ সমাপ্ত হতে পারে, তবে অন্তত: আর একখানি মহাকাব্য (heroic poem) লিখিত হতে পারত।

মহাকাব্য কোন যুগেই ঝুড়ি ঝুড়ি লিখিত হয় না; আবার কোন যুগে আদৌ লিখিত হয় না। মাইকেলের যুগে একটা বিস্ফারণ ঘটেছিল, এবং এই বিস্ফারণ আমাদের বৈষয়িক জীবনের সঙ্কীর্ণতা ও দীনতার জন্য দীর্ঘস্থায়ী ও বৃহৎ হয়নি; তবু এ যে একটা 'awakening,'-একটা জাগরণ ও বিস্ফারণ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। মেঘনাদবধ কাব্য তারই মহাকাব্যিক রূপ। ঐ মেঘনাদবধ কাব্য রচনার মধ্য দিয়েই ঐ যুগের নবোত্থিত

জীবনদর্শনের বা সমাজ-সত্যের কাব্যচরিতার্থতা ঘ'টে গিয়েছিল। দ্বিতীয় কোন মহাকাব্য রচনা অপ্রয়োজনীয়; তাই অসমাপ্ত।

যুগ-প্রয়োজন ব্যতীত মহাকাব্য রচনায় প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য। শুধু প্রতিভাধর ব্যক্তিই এই প্রয়োজন যথাযথ সময়ে উপলব্ধি করতে পারেন; পরেও নয়, আগেও নয়। স্পেঙ্গলারের ভাষায় "neither earlier, nor after."......

তাই বলে কবি কি নীরব থাকবেন? এবং সমালোচকরা বলবেন, "তিনি অলিখিত মহাকাব্যের কবি?" না, কখনই তা নয়। মিলটন দ্বিতীয় মহাকাব্য লিখেছেন, তাতেই ত ব্যর্থ। তৃতীয়, কি চতুর্থ প্যারাডাইস লষ্ট লিখতে পারেন নি ব'লে সমালোচকরা তাঁর সময়াভাবের জন্য সান্ত্বনা খোঁজেন নি,—'অলিখিত মহাকাব্যের কবি' বলে সমালোচক-প্রতিভার অলোকসামান্যতা দেখান নি।

মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনাকাব্য, বীরাঙ্গনাকাব্য ও চতুর্দশপদী কবিতাবলী লিখিত কাব্য; এবং আমরা এই লিখিত কাব্যত্রয়ের সাফল্য থেকেই নিঃসংশয়ে একথা বলতে পারি, মাইকেল গীতিকাব্যের আদি কবি। মহাকাব্য কোন যুগেই ঝুড়ি ঝুড়ি লিখিত হয় না। গীতিকবিতার সঙ্গে অজস্রতার জন্মগত সম্পর্ক। আর মহাকাব্য নিঃসঙ্গতার চরম উদাহরণ, কাব্য-কাননের সে মহামহীরুহ।

চতুর্দশপদী কবিতাবলীর কবিতাগুলিকে বিষয়-বৈচিত্র্য অনুসারে বিভক্ত করলে নিম্নরূপ দাঁড়ায়: (ক) আত্মকথামূলক; (খ) প্রেমমূলক; (গ) প্রকৃতিমূলক; (ঘ) পৌরাণিক; (ঙ) মহাপুরুষ প্রশস্তিমূলক; ও (চ) সাহিত্য ও কাব্য বিষয়ক; (ছ) বিবিধ। আমরা ইচ্ছা ক'রেই আত্মকথামূলক ও প্রেমমূলক কবিতা দুই পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। আত্মকথামূলক কবিতার পর্যায়ে প্রেম-মূলক কবিতা সন্নিবিষ্ট হতে পারত, কিন্তু এখানে প্রেম-ভাবনা এক বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে হাজির হয়েছে।

আত্মকথামূলক কবিতায় কবির আশানৈরাশ্য স্বপ্নসাধ চৌদ্দ পংক্তির সংকীর্ণ অবয়বে উচ্ছ্বসিত হয়েছে, প্রশান্ত হয়নি।

> "সুবর্ণ দেউল আমি দেখিনু স্বপনে
> অতি-তুঙ্গ শৃঙ্গ শিরে।"

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রমথনাথ বিশী এই কবির অন্তর্জীবন ব্যাখ্যায় অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন ; কিন্তু স্বপ্নে কুবেরের বা লক্ষ্মীর স্বর্ণ দেউল দর্শন, তাঁরও দৃষ্টির আওতায় এল না। কবির জীবন আর কবির কাব্য এক হয়েও এক নয়।

প্রেম-মূলক কবিতা ছয়টি পাওয়া যাচ্ছে—মেঘদূত—১০, ১১ ; পরিচয়—১৩, ১৪ ; ও ৫৮, ১০০ সংখ্যক কবিতা। প্রমথনাথ বিশী বলেছেন যে, ১০/১১ কবিতা কল্পনামূলক ; এতে বাস্তব ঘটনার সংশ্রব নেই। ১৩, ১৪, ৫৮ ও ১০০ সংখ্যক কবিতার পশ্চাতে বাস্তব প্রেরণা আছে।

১০০ সংখ্যক কবিতার উৎস সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই—কবিপ্রিয়া আঁরিয়েতার উদ্দেশে এই কবিতাটি লিখিত।

দূরে কি নিকটে

যেখানে যখন থাকি, ভজিব তোমারে ;
যেখানে যখন যাই, যেখানে যা ঘটে।
প্রেমের প্রতিমা তুমি আলোকে আঁধারে।
অধিষ্ঠান নিত্য তব স্মৃতি-সৃষ্ট মঠে,—
সতত সঙ্গিনী মোর সংসার-মাঝারে।

'সংসার-মাঝারে' কথাটি থাকায় কবিতাটি মাটিতে অনেকখানি পা ডুবিয়েছে।

১৩, ১৪ ও ৫৮ সংখ্যক কবিতার উৎস সম্পর্কে অধ্যাপক প্রমথনাথ এক ফরাসী মহিলার কথা বলেছেন। এই ফরাসী মহিলার সঙ্গে কবির প্যারিসে আলাপ হয়,—মধুস্মৃতিতে নগেন্দ্রনাথ সোম একথা বলেছেন। তাছাড়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লিখিত এক পত্রে মধুসূদন বিষয়টির উল্লেখ করেছেন। ৫৮ সংখ্যক কবিতায় 'চারুনেত্রা' বিশেষণটি অতীব উল্লেখযোগ্য ; আর উল্লেখ-যোগ্য লক্ষ্মণ প্রসঙ্গ। বীরাঙ্গনাকাব্যে 'লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখা'র পত্রে রাক্ষস-রমণীর এক প্রেমোন্মত্ত হৃদয় উলঙ্গিত হয়েছে, ব্রহ্মচারী লক্ষ্মণ তাতে সাড়া দেয়নি। জীবন-রস রসিক মধুসূদন লক্ষ্মণের এই তথাকথিত ত্যাগ ও ব্রহ্মচর্যকে সমর্থন-যোগ্য মনে করেন নি।

এতে দিগম্বরী-রূপ যদি, সুবদনি
ত্রস্ত হয়ে ব্যস্ত কে লো পরাস্ত না মানে ?

এই স্বীকারোক্তি বিবাহিতা স্ত্রী সম্পর্কে হাস্যকররূপে অনাবশ্যক। কাজেই কোন কোন সমালোচক এই কবিতার পশ্চাতে কবির প্রথমা পত্নী রেবেকার ছায়া দেখেছেন, তা নিতান্তই ভুয়োদর্শন।

"আমার নিজের প্রবণতা ছয়টিকে একসূত্রে গাঁথিয়া একমাত্র রমণীতে প্রতিষ্ঠিত করিবার দিকে। কিন্তু সেরূপ করিবার অন্তরায় প্রমাণাভাব। তবে এতক্ষণ কি বলিলাম?

বলিলাম এই যে রমণী একটি হোক বা একাধিক হোক এই সনেটগুলিতে মধুসূদন তাঁহাদের ব্যক্তিগত-প্রণয় অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার অনুরূপ তাঁহার কাব্যে আর কোথাও নাই—তাই এগুলির মূল্য অত্যন্ত বেশী।"[৭১]

অধ্যাপক বিশী ছয়টি কবিতাকে একত্রে গেঁথে একটি রমণী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। বাস্তব ঘটনায় একজন রমণী ছিল কিনা, তা সন্দেহের। কল্পনায় মধুসূদন এক চিরন্তন প্রেমিকামূর্তি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সেখানে যে নানা মূর্তি মিলে-মিশে গেছে, এতে সন্দেহ নেই।

পৌরাণিক পর্যায়ে বহু কবিতার মধ্যে রমণী-প্রসঙ্গই মুখ্যস্থান জুড়ে আছে—সীতাদেবী, সুভদ্রা, উর্বশী, হিড়িম্বা, দ্রৌপদী, শকুন্তলা। এ ছাড়া, পুরুরবা ও ব্রজবৃত্তান্তে ঐ একই আবেশকে সংহত করা হয়েছে।

সীতা ও সুভদ্রা মধুসূদনকল্পিত একই রমণীর দুই রূপ। আপাত মনে হয় দুইটি বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব; কিন্তু তলে তলে পাঠককে প্রতারিত করে তারা কখন যেন মিলিত হয়ে পড়েছে।

কবির পত্নী-ভিত্তিক ও পত্নী-বহির্ভূত রমণী-কল্পনার মধ্যস্থিত যোগ-সূত্রটি এই পৌরাণিক আলোকে সহসা দৃশ্যমান হয়ে পড়ে।

কবির পৌরাণিক কবিতাবলীর পাশাপাশি রেখে মহৎ ব্যক্তির প্রশস্তিমূলক কবিতাসমূহ পড়লে শেষোক্তশ্রেণীর কবিতার নব মূল্যায়ন ঘটে।

কালিদাস, জয়দেব, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, ঈশ্বর গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিগুরু দান্তে, পণ্ডিতপ্রবর থিওডোর গোল্ড্‌ষ্টুকর, কবিবর আলফ্রেড টেনিসন, কবিবর ভিক্তর হ্যুগো এবং সর্বশেষে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। লক্ষ্য করবার এইটুকু যে, মহৎ ব্যক্তিমাত্রেই কবির নিকট সংস্কৃতির একনিষ্ঠ কর্মিরূপে দেখা দিয়েছেন। ক্ষমতাবান রাষ্ট্রনায়ক বা বিত্তবান ব্যবসায়ীরা তাঁর প্রণতি ও

প্রশস্তির অধিকারী হয়নি। (হায় এ যুগের কবি!) মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণও ত শুধু ধনী বা ঐশ্বর্যশালী নয়! মাইকেলের প্রশস্তিভাজনেরা ঐতিহাসিক ও সাম্প্রতিক কালের হয়েও পৌরাণিক বীর পুরুষদের আদল পেয়েছেন, যেমন পৌরাণিক ব্যক্তিরা আধুনিক আদল পেয়েছেন; বা এই উভয় জগৎ মিলে কবির আদর্শ জগৎ সৃষ্টি করেছে।

সাহিত্য-কাব্য-বিষয়ে কবি একাধিক কবিতা রচনা করেছেন। এবং এগুলি পূর্বতন সংস্কৃত কাব্য-জিজ্ঞাসার বঙ্গীয় সূত্র মাত্র নয়।

বঙ্গভাষা, কবি, কবিতা, মহাভারত, সরস্বতী, কল্পনা, করুণরস, বীররস, শৃঙ্গাররস, রৌদ্ররস, ভাষা, সংস্কৃত, রামায়ণ, মিত্রাক্ষর—আলোচ্য কবিতাগুলিতে কবির সাহিত্য-সাধনার ইতিহাস (বঙ্গভাষা, মিত্রাক্ষর) থেকে শুরু ক'রে কবির ব্যক্তিগত সাহিত্যবোধের স্বাক্ষর রয়েছে। কোন কোনটি কবির রস-চর্বণার পরিণতি—কমলে কামিনী, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, শ্রীমন্তের টোপর এবং ঈশ্বরী পাটনী। ঈশ্বরী পাটনীকে আমরা পরেও স্মরণ করব—কারণ সে যে অবিস্মরণীয়! কবি অনেক চিঠিপত্রে তাঁর সাহিত্যবোধের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন—প্রস্তাবিত কবিতাগুলি সেই বিশ্লেষণকে শক্তিশালী করবে।

> কে কবি—কবে কে মোরে? ঘটকালি করি,
> শবদে শবদে বিয়া দেয় যেইজন,
> সেই কি সে যম-দমী? (কবি)

শব্দের সঙ্গে শব্দের মিলনের ঘটক হলেন কবি। একথা বাংলা-কাব্য-ইতিহাসে ভারতচন্দ্রের পর দ্বিতীয়বার বিবৃত হলো।

কল্পনা ও সরস্বতী—কবিতাচয় একই ধর্মে দীক্ষিত। সরস্বতীর চরণ দুখানি কবির বাস্তব জীবনের জ্বালা জুড়াবার স্থান। 'কল্পনা' কবিতায় কবি পলাতকা-বৃত্তি অবলম্বন করতে চান। শব্দের সঙ্গে শব্দের বিবাহ দিয়েছেন; কিন্তু তাদের জন্মান্তর ঘটাননি। আর কল্পনার কর ধারণ ক'রে কবি ত্রিভুবন পর্যটন করেছেন—

> কি স্বরগে, কি মরতে, অতল পাতালে,
> নাহি স্থল যথা, দেবি, নহে তব গতি!

কিন্তু সাধারণ জগৎকে অসাধারণ করতে পারেন নি। কবির কল্পন নিতান্তই বহির্মুখী।

চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে নিসর্গবিষয়ক বা প্রকৃতিমূলক কবিতার সংখ্যা সর্বাধিক,—(১) সায়ংকাল, (২) সায়ংকালের তারা, (৩) নিশা, (৪) ছায়াপথ, (৫) সূর্য, (৬) নন্দনকানন, (৭) রাশিচক্র, (৮) শনি, (৯) তারা, (১০) নিশাকালে নদীতীরে বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির, (১১) কুসুমে কীট, (১২) বটবৃক্ষ, (১৩) মধুকর, (১৪) উদ্যানে পুষ্করিণী, (১৫) কেউটিয়া সাপ, (১৬) সাগরে তরি, (১৭) পৃথিবী, (১৮) নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ মন্দির, (১৯) ভরসেলস নগরের রাজপুরী ও উদ্যান, (২০) নূতন বৎসর, (২১) শ্যামাপক্ষী ও (২২) বউ কথা কও।

কবিতাগুলিকে যদি উপশাখায় ভাগ করি, তবে দেখব এর মধ্যে কয়েকটিতে আছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতামূলক প্রত্যক্ষ জগৎ আর বাকীগুলিতে আছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত অপ্রত্যক্ষ জগৎ।

এই দুই জগতের দুইরূপ। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাবহির্ভূত জগৎ হ'ল কল্পনার ঐশ্বর্যে ভরপুর।

আর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মায়া কিরণ লেগেছে যে জগতে, তার আকর্ষণ ঐশ্বর্যের জন্য নয়, কল্পনা বিলাসের জন্য নয়। বৈভব, ঐশ্বর্য এখানে অবান্তর। প্রয়োজন শুধু হৃদয়-অমৃতের।

বিদেশে অন্তরীণ কবির স্মৃতিকে উদভ্রান্ত করেছে দূর মাতৃভূমির তরু-মাঠ-প্রান্তর-নদী। এ এক অপূর্ব nostalgia! থিওক্রিটাস থেকে গ্রাম্য জীবনের মাধুর্য গেয়ে বহু কবিতা লেখা হচ্ছে। বর্তমানে সে গান তার সুর বদলেছে। ইংরেজী কাব্যে কেলটিক আন্দোলনের সঙ্গে মাইকেলী প্রয়াস তুলনীয়।

আন্তরিকতার অমৃতে জারিত হয়েছে বাংলার চিরকালের পথঘাট, দেব দেউল, তরুলতা, নদনদী, বিহঙ্গ, এমন কি দিগন্তের তারা। এরা কেউ ইতিহাসের কুশীলব নয়—বাংলার অতি পরিচিত অতি নগন্য পল্লীর উপকরণ। কিন্তু কবির প্রেমিক লেখনীর চুমায় চুমায় এরা অভিষিক্ত।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার জগৎ ও নৈর্ব্যক্তিক জগৎ—উভয়ের সম্পদ সমাহৃত ক'রে রচিত হয়েছে 'সাগরে তরি।' এবং এই জাতীয় রচনা একবারই মাত্র।

হেরিনু নিশায় তরি অপথ সাগরে,
মহাকায়া, নিশাচরী, যেন মায়া-বলে,
বিহঙ্গিনী-রূপ ধরি, ধীরে ধীরে চলে,
রঙ্গে সুধবল পাখা বিস্তারি অম্বরে!
রতনের চূড়া-রূপে শিরোদেশে জ্বলে
দীপাবলী, মনোহর নানা বর্ণ করে,—
শ্বেত, রক্ত, নীল, মিশ্রিত পিঙ্গলে।
চারিদিকে ফেনাময় তরঙ্গ সুস্বরে
গাইছে আনন্দে যেন, হেরি এ সুন্দরী
বামারে, বাখানি রূপ, সাহস, আকৃতি।
ছাড়িতেছে পথ সবে আস্তে ব্যস্তে সরি,
নীচজন হেরি যথা কুলের যুবতী।
চলিছে গুমরে বামা পথ আলো করি,
শিরোমণি-তেজে যথা ফণিনীর গতি।

(সাগরে তরি)

সমগ্র কবিতাটি উদ্ধৃত করা গেল। জানার সহায়তায় কবি অজানা রহস্যময়ীর সন্ধান দিয়েছেন। অনির্দেশ্য, অজ্ঞাত এই শক্তির চলাফেরায় বিশ্ব নন্দিত হ'য়ে উঠছে তরঙ্গে-তরঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'র জগৎ প্রায় ছুঁয়ে দেয় দেয়! এবং তা ঐ একবারই মাত্র।

*　　*　　*

বিবিধ পর্যায়ের কবিতায় নানা উৎসব পাল-পার্বণের কথা আছে। দেবদোল, শ্রীপঞ্চমী, আশ্বিনমাস, বিজয়া দশমী, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা—কবির মানস-জগতের আনন্দময় সংবাদ বহন করে। সাংবাদটি পুরানো। আমরা মেঘনাদবধ কাব্যের উপমা-উৎপ্রেক্ষা জগৎ জরিপ ক'রে এই মানস-বিগ্রহের খবর দিয়েছিলাম। কবি এখানে সেই একই প্রতিমা দো-মেটে শুধু করলেন।

চতুর্দশ কবিতাবলীর প্রসঙ্গে স্বভাবতই আর একখানি কাব্যের কথা মনে করিয়ে দেয়—চৈতালি, রবীন্দ্রনাথের চৈতালি। চৈতালিরও বহু কবিতা সনেটের আকারে লিখিত; শুধু সেই কারণেই আমরা একথা বলছি না। চৈতালিতেও কবি বাংলাদেশের নানা চিত্র উদ্‌ঘাটন করেছেন। গ্রাম-বাঙলার অকিঞ্চিৎকরতা,

তুচ্ছতা, অজ্ঞাতকুলশীলতা ও ছায়া-সুনিবিড়তার মধ্যে কবি মাধুর্য খুঁজে পেয়েছেন। কখনও দেখতে পাই দুপুরের রৌদ্রে শৈবালে জর্জর স্রোতোহীন স্থির ক্ষুদ্রশীর্ণ নদী কবির মন কেড়েছে, কখনও বা বরষায় সেইনদী শিশু-প্রায় তৃপ্ত নিস্তরঙ্গ পুষ্ট অঙ্গে নিঃশব্দে ঘুমুচ্ছে দেখে কবি পরিতৃপ্ত হয়েছেন। গ্রাম-বাঙ্‌লার এই সজল সবুজ আঁচলের ভিজা ছায়ায় কবি নিজেকে সমর্পন করেছেন। শুধু প্রকৃতি নয়, এই প্রকৃতির দোসর নামহীন সাধারণ মানুষ রবীন্দ্র-কাব্যে আসন পেতেছে। মাইকেল মানুষকে বাদ দিয়ে গ্রামকে দেখেছেন; তাঁর দেখা বাঙলা তাই আধখানা বাঙ্‌লা (পাঠক, রাজনৈতিক অর্থে গ্রহণ করবেন না)। মাইকেলের ঈশ্বরী পাটনী অবিস্মরণীয়; কিন্তু ঈশ্বর পাটনী কবির রস-চর্বণার পরিণতি। ঈশ্বরী পাটনী বাঙ্‌লার হয়ত চিরকালের অধিবাসী, কিন্তু একান্ত ক'রে কোন কালের নাগরিক নয়। মাইকেলের উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর পাটনীদের গ্রাম-বাঙ্‌লার বুকের মধ্যে বসিয়ে তাদের তুচ্ছ সাধারণ রূপ ও মাহাত্ম্য অবলোকন করেছেন। তাই মাইকেল শুধু বহিঃভাগের কবি, বহিঃদেশের কবি, বিদেশের কবি যদিও নন। রবীন্দ্রনাথ জীবনের দুই দেশের কবি। চৈতালির জগৎ শুধু ইচ্ছামতী আর পদ্মার তরঙ্গ কলরবে মুখর নয়; পুঁটুরানী, দিদি, আর দিদির সেই উলঙ্গ ভ্রাতৃবরের অবোধ্য অন্ত্যজ কাকলিতে ভরপুর। গ্রাম-বাঙলার এমন আন্তরিক আলেখ্য আর এক কবি পরিবেশন করেছেন, তিনি জীবনানন্দ দাশ। তাঁর কাব্যে মাইকেল দৃষ্টিরই আর এক বিস্ময়কর পরিণতি দেখা যাবে, প্রকৃতিই সেখানে মানুষ হয়ে পড়েছে। আর মানুষ সেখানে প্রকৃতি হ'তে না পেরে স্থান পেল না।

মাইকেলের হাতে বাংলার রেনেসাঁস যুগের দ্বারোদ্ঘাটন ঘটেছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের অশনি নিনাদে এই দুয়ার উন্মুক্ত হোল; এই দ্বার উদ্ঘাটনে আর একটি চাবি তিনি ব্যবহার করেছেন—সে হোল সনেট। সনেট রেনেসাঁসের স্বর্ণচাবি। সনেট ব্যতীত রেনেসাঁসের দ্বারোদ্ঘাটন সম্পূর্ণ হয়না। সনেট একাধারে হৃদয়-বৃত্তির উত্তাল উর্মিমালা ও সংযমের নিশ্চিন্ত তটযুগল।

ইংলণ্ডের জনৈক কবিশ্রেষ্ঠ সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি সনেট লিখে তাঁর মনের কবাট খুলেছিলেন। মাইকেলের মন পুরাণ-জগৎ পরিক্রমার শেষে নবীন বা বর্তমান জগতে এসে ভিড়েছে। মেঘনাদবধ, ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনা মাইকেল-

হৃদয়ের নানা মহলেরই ত দ্বার খুলেছে। যে মন গোপনচারী, ভীরু, ও আত্ম-পরায়ণ, তার দুয়ার এতদিনও অর্গলবদ্ধ ছিল। চতুর্দশপদী কবিতাবলী সেই দ্বারের অর্গল উন্মোচন করেছে। "I have been lately reading Petrarca, the Italian poet, and scribbling some "sonnets" after his manner."

—গৌরদাস বসাককে লিখিত চিঠি, ১৮৬২, ২৬ জানুয়ারী।

... ...

"In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian.

... ...

I dare say the sonnet চতুর্দশপদী will do wonderfully well in our language.

... ...

Believe me, my dear fellow, our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up."

মধুসূদন সবশুদ্ধ ১০২টি সনেট রচনা করেছেন। সনেটগুলির রূপগত সার্থকতা নিয়ে নানাজন নানা মত অভিব্যক্ত করেছেন। তন্মধ্যে মোহিতলালের অভিমতের গুরুত্ব আছে।

"মধুসূদনের সনেটগুলির ভাববস্তু খুব গভীর নয়, একটি সাধারণ চিন্তা বা ভাব, কিছু বিশেষ বক্তব্য বা মন্তব্য, এবং তৎসহ একটু আলংকারিক কবি-কল্পনা—ইহাই তাহাদের উপজীব্য। যে গূঢ়সঞ্চারী ভাব ও ভাবনার দীপ্ত আবেগ, এবং সেই আবেগের অতিশয় সংহত বাণীরূপ সনেটের প্রধান গৌরব, মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতায় তাহার একান্ত অভাব।" [১২]

একথা ঠিক যে মধুসূদনের অষ্টক ষটক বিভাগ নিতান্তই আঙ্গিকগত; খুব অল্পক্ষেত্রেই ভাবগত।

মাইকেল সনেটের আদিশিল্পী। মোহিতলাল অবশ্য এই আদিশিল্পীর মর্যাদা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেন নি। "আদি সনেটের রচয়িতা হিসাবে মধুসূদনের কীর্তি স্মরণীয়; তিনি বাংলা সনেটের ছন্দ ও আকৃতি ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন; এবং তাঁহার চতুর্দশপদীর একটি লক্ষণ সনেটের লক্ষণই বটে।" [১৩] এই স্তুতিও অবশ্য দ্বিধাশূন্য নয়।

মাইকেল ইতালীতে গিয়েই সনেট সম্পর্কে সচেতন হলেন, এটা সংবাদ হিসাবে সত্য নয়। মাইকেল ছাত্র-অবস্থাতেই সনেট-চর্চা করতেন; অবশ্য তা বিদেশীভাষায়। এবং এই সনেটের গঠন-রীতিতে মিলটনীয় আদর্শ সক্রিয় ছিল। এই মিলটনীয় আদর্শটি তিনি ডিরোজিও ও রিচার্ডসনের ইংরাজি রচনা থেকে শিখে নিয়েছিলেন। সেখানেও অষ্টকে দুই এবং ষটকে দুই বা ততধিক মিল দেখা যায়। আমরা মাইকেল-লিখিত কয়েকটি ইংরাজী সনেটের কাঠামো ইতঃপূর্বেই বিশ্লেষণ করেছি, এগুলির সঙ্গে তাঁর বাংলা ভাষায় লিখিত সনেটগুলির রূপ-নির্মিতির মিল আছে। "পেত্রার্কের (১৩০৪—৭৪) সনেটের বাহ্যিক গঠন অনুসারে মধুসূদন চতুর্দশপদী কবিতাবলী লিখেন নাই, যদিও সর্বসমেত ১০২টি কবিতার মধ্যে তেতাল্লিশটিতে পেত্রার্কের অনুযায়ী অষ্টক-ষটক বিভাগ আছে (কখ কখ কখ কখ+গঘ গঘ গঘ)। মধুসূদন এ বিষয়ে মিলটনেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। মিলটনের অষ্টকে দুইটি মিল, মধুসূদনেরও তাই। মিলটনের ষটকে দুইটি বা তিনটি মিল, মধুসূদনও তাহাই করিয়াছেন। চতুর্দশপদী কবিতাগুলির মধ্যে পাঁচটির ষটকে পাই তিনটি মিল, একটিতে অষ্টক ষটক মিলিয়া তিনটি মিল, আর বাকি ছিয়ানব্বইটি কবিতার ষটকে দুইটি করিয়া মিল।"[৭৪] সনেটে অনুপ্রাস প্রভৃতি প্রাচীন কাব্য-রীতি ও কলাবিধি অবলম্বিত হয়নি। এইকারণে চতুর্দশ পদাবলীর ভাষা সমসাময়িক যুগে অভিনন্দন লাভ করেছিল।[৭৪ক]

মাইকেলের "বিবিধ" পর্যায়ের কবিতাগুলি পাঠকের অন্তহীন শোকের কারণ। বহু অসমাপ্ত রচনা কবির অকৃতার্থ ভালোবাসার নজির হ'য়ে রয়েছে। সিংহলবিজয়, রিজিয়া, সুভদ্রাহরণ—সবই কবি-আকাঙ্ক্ষার অচরিতার্থতার উদাহরণ।

"আত্মবিলাপ" ও "বঙ্গভূমির প্রতি" এই হাত-পা-ভাঙ্গা সৃষ্টির জগতের শ্রেষ্ঠ কবিতা; সম্পূর্ণ এবং সমাপ্ত। "আত্মবিলাপ" রাবণ-কাব্যকারের পরিণত হৃদয়-সংগ্রামের পাঁচালী।

কবিতাটির স্তবক-রচনা ও মিল-বিন্যাস অভিনব। ত্রিপদী চৌপদীর অনুচ্ছেদ বিভাগ নয়, মিলের এক নব্য শৃঙ্খল সৃজন ক'রে, এক নব্য স্তবক তিনি

তৈরি করেছেন। এবং স্তবকে স্তবকে কবির "আইডিয়া" এক এক পদক্ষেপে যেন সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এরা পৃথক্ হয়েও এক, বিভক্ত হয়েও অবিভাজ্য। ভবিষ্যৎ বাংলা কবিতা-শরীর রচনায় এই দৃষ্টান্ত অবহেলিত হবে না। "বঙ্গভূমির প্রতি" রবীন্দ্রনাথের "অয়ি ভুবনমনোমোহিনী" রচনা-পূর্ব যুগের মাতৃভূমির শ্রেষ্ঠ অকপট বন্দনা। এর পাশে ভারতচন্দ্রের অঞ্চল-প্রীতিসূচক পঙ্ক্তি বর্বরতার নামান্তর।

মাইকেলের নীতিগর্ভ কবিতা দ্বিতীয় চাণক্যশ্লোক কিংবা পরবর্তী 'সদ্ভাব শতক' (১৮৬১) নয়। ময়ূর ও গৌরী, কাক ও শৃগালী, রসাল ও স্বর্ণলতিকা, অশ্ব ও কুরঙ্গ, কুক্কুট ও মণি, সিংহ ও মশক, পীড়িত সিংহ ও অন্যান্য পশু—এই কবিতাগুলিতে নীতিবিদের কুঞ্চিত ভুরু, যেমন দেখা যায়; পরিহাস রসিকের চাপা ঠোঁটের কোণে বিচ্ছুরিত হাসির টুকরাও তেমনি অলক্ষ্য নয়। অর্থবান, অথচ বিদ্যাহীন ও অথর্ব ক্ষমতাদম্ভীর প্রতি কবি রূপকের রূপালি তীর নিক্ষেপ করেছেন; শুধু বিদ্ধ করাই উদ্দেশ্য নয়, তীরের গতি-রেখার ঝলকানিটুকুও দর্শনীয়।

মধুসূদন নীতিগর্ভ কবিতায় নবীনতর ইশপের গল্প লিখতে চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর পথ-প্রদর্শক হলেন বিখ্যাত ফরাসী কবি লা ফঁতেন (La Fontaine) জন্ম—১৬২১, মৃত্যু—১৬৯৫। মধুসূদনের নীতিগর্ভ কবিতা প্রকাশিত হয়েছে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে; বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'কথামালা' (১৮৫৬) তার পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। লা ফঁতেন স্বয়ং ঈশপ, ফিড্রাস, পিলপে প্রভৃতির অনুসরণ করেছেন।

মধুসূদনের 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা', 'ময়ূর ও গৌরী', 'কাক ও শৃগালী' কবিতাত্রয়ের সঙ্গে যথাক্রমে লা ফঁতেনের 'ওকগাছ ও নলখাগড়া (Le chene et Le Roseav) জুনোর কাছে ময়ূরের নালিশ (Le Pson se plainquant a Junon) ও 'কাক ও শৃগাল' কবিতাত্রয়ের সাদৃশ্য আছে। উভয়ের জীবন-ছন্দেও সাদৃশ্য ছিল।[৭৫]

মাইকেলের প্যারিস-ভ্রমণ শুধু 'টুরিষ্টে'র বাহ্যসম্ভোগে মুখর নয়, আন্তর সম্ভোগেও ধ্যান-গম্ভীর। প্যারিস থেকে লিখিত চিঠিপত্রে তার প্রমাণ আছে

লা ফঁতেন শুধু মাইকেলের আদর্শ নন, তিনি এক আন্তর্জাতিক প্রভাব।* বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক ক্রিলভ রুশ সমাজের প্রচলিত ভূমিদাস প্রথা, ভূস্বামীদের শোষণ, অভিজাতবর্গের অত্যাচার ও অসাধু কর্মচারীদের অবিচারের বিরুদ্ধে যখন প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য উৎকণ্ঠিত হচ্ছিলেন, তখন প্রতিভাধর ফরাসী শিল্পী লা ফঁতেন লিখিত এই রূপক-আশ্রয়ী অপরূপ পরিহাস-বিজল্পিতম তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। জারের কঠোর সেন্সর ব্যবস্থাকে বৃদ্ধ-অঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তাঁর শিশু-ভুলানো কথার ডালি (১৭৮৯-৯০) প্রকাশিত হোল।

মাইকেল সেই আন্তর্জাতিক কাব্য-কৌশলকে বাংলার পরদেশী শাসনজর্জর প্রেস আইনে কণ্ঠরুদ্ধ উনবিংশ শতাব্দীর দুঃস্থ পরিবেশে উপস্থিত করলেন।

উর্ধ্বশির যদি তুমি কুল মান ধনে ;
করিও না ঘৃণা তবু নীচশির জনে। (রসাল ও স্বর্ণলতিকা)
মূর্খ যে বিদ্যার মূল্য কভু সে জানে। (কুক্কুট ও মণি)

কবির নীতিগর্ভ কবিতায় ছন্দ, মিল ও চরণ বিন্যাসে নানা পরীক্ষা

* এদেশে ফরাসী কাব্য-সংগ্রহ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশিত হয়। আমরা একখানি কাব্য-সংগ্রহের সন্ধান পেয়েছি। সংকলন-গ্রন্থখানির নাম —Selections from the French Poets of the Past and Present Century—R. F. Hodgson. Calcutta. W. Thacker & Co., 1850. এতে Troubadours, Racine, Cornielle, Rousseau, Moliere, Boileau, La Fontaine, Lamartine, De Vigny, Victor Hugo প্রভৃতির কবিতা স্থান পেয়েছে।

১৮৮০—৯০ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের অধিনায়কত্বে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের পরিচয় যখন ঘনিষ্ঠতর হতে চলেছিল, তখন লা ফঁতেনের নাম আবার শোনা গেল।

"বস্তুত, তাঁর সাহচর্য ও সান্নিধ্যের ফলে আমরা বাড়িতে সর্বদাই একটি সাহিত্যের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছি। * * আমি লরেটো ইস্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি টেবিলের উপর তখনকার দিনের বিখ্যাত ফরাসী কবি কপ্পে, মেরিমে, ল্যকঁৎদলীন, লা ফঁতেন প্রভৃতির রচনাবলী সুন্দর ক'রে বাঁধিয়ে সোনার জলে তাদের নাম লিখিয়ে সাজিয়ে রেখেছিলেন।"

রবীন্দ্রস্মৃতি—ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

নিরীক্ষার সাক্ষাৎ পাই। মাঝে মাঝে আকস্মিকভাবে অভিনব বাক্-নৈপুণ্য আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়:

সাগরের নীল পায়ে পড়ি, ঠোঁটের বলে না টুটে, উজ্জ্বল যৌবন তপন, প্রভৃতি।

* * *

মধুসূদন বাংলার কাব্য-রাজপুরীর অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ। পুরাতনের বিলুপ্তি সাধন ক'রে রাজপুরীর ঐশ্বর্য ও গরিমা প্রবৃদ্ধ করেছেন।

ডিরোজিও, রিচার্ডসন, কাশীপ্রসাদ ঘোষ এবং দত্তমহাশয়দের অচরিতার্থ কাব্য-কৃতি তাঁর হাতে চরিতার্থতা পেল। ডিরোজিওর দেশপ্রেম, রিচার্ডসনের নিসর্গ-প্রীতি (এ নিসর্গ-প্রীতি ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় নয়, 'সিজন্‌স্'এর কবি টমাসের নিসর্গপ্রীতি), কালীপ্রসাদ ঘোষের ভারতীয় জীবন-অনুরাগ ও পুরাণ-আখ্যানের নব রূপায়ণ মাইকেলের মধ্যেই সম্পূর্ণতা পেল। ইন্দ্রজিতের মধ্যেই তো লঙ্কার পরিপূর্ণতা!

মাইকেল উনবিংশ শতাব্দীর এক বিশেষ স্তরের সাহিত্য-বাসনার পরিপূর্ণতা।

উনবিংশ শতাব্দী পরিবর্তন-মুখর যুগ: কোন ভাব বা idea এক সময় জাতির চিত্তকে অধিকার করেছে; কখনও বা সেই 'আইডিয়া' দূরে স'রে যাচ্ছে। মাইকেলের কাব্য-জীবনের আদিপর্বে মূর, বাইরন এবং আংশিকভাবে স্কট প্রভাবশালী। এঁরা (পোপসহ) তদ্‌কালের 'কালচার-'কমপ্লেক্‌স্'-এর অপরিহার্য অঙ্গ; আধুনিকতার মুখ্য মাপকাঠি।

তাঁর Captive Ladie-র একাধিক সর্গের শীর্ষে মূর এবং বাইরনের উদ্ধৃতি আছে। আর ছাত্রাবস্থায় তিনি পোপ নামে অভিহিত হতেন, এ কথা তাঁর একাধিক সহপাঠী বা সমসাময়িক বলেছেন।

কিন্তু তাঁর শিরে কাব্যলক্ষ্মী রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছেন, এত অল্পে তাঁর সন্তুষ্টি আসবে কি ক'রে?

* * *

"I like to see you write my life, if I happen to be a great poet, which I am almost sure I shall be.

*   *   *

My life is more busy than that of a school boy. Here is my routine ; 6 to 8 Hebrew, 8 to 12 school, 12—2 Greek. 2 to 5 Telegu and Sanskrit, 5—7 Latin, 7—10 English. Am I not preparing the great object of embellishing the tongue of my fathers ?

*   *   *

As for me, I never read any poetry except that of Valmiki, Homer, Vyasa, Virgil, Kalidas, and Dante (in transalation), Tasso (do) and Milton. These কবি কুলগুরুs ought to make a fellow first rate poet—if Nature had been gracious to him.

*   *   *

The muses before everything is my motto.

মাইকেলের কাব্য-কাঠামো মিলটনীয় ; কিন্তু কাব্য-বিষয় হোমারীয়। সেই এ্যাকিলিসের ক্রোধ দিয়ে কাব্য শুরু হয়ে প্রায়ামের ও প্রায়ামবংশীয়দের শোকোচ্ছ্বাসে কাব্য-পরিসমাপ্তির মত। মেঘনাদবধ কাব্যেরও শুরু রাবণের ক্রোধ দিয়ে ; এবং শেষও হয়েছে রাবণের ও রাবণবংশীয়দের শোকোচ্ছ্বাসে। তাছাড়া ঘটনার বাঁকে বাঁকে হোমারীয় বিভিন্ন কাহিনীর পক্ষচ্ছায়া দেখা যাবে। ঐ হোমারীয় পটভূমিকাতেই মাঝে মাঝে ভর্জিলের আঁচড় পড়েছে, কিন্তু তা প্রধান নয়। আর এ কাব্যের সুর নির্ধারণে অন্যতম সক্রিয় প্রভাব হলেন ট্যাসো—সেই অদ্বিতীয় শিল্পী, যিনি আদিম অপ্রাকৃত জীবন-রসের সঙ্গে মধ্যযুগীয় রোমান্স রসের সংমিশ্রন ঘটিয়েছিলেন।

"Hitherto epics had been the outcome of the large, free, joyous life of antiquity, or the phantasies of mediaval romance. He retained something of both element, and added to them a Christian sentiment."[১৬]

মেঘনাদবধকাব্যে 'Christian sentiment' নেই, আছে উনিশ শতকীয় বাঙ্গালী 'sentiment' ; জীবন-পিপাসার উদগ্র প্রকাশ, পুরাতনকে নবীনের

মধ্যে সমাহিত করার দুঃসাহসিক সাধনা। এ্যারিওষ্টোর উচ্ছল চপল জীবন-ছবি তাঁর কাব্যে প্রবেশ-পথ পায়নি, যদিও ট্যাসোর কর-আকর্ষণে তা খুবই সম্ভব ছিল। সম্ভবত কোন বৃহত্তর প্রতিভা সে-পথ রোধ করেছিল। ট্যাসো অপেক্ষাও অধিকতর আকর্ষণীয় হলেন সেক্সপিয়র; ম্যাকবেথ-কিং লিয়রের দীর্ঘনিশ্বাস রাবণের বুকের মধ্যে যে কিছুটা ঢুকে যায়নি, একথা হলপ ক'রে বলা শক্ত। নাটকেও মহাকাব্যের প্রসারতা দেখা যায়, অন্ততঃ সেক্সপিয়রের রচনা তা পেয়েছে। কিন্তু মাইকেল শুধু মেঘনাদবধ কাব্যের কবি নন; বরং মেঘনাদবধ কাব্যই ব্যতিক্রম। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য ও চতুর্দশপদী—এই কাব্যসমূহকে যদি একটি স্রোতোধারা বলে মনে করি, তবে মেঘনাদবধ কাব্য এই স্রোতধারায় একটি নির্মল হ্রদ, গতিশীল অভিন্ন প্রবাহ নয়। মেঘনাদবধ কাব্য যে একটি ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়—এই সাধারণ সত্য উনবিংশ শতাব্দী উপলব্ধি করতে পারেনি, এমন কি তার গ্রন্থকারও নয়। তাই সিংহলবিজয়, সুভদ্রা-হরণ-এর কাহিনীকে মহাকাব্য রূপ দেবার কী বাল-সুলভ স্বপ্ন! হায়, তিনি যদি তাঁর এই উক্তির সারবত্তা নিজেও উপলব্ধি করতে পারতেন—

But I suppose I must bid adieu to heroic poetry after Meghnad. A fresh attempt would be something like a repetition. But there is wide field of romantic and lyric poetry before me, and I think I have a tendency in the lyric way.

* * *

উনবিংশ শতাব্দীর 'এপিক-পড়া' শিক্ষিত বাঙ্গালী মাইকেলকে নতুনতর এপিক রচনায় উৎসাহিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ যে লিখেছিলেন, "মিলটন-ভক্ত বাঙ্গালী মাইকেলকে বাহবা দিল," (বাংলাকাব্য-পরিচয়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত-ভূমিকা), কথাটি সত্য। সেই বাহবার প্রতিঘাত চলল বেশ কিছুকাল ধ'রে অক্ষম মহাকাব্য রচনার নিষ্ফল প্রয়াসে। মাইকেল কার্যতঃ গীতিকবিতা খণ্ড-কবিতা রচনার ক্ষেত্রে নেমে এলেন; কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তাঁর অবতরণ বিচলিত ও বাধাগ্রস্ত। যদিও তিনি লিখেছিলেন,

"He (Rangalal) reads Byron, Scott and Moore, very nice poets in their way no doubt, but by no means of the highest school of poetry, except perhaps, Byron, now and then. I like Wordsworth better."

মিলটন থেকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ—একই জীবনে দুই যুগ ডিঙিয়ে যাবার মর্মান্তিক প্রয়াস! ওয়ার্ডসওয়ার্থকে পছন্দ করা আর তাঁকে অনুসরণ করা এক নয়। মধুসূদনের কবিতায় মন্ময়তার সংস্রব না থাকায় অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী সমালোচনা করেছিলেন, "মাইকেলের নিসর্গ কবিতায় বিশেষ দৃষ্টির সম্মিলন ঘটে নাই।" ১৬

মাইকেল যে ওয়ার্ডসওয়ার্থকে অনুসরণ করতে পারেন নি, তার জন্য অংশতঃ দায়ী তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা। তাঁর শিক্ষাগুরু রিচার্ডসন ছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ-বিরোধী। রিচার্ডসনের ছাত্রের পক্ষে ওয়ার্ডসওয়ার্থ-অনুধাবনই বিরাট অগ্রগতি; বালকবয়সে তিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্য-ভাষার প্রশস্তি গেয়েছিলেন। ১৬ক

ওয়ার্ডসওয়ার্থকে অনুসরণের অবসর তিনি পান নি। কথাটি একটু যান্ত্রিক হ'ল। ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় চেতনার উন্মেষ বাংলাকাব্যে তখন ঘটতে পারে না। ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় জীবন-জিজ্ঞাসা ডীয়িষ্ট দর্শনের প্রতিদ্বন্দ্বী। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ছিলেন রুশো-প্রভাবিত। ইতঃপূর্বে কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর উপর হার্টলের সম্পর্কবাদের (Associationism) প্রভাব খুব বেশী। সম্প্রতি আর একজন প্রখ্যাত সমালোচক নতুন ক্লু'রে বলছেন, ওয়ার্ডসওয়ার্থের উপর ডীয়িষ্ট প্রভাব প্রবল। এই বক্তব্যের অবশ্য প্রেরণা হ'ল বহুপূর্বে লিখিত অধ্যাপক বীটির আলোচনা। অধ্যাপক বীটি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্য-ভাষা পর্যালোচনা ক'রে বলেছিলেন, ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যের দার্শনিক প্রসঙ্গে ডীয়িষ্ট দর্শনের পরিভাষাই ব্যবহৃত। কিন্তু এ কাব্যের আবেদন শেষ পর্যন্ত কোথায় পৌছাচ্ছে, সে প্রশ্নের তাঁরা জবাব দেন নি। বৃটনের দর্শনজগতে তখন ডীয়িষ্ট দর্শনের পরিভাষাই প্রভুত্ব করছে; কেম্ব্রিজছাত্র ওয়ার্ডসওয়ার্থ অজ্ঞাতসারেই এই পরিভাষা গ্রহণ করেছেন। স্কটল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়েই তখন কেবল ভিন্ন হাওয়া বইছিল। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যে কেবল যে প্রত্যক্ষ জগতের ভাষাই প্রবল নয়, সে কথা বস্তুতান্ত্রিক দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল

তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন। তাঁর বস্তু-পীড়িত মনের কাছে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ভিন্ন জগতের সংবাদ বহন করে এনেছিলেন।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ আর মরমিয়াবাদ যে সমার্থক, ভারতীয় অধ্যাত্মবাদীর চক্ষেও তা প্রতীয়মান হয়েছিল। রামতনু লাহিড়ীর জীবনী থেকে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি—"One of his friends tells us that one early morning he rushed into his room like a mad man an ddragged out of bed, saying that when the whole nature was ablaze with the light and fire of God's glory, it was a shame to lie in bed. He took the sleeper to the next field, and pointing his fingers to the rising sun and the beautiful trees and foliage, he recited with the greatest pleasure—what? Not a hymn of the Veda but some verses from Wordsworth." ১৭

বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে য়ুরোপের বিভিন্ন অংশে একই সময়ে ভাববাদী দর্শনের বিকাশ দেখা দেয়। কেউ কবিতার ভাষায়, কেউ দর্শনের ভাষায় প্রায় একই বক্তব্য পরিবেশন করতে লাগলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, গ্যয়টে, কাণ্ট একই বক্তব্যে বিভিন্ন পথে এসে পৌঁছেছেন। "His poetry is immensely interesting as an imaginative expression of the same mind which, in his day, produced in German great philosophies. His poetic experience, his intuitions, his single thoughts, even his large views correspond in a striking way, with ideas methodically developed by Kant, Schelling, Hegel, Schopenhauer." ১৭ক

ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত কাণ্টও ছিলেন রুশো-ভক্ত। তিনি বলেছিলেন "Rousseau set me right." রুশো যে কথা আবেগকম্পিত ও অলংকার-ভূষিত ভাষায় পরিবেশন করেছিলেন, কাণ্ট তাই দর্শনের পরিচ্ছন্ন 'সুস্পষ্ট ভাবসমৃদ্ধ ভাষায় নিবেদন করলেন। "Kant had to complete Rousseau's ideas and give them a systematic foundation." ১৮ কাণ্ট যে ভাবে সত্যে উপনীত হয়েছিলেন, আর একজন জর্মণ মনীষী

তেমনিভাবে অনুরূপ সত্যে উপনীত হয়েছিলেন। "Kant never took any notice of me, although independently I was following a course similar to his. I wrote my Metamorphosis of plants before I knew anything of Kant, and yet it is entirely in the spirit of his ideas." [১৮ক]

গ্যয়টের প্রকৃতি-বন্দনা ছিল নিউটন ও নিউটনীয় পদার্থবিদ্যার বিরোধী। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কাণ্ট, গ্যয়টে সকলেই স্বাধীনভাবে একই মতাদর্শে এসে প্রায় পৌছাচ্ছিলেন, যদিও প্রত্যেকের পরিভাষা একজাতীয় নয়। য়ুরোপে বস্তু-প্রধান দর্শন তার আদিযুগের বলিষ্ঠতা ও আশাবাদ হারিয়ে ফেলে, এবং ক্রমশই দুর্জ্ঞেয়তার অন্ধকূপে নিমজ্জিত হচ্ছিল; নৈরাশ্যের হাহাকারে পরিসমাপ্ত হচ্ছিল। অপরপক্ষে, রুশোর প্রভাবে ভাববাদী দর্শন নতুন আশাবাদের উদ্বোধন করলো। বাংলাকাব্যের আলোচনায় এই ঐতিহাসিক ঘটনা-প্রবাহ স্মরণ রাখা কর্তব্য।

মধুসূদনের যুগে বাংলাদেশে লক, পেইন ও হিউমের প্রভাব। কঁৎ বা কমতে তখনও এসে পৌছাননি; বা পৌছালেও আরও অনতিদীর্ঘ দশ বৎসর পরে প্রভাবশালী হলেন। আর ভারতীয় বেদান্তদর্শন যদিও আবিষ্কৃত ও ব্যাখ্যাত, তবু তা গৃহীত হয়নি বুদ্ধিজীবী সমাজে।

কাণ্ট ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ম্যাকিনটসের হাত ধ'রে ভারতে এসেছেন; কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে'ও তিনি সাদর আপ্যায়ন লাভ করতে পারেন নি। [১৮খ]

বোম্বাই লিটাররি সোসাইটির গ্রন্থাগারে ম্যাকিনটস কাণ্ট, ফিক্টে ও গ্যয়টের গ্রন্থ উপহার দিয়েছিলেন। [১৮গ]

"বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন, এ-সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈত নাই। মিথ্যা হইলেও হিন্দুদের কাছে এই দুই দর্শন অসাধারণ শ্রদ্ধার জিনিস। সংস্কৃতে যখন এ-গুলি শিখাইতেই হইবে, উহাদের প্রভাব কাটাইয়া তুলিতে প্রতিষেধকরূপে ইংরাজীতে ছাত্রদের যথার্থ দর্শন পড়ান দরকার। বার্কেলের Inquiry বেদান্ত বা সাংখ্যের মত একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছে। য়ুরোপেও এখন আর ইহা খাঁটি দর্শন বলিয়া বিবেচিত হয় না, কাজেই ইহাতে কোন ক্রমেই সে কাজ চলিবে না। তা ছাড়া হিন্দু-শিক্ষার্থীরা যখন দেখিবে,

বেদান্ত ও সাংখ্য-দর্শনের মত একজন য়ুরোপীয় দার্শনিকের মতের অনুরূপ, তখন এই দুই দর্শনের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা কমা দূরে থাকুক, বরং আরও বাড়িয়া যাইবে।" [৭৯]

তার অর্থ এই নয় যে, এ-যুগে বেদান্তকে উপলব্ধি ও অনুভব করার উদ্যম শুরু হয় নি—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপনিষদের মর্ম অনুসন্ধানে ব্যাপৃত, শুধু উপনিষদ কেন, য়ুরোপের সমস্ত মন্ময়বাদী স্বজ্ঞাবাদী দর্শনের (Intuitive Philosophy) সঙ্গে তিনি আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—স্পিনোজা, রীড, হ্যামিলটন, এবং সর্বশেষে কাণ্টের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। কিন্তু মহর্ষির এই সাধনার সুফল তখনও দেশ গ্রহণ করে নি। রামকৃষ্ণ-কেশব সেনের ভক্তিবাদ তখনও সমাজে প্রভাব বিস্তার করে নি। ওয়ার্ডসওয়ার্থ শুধু রামতনু লাহিড়ীর মুগ্ধপ্রণতির অধিকারী হচ্ছেন; কাব্য-চর্চার অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছেন না।

মাইকেলের কাব্যে তাই জীবনের বহিরঙ্গেরই শুধু রূপায়ন। তাঁর সনেট, তাঁর অন্যান্য গীতিকবিতায় মিলটনীয় আমেজ যতটা অনুভবনীয়, পেত্রার্কা ততটা নয়। তখনকার সাহিত্য-ক্ষেত্রে ও সমাজ-ময়দানে বুদ্ধির চলেছে জয়যাত্রা, প্রত্যক্ষের চলেছে প্রভুত্ব। মাইকেল বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রত্যক্ষ জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্যকার। মাইকেলের 'কল্পনা' নিতান্ত প্রত্যক্ষকে জানার দূতী বিশেষ; আর সেই কল্পনাই রবীন্দ্র-কাব্যে বিচিত্রের নর্ম বাঁশীখানি তার সুঠাম পাঁচ আঙ্গুলে তুলে নিয়ে 'চিত্রা' হয়েছে। মাইকেলের এই অসম্পূর্ণতার জন্য (সম্পূর্ণতা বলাই সংগত!) কেউ কেউ মাইকেল-সাহিত্যকে পুস্তক-গন্ধী ও কৃত্রিম ব'লে অভিযোগ করেছেন। অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন—"মৃত শব্দরাজিতে আকীর্ণ বলেই মাইকেলি কলরোল আমাদের কানেই শুধু পৌঁছায়, কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে না, এবং দেব-ভাষা তাঁর ক্ষেত্রে ভাষা-দানব হ'য়ে উঠেছিলো ব'লে তিনি তাকে সামলা-তেই নিরন্তর ব্যস্ত ছিলেন, কখনোই চোখে দেখে লিখতে পারেন নি। মাইকেলের সযত্নসজ্জিত সমস্ত বর্ণনা তাই-তো কেবল সহস্রাক্ষ ছাপার অক্ষরে মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকে, কোনো একটিও বাসা বাঁধতে পারে না মনের মধ্যে।" [৮০]

এই অভিযোগ শুধুমাত্র উষ্মা প্রয়োগে বাতিল হ'য়ে যায় না। অধ্যাপক

বসু ইচ্ছা করলেই মাইকেল-সাহিত্যের এই সীমাবদ্ধতার হেতু উপলব্ধি করতে পারতেন।

কৌতুকের বিষয় এই, বুদ্ধদেব বসুর এই সমালোচনার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ নিম্নোক্ত সমালোচনা করেছিলেন :

"এই খাঁটি বাংলায় সকল রকম ছন্দেই সকল কাব্যই লেখা সম্ভব, এই আমার বিশ্বাস।......

অথচ এই প্রাকৃত বাংলাতেই মেঘনাদবধ কাব্য লিখলে যে বাঙ্গালীকে লজ্জা দেওয়া হত সে কথা স্বীকার করব না। কাব্যটা এমনভাবে আরম্ভ করা যেত—

যুদ্ধ যখন সাঙ্গ হল বীরবাহু বীর যবে
বিপুল বীর্য দেখিয়ে হঠাৎ গেলেন মৃত্যুপুরে
যৌবন কাল পার না হতেই, কও মা সরস্বতী,
অমৃতময় বাক্য তোমার, সেনাধ্যক্ষ পদে
কোন বীরকে বরণ করে পাঠিয়ে দিলেন রণে
রঘুকুলের পরম শত্রু, রক্ষকুলের নিধি।

এতে গাম্ভীর্যের ত্রুটি ঘটেছে, একথা মানব না।" [৮১]

গাম্ভীর্যের ত্রুটি ঘটেছে কিনা, তার মীমাংসার দায়িত্ব তাঁর ওপরেই ন্যস্ত করা যাক।

"মাইকেল তাঁহার মহাকাব্যে যে বড়ো বড়ো সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, শব্দের স্থায়িত্ব, গাম্ভীর্য এবং পাঠকের সমগ্র মনোযোগ বদ্ধ করিবার চেষ্টাই তাহার কারণ বোধ হয়। 'যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে' দুর্বোধ্য হইতে পারে, কিন্তু 'সাগরের তট যথা তরঙ্গের ঘায়' দুর্বল ; 'উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে' ইহার পরিবর্তে 'উড়িল যতেক তীর আকাশ ছাইয়া' ব্যবহার করিলে ছন্দের পরিপূর্ণ ধ্বনি নষ্ট হয়।" [৮২]

মোট-কথা, রবীন্দ্রনাথ মাইকেলের ভাষা সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত মনস্থির করতে পারেন নি। কিন্তু মতবিশেষ তাঁর চূড়ান্ত কথা, এ রায় দেওয়া যায় না। তাঁর ভারতীর প্রবন্ধ, সমালোচন (১২৯৪)-এর সমালোচনা স্মরণ রেখেই বলছি। বুদ্ধদেব বসু মহাশয় এক্ষেত্রে যে পর্বতের আড়ালে দাঁড়াবেন, তারও সুযোগ নেই।

কৌতুকের হচ্ছে এই যে, বসু মহাশয়ের এই সমালোচনা তাঁর একাধিক বক্তব্যের মত ইংরেজী দৃষ্টান্তে প্রগল্ভ।

প্রখ্যাতসমালোচক জন মিডলটন মারের মিলটন-সমালোচনা সম্প্রতি কয়েক বছর ধরে বেশ বাজার-মত্ততা সৃষ্টি করেছে। মারে মহাশয়ের এই সমলোচনার বহু বছর আগেই য়্যাডিসন এই কথাই বলেছিলেন: "Our language sank under him." এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর বৃটিশ মনীষী ডাঃ জনসন মিলটনীয় রীতিকে বলেছিলেন "perverse and pedantick principle" এবং আরও বলেছিলেন যে, মিলটন চাইতেন "to use English words with a foriegn idiom." কথাগুলি এতই অতি-পরিচিত যে ইংরেজী সাহিত্যের নবীন ছাত্রেরাও এই বুকনিগুলি রপ্ত ক'রে রাখে। মারে মহাশয় সাম্প্রতিক সমালোচক। তাঁর বক্তব্য পুরাতন সমালোচনারই ভাষান্তর মাত্র। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Studies in Keats, New and Old'-এ মিলটন-সাহিত্যের বিরুদ্ধে যে কয়টি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, অধ্যাপক বসু তারই সারসংকলন করেছেন।

"The things they (Shakespeare and Keats) contemplate, the words they use, reach out beyond themselves and become the portals of a mystery. There is no pneumbra of mystery in Milton. With him imagination is a faculty, with them it is a condition. In him there is rich ornament in plenty, but it is not consubstantial with the thought it clothes. Deep thinking and deep feeling are inseparable. A poet so evidently great, in some valid sense of the word, should have so little intimate meaning for us. We cannot make him real. He does not, either in his great effects or his little ones, touch our depths. He demonstrates but he never reveals. He describes beauty beautifully, but truth never becomes beauty at his touch." [৮৩]

মারে মহাশয়ের যুক্তিজাল-বিস্তৃতি সত্ত্বেও মিলটন ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, এবং তাঁর কাব্য ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মাইকেল-ভাষার বৈশিষ্ট্য

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। মাইকেলের ভাষা বহিঃঐশ্বর্যে ধনী; অর্থাৎ অলংকার-প্রধান। ইংরেজীতে যাকে বলে sensuousness (ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতা,) মাইকেলের ভাষায় তা নেই; মাইকেলের ভাষা metaphorical. অনেকে মনে করেন রোম্যানটিকতা আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা অচ্ছেদ্য। কিন্তু রোম্যানটিকতারও বিভিন্নতা আছে। রেনেসাঁস যুগের রোম্যানটিকতা আর অষ্টাদশ শতকের রোম্যানটিকতা ভিন্ন ভাবধর্মে দীক্ষিত। রেনেসাঁস যুগের আশাবাদ ও যুক্তি-নির্ভরতা অষ্টাদশ শতকের রোম্যানটিক কাব্যের প্রধান সুর নয়। এই ভিন্ন ধর্মই কাব্যের ভাব-বস্তু ও ভাষা-সম্পদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। "There is no penumbra of mystery in Milton." মাইকেলের ক্ষেত্রেও তা সত্য। লক-পেইন ও অক্ষয়কুমার দত্ত-বিদ্যাসাগর-প্রভাবিত যুগে অতীন্দ্রিয়তার স্থান নেই।

* * *

তবু বাংলাকাব্যে মাইকেল এক বিস্ময়কর প্রতিভা। আপন যুগকে হেলায় তিনি অতিক্রম ক'রে গেছেন। কাব্য, নাট্য, উপন্যাস—সর্বত্রই তাঁর প্রভাব বা পদাঙ্ক অনুভূত বা অনুসৃত হবে।

কাব্যে তাঁর বিদ্রোহ সর্ব-যুগের নবীনত্ব প্রয়াসীর আদর্শস্থল। তাঁর গ্রন্থভেদে নবীন বিষয় ও আঙ্গিক বরণের দুঃসাহস যে কোন প্রতিভাসম্পন্ন কবির পক্ষে অনুকরণীয়, বিদেশী ভাববস্তুর বিস্ময়কর আত্মীকরণ, এবং বিদেশী আঙ্গিকের সফলতাময় দেশীয় জন্মান্তর সাধন, তাঁর অক্ষয় কীর্তি।

বাংলাকাব্যের বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির শ্রীবৃদ্ধিসাধনে তিনি এক নিরলস শিল্পী।

পরবর্তী সৃষ্টিশীল সাহিত্য তাঁর কাছ থেকে দু'হাত পেতে ঋণ গ্রহণ করেছে।

একটি মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি; বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) ও কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬)—এই দুইখানি উপন্যাসের মধ্যে যে একটি বিশেষ প্রভেদ আছে, তা উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়। দুর্গেশনন্দিনীর জগতে ভারতচন্দ্রের উড়ুনির হাওয়া অল্প নয়, বিদ্যাদিগ্‌গজ ও হীরামালিনী ভারতচন্দ্রের কাব্য-উপন্যাসের জগৎ থেকে বেরিয়ে এসেছে; তাঁর সঙ্গে আর একব্যক্তি দুর্গেশনন্দিনীর মানস-গঠনে এগিয়ে এসেছেন, তিনি

ঔপন্যাসিক স্কট। তবু ভারতচন্দ্রীয় স্থর অবহেলার নয়। শুধু বিদেশী সাহিত্য অধ্যয়ন ও রসাস্বাদনের পরিণতি এটা নয়। বঙ্কিম তাঁর 'বসন্তে কুল-কামিনীর খেদ'-এর গাঁইগোত্র থেকে তখনও সম্পূর্ণ স'রে আসতে পারেন নি। আর কপালকুণ্ডলার জগতে স্কটের কোন স্থান নেই, ভারতচন্দ্রও অ-নিমন্ত্রিত। সেখানে লেখনী নিয়ন্ত্রিত করছেন সেক্সপিয়র ও কালিদাস এবং মাইকেল। মিরান্দা ও শকুন্তলার প্রসঙ্গ সবাই উত্থাপন করেছেন; কিন্তু মাইকেলের ক্ষুদ্র একটি কাব্য-পত্রিকা সমালোচকদের এতাবৎ কেন দৃষ্টি আকর্ষণ করল না, এটাই আশ্চর্য!

"শান্তনুর প্রতি জাহ্নবীর" মূল বক্তব্য ও ইঙ্গিতের মধ্যে নারী-চরিত্রের এক অপ্রাপনীয় রহস্যময়তা ধরা পড়েছে। এবং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের পরিচ্ছেদসমূহের শীর্ষে যে কয়টি উদ্ধৃতির সমাবেশ ঘটিয়েছেন, তার মধ্যে একটি হ'ল—

"পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে!"

কপালকুণ্ডলার চরিত্রের একটি বড় সংকেত এখানে ধরা পড়েছে। যে নিষ্ঠুর মধুর মর্মান্তিক নিরাসক্তি জাহ্নবীর স্বল্পকালীন দাম্পত্যজীবনে আভাষিত হয়েছে, কপালকুণ্ডলা তা থেকে দূরবর্তিনী নয়। বঙ্কিম মাইকেলের নিষ্ঠাবান পাঠক; তাঁর উপন্যাসে মাইকেল থেকে একাধিক উদ্ধৃতি আছে।

দ্বিতীয়ত বীরাঙ্গনাকাব্যের ভাষা আধুনিক বাংলাসাহিত্যের সৃষ্টিমূলক রচনার (creative writing) আদর্শতম ভাষা। এই কাব্যের শব্দভাণ্ডার, বাক্য-রচনা-প্রণালী ও অলংকার-প্রয়োগ-নৈপুণ্য কাব্য-ভাষার একটি নবীন স্তর সৃষ্টি করেছে।

দুর্গেশনন্দিনীর ভাষার ভিত্তিভূমি সম্ভবতঃ বিদ্যাসাগরের গদ্য। 'সীতার বনবাস'-এর ধ্বনি-তরঙ্গ এখানে প্রতিঘাত তুলেছে। কিন্তু কপালকুণ্ডলার ভাষা নিঃসন্দেহ বীরাঙ্গনার ভাষা। বিদ্যাসাগরের ভাষা বিতর্কের, আলোচনার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বর্ণনার ভাষা মাত্র। কিন্তু মাইকেলের ভাষা প্রাণের ভাষা, মনের ভাষা; মস্তিকের আর কর্ণের ভাষা নয়। মাইকেলের ভাষা আবেগের ভাষা,—যে ভাষায় ভীষণ মধুর করুণ হাস্য যুগপৎ উদ্বুদ্ধ হ'তে পারে, যে ভাষায় চরিত্র উদ্ঘাটিত হয় ও চরিত্র নির্মিত হয়।

এই ভাষাতেই রসসৃষ্টি সম্ভব; নতুন যুগের কাব্যসৃষ্টি সম্ভব। বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলাও কাব্য। কাব্য ত কাব্যের ভাষাতেই আলাপচারী হবে।

* * *

মাইকেল ও বঙ্কিম—রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলাসাহিত্যের দুইটি স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ অধ্যায়। মাইকেলের জীবিতকালেই বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী ও বিষবৃক্ষ প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলির একখানিও মাইকেল পড়েছিলেন কিনা, এবং পড়লেও তাঁর মতামত কি ছিল, তা অনুদ্‌ঘাটিত। কিন্তু বঙ্কিম মাইকেলের মৃত্যুতে যা লিখেছিলেন, তা আজিও স্মরণীয়।

"কাল সুপ্রসন্ন, ইউরোপ সহায়—সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ শ্রীমধুসূদন।" [৬৪]

পাদটীকা

১. A History of the Eighteenth Century Literature——1660—1780—Edmund Gosse.
২. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী। পৃ—২২১
৩. ঐ পৃ—ঐ
৪. সাহিত্য-সাধক চরিতমালা—দ্বিতীয় খণ্ড—মধুসূদন দত্ত—৪র্থ সংস্করণ—১৩৬২—পৃ—১২
৫. ঐ পৃ—২৪
৬. ঐ পৃ—২৫
৭. ঐ পৃ—২৫
৮. ঐ পৃ—২৫
৯. ঐ পৃ—১২-১৩
১০. ঐ পৃ—১৩
১১. Early Recollections of Michael M. S. Dutt—Buncoo Bihary Dutta—মধুস্মৃতি—নগেন্দ্রনাথ সোম—পরিশিষ্ট—পৃ—৬১৪
১২. সা-সা-চ-মা—দ্বিতীয় খণ্ড—পৃ—৩৫
১৩. ঐ পৃ—৩৬

১৪. ঐ পৃ—৩৭
১৪ক. ঐ
১৫. মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু। চতুর্থ সংস্করণ। পৃ—২৪৮-২৫০
১৬. ঐ, ২৬৫—২৬৬
১৭. ধর্মমঙ্গল—ঘনরাম চক্রবর্তী। বঙ্গবাসী সংস্করণ—দ্বিতীয় মুদ্রণ—১৩০৮। পৃ—২৬১
১৮. মধুসূদন দত্ত—ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—চতুর্থ সংস্করণ—১৩৬২—পৃ—৩০
১৯. বাঙ্গালা সাহিত্য—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅনিলকুমার কাঞ্জিলাল সম্পাদিত—১৯৫৬, পৃ—১৮৫
২০. রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত মধুসূদনের চিঠি—জীবনচরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু—পৃ—৩২৬
২১. রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে লিখিত পত্র—জীবনচরিত—পৃ—২৯৪
২২. রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত মধুসূদনের চিঠি—জীবনচরিত—পৃ—৪৩৭
২৩. তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য—উৎসর্গপত্র—পরিষৎ সংস্করণ।
২৪. রাজনারায়ণকে লিখিত মধুসূদনের চিঠি—জীবনচরিত—পৃ—৪৩৭
২৫. ঐ চিঠি পৃ—৩০৯-৩১০
২৬. রাজনারায়ণকে লিখিত মধুসূদনের চিঠি—জীবনচরিত—পৃ—৩২৭
২৭. ঐ পৃ—৩৩০
২৮. ঐ পৃ—৩২৯
২৯. ঐ পৃ—৪৫৬
৩০. Paradise Lost—Book I
৩১. ঐ
৩২. চতুর্দশপদী কবিতাবলী—মধুসূদন দত্ত। পরিষৎ সংস্করণ, পৃ—১০
৩৩. রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে লিখিত রাজনারায়ণ বসুর চিঠি—জীবনচরিত। পৃ—২৯৩
৩৩ক. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। শিবনাথ শাস্ত্রী—পৃ—২২১
৩৪. The Decline of the West—Vol. I—Aswald Spengler. পৃ—৪৩০

৩৫. Milton's Works—Reasons of Church Government—II. পৃ—২৩৫

৩৬. Germany in the Nineteenth Century—J. H. Rose; C. H, Herford; E. C. K. Gonner; M. E. Sadler. Manchester University Press—1912—পৃ—২৫-২৬

৩৭. বিবিধ প্রসঙ্গ—প্রথম খণ্ড—রাজনারায়ণ বসু, ১২৮৯,। পৃ—২৩

৩৮. রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত মধুসূদনের চিঠি—জীবনচরিত। পৃ—৩১১

৩৯. ঐ পৃ—৩১৫

৪০. ঐ

৪১. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী

৪২ক. অক্ষয়কুমার দত্ত—সাহিত্য সাধক চরিতমালা—প্রথম খণ্ড, পৃ ২০—২১

৪২খ. The Eighteenth Century Background—Basil Willey. পৃ—১৩৬

৪৩. A History of Philosophy—W. Windelband. Macmillan & Co. Ltd.—1953—পৃ—৪৮৭

৪৪. English Social History—G. M. Trevelyan. Longmans, Green & Co.—1945. পৃ—৩৫৬

৪৫. ঐ পৃ—৩৫৭

৪৬. সাহিত্য—সাহিত্যসৃষ্টি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৭. রক্তকরবী—নাট্যপরিচয় অংশ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৩৫৭।

৪৮. পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—পৃ—৩৮-৩৯

৪৯. শ্রীমধুসূদন—মোহিতলাল মজুমদার। পৃ—১২৮

৫০. Capital—Vol I. Karl Marx. পৃ—৭৮৯

৫০ক. বঙ্গদর্শন—নবপর্যায়—১২৮৮—শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

৫০খ. মধুস্মৃতি—নগেন্দ্রনাথ সোম। পৃ—৩৭১

৫১. জীবনচরিত—পৃ—১১৭

৫২. Literature of Bengal—R. C. Dutt. পৃ—৪

৫৩. জীবনচরিত—পৃ—৪৯০-৪৯১

৫৪. রাসু নৃসিংহ—সংবাদ প্রভাকর। ১ মাঘ, ১২৬১। ১৩ জানুয়ারী ১৮৫৫।

৫৫. The Iliad—Homer. E. V. Rieu. Penguin Classics.

৫৬. The Odyssey—Homer. E. V. Rieu. Penguin Classics.

৫৭. The Aenid—Virgil. Jackson Knight. ঐ

৫৮. The Odyssey—Homer. E. V. Reiu. Introduction.

৫৯. বাঙ্গালা সাহিত্য—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—চট্টোপাধ্যায় ও কাঞ্জিলাল সংস্করণ, পৃ—২২

৬০. Paradise Lost—Bk IV. P. 453-469.

৬১. বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—গঙ্গাচরণ সরকার, ১৮৮০। পৃ—৫৭

৬২. মেঘনাদ সমালোচনা—কালীপ্রসন্ন রায়—A Criticism of Meghnad by Kaliprasanno Roy—১২৭৭ বঙ্গাব্দ। পৃ—৪২

৬৩. জীবনচরিত—পৃ—৪৭৩

৬৪. The Aenid—Virgil. W. F. Jackson Knight. ভূমিকা

৬৫. বাংলা কবিতার ছন্দ—মোহিতলাল মজুমদার। পৃ—১৫১

৬৬. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—দ্বিতীয় খণ্ড—সুকুমার সেন। পৃ—১৩৬

৬৭. বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন। চতুর্থ সংস্করণ, পৃ—২৪০

৬৮. Heroides—Ovid. Translated by Henry T. Riley. George Belt and Sons Ltd.—1875. পৃ—১৯

৬৯. ঐ পৃ ১৩৫

৭০. চতুর্দশপদী কবিতাবলী; প্রথম সংস্করণ। প্রকাশকদিগের বিজ্ঞাপন।

৭১. মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনভাষ্য—প্রমথনাথ বিশী। পরিশিষ্ট পৃ—।০-।/০।

৭২. বাংলা কবিতার ছন্দ—মোহিতলাল মজুমদার। পৃ—১৮৫

৭৩. ঐ, পৃ—১৮৫

৭৪. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—দ্বিতীয় খণ্ড—সুকুমার সেন। তৃতীয় সংস্করণ, পৃ—১৪০

৭৪ক. রহস্য সন্দর্ভ—তৃতীয় পর্ব, ৩৪ খণ্ড—রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত।

৭৫. A Short History of French Literature—Laurence Bisson. Penguin Books. পৃ—৬৭।

৭৫ক. মধুস্মৃতি—নগেন্দ্রনাথ সোম। পৃ—১৩-১৪

৭৬. Tasso and His Times—William Boutling. Methuen and Co. Ltd. 1907. পৃ—১৫৭

৭৬ক. মধুস্মৃতি—পরিশিষ্ট 'On Poetry' নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। এখানে Wordsworth—Coleridge-এর কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "he rejected sing-song style of his immediate predecessors."

৭৭. Rammohan to Ramkrishna—Aud Lang Syne—F. Max-Muller. Susil Gupta (India) Ltd. পৃষ্ঠা—৭১

৭৭ক. Oxford Lectures on Poetry—A.C. Bradley. পৃ—১২৯-১৩০

৭৮. Rousseau, Kant and Goethe—Ernest Cassirer. 1948. পৃ—১

৭৮ক. Conversation with Eckermann—Goethe. April 11, 1827.

৭৮খ. The Literature of the Victorian Era—Hugh Walker. S. Chand and Co. 1955. পৃ—২১

৭৮গ. Calcutta Review—Vol XIV. July-December, 1860.

৭৯. সাহিত্যসাধক চরিতমালা—দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ—৩৫

৮০. সাহিত্য চর্চা—বুদ্ধদেব বসু। ত্রিবেণী প্রকাশনী, ১৩৬৮ ; পৃ—২৪

৮১. ছন্দ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্র রচনাবলী, ২১ খণ্ড। পৃ—৩৫৮-৩৫৯

৮২. ঐ পৃ—৩৮২

৮৩. Studies in Keats, New and Old—John Middleton Murray. পৃ—১২২

৮৪. বঙ্গদর্শন—১২৮০, ভাদ্র।

—০—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাইকেল সমসাময়িক কবিতা

মাইকেলের হাতে কাব্য-অঙ্গনে যে পরিবর্তন সাধিত হ'ল, তা থেকে অনেকেই কোন শিক্ষা নিতে পারেন নি। অনেকেই পুরাতন রীতির অনুবর্তন ক'রে চললেন, ভারতচন্দ্রীয় বা ঈশ্বর গুপ্তীয় কাব্যরীতিই তাঁদের অবলম্বনীয় হ'ল। কেউ কেউ মাইকেলকে অনুকরণ করেছেন, কিন্তু সে অনুকরণ হ'ল অন্ধ অনুকরণ, পঙ্গু অনুকরণ। মাইকেল তাঁর প্রতিটি কাব্যে নিজেই নিজেকে ডিঙ্গিয়ে গেছেন, আত্ম-অনুকরণের অন্ধগলিতে পা দেন নি। কিন্তু মাইকেল-অনুকারীরা গুরুর ধর্ম অগ্রাহ্য করলেও গুরুর পদ্ধতি আচরণীয় ব'লে মনে করেছেন। মাইকেল-সমসাময়িক প্রাচীনপন্থী কবিদের মধ্যে দ্বারকানাথ রায়, রসিকচন্দ্র রায়, বনওয়ারিলাল রায়, রাধামাধব মিত্র, গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিশচন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

॥ ১ ॥

দ্বারকানাথ রায়ের প্রকৃতিপ্রেম (১৮৬২), প্রকৃত সুখ (১৮৬৩), সীতাহরণ কাব্য (১৮৫৭), ও কবিতাপাঠ তত বিশেষ জনসমাদৃত রচনা নয়। তাঁর প্রকৃতিপ্রেম রূপক রচনা, দুই খণ্ডে সমাপ্ত। দুই খণ্ডে যথাক্রমে তিনটি ও চারটি সর্গ আছে। কাব্যটির শুরু হয়েছে সরস্বতীর বন্দনা দিয়ে। কাব্যটির মূল বক্তব্য:

> কে চিনিবে রে প্রেমধনে!
> প্রকৃতি পুরুষভাবে বিহরে ভুবনে। (২য় সর্গ, পৃঃ ১৬)

এ বক্তব্য তন্ত্রের বক্তব্য।

'প্রকৃত সুখ' কাব্যখানিও রূপক-ধর্মী। কাব্যটি দশ সর্গে সম্পূর্ণ, এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। ভাষা প্রায় সংলাপের দোরে গিয়ে পৌঁছেছে। "মহাত্মা কৃত্তিবাস পণ্ডিত যেরূপ মিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টিকর্তা, সেইরূপ শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় এই অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং

দেশবাসী লোকদিগকে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা, এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া নিতান্ত কর্তব্য।" ১ দ্বারকানাথ অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রকৃতি অনুধাবন করতে পারেন নি। তাঁর হাতে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রায় গদ্যের পর্যায়ে নেমে এসেছে।

সম্মুখে দেখেন তাঁরা এক উপবন,
কিঞ্চিত আশ্বাস তায় পেলেন তখন;
যেন বাকরুদ্ধ স্পন্দহীন অচেতন
রোগী, সচেতন হ'লে তার পরিবার
সকলে আশ্বাস পায় কিছু।

দীন, ধনী ও মধ্যবিত্ত—এই তিন শ্রেণীর লোকের প্রকৃত সুখ অর্জনের পথ নির্দেশ করা হয়েছে।

দ্বারকানাথের কবিতাপাঠ স্কুল-পাঠ্য নীতিকথামূলক কবিতার সমষ্টি। ডাফ সাহেব প্রভৃতির অনুরোধে এই গ্রন্থ বিরচিত হয়। এই কাব্য রঙ্গলালের 'নীতিকুসুমাঞ্জলি'র সঙ্গে তুলনার যোগ্য। দু'টি উদাহরণ এখানে উৎকলিত হচ্ছে :

কিবা শোভা পায় মণি, রমণীর গলে।
কিবা শোভা পায় ধনী. পারিষদ দলে॥ (পৃঃ ১০)

তৃণ পত্র জল, আহারে কেবল,
যদি লোক যোগী হয়।
যতেক কুরঙ্গ, মাতঙ্গ তুরঙ্গ,
তারা কেন যোগী নয়। (পৃঃ ২৯)

প্রথমোক্ত কবিতাটিতে একটি বাস্তব তথ্য আছে, কলকাতার বাবু-বিলসিত সমাজের বাস্তব চিত্র। দ্বারকানাথ রায় নতুন ছন্দসৃষ্টিতে তৎপর ছিলেন। তাঁর প্রকৃতিপ্রেম ও কবিতাপাঠে নতুন নতুন ছন্দ সৃষ্টির চেষ্টা দেখা যায়।

প্রকৃতিপ্রেমে—

সে সময় ধরা অতি সুধাময়,
প্রকাশ হয়েছে মধুর মধু।
জগত-লোচন দিনেশ উদয়,
সহ উষা সুরসুন্দরী বধু॥ (পৃঃ ৩০)

কবিতাপাঠে—

কেন রে রসনা, সুরসে রসনা,
বিরস বাসনা, কেনরে কর।
অমল কমল, জিনিয়ে কোমল,
অতি নিরমল, শরীর ধর॥ ইত্যাদি (পৃঃ ১২)

কবি লঘু চতুষ্পদী ব'লে এই ছন্দের নামকরণ করেছেন। ইংরেজী 'রীত্যনুযায়ী ছন্দ' নামে অভিহিত করেছেন। এই ছন্দ বিহারীলালের ছন্দের পূর্বাভাস। যদিও উদ্ধৃত প্রথম স্তবকটিতে 'সুরসুন্দরী'তে মাত্রাধিক্য ঘটায় ছন্দপতন হয়েছে। যুক্তাক্ষরের ওজন তিনি ধরতে পারেন নি।

রসিকচন্দ্র রায় প্রথমে পাঁচালীকার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর জীবনতারা (১২৪৫), পদাঙ্কদূত (১২৬১), শ্রীকৃষ্ণ প্রেমাঙ্কুর (১২৬২), নবরসাঙ্কুর কাব্য (১২৭৫), পদ্যসূত্র (১২৭৫) মোটামুটি পুরাতন রীতির অনুবর্তন।

গদ্যের আবির্ভাবকে তিনি সুস্থ মনে গ্রহণ করতে পারেন নি।

হায়রে বঙ্গের পদ্য হায় হায় হায়।
পূর্বের অপূর্ব মান এখন কোথায়॥
পয়ার দয়ার নাই তোর প্রতি টান।
হতিস্ বিলাতী বরং পেতিস্ সম্মান॥ (৵০)

তাঁর পদাঙ্কদূত গদ্যপদ্য মিশ্রিত রচনা; যদিও কাব্য নামে পরিচিত। নানাবিধ সংস্কৃত ছন্দ এখানে অবলম্বিত হয়েছে। তোটক, মালতী, তূণক, পজঝটিকা, গজগতি, কুসুমমালিকা, অনুষ্টুপ, ললিত, চামর, মালঝাঁপ প্রভৃতি ছন্দ বাংলায় প্রযুক্ত হয়েছে।

পদাঙ্কদূতের বিষয়বস্তুও পুরাতন; সেই প্যারী রাধা, বৃন্দাদূতী ও নাগর কৃষ্ণ।

'জীবনতারা' রসিকচন্দ্র রায়ের অধিকতর পরিচিত রচনা। জীবনতারা প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসুন্দরের epilogue. মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ভাঁড়ের মুখে শুনলেন কিভাবে সুন্দর বিদ্যার মনোরঞ্জনার্থে সুড়ঙ্গ খুঁড়েছিল। সুন্দরের এই কেরামতিতে কৃষ্ণচন্দ্র খুসী হলেন, এবং ভারতচন্দ্রের কাছে এই ধরনের মধুর গল্প আরও শুনতে চাইলেন। তখন ভারতচন্দ্র 'জীবনতারা'র গল্পটি বললেন। বলা বাহুল্য যে, কাব্যটি ভারতচন্দ্রীয় রীতিতেই লেখা, কিন্তু ভারতচন্দ্রীয় প্রতিভা দিয়ে নয়। এ কাব্যে রাগরাগিনী উল্লিখিত হয়েছে।

কবির 'নবরসাঙ্কুরকাব্যে' (১২৭৫) অমিত্রাক্ষর ছন্দে নবরস বর্ণনা করা হয়েছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রকৃতি এক্ষেত্রেও কবির উপলব্ধির বাইরে; তাঁর কাছে মিলহীন পয়ারই অমিত্রাক্ষর বলে অনুমিত হয়েছে। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় এই কাব্যের এক বিরূপ সমালোচনা বের হয়।

কবি অবশ্য নিজেই নিজের সমালোচনা করেছিলেন—

কামেতে কিছুই নাই, নামেতে রসিক।
নাহি জানি রসিকতা, নাহি জানি রস।
এ ছার রসিক নাম, কিসের পৌরুষ ॥

(পদাঙ্কদূত—পৃ ।০)

বনওয়ারিলাল সে যুগের অন্যতম পরিচিত কবি। তাঁর 'যোজনগন্ধা' (১৫৫৮), দ্বারকাকেলিবিলাস (১৮৬৩), জয়াবতী (১৮৬৫) সাবেকী রীতির গ্রন্থ। তবে তাঁর রচনায় রোমান্স-ধর্মী গল্পরস নিপুণতার সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে। তাঁর 'যোজনগন্ধা' ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর হেরফের। অপূর্বনগরের রাজপুত্র যোজন চিত্রকরের বেশ ধারণ ক'রে সৌরাট রাজকুমারী গন্ধার গৃহে প্রবেশ করল; তারপর চলল নানাবিধ বিহারের রসিয়ে রসিয়ে বর্ণনা।

তাঁর 'জয়াবতী'ও রোম্যান্সজাতীয় রচনা; সম্ভবতঃ প্রচলিত রূপকথাকে রোম্যান্সের রাঙ্‌তা মুড়িয়ে এখানে পরিবেশন করা হ'ল। 'দ্বারকাকেলি-বিলাস' কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য; তবে কাহিনী-ধর্মী কাব্য নয়। রাধাকৃষ্ণ লীলা অবলম্বনে টুকরো কবিতার সংকলন। তাঁর আর একখানি কাব্যগ্রন্থ হ'ল কোকিলদূত; বস্তুত এখানি অনুবাদ গ্রন্থ। 'কোকিলদূতে' রাধিকার প্রোষিতভর্তৃকা রূপের স্তুতি করা হয়েছে। রহস্যসন্দর্ভে কাব্যখানি সমালোচিত হয়; বলা বাহুল্য নিন্দিতই হয়েছিল।

উল্লিখিত রোম্যান্সধর্মী কাব্যসমূহের প্রেরণা স্থল রঙ্গলাল ব'লে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন।[২] রঙ্গলাল নন, ভারতচন্দ্র ও তারাচরণ দাস (মন্মথকাব্যের কবি)। এবং এইজাতীয় কবিদেরই বনওয়ারিলাল আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। বনওয়ারিলাল রায় সংবাদপ্রভাকরের লেখকগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত। বনওয়ারিলালের 'যোজনগন্ধাকাব্য' সেকালে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তার তিনটি কারণ—এক, দেশে তখনও আদিরসাত্মক কাব্যের

প্রতি অনুরাগ বলবৎ ছিল; দুই, এই কাব্যের ভাষা প্রচলিত ভাষা ব'লে পাঠকের পক্ষে সহজবোধ্য; তিন, এই কাব্যে বহুসংখ্যক গান সংযোজিত হয়েছিল এবং গানগুলির অধিকাংশই নিধুবাবুর টপ্পা।

রাধামাধব মিত্রের প্রসঙ্গে পূর্বেই আমরা কিছু বলেছি। রাধামাধব ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যশিষ্য। তাঁর 'বসন্তে বিচ্ছেদে কুলকামিনীর খেদ' (১২৬৭ বঙ্গাব্দ-১৮৬৩ ইং), কবিতাবলী (১৮৭৩) ও রত্নমালা (১২৯১ বঙ্গাব্দ) কাব্যত্রয় সম্পূর্ণই পুরাতন ধারার কাব্য। 'কবিতাবলীতে' বিষয় নির্বাচনে সমসাময়িকতার চিহ্ন ছিটেফোঁটা আছে। নতুবা রচনাশৈলীর দিক্ থেকে এ কাব্যত্রয় অষ্টাদশ শতকে লিখিত হ'লেও বেমানান হ'ত না!

গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হ'লেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুজ। ইনিও সংবাদপ্রভাকরের লেখক ছিলেন। গণেশচন্দ্রের চিত্তসন্তোষিনী (১৮৬৩), ঋতুদর্পণ (১৮৬৪) ও কৃষ্ণবিলাস (১৮৬৪) কাব্যত্রয় সম্পূর্ণই যে পুরাতন রীতির কাব্য, একথা বলা চলে না।

'চিত্তসন্তোষিনী' খণ্ড কবিতার সমষ্টি; কিন্তু এ কাব্যের ভাব-পরিমণ্ডল অধিকার ক'রে থেকেছেন বৃন্দাবনের সেই গোপ বালক-বালিকা। 'ঋতু-দর্পণ' বাস্তববাদে উদ্বুদ্ধ। ডাঃ সুকুমার সেনের মতে "কাব্যটি একেবারে ঈশ্বরগুপ্তের ভাবে-ভাষায় লেখা। কলিকাতার সাহেবদের ও সাহেবি-ভাবাপন্ন বাবুদের প্রতি কটাক্ষ আছে। সেকালের শহর-মফঃস্বলের সমাজ সংসারের টুকিটাকি বর্ণনা ঐতিহাসিকদের কাজে লাগিবে।"[৩]

'কৃষ্ণ-বিলাস' রাধাকৃষ্ণ লীলাকে অবলম্বন ক'রে লিখিত খণ্ড-কবিতার সমষ্টি। এইকাব্যে প্রকৃতি বর্ণনা আছে—অনেকটা 'ব্রজাঙ্গনাকাব্য'-র আদর্শে।

"বিদেশীরা কইয়া থাকেন যে বাঙ্গলা কবিতায় স্বভাববর্ণনের তাদৃশ মাহাত্ম্য নাই। তৎসমুদয় একমাত্র আদিরসে নিবেদিত হইয়াছে; সর্বত্রই কেবল প্রেমের মধুরিমায় অভিষিক্ত।......

মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'কর্মদেবী'তে স্বভাববর্ণনের অবকাশ লইয়াছেন, এবং তদ্দারা যে আদর্শ দর্শাইয়াছেন, তাহাতে নিশ্চয় বোধ হয় যে ঐ অমৃতভাষা কবিবরেরা পরীক্ষা করিলে অতি উৎকৃষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারিতেন, কিন্তু স্বভাববর্ণনে তাঁহাদের উপযুক্ত অবসর হয় নাই।"[৪]

গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঋতুদর্পণ ও শ্রীকৃষ্ণবিলাস সমালোচনা প্রসঙ্গে এই মন্তব্যটি করা হয়েছিল। সমালোচক-মহাশয় মধুসূদনের ব্রজঙ্গনাকাব্যের 'প্রতিধ্বনি' পদটি উল্লেখ ক'রে বলেন যে, "এই রকম নূতনত্ব গণেশচন্দ্রের নাই।"

আমরা গণেশচন্দ্রের প্রকৃতিবর্ণনা থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করছি।

চলহে ভাবুক পান্থ, এখনি হয়োনা শ্রান্ত,
প্রবেশহ কাননের মাজে।
দেখিবে বিচিত্র বর্ণ, ফলতরু নানা বর্ণ,
সাজিয়াছে স্বভাবের সাজে॥
নীচু নামে খ্যাত বঙ্গে, না আলাপে নীচ সঙ্গে,
বসন্তের প্রিয়কর ফল।
সেই বনে এই কালে, থাকয়ে আবৃত জালে,
খগকুল হেরিয়া বিকল॥

হরিশচন্দ্র মিত্র ও কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার এই সময়কার সর্বাধিক পরিচিত কবি ছিলেন। হরিশচন্দ্র মিত্র কবি-সাংবাদিক বলতে যা বুঝায়, তাই ছিলেন। অর্থাৎ তিনি যে কোন বিষয়ের উপর দ্রুত পদ্য লিখতে পারতেন। হরিশচন্দ্র মিত্র 'কবিতা কুসুমাবলী' ও 'কাব্যপ্রকাশ' নামে দু'খানি পদ্য মাসিক পত্রিকা বের করেছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'হাস্যরসতরঙ্গিনী' (১৮৬২), 'বিধবাবঙ্গাঙ্গনা'(১৮৬৩.),'কবিতাকৌমুদী' তিনভাগ (১৮৭৩, ১৮৭৭, ১৮৮০), বীরবাক্যাবলী (১৮৬৪), কীচকবধকাব্য (১৮৬৬), বঙ্গবালা (১৮৬৮), নির্বাসিতা সীতা (১৮৭১), কবিতাবলী, ১ম ভাগ (১৮৭২) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হরিশচন্দ্র অজস্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচনায় পুরাতন ও নতুন রীতির মিশ্রণ আছে—মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয় প্রকার ছন্দ তিনি ব্যবহার করেছেন। তাঁর বিষয়-নির্বাচনে নবীন যুগের সহৃদয়তা ও সমবেদনার ছাপ আছে। বেদনাহত নারীত্বের প্রসঙ্গ তাঁর কাব্যে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। অবশ্য ব্যক্তিজীবনে তিনি সর্বদা আদর্শে স্থিরনিষ্ঠ থাকতে পারেন নি। হিন্দু হিতৈষিণী পত্রিকায় তিনি যোগদান করলে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে লেখা হয়: "বিধবা বঙ্গাঙ্গনার লেখক শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র মিত্র মহাশয় উক্ত পত্রিকাখানি লিখিতেছেন। হরিশবাবু এতকাল চিরদুঃখিনী বঙ্গবিধবাদিগের স্বপক্ষে লেখনী

সঞ্চালন করিয়া এক্ষণে তাহাদিগের বিপক্ষতাচারণ করিতেছেন, শিক্ষিত অন্তঃকরণের এতাদৃশ পরিবর্তন অসম্ভবনীয়।"[৫]

হরিশচন্দ্র মিত্র ঢাকার সর্ববিধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ; তাঁর মৃত্যুতে অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা হয়, "হরিশবাবু ঢাকা প্রদেশের একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন।"[৬] হরিশবাবু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন সন্দেহ নেই ; কিন্তু 'কবি' শব্দটি সেকালে অত্যন্ত শিথিল অর্থে ব্যবহৃত হ'ত। পদ্যকার মাত্রেই যে কবি নন, একথা তখনকার কাব্য-পাঠকেরা বুঝতেন না।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সংবাদ প্রভাকরের অন্যতম লেখক, এবং হরিশচন্দ্র মিত্রের সহযোগী। তিনি হরিশচন্দ্র ও প্রসন্নকুমার সেনের সহযোগিতায় 'কবিতাকুসুমাবলী' নামে এক পদ্যপ্রধান মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইনিও হরিশচন্দ্র মিত্রের মত নানা সাময়িকপত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সদ্ভাব-শতকের কবি হিসাবেই কৃষ্ণচন্দ্র বিখ্যাত। 'সদ্ভাবশতকে' সদ্ভাবের সংখ্যা ১৩৬ ; প্রথম সংস্করণে অবশ্য একশতটি কবিতাই ছিল। অক্ষয়কুমার দত্তের প্রবন্ধ ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বিবিধ প্রবন্ধাবলীর দ্বারা কবি বিশেষভাবে প্রভাবিত হন এবং ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। 'সদ্ভাবশতক' গ্রন্থ রচনায় এই ব্রাহ্মপ্রভাব স্মরণীয়, কারণ হাফেজের বিভিন্ন কবিতার অনুবাদ এই ব্রাহ্মপ্রভাব জনিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সুফী কবি সাদী ও হাফেজের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। 'সদ্ভাবশতক' ব্যতীত কবি 'মোহভোগ' নামে আর একখানি কাব্য রচনা করেন। এছাড়া তাঁর কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতাও বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাব শতক'ই বিশেষ সমাদৃত গ্রন্থ। বাংলাকাব্যের ইতিহাসে খুব কম গ্রন্থই এতটা পরিচিতি দাবী করতে পারে। এ কাব্য এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, তার কারণ তখনকার পেশাদারী কবিতার রঙ্গমঞ্চে এই কাব্য ভিন্ন স্বাদ বহন করে এনেছিল। দ্বিতীয়তঃ এ কাব্যের ভাষা বিশেষ মার্জিত ;"ঢাকাই কাপড়ের ন্যায় উৎকৃষ্ট ঢাকাই কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের প্রণীত 'সদ্ভাবশতক' অতীব মনোহর।"[৭] সুফী কবিদের মরমিয়াবাদ কবি বিশেষ অনুসরণ করতে পারেন নি। কবি তৎকালের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সংস্পর্শে মরমিয়াবাদের মধ্যকার সমস্ত বাষ্পীয় পদার্থকে মিলিয়ে যেতে বাধ্য করেছেন। "বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ্ণতা সম্পাদনার্থে বিজ্ঞান বিস্তার

যেরূপ আবশ্যক, অন্তঃকরণের উৎকর্ষ বর্ধনার্থ সদ্ভাবভূষণা-কবিতাকলাপের চর্চাও সেইরূপ প্রয়োজনীয়।" (সদ্ভাবশতক—১ম সংস্করণ, ১৮৬১—ভূমিকা) সাদী ও হাফেজের রচনায় যে মরমিয়াবাদী অতীন্দ্রিয় বক্তব্য ছিল, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার তার ভাষান্তরণে ঠিক সমর্থ হন নাই।

কৃষ্ণচন্দ্র-লিখিত মোহভোগ কাব্যখানি তত পরিচিত নয়। মোহভোগ খণ্ড কবিতার সমষ্টি নয়। একটি সম্পূর্ণ কাব্য, "মহাভারতের বাসব-নহুস সংবাদ অবলম্বনে নাটকাকারে লিখিত।"

কবি নানাস্থানে প্রকৃতিবর্ণনা করেছেন। এ সমস্ত বর্ণনায় কোন যাদু নেই। আমরা কৃষ্ণচন্দ্রের সদ্ভাবশতক ও মোহভোগ থেকে দু'টি অংশ উদ্ধৃত করছি:

অয়ি সুখময়ি উষে! কে তোমারে নিরমিল?
বালার্ক-সিন্দুরফোঁটা, কে তোমার ভালে দিল?
হাসিতেছ মৃদু মৃদু, আনন্দে ভাসিছে সবে,
কে শিখাল এত হাসি, কেবা সে যে হাসাইল?
জগৎ মোহিত করি, গাইছ বিপিনে কারে;
বল সে যে পুষ্পাঞ্জলি, অর্পণ করিছ যারে?
কমল-নয়ন খুলে, কার পানে চেয়ে আছ,
কার তরে ঝরিতেছে, প্রেম-অশ্রু নিরমল?

* * *

নিশি শশী মলিন হইলা।
স্বভাব রচিত ভূষা, নির্মল বরণী উষা,
সুসম্পদে আসি সমুদিলা।
তিন ফুল কোশা করে, তর্পন স্নানের তরে,
ধেয়ে গেলা ব্রতচারী সব।
উলি অপগার জলে, ডুব দিয়া গঙ্গা বলে,
ভক্তিতে পড়েন গঙ্গাস্তব।
ক্রমেতে উদিলা রবি, হিঙ্গুল রঞ্জিত ছবি,
উজলিলা সকল সংসার।
জল রুচি ঝকমক, রেণু তট চকচক,
ধক ধক ভ্রমদার হার। (পৃঃ ৯)

কবিতাংশ দু'টি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এখানে বাস্তব দৃশ্যের বর্ণনা মার্জিত ভাষায় করা হয়েছে। প্রথমাংশে প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের মধ্যে স্রষ্টার ঐশ্বর্য প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা দেখা যায়। এই কবিতাটি ব্রহ্মসঙ্গীতসংগ্রহে স্থান পেয়েছে। বাংলা কবিতার বিপদ্ বিবিধ; তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল প্রকৃতিবোধে ডীয়িষ্ট মতবাদের প্রভাব। ডীয়িষ্ট মতবাদের বক্তব্য কি, তা পূর্বেই আলোচনা করেছি। কৃষ্ণচন্দ্র হাফেজের অনুসরণ করেও হাফেজের লক্ষ্যে উপনীত হতে পারেন নি; যদি পারতেন, তাহলে বাংলা কবিতার মুক্তি-যজ্ঞে অন্যতম প্রধান ঋত্বিক হতে পারতেন।

তাঁর হাতেও লঘু চতুষ্পদীর জন্ম ঘটেছে;

চির সুখী জন, ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত বেদন, বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে, দংশেনি যারে?

এই ছন্দ বিহারীলালের ছন্দের দেহ-কাঠামোর নিকটআত্মীয়; কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতি পৃথক্। এখানে ছন্দের সেই চলতা-ধর্ম, প্রবহমানতা নেই।

কৃষ্ণচন্দ্র বিরচিত মোহভোগ কাব্য ১২৭৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। নহুসের কাহিনী নিয়ে কাব্যটি লেখা হয়েছে। কাব্যে মাইকেলী প্রভাব আছে। কবি সমিল অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছেন—

স্বর্ণ রসে অতিথির ভাতিল সে কর,
ভাতিল তাতে রম্য পাদপ নিকর
রুচির বিভাতে। আহা মনে হয় হেন
চন্দনে চর্চিত শ্যামশরীরতা যেন।

কবি প্রকৃতি অর্থে স্বভাব ব্যবহার করেছেন—

"কি বিচিত্র ভাব আজি স্বভাবে সঞ্চারে" (পৃঃ ২০)

কৃষ্ণচন্দ্র নতুন-পুরাতন দুই স্রোতোধারাতেই অবগাহন করেছেন।

* * * *

॥ ২ ॥

পূর্বোক্তদের মত এত খ্যাতির অধিকারী না হ'লেও মদনমোহন মিত্র, কাঙাল হরিনাথ, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়, ভুবনমোহন রায় চৌধুরী ও জগদ্বন্ধু ভদ্র এ যুগের মোটামুটি পরিচিত কবি।

এঁরা সাময়িক পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন; অনেকেরই একাধিক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। মদনমোহন মিত্রের 'কবিতা কদম্ব' ও 'পদ্য সোপান' ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

'কবিতা কদম্ব' মধুসূদনের বীরাঙ্গনার অনুসরণে লেখা। কবি নিজেই তাঁর কাব্যরচনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন:

স্মৃতি পথে তুলিবারে
পূর্বের গৌরব কথা
সেই হেতু এই আকিঞ্চন।

সাবিত্রী, শচী, সীতা, সতী, রাধিকা, উর্মিলা, ভানুমতী, তারাবাঈ প্রভৃতি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নারী অবলম্বনে এই monologue-গুলি লেখা।

কবিত্ব যে কিছু নেই, তা নয়। একটু নমুনা দিচ্ছি:

নীহার কুমারীগুলি
শ্যামল শয্যায় শুয়ে
তারা হার পরিয়াছে শিরে।

স্বচ্ছ সরসীর বুকে
ছুটিলে লহরী মালা,
কিরণ মুকুট শোভে শিরে।

শ্যাম দূর্বাদল পরে
শিশির বালিকাগুলি
কত সুখে ঘুমায়ে পড়েছে।

নীলাম্বরে তারা পাঁতি
লুকায়ে দেহের ভাতি,
মুখ তুলি কতই হাসিছে।

লেখকের কল্পনাশক্তি আছে, স্বীকার করতেই হবে। ভাষার উপরে দখল কতটা আছে, তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে।

কবির ভাষায়ও মাইকেলী অনুসরণ-প্রয়াস আছে।

* * * কতবার
এসেছে কাননে, কতবার মনোসাধে
কুরঙ্গ-কুরঙ্গী সাথে খেলিছি গহনে,
বনফুল তুলি গাঁথি মালা, পরাইয়ে
দিছি তার গলে। বন বিহঙ্গিনী সাথে
উচ্চতান প্রতিধ্বনি তুলিয়া কৌতুকে
আকুলিত করিয়াছি নিবিড় কানন।
স্বপ্নসাধ মন সাধে করেছি পূরণ। (সীতা-৮)

মিত্রমহাশয়ের পদ্যসোপান ছাত্রবোধ্য কবিতার সমষ্টি।

॥ ২ ॥

কাঙাল হরিনাথ নিজেই একটি Institution ; সুদূর মফঃস্বলে এত বড় জাগ্রত চিত্ত তখন আর দ্বিতীয় ছিল না। তাঁর মনীষা নানাদিকে প্রকাশিত হয়েছে—সাময়িক পত্র সম্পাদনায়, বঙ্গবিদ্যালয় সংগঠনে, উপন্যাস রচনায়, ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায়, বাউল সংগীতের পুনরুজ্জীবনে এবং আধ্যাত্মিক সাধনায়। তাঁর রচিত বাউল সংগীত 'ফিকিরচাঁদের গান' বলেই বিখ্যাত। এ ছাড়াও তিনি বাউল গান সংগ্রহ করেছিলেন। পদ্মা-গড়াই-কালীনদীর দু-পাশে নানা বাউল সাঁইজীদের আস্তানা। স্বয়ং কাঙাল তার কেন্দ্রবিন্দুতে বসবাস করতেন! ব্যক্তিগত জীবনে তিনি লালন শাহের সাধন ভজনের উৎসুক সমজদার ছিলেন।

কাঙালের গানকে কেউ কেউ কৃত্রিম 'বাউল গান' বলেছেন। কিন্তু কাঙালের সাধন-জীবন কৃত্রিম নয়। এ বিষয়ে বাংলার দুই সর্বজনমান্য সাহিত্যরথী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও জলধর সেন সাক্ষ্য দিয়েছেন। উভয়েই কাঙালের সাহিত্য-পাঠশালার ছাত্র। কাঙালের অধ্যাত্ম জীবন যদি আন্তরিক ও অকপট হয়, তবে তাঁর বাউল গানগুলি নিশ্চয়ই কৃত্রিম নয়। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর বাংলা বিভাগ লালন শাহের বাউল গানের

এক সংকলন 'সাহিত্য পত্রিকা'য় ছাপিয়েছেন। সেই গানগুলির সবগুলিই তুল্যভাবে সাহিত্যিক নজরানায় সমৃদ্ধ নয়।

ফিকিরচাঁদের গানগুলি এই গীতসংগ্রহের অন্তর্ভূ'ক্ত হ'লে এদের পিতৃত্ব বিচার কষ্টকর হ'ত।

বাউল-সঙ্গীতের ভাষার যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ, ফিকিরচাঁদ তা সফলতার সঙ্গে শিক্ষিত মহলে প্রচার করেছেন। এ ভাষা তখন গৃহীত হয় নি, কারণ দেশ এবং তার কাব্য তখনও এই ভাষা গ্রহণ করার জন্য তৈরী ছিল না। মুষ্টিমেয় মর্মজ্ঞ শ্রোতা তখন তৈরী হয়েছিলেন—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন। ভক্তিবাদ, মরমিয়াবাদ ও অতীন্দ্রিয়বাদ ধীরে ধীরে সমাজসত্তার গভীরে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছে। আমরা এ বিষয়ে যথাস্থানে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করব, যখন বাংলা কাব্য আর এক পরিবর্তনের স্বর্ণদ্বারে এসে দাঁড়াবে। ইতোমধ্যে আমরা কাঙালের সংগীতগুলি থেকে দুই একটি নমুনা উদ্ধৃত করছি।

অরূপের রূপের ফাঁদে, পড়ে কাঁদে
প্রাণ আমার দিবানিশি।
কাঁদলে নির্জনে বসে, আপনি এসে,
দেখা দেয় সে রূপ রাশি ;
সে যে কি অতুল রূপ, নয় অনুরূপ,
শত শত সূর্য শশী।
যদি সে চাই আকাশে, মেঘের পাশে,
সে রূপ আবার বেড়ায় ভাসি,
আবার রে তারায় তারায়, ঘুরে বেড়ায়,
ঝলক লাগে হৃদে আসি। (৮)

আর একটি গানের দু'টি পঙ্‌ক্তি শুধু তুলছি :

ডাকে করুণ স্বরে, পাখীর হল কি ?
একে ঘোর রাতি, মাঝে নদী, দু' পারে দু' পাখী! (৯)

প্রথমটির সঙ্গে নিশ্চয়ই তুলনা হতে পারে এই গান দু'টির :

(১) অরূপ-বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে,
সে বীণা আজি উঠিল বাজি হৃদয় মাঝে॥ (১০)

(২) রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি। (১১)

এ গুলির ভাষা ও বক্তব্য একদেশীয়।

কাঙাল হরিনাথের গান ভবিষ্যতের কাব্যের এক বিশেষ ভাষা-সৃষ্টির উপকরণ সরবরাহ করল। গদ্যাত্মক শব্দ নয়, পদ্যেরই নিজস্ব একান্ত শব্দ এই বাউল সংগীতের উপকরণ, সম্পদ। সেই গান ও শব্দসম্ভার তাঁকে কেন্দ্র ক'রেই শিক্ষিত সমাজে প্রবেশাধিকার পায়। শিলাইদহের কবি কুমারখালির এই সাধক-বাউলের প্রতিবেশী, এবং পরিচিত।

কাঙালের পদ্য পুণ্ডরীক ছাত্রপাঠ্য ও শিশুবোধক নীতিকবিতার সমষ্টি। বঙ্গ বিদ্যালয়-এর অধ্যক্ষের পক্ষে এই জাতীয় নীতিকাব্য রচনা স্বাভাবিক ঘটনা। এই বিদ্যালয় বাংলাদেশের তিনজন সাহিত্যসেবীর প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। কাঙাল-সম্পাদিত 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' এই বঙ্গবিদ্যালয়েরই অচ্ছেদ্য অংশ।

* * * *

যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় বহু পদ্যগ্রন্থের লেখক। তৎকালে তাঁর পদ্যের যে বেশ চাহিদা ছিল, তাও বুঝা যায়। কিন্তু তাঁর সমস্ত পদ্য পদ্যই মাত্র, কবিতা নয়; একটিও কবিতা নয়। অথচ তাঁর ভাষা মার্জিত, বক্তব্য সুস্পষ্ট। তাঁর পদ্য পাঠ (১৮৬৮-৬৯) তিন ভাগে প্রকাশিত। পাঠ্য পুস্তকে এখনও যদু-গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের পদ্য দেখতে পাওয়া যায়; এবং এটুকু অনুগ্রহ অবশ্য তিনি আশা করতে পারেন।

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় সম্পূর্ণই পুরাতন রীতির কবি। এঁর দু'খানি কাব্য 'চিত্তচৈতন্যোদয়' এবং 'বৈরাগ্যবিপিনবিহার' যথাক্রমে ১৮৬৭ ও ১৮৭৮ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। কাব্য দু'টি ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য-রীতি ও কাব্য কলাবিধির অনুকরণ। এবং বক্তব্যে ঈশ্বর গুপ্তীয় আধ্যাত্মিকতার প্রশ্রয় আছে।

ভুবনমোহন রায়চৌধুরী তাঁর ছন্দঃকুসুম কাব্যের জন্য বাংলা কাব্য ও কাব্যশাস্ত্রে অশেষ খ্যাতির অধিকারী। কারণ ছন্দঃকুসুম একাধারে কাব্য ও ব্যবহারিক ছন্দোবিজ্ঞান। কাব্যটি ১২৭০ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত শ্রী রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক গ্রন্থ সংশোধিত হয়েছে। 'কেবল গুরু লঘু ও ব্যঞ্জন বর্ণ সকলের সম্ভবমত সম্পূর্ণ উচ্চারণ করিলে এবং চরনান্ত যতির

প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পাঠ করিলে, আপনা হইতেই ছন্দ সকল মূর্তিমান হইবেক; রূপ যথার্থ উচ্চারণ করিলে যদিও চলতি ভাষায় কি কথার ঐরূপ বৈলক্ষণ্য হয় বটে, কিন্তু লিখিত ভাষার সহিত বাচনিক কথার ঐরূপ বৈলক্ষণ্য সর্বদাই সকল ভাষায় ব্যবহার আছে।" (বিজ্ঞাপন)

এইরূপ গদ্য-ধর্মী বক্তব্যই পদ্যে বলা হয়েছে প্রচলিত পয়ার ত্রিপদী ছন্দসমূহকে সমালোচনা ক'রে :—

লঘুকে গুরু সম্ভাষে, দীর্ঘ বর্ণে কহে লঘু।
হ্রস্বে দীর্ঘে সজ্ঞানে, উচ্চারণ করে সবে॥ ৩১৫
হসন্ত প্রায় সম্ভাসে, শব্দের শেষ অক্ষরে।
বর্ণান্তস্থ অকারের, লুপ্তাকারে পঠে সদা॥ ৩১৬
এই কুৎসিত সংস্কারে, দেশভাষা দিনে দিনে।
হয়েছে সম্পদভ্রষ্টা, দীনভাবে ভ্রমে সদা॥ ৩১৭
বর্ণমালা ধরে মাত্র, মাতৃ আচার রাখিতে।
ভগ্ন শব্দাদি রত্নেতে, ছিন্নালংকারে ভূষিতা॥ ৩১৮

আধুনিক কাব্য-প্রয়াসকে সমালোচনা ক'রে বলা হল :

দ্বারে দ্বারে করে ভিক্ষা, নাহি জাতি বিবেচনা।
নানা জাতীয় শব্দার্থে, করে যত্ন প্রতিগ্রহ॥ ৩১৯
পারশ্য আরবী হিন্দী, ইংরাজী শব্দ সম্পদে।
লয়ে দান মহাকষ্টে, করে উদর পোষণ॥ ৩২০
অভাবে শব্দ সম্পত্তি, যাচে অন্যের আলয়ে।
শ্রীভ্রষ্টা দৈন্য দৌর্ভাগ্যে, সুতরাং হীন গৌরবা॥ ৩২১

এই অংশটি অনুষ্টুপ ছন্দে লিখিত। বিজ্ঞাপনে আমাদের মত প্রাকৃত জনের উচ্চারণ ত্রুটি সংশোধনের জন্য যে ব্যবস্থাপত্র রচনা করা হল, তা ছিন্নপত্রে পর্যবসিত হ'চ্ছে। এ ক্ষেত্রে আমরা এ ছন্দের মহিমা উপলব্ধিতে অপারগ। কাব্যটির আখ্যায়িকা নিম্নরূপ :

মাতৃভাষার দুরবস্থা দেখে কবি যারপরনাই কাতর। এমনি সময় সংস্কৃতা দেবী দর্শন দিলেন ; কবি তাঁর কাছে হৃদয়-বেদনা নিবেদন করলেন। দেবী বললেন, হিন্দু রাজত্বে আমি সুখে ছিলাম ; মুসলমান রাজত্বকালে আত্মগোপনে বাধ্য হয়েছিলাম। ইংরেজের সুশাসনে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে এবং

জ্ঞানচর্চাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছন্দোমঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থের সহায়তায় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হবে ব'লে আশা রাখেন। আর কবিকে দেবী বর দিয়ে বললেন:

আবৃত্তি করিবে যেবা, ছন্দঃকুসুম পুস্তক।
উচ্চারণ পরিষ্কার, হইবে তার সত্বর ॥ ৩৬৩
হ্রস্ব দীর্ঘ অনুস্বরে, যথাবিহিত উচ্চরি।
যে পঠে সে হবে সিদ্ধ, ছন্দঃ জ্ঞানে অসংশয় ॥ ৩৬৭
তথা ব্যঞ্জনে বর্ণান্তে, হসন্ত যদি না বহে।
পূর্ণ উচ্চারণে তাহা, পাঠ পূর্বফল লভে ॥ ৩৬৮

এসবই তো কবির কাব্য রচনার উদ্দেশ্য। এখন কাব্যের বিষয়বস্তু কি?

মান ভিক্ষাচ্ছলে কৃষ্ণ, হইয়া ছদ্মযোগিনী।
রাধা স্থানে লভে ভিক্ষা, নানা বচন কৌশলে ॥ ৩৯০
রাধা কৃষ্ণের সংযোগে, যুগ্ম বিগ্রহ বর্ণনা।
বৃন্দারণ্যের সৌন্দর্যে, হৈল গ্রন্থ সমাপণ ॥ ৩৯৮

কবি নানা সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় প্রয়োগ করেছেন। এই ধরনের কৃতিত্ব ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও মদনমোহন তর্কালংকার দাবী করতে পারেন। ভুবন মোহন রায়চৌধুরী অধিক সংখ্যক সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় রূপান্তরিত করেছেন। তবে তিনি রূপ দিতে পারেন নি। তিনি রূপান্তরকারী, রূপকার নন। দুই একটি নমুনা তুললেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

ভুজঙ্গপ্রয়াত; সদা বিশ্বপাতা মহাবিষ্ণুরূপী,
জগৎ সৃষ্টিকর্ত্তা নিয়ন্তা বিধাতা।
মহাকালরূপে পুনঃধ্বংসকারী,
কত ত্রাণ দীনেশ দীনে অপাঙ্গে ॥

মত্তমাতঙ্গ লীলাকর:

১ . ৩ ৪ . ৬ ৭ . ৯ ১০. ১২ ১৩ . ১৫ ১৬. ১৮ ১৯
যোগিনী বেশধারী নিমেষৈক মধ্যে হবে স্বীয় মায়া
. ২১ ২২ . ২৪ ২৫ , ২৭
ধরে পূর্বে কায়া তবে,
নূপুর শ্রীপদে বাজিছে ঝন ঝন পীতবাসে
কটীবদ্ধ শোভে সুমালা গলে। (পৃঃ ৯১)

কবি তাঁর কাব্য-উদ্দেশ্যে আরও স্পষ্ট ক'রে বলেছেন :

অতএব পুরাকালে, যে ছন্দঃ ছিল মঞ্জরী।
ইদানীং কুসুমাকারে, সে হইল বিকশিত॥ ৪০৩

বুঝা গেল, কবি নতুন ক'রে চর্যাগীতিকা-পুর্ব বাংলা কবিতা রচনা করতে চেয়েছেন। কিন্তু ইতিহাসের চাকা পিছনে টেনে নিয়ে যাওয়া কষ্টকর, এবং সাময়িকভাবে সফল হলেও শেষ পর্যন্ত তা সম্মুখমুখী হয়।

রহস্য-সন্দর্ভের দ্বিতীয় পর্বের ১৩খণ্ডে ছন্দঃকুসুম সমালোচিত হয়; "তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, সমস্ত সংস্কৃত বৃত্তছন্দ ও মাত্রাছন্দ বাঙ্গালাতে রচিত হইতে পারে, এবং লঘু ও গুরুর প্রকৃত উচ্চারণ করিলে তাহাতে তাহাদের কান্তির হানি হয় না।"

এ সমালোচনায় বাংলা ভাষার অন্তঃপ্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখান হয় নি।

রবীন্দ্রনাথও 'ছন্দঃকুসুম' গ্রন্থের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন; সে উল্লেখ ছন্দ প্রসঙ্গেই।

মোটকথা ছন্দঃকুসুম কাব্য নয়, পদ্যে কাব্য-কলাবিধি। এবং তা-ও বিগতযুগের।

কালের শিঙ্গা বাজলেই যে সবাই তা শুনতে পাবেন, তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

জগদ্বন্ধু ভদ্রের মাইকেল-বিরোধিতা অত্যন্ত স্পষ্ট; তাঁর ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য বস্তুত মেঘনাদবধ কাব্যের প্যারডি, এবং বাংলা ভাষায় এতাবৎ কাল লিখিত শ্রেষ্ঠ প্যারডির অন্যতম। Mock heroic poetry বলতে বাংলা কাব্যে ইতিপূর্বে কিছু ছিল না। রঙ্গলালের 'ভেক মূষিকের যুদ্ধ' অনুবাদ বা অনুসরণ মাত্র। 'খোকা যাবে মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কূলে' প্রভৃতি মনোরম শিশু-ভুলানো ছড়াতে 'mock heroic poetry'-র আমেজ থাকলেও এগুলিকে ঠিক আলংকারিক পরিভাষায় 'mock heroic poetry' বলা চলে না। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাসে তিনখানি কাব্যকে এই মর্যাদা দেওয়া যায়; এক ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য, দুই গুম্ফ-আক্রমণ কাব্য, তিন ভারত-উদ্ধার কাব্য। প্রথমটির রচনাকারী জগদ্বন্ধু ভদ্র, দ্বিতীয়টির দ্বিজেন্দ্রলাল ঠাকুর, তৃতীয়টির হলেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। জগদ্বন্ধু ভদ্র 'mock heroic portry'র তাহলে আদি শিল্পী এবং তিনি যে শিল্পী এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সার্থক প্যারডিতে সব সময়ই মূলের ভাষা ও রচনাশৈলীর সুচতুর অনুসরণ থাকে। বলা বাহুল্য আলোচ্য কাব্যে তার অপ্রতুলতা নেই। অনুসরণ অপেক্ষা অধিক কিছু আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্যারডিতে আতিশয্যের আমেজ থাকে। বাতির সলিতা একটু ঈষৎ চড়ানো—তাতে চিমনি ফাটে না, কিন্তু আলো-অন্বেষীর চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ছুচ্ছুন্দরীতেও পলিতা ঈষৎ চড়ানো। মাইকেল একান্তই অভিধানভুক্ত ও যুক্তাক্ষর বহুল শব্দ ব্যবহার করতেন, জগদ্বন্ধু তার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। মাইকেল উপমা উৎপ্রেক্ষা একটু বেশী ব্যবহারের পক্ষপাতি ছিলেন; জগদ্বন্ধু তাদের নিয়ে হরির লুট দিয়েছেন। মাইকেল বন্ধনী প্রয়োগ করতেন, জগদ্বন্ধুই-বা তা বাদ দেবেন কেন?

বরং মাইকেলকে যাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুসরণ করতে চেয়েছেন, তাঁদের অপেক্ষা এই শত্রুপক্ষীয় তীরন্দাজের বিদ্রুপ বাণই সার্থকতরভাবে গুরুর পাদবন্দনা করল।

দ্বারকানাথ রায়, হরিশচন্দ্র মিত্র ও কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার অমিত্রাক্ষর ছন্দ অনুকরণের ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের চেষ্টা ছিল সশ্রদ্ধ। এই উদ্ধত বৈষ্ণবের চেষ্টা ছিল প্রতিবাদের, কিন্তু তাঁরই চেষ্টা হল সফল। এক মদনমোহন মিত্র ব্যতীত সমসাময়িক অন্য কোন কবি তাঁর তুল্য সাফল্য করায়ত্ত করতে পারেন নি। মদনমোহন অপেক্ষাও তাঁর সাফল্য বিশ্বস্ত। মদনমোহনের হাতে অমিত্রাক্ষর তরলতর; কারণ যুক্তাক্ষরের প্রতি তাঁর একটু ভীতি ছিল। আর যুক্তাক্ষর,—ব্যঞ্জনবর্ণ-বহুল যুক্তাক্ষর ব্যবহারেই তাঁর আনন্দ। এবং তাঁর কাব্যের কৌতুককর জলবিম্ব ফুটে উঠেছে এই যুক্তাক্ষরের গদা আস্ফালনে। আস্ফালনটা ভুয়া, তাই মজাটা ষোলো আনার স্থলে আঠারো আনাই উপভোগ্য।

১২৭৫ বঙ্গাব্দে ১২ই আশ্বিন অমৃতবাজার পত্রিকায় এই কাব্যের ১ম সর্গ ছাপা হয়। ঐ প্রথম সর্গই শুধু, দ্বিতীয় সর্গ আর কোন কালেই ছাপা হয় নি। ছাপা হওয়ার প্রয়োজনও ছিল না। কারণ ইতিমধ্যেই এই কাব্য তখন লোকের মুখে মুখে ফিরছে। মেঘনাদবধের ছন্দ যাঁরা আয়ত্ত করতে পারছিলেন না, ভদ্রমহাশয়ের কৌতুকের পেয়ালায় ঠোঁট ডুবিয়ে তাঁরা আমিত্রাক্ষর ছন্দের দুরূহতার ‘myth’ ফাঁসিয়ে দিলেন।

তুচ্ছ ছুঁচোবধ করার জন্য যে সমরায়োজনের প্রয়োজন (ভাষার ও ছন্দের), কবি তা চমৎকারভাবেই করেছিলেন। তাতে ছুঁচো শেষ পর্যন্ত ভবলীলা সংবরণ না করলেও কাব্যামোদীদের হাস্যলীলা সংবরণ করা কষ্টকর হয়েছে।

মধুসূদনের ছন্দ কাঠামোর ৮+৬ পর্ব-বিভাগ বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুকৃত হয়েছে, এবং যতি স্থাপনে কবি মধুর অনুসরণ হেমচন্দ্র ও অন্যান্য "মহাকবি" অপেক্ষা সার্থকতর এবং প্রায় নির্ভুল। যথা,

ক্রুহিন-বাহন-সাধু, অনুগ্রহনিয়া
প্রদান সুপুচ্ছ মোরে দাও চিত্রিবারে
কিম্বিধ কৌশলবলে শকুন্তদুর্জয়—
পললাশী বজ্রনখ আশুগতি আসি
পদ্মগন্ধা ছুচ্ছুন্দরী সতীরে হানিলা ?
কিরূপে কাঁপিল ধনী নখর প্রহারে,
যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে।

মধুকবির পঙক্তি বিশেষ শুধু নয়, কবির বাচন বৈশিষ্ট্যও সার্থকভাবে অনুকৃত হয়েছে। এছাড়া মধুকবির একই স্থলে একাধিক উপমা উৎপ্রেক্ষা প্রয়োগ—সু, হায়, যেমতি শব্দ প্রয়োগ, দূরান্বয় ত্রুটি, ও বন্ধনী-ব্যবহার- অতিশয়তা মধুর নির্মমতার সঙ্গে উপহসিত হয়েছে।

অর্কক্ষারুহের তলে বিক্রুত গমনে—
(অন্তরীক্ষ অধ্বে কলম্ব লাঞ্ছিত
সু আশুগ ইরম্মদ গমে সন সনে)
চতুষ্পদ ছুচ্ছুন্দরী মর্মরিয়া পাতা
অটছে একদা, পুচ্ছ পুষ্প গুচ্ছ সম
নড়িছে পশ্চাদ্ভাগে। হায়রে! যেমতি
সুশ্যামল বঙ্গ গৃহে কন্যায় শরদে,
বিশ্বপ্রসূ বিশ্বম্ভরা দশভুজা কাছে,
(ক্ষাভ্রীশ আত্মজা যিনি গজেন্দ্রাস্য মাতা
ব্যজেন চামর লয়ে ঋত্বিক মণ্ডলী।
কিম্বা যথা ঘটিকা-যন্ত্রের দোলদণ্ড
ঘন মুহুর্মুহু দোলে। অথবা যেমতি

মধুঋতু-সমাগমে আর্যাত্মজালয়ে
(বিষ্ণুপরায়ণ যাঁরা) বিচিত্র দোলনে—
দারু বিনির্মিত-দোলে রমেশ হরষে।
কিম্বা যথা অর্কফলা নেড়া শীর্ষে নড়ে,
বাদেন মুরজ যবে হরি সঙ্কীর্তনে।

ভদ্রমহাশয়ের এই পরিহাস নির্মম পরিহাস; তবে অভদ্র নয়। এই হাসির তীর কিন্তু পরিহসিত ব্যক্তিটিকে বিদ্ধ করতে পারে নি, দুঃখকাতর করতে পারে নি। উচ্চহাসির স্বভাবই এই-যে, তা ছড়িয়ে পড়ে উচ্চ শব্দেরই মত; শত্রুমিত্র ভাগাভাগি ক'রে নেয় সমানভাবে। বক্র হাসির মত সংকীর্ণ ছুঁচালো হয়ে প্রতিপক্ষকেই কেবল বিদ্ধ করে না। কবির অন্যতম জীবনীকারের মতে স্বয়ং মধুসূদন নাকি এই কাব্যের প্রশংসা করেছিলেন।[১২] পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ মেঘনাদবধ কাব্যের এই ব্যঙ্গানুকৃতিতে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু সমসাময়িক সুধীবৃন্দের প্রতিক্রিয়া ছিল ভিন্নরূপ। বিদেশী সাহিত্যে হোমার প্রভৃতির ব্যঙ্গানুকরণ প্রচুর দেখা যায়। রাজনারায়ণ বসুর মতে, "এই অনুকরণটি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"[১৩] আমাদের মতে ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্যারডি, এবং অসমাপ্ত শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ কাব্য।

* * *

এই পরিচিত কবিকুল ছাড়াও এক বিপুল সংখ্যক কাব্য-প্রণেতার আবির্ভাব ঘটেছিল এই যুগে। প্রথমতঃ মাইকেল সাফল্য তার কারণ, দ্বিতীয়তঃ গদ্য তখনও জনপ্রিয় সাহিত্য-মাধ্যম নয়। বিশেষ ক'রে সৃষ্টিশীল সাহিত্যের (creative literature) বাহন নয়। বঙ্কিমের সাহিত্য-কৃতি পদ্যের একচেটিয়া আধিপত্য ক্ষুণ্ণ করবে। উপন্যাসের বিপুল প্রতিপত্তি পরবর্তীকালে পদ্য-অঙ্গন থেকে বহু সাহিত্য-যশঃ-লোভীর অন্তর্ধানের কারণ হবে। মাইকেল-সমসাময়িক যুগে মাইকেলের মহাকাব্য-খ্যাতির প্রলোভনে বহু "কবি" মহাকবি হবার সাধনায় মত্ত হলেন। পৌরাণিক এমন কোন বীরই প্রায় বাদ থাকলেন না, যাঁদের অতুলনীয় বীরত্ব গৌরব বর্ণনা ক'রে কোন না কোন মহাকাব্য রচিত হ'ল। বধ্য অনেককেই হ'তে হ'ল—কীচক, অভিমন্যু, তপতী, সম্বরণ, নিবাত কবচ, লবণ, কংস প্রভৃতি। হরণ বা উদ্ধার বা দলন করা হ'ল বিভিন্ন ব্যক্তিকে বা জাতিকে—দানব, পিশাচ, সীতা, সুভদ্রা। এ ছাড়া কোন কোন নন্দিনীকে

নিয়ে মর রসাত্মক কাব্য রচনা করা হ'ল ; পূর্বরাগই এখানে মুখ্য বিষয়, যথা—যাদবনন্দিনী, কাদম্বরী প্রভৃতি। এঁদের রচনায় মাইকেল নানা স্তর থেকে প্রভাব বিস্তার করেছেন। কারো ক্ষেত্রে ছন্দে ও ভাষায়—যেমন, ব্রজনাথ মিত্রের কাদম্বরী কাব্য ; কারো ক্ষেত্রে শুধু বিষয়ের, যেমন—মহেশচন্দ্র শর্মার নিবাত কবচ বধ (১৮৬৯)* ; কারো ক্ষেত্রে শুধু বিষয় ও ভাষার, যেমন—দীননাথ ধরের 'কংস বিনাশ' কাব্যে'র† (১৮৬১) ; কারো কারো ক্ষেত্রে ভাষায়-ছন্দে আংশিক ভাবে মাইকেল-প্রভাব অনুভূত হয়েছে।

মাইকেল-প্রভাব এককভাবে শুধু ভাষা বা শুধু ছন্দের ক্ষেত্রে সমসাময়িক কালে আদৌ অনুভূত হয় নি। সর্বদাই বিষয়কে অবলম্বন ক'রেই এই প্রভাব ছন্দ বা ভাষার ক্ষেত্রে অনুভূত হয়েছে। কোন আদর্শই তার আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গেই সমাজদেহে প্রবেশ করতে পারে না, তবে ধীরে ধীরে মিশে যায়। মহাকাব্য-অঙ্গনের কর্ণবিদারী কলরব এড়িয়ে গীতিকবিতার কাকলী-মুখর অঙ্গনে পদার্পণ করা যেতে পারে। এখানে দেখতে পাই, মাইকেল-প্রভাব গীতিকবিতার ঘুমভাঙ্গানিয়ার কাজ সফলতার সঙ্গেই করছে। যদি সমসাময়িকদের মধ্যে মাইকেল-শিষ্যত্বের কোন মূল্যবান ফলশ্রুতি খুঁজতেই হয়, তাহলে মহাকাব্য-অঙ্গনে খুঁজলে হবে পণ্ডশ্রম। বরং গীতিকবিতার অঙ্গনে কিছু কিছু সার্থক গুরুদক্ষিণার সন্ধান মিলবে। ব্রজাঙ্গনা ও চতুর্দশপদীর অনুকরণই অধিক দেখা যায়। গান্ধারীবিলাপ (১৮৭০), রাধাবিলাপ লহরী (১৮৭০) বা দময়ন্তী বিলাপ (১৮৬৮) ব্রজাঙ্গনা-অনুগত রচনা। এগুলির সাহিত্যিক মূল্য নতুনের অনুকরণের মধ্যে যতটুকু থাকতে পারে (যদি থাকে), তাই মাত্র।

চতুর্দশপদীর অনুকরণের লেখা রামদাস সেনের কাব্যদ্বয় উল্লেখযোগ্য। কবিতাবলী (১৮৬৭) ও চতুর্দশপদী কবিতামালা (১৮৬৭) পরে একসঙ্গে 'কবিতা লহরী' নামে প্রকাশিত হয়। কবিতালহরীর মলাটে Wordsworth ও মাইকেল থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছিল। অধিকাংশ কবিতা সংবাদ প্রভাকর, সোমপ্রকাশ, বিশ্বমনোরঞ্জন, ভারতরঞ্জন, গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা, বিদ্যোন্নতি সাধনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবিতালহরী দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ; প্রথম খণ্ডে নানা বিষয়িনী কবিতাকলাপ, দ্বিতীয় খণ্ডে চতুর্দশপদী কবিতামালা।

* গ্রন্থখানি রহস্য সন্দর্ভে নিন্দিত হয়েছিল।

† এখানিও রহস্য সন্দর্ভে সমালোচিত হয়।

বিষয়-অনুসারে কবিতাগুলিকে এইভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা যায় :—

(১) ঐতিহাসিক ঘটনা-বিষয়ক (২) প্রকৃতি-বিষয়ক (৩) ঈশ্বর-বিষয়ক (৪) ব্যক্তিগত অনুভব-বিষয়ক কবিতা। কবিতা সূচী নিম্নরূপ :

ঈশ্বর স্তোত্র, নিশীথসময়ে পরিভ্রমণ ও চিন্তা, বীর্যবতী হিন্দুনারী, কপালকুণ্ডলা, বিপদাপন্ন যুবা, কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তুষারাবৃত গিরি, জনৈক ভারতবর্ষীয়ের বিলাপ, কোন নৃপের সাংসারিক সুখে বিরাগপ্রকাশ পূর্ণিমা, শোকাতুর বৃদ্ধের খেদ, বসন্ত, দ্বিপ্রহর বেলায় ভাবুকের ভ্রমণ, প্রেমিকার সংগীত, আওরঙ্গজেবের স্বপ্নদর্শন, বিপদগ্রস্ত গৃহস্থ পরিবার, ভগ্ন প্রাচীরোপরি চমৎকার শোভা, সন্ধ্যাকালে ভাগীরথী দর্শন, নীলকরের কারাগারে জনৈক কৃষকের খেদ, চন্দ্রগ্রহণ, মুঙ্গের দুর্গ, পাদ্রি লং সাহেব, ভগবান্ শংকরাচার্য, ঝড়বৃষ্টির পর কাশীমবাজারের ধ্বংস।

কবিতাসূচীর প্রতি দৃষ্টি দিলেই বুঝা যাবে যে, মাইকেল-বিষয়-নির্বাচন কী মৌলিক পরিবর্তনই না সাধন করেছে বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে! কবি রামদাস সেন বর্ণনাত্মক রচনায় খুব ব্যর্থ নন। তাঁর ব্যবহৃত দু'টি শব্দ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : প্রকৃতি অর্থে স্বভাব, এবং কবি অর্থে ভাবুক।

তাঁর প্রকৃতিবর্ণনা থেকে উদাহরণ হাজির করছি :

দ্বিপ্রহরে উষ্ণ অর্ক-কর,
তরুলতা তপ্ত নিরন্তর,
শাখীর শাখায় পাখি, পক্ষমাঝে চঞ্চু রাখি,
বিশ্রামের হ'ল অনুচর। (ঈশ্বরস্তোত্র)

কি শোভা ধরেছে এবে এই গিরিবর।
বিমল তুষারাবৃত সর্ব কলেবর॥

ঘুমে ঢুলুঢুলু যথা কৈলাসের পতি।
রজত জিনিয়া কান্তি প্রকাশিছে ভাতি॥

আকাশের সুপ্রশস্ত চন্দ্রাতপতলে।
গম্ভীর প্রকাণ্ড গিরি মূর্তি ঝলঝলে॥

পড়েছে তাহাতে বাল অরুণের ছটা।
রজত কাঞ্চন উভ রঙে করি ঘটা॥

মুকুর ভ্রমিয়া সুরসুন্দরী নিকর।
দেখিবে অদ্রির অঙ্গে আনন-সুন্দর॥ (তুষারাবৃত গিরি)

ঘাসের উপরে আর কুসুম কোরকে।
টোপা টোপা বৃষ্টিজল কিবা ঝক ঝকে॥ (পৃঃ ৫৪)

প্রকৃতির 'অবজেকটিব' বর্ণনায় কবি কুশলতা দেখিয়েছেন। কিন্তু এ বর্ণনা প্রকৃতিবাদীর (Naturalist) বর্ণনা। এ বর্ণনার সঙ্গে প্রাণের যোগ নেই। আনন্দ বা বিষাদ কোনটিরই স্পর্শে বিষয় দ্রবীভূত হয় নি। হৃদয়ের উত্তাপে উত্তপ্ত না হ'লে বিষয়ের কাব্য-উত্তরণ সম্পূর্ণ হয় না। রামদাস সেন সেকালের পণ্ডিত ব্যক্তি। দেশীবিদেশী সাহিত্য বেশ ভালোভাবেই তাঁর অধীত ছিল। পরবর্তী জীবনে ভারত-বিদ্যার (Indology) চর্চায় অনন্যমনা হওয়ায় কাব্যলক্ষ্মী তাঁর বন্দনা-গীতি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

পূর্বেই বলেছি রামদাস সেনের গীতকবিতাসমূহ বর্ণনামূলক ; এবং এ যুগের গীত-কবিতার এটাই হ'ল ঐকান্তিক সীমাবদ্ধতা। আরও কয়েকটি বৎসর পরে গীতিকবিতায় আত্মমুখীন স্বর তীব্র নিখাদে বেজে উঠবে। তার পূর্বে ব্যক্তির আত্মচিন্তা প্রবলতর হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর একটি দীর্ঘ অংশে সমাজ ও ব্যক্তি পরস্পরের কণ্ঠলগ্ন থাকবে। এবং যদিও মহাকাব্য একবারই মাত্র রচিত হোল, কিন্তু তার পুনরনুশীলনে দোষ কি !

পাদটীকা

১. প্রকৃত সুখ—দ্বারকানাথ রায়। ১৮৬৩, ভূমিকা—৵.

২. বঙ্গ দর্শন—১২৮১, ৩য় বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ।

৩. রহস্য সন্দর্ভ—

৪. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-২য় খণ্ড-সুকুমার সেন ১৩৬২, পৃ—১৪৭

৫. সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়—১৮৬৬, ১১ জুলাই।

৬. অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৮৭২, ১১এপ্রিল।

৭. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব—রাজনারায়ণ বসু,। পৃঃ ৩৩।

৮. কাঙাল হরিনাথের জীবনী—জলধর সেন। পৃঃ—৩৭

৯. ঐ, পৃ—১৫২

১০. ও ১১. গীতবিতান—পূজা—৩৪৭ ও ৬০৭ সংখ্যক গান।

১২. মধুস্মৃতি—নগেন্দ্রনাথ সোম, ১৩২৭, পৃ—১৭২।

১৩. ঐ, পৃ—১৭২।

—০—

তৃতীয় অধ্যায়

"যেমন কবিতার ভাষা চলিত ভাষা নহে, তেমনি কবিতার বিষয়ও চলিত বিষয় নহে।"—ভারতী, বৈশাখ, ১২৮৮

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রত্যক্ষবাদ ও জঙ্গী দেশপ্রেম

॥ ১ ॥

বাঙলা দেশের চিন্তা-জগৎ পরিবর্তনের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বেকন-লক-পেইন-এর জীবন-জিজ্ঞাসায় স্পন্দিত বাঙ্গালী ক্রমশঃ এক বুদ্ধিসর্বস্ব জীবনচেতনার তন্তুজালের মধ্যে আটকে পড়ল।

মাইকেল-সমসাময়িক যুগে Deist Philosophy যেমন সর্বগ্রাসী হয়েছিল, পরবর্তী যুগে তেমনি কমতে বা কঁৎ-এর প্রত্যক্ষবাদ (Positivism) ও মিলের হিতবাদ (Utilitarianism)-এর প্রভাব অতিশয় অনুভূত হতে থাকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ববোধ, তথা আর্য্যামির অহংকার গুটিগুটি এসে হাজির হ'ল। বঙ্গদর্শন একদা মুক্ত বুদ্ধির জয়পতাকা উড়িয়েছিল; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পর্যন্ত এই পতাকা বেশীক্ষণ উঁচু ক'রে তুলে রাখতে সক্ষম হন নি। শশধর তর্কচূড়ামণি তাঁরই আনুকূল্যে প্রথমে শিক্ষিত সমাজে পরিচিত হন। "আমাদের হিন্দুধর্মের মধ্যে এত যে ইংরেজী বিজ্ঞান লুক্কায়িত ছিল, তাহা আমরা বিন্দুবিসর্গও জানিতাম না।"[১]

এই আর্য্যামির অহংকারের সঙ্গে দেশপ্রেমের দুন্দুভি অতিশয় নিনাদিত হতে লাগল। আর্য্যদর্শন, বান্ধব, Indian Mirror প্রভৃতি পত্রিকায় দেশপ্রেম নানাপ্রকার মহৎ বাক্যের আতসবাজি পুড়িয়ে জাতির চিত্তাকাশে বহ্নি-উৎসব ঘটিয়ে দিল। ১৮৬১-১৮৮১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইওরোপেও জাতীয় আন্দোলন ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। জার্মানী, ইতালী, রুমানিয়া ও সার্বিয়া এই সময়েই জাতীয় ঐক্য অর্জনে সমর্থ হয়। এই সময়েই (১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে) রাজনারায়ণ বসু মহাশয় জাতীয় গৌরব-সম্পাদনী সভা স্থাপন করেন। এই সভার অপর নাম জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা। 'Prospectus of a Society for the Promotion of National Feeling among

the Natives of Bengal' রচিত হ'ল। এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বাবুর হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব-বিষয়ক এক বক্তৃতা প্রকাশিত হয়। এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি মহা হিন্দু সমিতি গঠনের পরিকল্পনা প্রকাশ করলেন। হিন্দু জাতীয়তা ও দেশপ্রেম এইভাবে একসূত্রে গাঁথা পড়েছিল; যেটুকু বাকি ছিল তা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবল কল্পনা শক্তি ও হৃদয়ানুভূতির সঙ্গে সম্পূর্ণ করলেন। তাঁর আনন্দমঠ, কমলাকান্তের দপ্তর প্রভৃতি গ্রন্থে এর প্রমাণ আছে। ধর্ম ও দেশপ্রেম এক হ'য়ে গেল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে তুমুল আলোড়ন উপস্থিত হ'ল; কারণ এই সময়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দানের সর্বোচ্চ বয়স উনিশ বৎসর ধার্য করা হ'ল। এ ছাড়া অস্ত্র আইন, ভারতীয় ভাষা মুদ্রাযন্ত্র আইনের বিরুদ্ধেও আন্দোলন দেখা দিল।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা যে আন্দোলন করে, তাতে ভারতীয়রা ক্ষুব্ধ হ'ল! বৃটিশ সরকারের শিল্পনীতি ও বানিজ্যনীতি ভারতীয়দের প্রচণ্ড অসন্তোষের কারণ হ'ল। নাগপুর, আমেদাবাদ, শোলাপুরে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বস্ত্র কলগুলি নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও যখন মাথা তুলছিল, তখন ল্যাংকাশায়ারের সূতী বস্ত্রের ওপর থেকে আমদানী শুল্ক রহিত করা হ'ল। এর ফলে রাজস্ব খাতে প্রভূত ক্ষতি হ'তে লাগল; এবং প্রতিবাদের ফলে যখন আমদানী শুল্ক পুনরায় ধার্য করা হ'ল, তখন বোম্বাই সূতী বস্ত্রের উপরও শুল্ক বসান হ'ল।

অষ্টাদশ শতকে বৃটেনের নবীন যন্ত্র শিল্পকে শক্তিশালী করার জন্য তখন সংরক্ষণ নীতি (Protectionist policy) অনুসরণ করা হয়েছিল; আজ যখন সে পালোয়ান হ'য়ে উঠেছে, তখন দুর্বলের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য অবাধ বাণিজ্য নীতির (Laissez faire) দোহাই দেওয়া হ'ল।

শাসকের এইপ্রকার নীতির ফলে জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আর সেই বিক্ষোভের সঙ্গে যে প্রকার দেশপ্রেম দেখা দিচ্ছিল, তাতে উগ্রতা থাকা স্বাভাবিক; কারণ এই সময়ে ধর্মবোধ ও দেশপ্রেম এক হ'য়ে উঠছিল। ধর্মবোধ আর উগ্রতা বিভিন্ন যুগেই হাত ধরাধরি করে চলে।

বঙ্কিম এই জঙ্গী জাতীয়তাবাদের দার্শনিক। "আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, পশুপ্রীতি, দয়া, এই প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, স্বদেশ প্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা উচিত।......সকল ধর্মের উপরে

স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।" (ধর্মতত্ত্ব—অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়, উপসংহার)। কোন মহত্তর জীবনবোধের উপর স্বদেশপ্রীতি আর প্রতিষ্ঠিত থাকল না।

॥ ২ ॥

একদিকে জাতীয়তাবাদের বড়াই, অপর দিকে বস্তুবাদী দর্শন-চর্চা। বাংলা সাময়িক পত্রেও বস্তুবাদী দর্শন-আলোচনা প্রবলভাবে দেখা দেয়। "বাঙ্গালী কমতের প্রত্যক্ষবাদ, ডার্বিনের পরিণামবাদ, রুশোর সাম্যবাদ, মিলের হিতবাদ ও স্বৈরবাদ, সাংখ্যের দ্বৈতবাদ, বেদান্তের মায়াবাদ, হিন্দুর অদৃষ্টবাদ, এ-সকলই বঙ্গদর্শন প্রভৃতি হইতে শিখিতে লাগিল। পাশ্চাত্ত্য সংঘর্ষণে যে জ্ঞান আত্মদর্শনে উদ্ভূত হইয়া প্রথমে তত্ত্ববোধিনীতে বিকশিত হইয়াছিল, তাহাই ক্রমশঃ পুষ্টিতে জগৎ-সংসার ব্যাপিয়া লইল; মহতী বিস্তৃতি লাভ করিল।"[২] বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত তত্ত্ব-আলোচনার সূচী নিম্নে দেওয়া গেল:

বঙ্গদর্শন: ১২৭৯-শ্রাবণ, কমৎদর্শন। এই প্রবন্ধে একনিষ্ঠ প্রেম ও সাবালক-সাবালিকার প্রেম প্রসঙ্গ আলোচিত হয়।

১২৮০, পৌষ—কমতে তত্ত্ব।

১২৮০, শ্রাবণ, মিলের মৃত্যুর প্রবন্ধ; "যেন আমাদিগের কোন পরম আত্মীয়ের সহিত চিরবিচ্ছেদ হইয়াছে।"

১২৮১—কমতে দর্শন—পৃ—৩৮৫।

১২৮১-৮২—মিল ডার্বিন ও হিন্দু ধর্ম।

১২৮২, চৈত্র—কমতেবাদী যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষের প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে কমতের আদর্শ নারী-কল্পনা (Ideal conception of Woman) আলোচিত হয়।

আর্যদর্শন: ১২৮১—১ম বর্ষ, ভাদ্র, ডারউইন সাহেব ও দশ অবতার।

১২৮২—হাক্স্‌লির উপর প্রবন্ধ।

১২৮৪, আষাঢ়—ডারউইন।

কার্তিক—হিতবাদ বা সুখবাদ দর্শন।

১২৮৫, ফাল্গুন—চার্বাকদর্শন—যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের প্রবন্ধ।

১২৮৮, আষাঢ়—মিল ও স্বাধীনতাবাদ।

১২৮৮-১২৮৯—নাস্তিকতা।

১২৯২,ভাদ্র-আশ্বিন — দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত 'পজিটিভিজম্' প্রবন্ধের প্রতিবাদ। কৃষ্ণকমল-দ্বিজেন্দ্র বিতর্কে যোগদান।

১৩০১, পৌষ—হাক্সলির উপর প্রবন্ধ।

ভারতী ১২৮৪, মাঘ—১ম বর্ষ—বঙ্গে সমাজবিপ্লব—এই প্রবন্ধে বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ঃ সংস্কারপ্রিয়, রক্ষণপ্রিয়, সংস্কার-রক্ষণপ্রিয়।

১২৮৫, চৈত্র—ডারউইন

১২৮৮, ভাদ্র—কাণ্ট

আশ্বিন—কাণ্টের দর্শন

অগ্রহায়ণ—অদ্বৈতবাদ ও আধুনিক ইংরাজ কবি। কাণ্টদর্শন।

১২৮৯, বৈশাখ—দেবতার উপর মনুষ্যত্ব আরোপ ; গ্যয়টে উল্লিখিত।

১২৯০, আষাঢ়-শ্রাবণ—সামাজিক ক্রমবিকাশ ; হার্বার্ট স্পেনসার-এর ক্রমবিবর্তনবাদ।

ভাদ্র—মালথাস, ডারউইন, দেকার্তে, লাইবনিৎস, হাক্সলি ব্যাখ্যাত।

অগ্রহায়ণ—মালথাস প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

পৌষ—স্থানমান।

১২৯২, শ্রাবণ—কৃষ্ণকমলের 'পজিটিভিজম' প্রবন্ধ।

ভাদ্র—দ্বিজেন্দ্র ঠাকুরের প্রতিবাদ।

আশ্বিন—ঐ, বাদ-প্রতিবাদ।

মাঘ—হীরালাল হালদারের 'আমি কি আছি' প্রবন্ধে কাণ্ট-হেগেল ব্যাখ্যাত।

১২৯৩, বৈশাখ—ডারউইন।

শ্রাবণ—দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাণ্ট উল্লিখিত।

পৌষ—ঐ বিতর্কে দ্বিজেন্দ্র ঠাকুরের সঙ্গে মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়ের অংশ গ্রহণ।

১২৯৪—'ভারতী ও বালক'—হিন্দুবিবাহ—রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অধ্যাপক সীলির প্রাকৃতিক ধর্ম (Natural Religion) উল্লিখিত।

কার্তিক—মানবীকরণ—(এই সময়ে মানসী কাব্যের প্রকাশ)

১২৯৫, জ্যৈষ্ঠ—দ্বৈত-অদ্বৈতবাদ—হ্যামিলটন উদ্ধৃত।

অগ্রহায়ণ—কাণ্টের দর্শন ও বেদান্ত দর্শন—দ্বিজেন্দ্র।

বান্ধব ১২৮৫, চৈত্র—১২ সংখ্যা হার্বার্ট স্পেনসারের Education গ্রন্থ থেকে সার সংকলন।

১২৮৭—কমতে দর্শন।

১২৮৯—ডারউইন, ইমারসন, লংফেলোর মৃত্যুতে শোকসূচক প্রবন্ধ।

নব্যভারত ১২৯১, শ্রাবণ—অজ্ঞেয়তাবাদ ও নাস্তিকতা—স্পেনসার উল্লিখিত।

কার্তিক—পৌরাণিক কমতে-শিষ্য।

অবোধবন্ধু ১২৭৩, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা—বেকন সন্দর্ভ।

২য় ভাগ—৭ম সংখ্যা—বেকন সন্দর্ভ—নাস্তিকতা

৩য় ভাগ, ১ম সংখ্যা— ঐ — প্রেম

এগুলি ছাড়াও ইংরাজি পত্র-পত্রিকায় দার্শনিক আলোচনা চলতে থাকে ; সেখানেও কঁৎ, ডারউইন ও মিল প্রভৃতিরই আধিপত্য। 'মুখার্জিস্ ম্যাগাজিনে' আশুতোষ মুখার্জি ষ্টিফেন সাহেবের আক্রমণের বিরুদ্ধে মিলের পক্ষাবলম্বন করলেন। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় চিঠিপত্র স্তম্ভে কঁৎ-দর্শন নিয়ে আলোচনা চলল। এ-ছাড়া প্রকাশিত গ্রন্থাদিতেও নব্য-দর্শন-চিন্তা বিশেষ স্থান অধিকার করল। বঙ্কিমের 'দেবী চৌধুরাণী'র প্রফুল্ল কতটা ভারতীয় শিক্ষায় শিক্ষিতা, আর কতটা কঁতের আদর্শে শিক্ষিতা, তা আজও অনিরূপিত। বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্বে ও কৃষ্ণচরিত্রে কঁৎ-তত্ত্বের প্রভাব ছিল। ভূদেব তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধ'-এর একাধিক প্রবন্ধে হাক্সলি ও কঁৎ প্রসঙ্গ উল্লেখ করলেন (পৃ-১০ ; -১৬৩)। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বাল্যস্মৃতিতে মিল, গিবন, লেকি, কার্লাইল, পেইনের প্রভাবের কথা বলেছেন। (পৃ-৪) "জন ষ্টুয়ার্ট মিলের Subjection of Women গ্রন্থ আমার সাধের পাঠ্য পুস্তক, আর তাই

প'ড়ে স্ত্রী স্বাধীনতা নামে এক pamphlet লিখলুম।" (ঐ) সেকালের অন্যতম বিদগ্ধশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য পুরাতন প্রসঙ্গে বলেছেন, "রামকমল, কবি বিহারীলাল, জজ দ্বারকানাথ ও আমি পজিটিভিষ্ট; আমি নাস্তিক।" শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে বলেছেন, "বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক তখন তিনি রুশোর সাম্যভাবের পক্ষে, উদারনৈতিকের অগ্রগণ্য, এবং বেন্থাম ও মিলের হিতবাদের পক্ষপাতী।" পরবর্তীকালে "তাঁহার দৃষ্টিও সম্মুখ হইতে পশ্চাৎদিকে পড়িতে লাগিল।" (পৃ-২৮৫)। সম্ভবতঃ এই কারণে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন, "বঙ্কিমবাবু যে কোঁৎ ভাল করিয়া পড়িয়াছেন, তাহা মনে হয় না।"

বঙ্কিমের বক্তব্যে কঁতের বক্তব্যের ষোলো আনা সমর্থন ছিল না ব'লেই গোঁড়া প্রত্যক্ষবাদী কৃষ্ণকমল এই মন্তব্য করেছেন। 'জ্ঞান' নামক প্রবন্ধে বঙ্কিমের দার্শনিক মত মোটামুটি সংকলিত হয়েছে; কিন্তু প্রবন্ধের পাদটীকায় তিনি বলেছেন "এসকল মত আমি এক্ষণে পরিত্যাগ করিয়াছি।" গ্রন্থকারে প্রকাশের সময় এই সংশোধন। উক্ত প্রবন্ধে লক-হিউম-মিল-স্পেন্সারের প্রত্যক্ষবাদ ও কাণ্টীয় মতবাদ বিশ্লেষিত হয়। এই সময়ে ব্রাহ্ম আন্দোলন থেকে এবং দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যজীবন থেকে ভক্তি আন্দোলনও দেখা দিতে থাকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী পাঠ করলে বুঝা যাবে যে, ধনৈশ্বর্যের ক্রোড়ে লালিত ঐ জ্ঞানতপস্বী কী আকুলভাবে সর্বত্র মরমিয়াবাদের-সন্ধান ক'রে ফিরতেন, "ভ্রমর যেমন হয় বিবাগী নিভৃত নীল পদ্ম লাগি।"

সংস্কৃত, ফারসী, হিন্দু, উর্দু, গুরমুখী, জার্মান—সর্বত্র তিনি অনুসন্ধান চালিয়েছেন তাঁর হৃদয়ের ধর্ম আবিষ্কারে। তদানীন্তন বৃটেনের মুখ্য দর্শন-চিন্তা তাঁকে তৃপ্ত করতে পারে নি; তিনি বেন্থাম, মিল এবং ফরাসী কঁৎ অপেক্ষা স্কটল্যাণ্ডীয় দার্শনিক চিন্তাকে শ্রেয়ঃ মনে করতেন। রীড, হ্যামিলটন তাঁর প্রিয় গ্রন্থকার। তার পর যখন তিনি উপনিষদের ছিন্নপত্রের সন্ধান পেলেন, তখন থেকে তাঁর পরশপাথর অন্বেষণের পরিসমাপ্তি ঘটল, এবং উপনিষদের এই নব্য উপলব্ধির সঙ্গে এসে কাণ্ট মিলিত হলেন। কাণ্টের বক্তব্য ও যুক্তি-পরম্পরা তাঁকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করল। পুরাতন দর্শন চিন্তার ক্ষেত্রে দেকার্তেও তাঁর অনুপ্রেরণার

উৎস।* দেবেন্দ্রনাথের দর্শন-উপলব্ধি নিতান্তই ব্যক্তিগত উপলব্ধি নয়; অংশত সামাজিক উপলব্ধি। ব্রাহ্ম সমাজের মধ্য দিয়ে তা প্রবাহিত হবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু এ যুগের মুখ্য দর্শন-চিন্তা হ'ল প্রত্যক্ষবাদ, বস্তুতন্ত্রতা। বেথুন সোসাইটিতে এক আলোচনা সভায় কাণ্ট-হেগেল প্রভৃতি সাম্প্রতিক জার্মান দর্শন-চিন্তার উপরে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ১৯শে মার্চ মিঃ ডন নামে এক ভদ্রলোক এক বক্তৃতা দেন। রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডাফ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ঐ বক্তা কাণ্টদর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ ক'রে দেখালেন। কিন্তু উপস্থিত বাঙ্গালী সভ্যদের পক্ষ থেকে কালীকুমার দাস এই দর্শনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে বেকন-দর্শনকে সমর্থন জানালেন।[৪] ঠিক একই রকম যুক্তি বিদ্যাসাগর মহাশয় বার্কলে-দর্শনের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত করেছিলেন। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন একটি মূল্যবান্ মন্তব্য করেছেন, "It was said that there were more Comteists in Bengal than in France."[৫] ঠিক অনুরূপ মন্তব্য করেছিলেন উইনডেলব্যাণ্ড ফ্রান্সের বেকন-প্রভাব সম্পর্কে। তিনি বলেছিলেন, ইংলণ্ড অপেক্ষা ফ্রান্সে বেকন-ভক্তের সংখ্যা অধিকতর।[৬] এই প্রত্যক্ষবাদিতার পক্ষে বলবার এইটুকু যে, ভারতের কূপমণ্ডুক জীবনের বিরুদ্ধে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, এই প্রত্যক্ষবাদ-প্রেম তাকে কেন্দ্রচ্যুত হ'তে দেয়নি।

এই প্রত্যক্ষবাদের কবলে প'ড়েই কবিরা কোন তত্ত্বমূলক কবিতায় শেষ পর্যন্ত কোথাও গিয়ে পৌঁছতে পারেন না। 'এই কারণে কল্পনা, চিন্তা ও কাব্যলক্ষ্মী সম্পর্কীয় কবিতাবলীও গতানুগতিক বা গদ্যধর্মী রচনা হ'য়ে পড়ে। আর আনুষ্ঠানিক কবিতা (occasional poems) এ-যুগের তাই প্রধান রচনা।

"There was no synthesising agency of the Unitary subject for experience. No theory of knowledge can be adequate which fails, as empericism must fail, to do justice to the universal.

"The Cartesian Philosophy has been thought to be associated with the 'Brahma Samaj as organised by Mahorshi Debendranath Tagore." Western Influence—(P. R Sen. পৃঃ—১৪০).

Human knowledge displays also an aspect of finiteness and we cannot deny altogether that its objects are particulars. Our problem, in fact, is to understand how this aspect of finiteness and particularity can be reconciled with the Universality and potential infinity without which there could be no knowledge at all."[৭]

উনিশ শতকের শেষার্ধে বাঙ্গালী-মানস এই বিশেষ অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছিল। প্রথম যুগের সেই বিস্ময়বোধ আজ আর নেই; এবং মধ্যযুগীয় কুসংস্কার বিরোধিতার গৌরবময় ভূমিকার তখন অবসান ঘটে গেছে। মননের ভূমিতে আজ নতুন কোন দুর্গতির দুর্গ দেখা যাচ্ছে না; তাই শুধু বিচার, বিতর্ক, আর অবিশ্বাস।

পাদটীকা

১। শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতার সমালোচনা—শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ। পৃ—৩২

২। নবজীবন—১২৯১, শ্রাবণ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, সম্পাদকীয়।

৩। পুরাতন প্রসঙ্গ—বিপিনবিহারী গুপ্ত, পৃ—৭৯।

৪। Report of the Bethune Society, Vol I. পৃ—৫।

৫। Western Influence on the 19th Century Bengali Literature—P. R. Sen. পৃ—১৪৮

৬। History of Philosophy—Windelband. 1953. পৃ—৪৮৭।

৭। Nature, Mind and Modern Science—George E. Harris. George Allen and Unwin Co. Ltd., 1954. পৃ—১৮৬-১৮৭

—০—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহাকাব্যের বিস্তৃতি ও কাব্যের দুর্গতি

এই প্রত্যক্ষবাদ ও জঙ্গী জাতীয়তাবাদেরই কবি হলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অথচ এই কবিই সমসাময়িক কালে 'অন্তরীক্ষের কবি' ব'লে পরিচিত ছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে হেমচন্দ্রের কাব্যজীবন শুরু হয়, ঠিক যে-বৎসর মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ মাইকেল-প্রভাব অনুভূত হওয়ার পূর্বেই হেমচন্দ্রের কাব্যজীবনের সূত্রপাত। হেমচন্দ্রের কবি-ধর্ম বিচারে এ তথ্যটি মনে রাখা কর্তব্য। হেমচন্দ্রের চিত্তবিকাশ প্রকাশ হয় ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে—'মানসী' প্রকাশের সাত বৎসর পরে। এই তথ্যটিও অবহেলার যোগ্য নয়।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই হেমচন্দ্রের শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হয়েছে। ঐ বৎসর এল. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে তিনি আইন ব্যবসায় শুরু করেন। এই সব তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্য হ'ল এই যে, কাব্য জীবন শুরু করার পূর্বে হেমচন্দ্র যথেষ্ট মানসিক সাবালকত্ব অর্জন করেছিলেন।

॥ ১ ॥

তাঁর চিন্তাতরঙ্গিনী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যের প্রেরণা বাস্তব ঘটনা। কোন প্রতিবেশী ও বাল্যসুহৃদের আত্মহত্যায় ব্যথিত হেমচন্দ্র এই কাব্য রচনা করেন। মাইকেল-পূর্ব যুগে ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলালই প্রভাবশালী কবি। এই কাব্যে এই তিনজনের প্রভাব বিদ্যমান। এই কাব্যের ভাষা আর বক্তব্য পরিবেশনে রঙ্গলালের ভঙ্গির অনুকরণ করা হয়েছে।

হেন সন্ধ্যাকালে যুবা পুরুষ নবীন।
ভ্রময়ে নদীর কূলে একা একদিন ॥

চারিদিকে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্য বিকশিত, কিন্তু তার মধ্যে কবি অতৃপ্ত ও অসন্তুষ্ট।

"অভাগা মানব আমি অসুখী কেবল।"

বাইরনীয় অসন্তোষ বাংলাকাব্যে এই প্রথম ধ্বনিত হ'ল। এই কাব্যে প্রকৃতি-জীবন ও মানব-জীবন—উভয়ের প্রতি কবির দৃষ্টি বাইরনীয়। মাঝে মাঝে বাইরনের কবিতার অনুবাদও আছে।

কেন বা হইবে আন্, পুরুষের শত টান,
শস্ত্র শাস্ত্র সংগ্রাম ভ্রমণ।
রাজনীতি, রাজদ্বার, ব্যবসায়, কৃষি, বিচার.
দ্যূতক্রীড়া রমণী রঞ্জন। (পৃ-৬)

আর বাইরনের ডন য়ুয়ানে বলা হয়েছে :—

Man's love of man's life a thing apart,
'Tis woman's whole existence ; man may range
The court, camp, church, the vessel, and the mart ;
Sword, gown, gain, glory, offer in exchange
Pride, fame, ambition, to fill up his heart,
And a few there are whom these cannot estrange ;
Men have all these resources, we but one,
To love again, and be again undone. [১]

এ-সাদৃশ্য নিতান্তই পঙ্ক্তিগত নয়, হেমচন্দ্রের কবি-প্রকৃতির সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। তাঁর জীবনীকার বলেছেন যে, প্রথমজীবনে হেমচন্দ্রের উপর ব্রাহ্মপ্রভাব পড়েছিল। আলোচ্য কাব্যে তার প্রমাণ আছে।

আনন্দে মিলাও তান, গাওরে বিভুর গান,
জয় জগদীশ বল মন।
হাসি কান্না ভরা, এই বসুন্ধরা,
বিশ্ববিরচক ভাবিল।
সত্য নাম তাঁর, অনিত্য সংসার,
রচয়িতা সার ভাবিল। (পৃ—১০)

এই সমস্ত পঙ্ক্তি ব্রাহ্ম সঙ্গীতের অনুরূপ। পরবর্তী জীবনে হেমচন্দ্র ব্রাহ্ম প্রভাব পরিহার করেছিলেন।

হেমচন্দ্রের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ বীরবাহু কাব্য। "বীরবাহু কাব্যে একদিকে

যেমন দেশভক্তির অঙ্কুর দেখা দিয়াছে, অন্যদিকে সেই রূপ ভাষা ও ছন্দের উপরে হেমচন্দ্রের আধিপত্য বিস্তার দেখা যাইতেছে।"২

বীরবাহুকাব্যে দেশপ্রেম দেখা দিয়েছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এখানে হেমচন্দ্রের নিজস্ব ভাষা দেখা দিয়েছে, এই মন্তব্যে সমালোচকের কল্পনা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। হেমচন্দ্রের কাব্যসাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্য জঙ্গী-দেশপ্রেম; চিন্তাতরঙ্গিনীতে তা দেখা দেয় নি। বরং চিন্তাতরঙ্গিনী হেম-কাব্য-ধারণার বহির্ভূত রচনা।

বীরবাহু কল্পনামূলক কাব্য; অবশ্য ঐতিহাসিক পটভূমিকায় সংস্থিত হয়েছে।

কনৌজ রাজপুত্র বীরবাহু এই কাব্যের নায়ক। বীরবাহু যখন পত্নী হেমলতা সহ আনন্দকেলিতে মগ্ন, তখন এক যোগিনী সেখানে উপস্থিত হ'য়ে যবন পদানত দেশের দুর্ভাগ্যের পাঁচালী গেয়ে তাকে উত্তেজিত করল। যোগিনী আত্মপরিচয় দিয়ে বলল যে, সে দ্বারকা নগরীর নিকটবর্তী সর্প রাজ্যের রাজকুমারী। স্বয়ম্বরা শেষে স্বামীসহ অম্বর-গমন পথে সে 'দুষ্ট-যবন' কর্তৃক আক্রান্ত হ'ল। কোন মতে দুষ্টের হাত এড়িয়ে সে যোগিনী বেশ ধারণ ক'রে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াল। এবং এখন কান্যকুব্জে এসে উপনীত।

তারপর কান্যকুব্জ যবন বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হ'ল। বীরবাহু বীরত্ব ও দেশপ্রেম দেখাবার সুযোগ পেল। নেপালের পথে শত্রুকে বাধা দিল, যুদ্ধে বীরবাহু বাণ বিদ্ধ হ'ল। যুদ্ধে শত্রু জয়ী হয়েছে; জ্ঞান পেয়ে বীরবাহু শ্বশুরের দেশে চলে গেলেন। কলিঙ্গ বাহিনী নিয়ে তিনি যবন সেনার সম্মুখীন হ'তে চললেন, এবং যুদ্ধে জয়ী হলেন। পত্নী হেমলতার সঙ্গে মিলন হ'ল। দিল্লী সিংহাসন রাহুমুক্ত হ'ল।

এইভাবে হিন্দুয়ানীর জয়ধ্বজা উঁচুতে তোলা হ'ল। বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার পূর্বে রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্রই ইতিহাস-আশ্রিত দেশপ্রেমমূলক রোমান্স রস পরিবেশন করেন। হেমচন্দ্রের কাব্যসাধনার প্রধান সুর এখানে সর্ব প্রথমে ধরা পড়ল। এবং হেমচন্দ্র-কাব্য-ভাষারও বৈশিষ্ট্য এখানে ফুটে উঠেছে। সে বৈশিষ্ট্য হ'ল ভারতচন্দ্রীয় অনুকৃতি। হেমচন্দ্র স্বতন্ত্র কোন কাব্য-ভাষা তৈরি করতে পারেন নি; শুধু পদবন্ধ রচনায় তাঁর কিছু কিছু বিশিষ্ট রীতি আছে। মঙ্গলকাব্যের ছন্দই ব্যবহার করেছেন তিনি। এই কাব্যে সর্গ

বিভাগ নেই ; শুধু ছন্দভেদে বিষয়ান্তর গমন বুঝা যাবে। বিহারীলালের ছন্দের কিছু নমুনা এখানেও দেখা যাচ্ছে :

গমনে পবন,
রথ-রাজিগণ,
পলকে যোজন পথ এড়ায়।
ধরণী বিমানে,
চলে কোন খানে,
কে জানে কখন কোথায় ধায়॥ (পৃ-৯)

অলংকার সম্পূর্ণ-ই ভারতচন্দ্রীয়! শব্দাবলীও ভারতচন্দ্রীয় বা মঙ্গল-কাব্যীয়। এদিক থেকে খিদিরপুরের বয়োজ্যেষ্ঠ কবির সঙ্গেই তাঁর মিল।

বীরবাহু কাব্য প্লট-ধর্মী রচনা।

এরপর 'নলিনী-বসন্ত' প্রকাশিত হয়। নলিনী-বসন্ত সেক্সপীয়ারের 'Tempest' নাটকাবলম্বনে লিখিত। পরবর্তী জীবনে 'রোমিও জুলিয়েট' নাটক অনুসরণ সময়ে তিনি যে বক্তব্য রেখেছিলেন, মোটামুটিভাবে তা নলিনী-বসন্ত নাটক সম্পর্কেও প্রযোজ্য : "এই পুস্তকখানি সেক্সপীয়ারের রোমিও-জুলিয়েট-নামক নাটকের ছায়ামাত্র, তাহা অনুবাদ নহে। বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষায় প্রকৃতিগত এত প্রভেদ যে, কোনও একখানি ইংরাজি নাটকের কেবল অনুবাদ করিলে, তাহাতে কাব্যের রস কি মাধুর্য কিছুই থাকে না, এবং দেশাচার, লোকাচার ও ধর্মভাবাদির বিভিন্নতাপ্রযুক্ত এরূপ শ্রুতিকঠোর ও দৃশ্যকঠোর হয় যে, তাহা বাঙ্গালী পাঠক ও দর্শকদিগের পক্ষে একেবারে অরুচিকর হইয়া উঠে। (রোমিও-জুলিয়েট, ভূমিকা, পৃষ্ঠা—৩, পরিষৎ সং)

উভয় নাটকেই হেমচন্দ্র সেক্সপীয়ারের গল্পটুকুই নিয়েছেন, কাব্যটুকু নয়। সে তাঁর সাধ্যাতীত ছিল। বাইরনের কাব্য বহিঃজগতের কাব্য। সেক্সপীয়ার অন্তঃজগৎ ও বহিঃজগৎ উভয় জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্যকার! হেমচন্দ্রের এখানে প্রবেশাধিকার নাই। এই সেক্সপীয়ার-চর্চা যে তাঁর মানসলোকে কোন প্রভাব বিস্তার করে নি, তাঁর প্রমাণ তাঁর পরবর্তী কাব্য। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁর কবিতা-বলী প্রকাশিত হয়। কবিতাবলীর প্রথম সংস্করণে নিম্নলিখিত কবিতাবলী স্থান পায় : ইন্দ্রের সুধাপান, হতাশের আক্ষেপ, জীবন সঙ্গীত, বিধবা রমণী, যমুনাতটে, কোন পাখির প্রতি, লজ্জাবতী লতা, মদন পারিজাত, জীবন

মরীচিকা, ভারত বিলাপ, ভারত সঙ্গীত, প্রিয়তমার প্রতি, গঙ্গার উৎপত্তি, চাতক পক্ষীর প্রতি। সংস্করণভেদে অবশ্য পরিবর্জন পরিবর্তন চলেছে। কিন্তু তাতে কাব্যটির চরিত্রগত কোন পরিবর্তন সূচিত হয় নি।

এই কাব্যের ইন্দ্রের সুধাপান ড্রাইডেন-এর Alexander's Feast, জীবনসঙ্গীত লংফেলো-এর Psalm of Life, মদন পারিজাত পোপ-এর Elosia to Abelard, চাতকপক্ষী শেলী-এর To Skylark, ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পূজা গ্রে-এর Progress of Poesy অবলম্বনে লিখিত। এই কবিকুলের প্রকৃতি বিচার করলে একমাত্র শেলী হবেন অন্যজগতের কবি। অবশিষ্ট কবিকুলের কুল-ধর্ম প্রায় এক। শেলীর যে কবিতাটি আদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়েছে, হেমচন্দ্রের লেখনীমুখে তারও স্বপ্নচারিতা ও সুদূরব্যাকুলতা অনেকাংশে পোষ মেনে খাঁচার পাখি হ'য়ে গেছে।

এই কাব্যে দেশপ্রেম, আর ব্যক্তিগত নৈরাশ্যবোধ প্রাধান্য পেয়েছে। এই দেশ-প্রেম পর্যায়ে অন্ধ দেশাচার বিরোধিতাও স্থান পেয়েছে। বিধবা রমণী বা পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত কুলীনমহিলা বিলাপ এই পর্যায়ের কবিতা।

কবির ব্যক্তিগত নৈরাশ্যবোধক কবিতা হ'ল জীবনমরীচিকা, পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত পরশমণি, এই কি আমার সেই জীবনতোষিনী ও কামিনীকুসুম।

কবির ব্যক্তিগতজীবনে নৈরাশ্যসূচক মনোভাবের অবশ্য বাস্তব ভিত্তি ছিল। "হেমচন্দ্রের দাম্পত্যজীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখের ছিল না, তাঁহার সহধর্মিনী চিরদিনই স্বল্পবুদ্ধি ছিলেন, এবং পরে উন্মাদরোগে আক্রান্তা হন।"[৩]

হেমচন্দ্রের এক শ্যালিকার নাম প্রমদা। ইনি বালবিধবা ছিলেন। ছিলেন বিদুষী ও বুদ্ধিমতী। জীবনীকার বলছেন, "তিনি মধ্যে মধ্যে প্রমদাদেবীর নিকট যাইতেন, এবং নানাপ্রকার সদালোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন।"[৪]

হেমচন্দ্রের সঙ্গে প্রমদাদেবীর সম্পর্ক যে গভীর বন্ধুত্বমূলক ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কবির বহু কবিতায় প্রমদা দেবী রয়েছেন—কখনও স্পষ্ট ভাবে, কখনও কখনও অস্পষ্ট ভাবে। বীরবাহু কাব্যে বহু স্থলে প্রিয়া অর্থে 'প্রমদা' শব্দ ব্যবহৃত :

পুলকিত দেহে বীর প্রমদারে তুলিল। (পৃ-৭৪)

প্রমদার সাহঙ্কার ভারতী শুনিয়া। (পৃ-৭৭)

প্রমদারে আলিঙ্গিয়ে করেন রোদন। (পৃ-৭৭)

বীরবাহু হর্ষ মন, প্রমদারে আলিঙ্গন। (পৃ-৭৯)

প্রমদা শব্দের প্রতি অতি ভালোবাসা নিতান্তই শব্দ-সন্ধানীর যথাযথ শব্দ নির্বাচনজনিত নয়। পদ্মফুল, কোন একটি পাখীর প্রতি, প্রিয়তমার প্রতি প্রভৃতি কবিতায়ও প্রমদা অস্পষ্টভাবে আছেন—

কতবার করি মনে ভুলিব রে তোরে
ধরিব সংসারী সাজ

*　　*

সত্য কিরে তোর দেহে এত শোভা রাস ?
কিম্বা সে আমারি মন
প্রমাদে হয়ে মগন,
ভাবে আপনার প্রভা তাতে পরকাল —(পদ্মফুল ২১৫-২১৬)

তবে 'হতাশের আক্ষেপ' কবিতাটিতে স্পষ্ট ভাষায় প্রমদাপ্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। 'হতাশের আক্ষেপ' তাঁর এই ব্যক্তিগত জীবনের ইতিবৃত্তিকাও বটে।

কৌমার যখন তার, বলিত সে বারম্বার,
সে আমার আমি তার অন্য কারো হবে না।
আরে দুষ্ট দেশাচার কি করিলি অবলার,
কার ধন কারে দিলি, আমার সে হ'লো না! (১২২)

*　　*　　*

সে দেখে আমার পানে, আমি দেখি তার পানে,
চিতহারা দুইজনে বাক্য নাহি সরে রে,
কতক্ষণে অকস্মাৎ, "বিধবা হয়েছি নাথ"
বলে প্রিয়তমা ভূমে লুটাইয়া পড়ে রে।

*　　*　　*

বদন চুম্বন ক'রে রাখিলাম ক্রোড়ে ধ'রে
শুনিলাম মৃদু স্বরে ধীরে ধীরে বলে রে—
"ছিলাম তোমারি আমি, তুমিই আমার স্বামী,
ফিরে জন্মে, প্রাণনাথ, পাই যেন তোমারে।—
কেন শশী পুনরায় গগনে উঠিলি রে!"

উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক কোন স্তরের ছিল, তা নির্ধারণে আমাদের বিশেষ উদ্বেগ নেই। কিন্তু যে এই প্রমদা-আখ্যান যে তাঁর ব্যক্তি জীবনে এক প্রবল আলোড়নের হেতু, এ বিষয়ে সংশয় নেই।

কাব্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্থান কি, তা নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। সম্প্রতিকালে প্রখ্যাত বৃটিশ সমালোচক আই. এ. রিচার্ডস্ এ প্রসঙ্গে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। সমগ্র কাব্য-অভিজ্ঞতাই ব্যক্তিগত : কিন্তু সকল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই কাব্য নয়।

"A merely repetitive retention is rather a disability than an asset in communication, since it makes the separation of the private and irrelevant from the essential so difficult."[৫] রিচার্ডস পরে যে মন্তব্য করেছেন তা কিঞ্চিৎ কড়া—"Persons to whom the past comes back as a whole are likely to be found in an asylum."[৬]

"এই কবিতাবলী একদিকে কবি-হৃদয়ের প্রকৃত ইতিহাস। হেমচন্দ্র সর্বত্র সরল, তাঁহার বাক্যভঙ্গির মধ্যে কোথাও কোন বক্রতা নাই, সর্বত্র ভিতরের মানুষটাকে স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে।"[৭]

এত স্পষ্টতাই হেমচন্দ্রের বহু বক্তব্যের কাব্যগত অপকর্ষতার হেতু হয়েছে।

॥ ২ ॥

হেমচন্দ্রের সর্বপ্রধান কাব্য হ'ল 'বৃত্রসংহার'; ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়; দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে। বৃত্রসংহার কাব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্রের দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এই সমালোচনা বস্তুতঃ প্রশস্তি, এবং বঙ্কিমতুল্য প্রতিপত্তিশালী লেখক বৃত্রসংহারের কবিকে শ্রেষ্ঠ কবি ব'লে মালা-চন্দন দিলে সাধারণ পাঠক আর প্রশ্ন তুলবার সাহস পায় না। এই পৌণে একশত বৎসর পর বঙ্কিম-স্তুতিই নানা জনের মুখে মুখে ফিরে একটা সংস্কারে পরিণত হ'য়ে গেছে। হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার কাব্যের মহাকাব্য মর্যাদার হেতু তার বিষয় নির্বাচন। স্বর্গ-উদ্ধার বা বৃত্রবধ এবং দধিচীর আত্মত্যাগ-কাহিনীর মহাকাব্যের বিষয়বস্তুরূপে গৃহীত হবার যোগ্যতা রয়েছে। আমরা মাইকেল-কাব্যকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে সিংহল-বিজয়ও

কারবালাযুদ্ধ অবলম্বন ক'রে কেন মহাকাব্য রচিত হ'ল না, এ-প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ করেছি। কোন বিষয়বস্তুরই বিষয়গত যোগ্যতা থাকে না মহাকাব্যে সমুন্নত হবার। রচয়িতার বিশেষ দৃষ্টি বা বিশেষ মন যুগের প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পারে, এবং তারই ফলে সেই নির্বাচিত ঘটনাবিশেষ একটা প্রতীকী অর্থ পরিগ্রহ করে। এবং যুগবিশেষে এইরূপ ঘটনা একবারই মাত্র ঘটে।

এখন কথা হচ্ছে, মাইকেল রচিত মেঘনাদবধ কাব্য, না হেমচন্দ্র রচিত বৃত্রসংহার কাব্য এই যুগ-তাৎপর্য প্রণিধান ক'রে এক প্রতীকী তাৎপর্যে ব্যঞ্জিত হয়েছে? মাইকেল যে কালে মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করলেন, সে কালের হৃদয়-পট আমরা বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছি, সে কাব্যের প্রাসঙ্গিকতা যুগের প্রমাণপত্রের মধ্যেই নিহিত ছিল। 'বৃত্রসংহার-এর দধিচীর আত্মত্যাগ হেমচন্দ্রের জঙ্গী দেশপ্রেমের নজির। সে যুগের দেশভক্তদের জীবনবলি প্রসঙ্গের সঙ্গে আত্মীয়তা করেছে এই ঘটনা। কিন্তু এ কাব্যের নায়ক দধিচী নন, বৃত্র। বৃত্র যুগচিত্তের দুলাল নয়, বৃত্র পৌরাণিক পুরুষ মাত্র। আধুনিক যুগে সে প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় জীব; সে আতঙ্কের, বিভীষিকার স্থূল। সে শারীরিক শক্তির প্রতিনিধি; সে নবলব্ধ মানসিক ঐশ্বর্যের ভাণ্ডারে প্রবেশাধিকার পায় নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর জাগ্রত মনীষার পাঠশালায় সে পড়ুয়া নয়। এই চরিত্র তাই বীর মাত্র, কিন্তু বিদেশী ও বিগতকালিক। ঊনবিংশ শতাব্দীর অনিবার্য নাগরিক নয়, বিগত যুগের অবহেলাকৃত আতঙ্কদায়ক অবশিষ্ট। বৃত্রচরিত্রের কাল-ঔচিত্য লঙ্ঘনের ত্রুটিই এ-কাব্যের চারিত্রিক অধোগতির কারণ। হেমচন্দ্র জঙ্গী দেশপ্রেমের ডঙ্কা বাজিয়েছেন, কিন্তু মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের মন্ত্র জপতে পারেন নি।

দ্বিতীয়ত হেমচন্দ্র আধুনিক মহাকাব্য রচনা করতে বসেছেন অতীত ভাষায়। ভাষা লেখকের সাধনালব্ধ কলাকৌশল; কিন্তু শুধু লেখকেরই তা সম্পত্তি নয়। ভাষা সাধারণের সম্পদ। কবি দ্বিধায় পড়েছেন; তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত তরুণের ভাষা গ্রহণ করবেন, না অষ্টাদশ শতাব্দীর শিক্ষিত তরুণের ভাষা গ্রহণ করবেন! অষ্টাদশ শতাব্দীর শিক্ষিত তরুণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে হয় মৃত, না হয় রামগতি ন্যায়রত্নের মুখ দিয়ে স্বীয় বক্তব্য উদ্গীরণ করছিল।

"কবি অবশ্য ভাষার লালিত্যে, অথবা ভাবের সৌকুমার্য বিষয়ে সর্বত্র

অল্লাধিক উদাসীন—স্থানে স্থানে অবলম্বিত ছন্দের গুরুভারে ভাষাকে নিপীড়িত এবং ভাবকে নিস্পেষিত হইতে দেখা যাইবে।"[৮] "হেমচন্দ্র এক গুরুর শিষ্য নহেন—তিনি ভারতচন্দ্রকেও গুরু করিয়াছিলেন। তিনি পূর্বগামী কবিগণের ছন্দের ও ভাষার অনুশীলন করিয়াছিলেন। তাই হেমচন্দ্র পূরাদস্তুর মধুসূদনের অনুবর্তী হইতে পারেন নাই। তাই বৃত্রসংহার ভাষায় ও ছন্দে কতকটা জগাখিচুড়ি হইয়া গিয়াছে। তাই বৃত্রসংহার মহাকাব্য হইলেও, জাতি-বৈরের ব্যাখ্যাপুস্তক হইলেও ভাষার বাঁধুনীর হিসাবে, ভাষার জমাট হিসাবে মেঘনাদের নিম্নস্তরে অবস্থিত।"[৯] শুধু ভাষা নয়, ছন্দ বিষয়েও কবি যে পথ অনুসরণ করেছেন, তাও তাঁকে দ্বিধাগ্রস্ত করেছে।

"নিরবচ্ছিন্ন একই প্রকার ছন্দঃ পাঠ করিলে লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিবার সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া পয়ারাদি ভিন্ন ভিন্ন ছন্দঃ প্রস্তাব করিয়াছি। এই গ্রন্থে মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর উভয়বিধ ছন্দঃই সন্নিবেশিত হইয়াছে। মৃত মহোদয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত সর্বাগ্রে বাঙ্গালা কাব্য রচনায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে পদ-বিন্যাস করিয়া বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেন। আমি তৎপ্রদর্শিত পথ যথাযথ অবলম্বন করি নাই। তদীয় অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ মিল্টন প্রভৃতি ইংরেজ কবিগণের প্রণালী অনুসারে বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু ইংরেজী ভাষাপেক্ষা সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা ভাষায় সমধিক নৈকট্য-সম্বন্ধ বলিয়া যে প্রণালীতে সংস্কৃত শ্লোক রচনা হইয়া থাকে, আমি কিছু পরিমাণে তাহারই অনুসরণ করিতে চেষ্টিত হইয়াছি। বাঙ্গালায় লঘুগুরু উচ্চারণ ভেদ না থাকায় সংস্কৃত কোন ছন্দেরই অনুকরণ করিতে সাহসী হই নাই, কেবল সচরাচর সংস্কৃত শ্লোকের চারিচরণে যে রূপ পদ সম্পূর্ণ হয়, তদ্রূপ চতুর্দশ অক্ষর বিশিষ্ট পঙ্‌ক্তির চারি পঙ্‌ক্তিতে পদ সম্পূর্ণ করিতে যত্নশীল হইয়াছি।" কবির অমিত্রাক্ষর ব্যবহারের নমুনা কিছু দাখিল করছি :

বসিয়া পাতাল পুরে ক্ষুব্ধ দেবগণ,
নিস্তব্ধ, বিমর্ষভাব চিন্তিত, আকুল ;
নিবিড় ধূমান্ধ ঘোর পুরী সে পাতাল,
নিবিড় মেঘ ডম্বরে যথা অমানিশি।

মিলহীন পয়ার প্রবাহমানতা ব্যতীত শুধুই পয়ার ; অমিত্রাক্ষরের মর্যাদা পেতে

পারে না। এমন কি মিলযুক্ত পয়ারের ধ্বনিসুষমাটুকু থেকে বঞ্চিত হ'য়ে এই ছন্দ অধিকতর কৃপার পাত্র।

দ্বিতীয় সর্গে তাঁর তিন মাত্রামূলক ছন্দ-ব্যবহার তাঁর ছন্দোজ্ঞানের পরিচয় বহন করছে; কিন্তু কাব্য-ভাষা এখানে এমনই জড় যে, ছন্দের সাবলীলতা সত্বেও বক্তব্যের আড়ষ্টতা ঘুচতে চায় না।

হেথা ইন্দ্রালয় নন্দন ভিতর,
পতিসহ প্রীতিসুখে নিরন্তর,
দানব রমণী করিছে ক্রীড়া।
রতি ফুলমালা হাতে দেয় তুলি,
পরিছে হরিষে সুষমাতে তুলি,
বদন মণ্ডলে ভাসিছে ব্রীড়া।

এই ভাষার আর যাই থাকুক, প্রেমের কবিতার কমনীয়তা নেই। কবি ভারত-অনুসরণ করেছেন ব'লে দোষবহ হয় নি; ভারতচন্দ্রবর্ণিত প্রেম কবিতার বয়ানে লাবণ্যের ছিটা অপরিসীম।

রহিতে না পারি ঘরে, আকুল পরাণ করে,
চিতে না ধৈরজ ধরে পিক কলকল।
দেখিব সে শ্যামরায়, বিকাইব রাঙ্গা পায়,
ভারত ভাবিয়া তায় ভাবে ঢলঢল ॥

শব্দ-নির্বাচনে, চরণ-সংগঠনে সংগীতের যেন কুসুম-বৃষ্টি হয়েছে। এই কবিতার জাত আলাদা। হেমচন্দ্রের ছন্দ "যেন শব্দের বোঝা লইয়া মালগাড়ির মত কেবল ভারের জোরে ঠেলা ভাঙ্গিয়া খাল খন্দ ও মাঠ পার হইয়া ছুটিয়াছে—কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, কারণ পাঠকও বাঙ্গালী।"[৩০] হেমচন্দ্র যুক্তাক্ষরের বাহুল্য ঘটিয়েছেন, কিন্তু একটিরও মাত্রা রক্ষা করতে পারেন নি। আর্যদর্শনের সম্পাদক বৃত্রসংহার সমালোচনা কালে বলেছিলেন, কবি সংস্কৃত শ্লোক প্রণালী অনুকরণ করতে গিয়ে বাস্তবিকই যেন সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেছেন। কবি ভাব অনুযায়ী যতি ব্যবহার করেন নি; এর চেয়ে তাঁর মিল দেওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। এতে "শ্রবণযুগল কথঞ্চিত পরিতৃপ্ত হইত।"[৩১] বঙ্গদর্শনের সমালোচক কবির অষ্টম সর্গের প্রশংসা করেছিলেন, "অষ্টম সর্গ আদ্যোপান্ত একটি সুদীর্ঘ মোহমন্ত্র।" কিন্তু কবির ছন্দ-ব্যবহার-রীতির অকৃপণ

প্রশংসা করেন নি। "হেমবাবু অক্ষর বৃত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ পরিত্যাগ করিয়া উপজাতি, মালিনী প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দঃ অবলম্বন করিলে বোধ করি ভাল করিতেন।" সমালোচকমহাশয় বলদেব পালিত এবং ভারতচন্দ্রের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন।[১২] হেমচন্দ্রের সংস্কৃত আদর্শ অনুকরণ যাতে আরও দূরগামী হয়, সমালোচকের তজ্জন্যই উৎকণ্ঠা।

॥ ৩ ॥

বৃত্রসংহার হেমচন্দ্রের কবিখ্যাতি বৃদ্ধি করল; সম্ভবতঃ কবির আত্মপ্রত্যয়ও বৃদ্ধি করল। বৃত্রসংহারের কবি আখ্যানমূলক কাব্য-সৃজন-ব্রত থেকে প্রায় বিদায় নিলেন। তাঁর আশাকানন (১৮৭৬), ছায়াময়ী (১৮৮০), ও দশমহাবিদ্যা (১৮৮২) কাব্যের কুলপঞ্জিকায় একই গুচ্ছের কুসুমত্রয়ী; বীরবাহু ও বৃত্রসংহারের মত নয়। এ কাব্যত্রয়ী চরিত্র ও আখ্যায়িকার উপরে দাঁড়িয়ে থাকেনি। দাঁড়িয়েছে কবির বিশিষ্ট দর্শন চিন্তার উপর। মেঘনাদবধ কাব্য রচনার পর মাইকেল সমসাময়িকতার নৈকট্য ত্যাগ ক'রে চিরকালের কাব্য-বিষয়ের সাধনব্রতী হয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন, যুগ-জিজ্ঞাসা ও কাব্য-জিজ্ঞাসার সদুত্তর একত্রে একবারই মেলে, একাধিকবার মেলে না। হেমচন্দ্র কিন্তু বৃত্রসংহারের 'সাফল্যে'র পর যুগ-হৃদয়কে আরও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় জড়িয়ে ধরলেন, বা বলা যেতে পারে যুগ-হৃদয় তাঁকে গ্রাস করল। তিনি সে যুগের নবীন প্রজ্ঞায় বিশ্বাসী, 'মডার্ন ম্যান'। কিন্তু কাব্যে আধুনিকতা ও সমসাময়িকতা এক নয়।

আশাকাননে কবি হেমচন্দ্র 'মানব-জাতির প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি সকলকে প্রত্যক্ষীভূত' করার চেষ্টা করেছেন। আঙ্গিকটা 'এলিগারি'র; আদর্শ স্পেন্সারের Faery Queene। কিন্তু অনুসরণ করেছেন পুরাতন বঙ্গীয় কাব্য-রীতি। আশাকাননে সর্গ অর্থে 'কল্পনা' ব্যবহৃত হয়েছে; দশটি কল্পনায় কাব্যটি সমাপ্ত।

ছায়াময়ীতে "প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় কবি ডান্টের লিখিত ডিভাইন কমেডিয়া নামক অদ্বিতীয় কাব্যের কিঞ্চিৎমাত্র আভাস প্রকাশ করা হয়েছে।" বলা বাহুল্য, এ কাব্যও রূপক বা এলিগরির আঙ্গিকে লেখা। "ছায়ামতীতে সংসারের এক ভয়াবহ নিয়তি চিত্রিত। এই চিত্রে কুত্রাপি অনুমাত্র সান্ত্বনা নাই। জীব রঙ্গভূমে ষড়রিপুর এই অনিবার্য সংগ্রাম ভীষণ কোলাহলের মধ্যে ক্ষণকালের

জন্যও স্খলিতপদ দুর্বল মানুষের জন্য কোন্ বিভু এই ভীষণ নরক-যন্ত্রণার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, জানি না।"

কবি এই কাব্যে নানাবিধ ছন্দ ব্যবহার করেছেন। বিভিন্ন সর্গ 'পল্লব' নামে অভিহিত হয়েছে। কাব্যটিতে সবশুদ্ধ সাতটি 'পল্লব' আছে। দশমহাবিদ্যার বক্তব্য ডারউইনের বিবর্তনবাদ ও কঁতের (Comte) সমাজবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ব'লে সেকালের পণ্ডিতেরা অনুমান করতেন। এই কাব্যে কবি নারীর অন্তর্নিহিত শক্তি বা বিশ্বশক্তির মূলাধারকে বুঝবার চেষ্টা করেছেন। "দশমহাবিদ্যায় এক একটি বিদ্যা মহাশক্তির এক একটি রূপেরই রূপক মাত্র।"

দশমহাবিদ্যার পরিবেশিত তত্ত্ব পৌরাণিক ও তান্ত্রিক তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে নি।

মহাকালী তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, মাতঙ্গী, ধুমাবতী, বগলা, ছিন্নমস্তা, মহালক্ষ্মী যথাক্রমে দশটি ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমান; এবং তাঁরা যথাক্রমে দশরূপে দেখা দিচ্ছেন—আদ্যাশক্তিলীলা জ্ঞানের অঙ্কুর রূপে কখনও হৃদয়ে করছেন প্রেমসঞ্চার, কখনও ভবে জাগাচ্ছেন স্নেহ, কখনও ভক্তি বিধায়িত করছেন, কখনও করছেন প্রীতিসঞ্চার, কখনও দেখা দেন তিনি শ্রম-কান্ত প্রাণিক্লেশরূপে; কখনও দারিদ্র্যদর্শন রূপে; আবার কখনও বা জগতের সর্বরূপ নিজ অঙ্গে ধারণ ক'রে পৃথিবীকে দয়ার সলিলে ডুবিয়ে দিচ্ছেন; তাঁর এই প্রয়াসের ফলে "নিখিল নিস্তার পাবে।"

কবির দার্শনিক চিন্তা ধারণের উপযুক্ত আধার এই কাব্য হ'তে পেরেছে কি না, তা নিয়ে সমসাময়িক কালেও দ্বিমত ছিল। মনস্বী ভূদেব ও চন্দ্রনাথ বসুর প্রশস্তি-বাক্য সত্ত্বেও এ কাব্য সমসাময়িক যুগেও সমাদৃত হয়নি। "দুর্ভাগ্যক্রমে দশমহাবিদ্যার দর্শন-ভাগ আমরা কিছুই বুঝিতে পারি নাই! * * যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই অবোধ্য হইয়া উঠে। কবি নিজ ইচ্ছামত পুরাণের বর্ণনা ভাঙ্গিয়াছেন, গড়িয়াছেন।"[১৪]

কবি অবশ্য নিজেও বিজ্ঞাপনে পুরাণের সঙ্গে তাঁর গরমিল আছে, এ কথা বলেছেন। "দশমহাবিদ্যা লইয়া এই গ্রন্থ বিরচিত হওয়াতে পাঠকগণ ভাবিবেন না যে, তৎসম্বন্ধে পুরাণাদির আখ্যান, সকল স্থানে ঠিক ঠিক অনুসরণ করিয়াছি। বস্তুত আমি কবিতা রচনার প্রয়াস পাইয়াছি, শাস্ত্রিকতা অথবা চলিত মতের প্রশুদ্ধতার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হই নাই।"

প্রবৃত্ত না হ'তে পারেন,কিন্তু কবিতা রচনার প্রয়াসও সিদ্ধ হয়েছে ব'লে মনে হয় না। কারণ পাঠক তাঁর প্রতীক ব্যবহারের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে নি।

"আমাদের বিশ্বাস,—দশমহাবিদ্যার প্রকৃত গৌরব অনুভূত হইতে দিন লাগিবে। সুতরাং এক অর্থে এই গীতিকাব্য বর্তমান সময়ের ঠিক উপযোগী নহে।"[১৫] সমালোচক ভবিষ্যৎ যুগের জন্য বরাত দিয়ে রেখেছেন; এবং তাঁর ভবিষ্যৎ যুগ আজ হ'ল বর্তমান। সেখানেও এ কাব্য হতমূল্য।

হেমচন্দ্র তত্ত্বপ্রধান কাব্য রচনা করেছিলেন; তাতে তত্ত্বই প্রাধান্য পেয়েছে, কাব্য নয়। এ তত্ত্ব-প্রবণতাও হ'ল তাঁর প্রত্যক্ষ-প্রবণতা।

॥ ৪ ॥

হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী','হুতোম প্যাঁচার গান' ও 'চিত্তবিকাশ' খণ্ড কবিতার সমষ্টি। কবিতাবলীতে ও চিত্তবিকাশে গম্ভীর বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে; আর হুতোম প্যাঁচার গানে উল্টো। কবিতাবলী ও চিত্তবিকাশের কবিতা-গুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে—ব্যক্তিগত ও স্বদেশগত। ব্যক্তিগত কবিতায় কবির ব্যক্তিগত জীবনের আশানিরাশা অভিব্যক্তি লাভ করেছে। আর স্বদেশগত কবিতায় কবির লেখনীমুখে জাতীয় আশাআকাঙ্ক্ষা ভাষা পেয়েছে।

কখনও দূর কাননের কোন পাখির কাকলী, কখনও শিশুর হাসি, কখনও লজ্জাবতী লতা, পদ্মের মৃণাল বা অশোক তরু বা ভগ্ন তরু, কখনওবা নদীতট তাঁর ব্যক্তি-জীবনের নানাবিধ সুখদুঃখানুভূতি-উদ্রেকে সহায়তা করেছে। পদ্ধতিটা যাই হোক, কবি সর্বত্রই প্রত্যক্ষ জগতের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। প্রকৃতির স্পর্শ তাঁকে কোন তৃতীয় ভুবনের স্বর্ণদুয়ারে করাঘাতে প্রলুব্ধ করে নি। প্রকৃতির জগৎ থেকে তিনি ব্যক্তিগত জগতে এসে কাব্য-তরীকে ভিড়িয়েছেন, সেখান থেকে তিনি অন্য কোন ভুবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন নি। তাঁর তরী নিতান্তই স্থূল বাস্তবতার তরী; কাষ্ঠ তরী, সোনার তরী নয়।

এসো ভ্রাতঃ, কবিকুলে আছ কোন জন।
শুনছে গভীর স্বর কি ঝরিছে মনোহর
কোকিলের কুহুরবে! অমনি কীর্তন
না শিখিবে যত দিন, ছেড়োনা বাদন। —(কুহুস্বর)

বসিয়া যমুনা তটে হেরিয়া গগন,
ক্ষণে ক্ষণে হলো মনে কত যে ভাবনা,
দাসত্ব, রাজত্ব, ধর্ম, আত্মবন্ধুজন,
জরা, মৃত্যু, পরকাল, যমের তাড়না!
রজনীতে কি আহ্লাদ, কি মধুর রসাস্বাদ
বৃন্তভাঙা মন যার সেই সে বুঝিল! —(যমুনা তটে)
সহসা চিন্তার বেগ উঠিল উথলি ;
পথ, জল, জলাশয় ভুলিয়া সকলি,
অদৃষ্টের নিবন্ধন ভাবিয়া ব্যাকুল মন—
অই মৃণালের মত হায় কি সকলি!
রাজা রাজমন্ত্রী লীলা, বলবীর্য শ্রোতলীলা ;
সকলি কি ক্ষণস্থায়ী দেখিতে কেবলি?
অই মৃণালের মত নিস্তেজ সকলি! —(পদ্মের মৃণাল)
বুঝেছি, রে শতদল, অদৃশ্য বন্ধনে
তাই তুই আমি বাঁধা,
এক সঙ্গে হাসা কাঁদা,
তাই, ওরে পদ্মফুল, এ মিল দু'জনে!
ভুলিব না তোরে, পদ্ম,
ভুলিব না,—ভুলিব না—জীবনে মরণে। —(পদ্মফুল)

"হেমচন্দ্র প্রকৃতির সঙ্গে আপন হৃদয়ভাব মিশাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু এ চেষ্টা বাহির হইতে চেষ্টা।"[১৬]

"ইহা প্রকৃতিকে নিজের মনের ভাব দিয়া দেখা নয়, নিজের মনের ভাবগুলিকে প্রকৃতির কয়েকটি ঘটনার বা উদাহরণের সাহায্যে ফুটাইয়া তোলামাত্র।"[১৭]

কবি ভুলবেন না বলে শপথ নিয়েছেন ; পাঠকও অনুরূপ শপথ নিতে পারলে সুখী হ'ত। কিন্তু কবি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে সাধারণীকরণে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই কবি ভুলতে না চাইলেও পাঠক ত মনে রাখছে না—কারণ কোন দিনই যে সে মনে রাখে নি। 'চিন্তা', 'কল্পনা'ও 'কবিতা সুন্দরীর প্রতি' নামে কবির তিনটি কবিতা আছে। তন্মধ্যে প্রথম দুটিতে প্রায় একই বক্তব্য

ভিন্ন ভাষায় পরিবেশন করেছেন। কিন্তু কবি এই তিনটি কবিতায় একটি বক্তব্যের পুষ্টি সাধন করেন নি। করলে এক নতুন দৃষ্টির উদ্বোধন ঘটত।

হে চিন্তা, অনন্ত অদ্ভুত তোর লীলার বিভঙ্গ,
ক্ষণকাল নহ ক্ষান্ত মুহূর্তেক নহ শ্রান্ত
মানব-হৃদয় তটে খেলায়ে তরঙ্গ
বহুরূপী রূপ ধরি করিতেছ ব্যঙ্গ। —(চিন্তা)
স্বর্গ মর্ত্য রসাতল
সব (ই) তার লীলা স্থল,
কোথাও গমন তার নিষেধ না মানে। —(কল্পনা)

'কবিতা সুন্দরী' কবিতায় এই কল্পনাশক্তিকে কবি কাব্য-লক্ষ্মীরূপে আঁকেন নি। এখানে কবিতাসুন্দরী নিতান্তই মঙ্গলকাব্যীয় বাণীবন্দনা।

অশোকের তলে, যেন শশী জলে,
হেন রূপবতী নারী,
ভাবিছে একাকী, করে গণ্ড রাখি,
অপূর্ব শোভা প্রসারি।

যে যাদুদণ্ডের স্পর্শে অশরীরী শরীরী হয় এবং চিত্র হয় চিত্রা, সেই যাদুদণ্ড হেমচন্দ্রের করতলগত ছিল না। কবি নিতান্তই স্থূল বিষয়-জগতের কবি।

॥ ৫ ॥

হেমচন্দ্রের কবিখ্যাতি তাঁর জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বীরবাহুতে যার উন্মেষ, সমগ্র কাব্যজীবনে তারই পরিপুষ্টি।

বৃত্রসংহারের খ্যাতি সম্ভবত এই জঙ্গী দেশপ্রেমের উপরে।

"দেবারাধনা বা পরহিতব্রত বৃত্রসংহারের আসল কথা হইলেও, ঐ দুটি কথা লুকান ছাপান আছে। কিন্তু জাতি-বৈর কাব্যে ওতপ্রোত। জ্বালা জ্বলন্ত। জ্বালা নিবারণের পালা নিস্তেজ!"[১৮]

"হেমচন্দ্র জাতি-বৈরের অপরাজেয় ও অদ্বিতীয় কবি—ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। যেখানে জাতি-বৈরের কথা, সেইখানেই হেমচন্দ্র গুরুর উপর টেক্কা দিয়েছেন, সেইখানেই তিনি মধুসূদনের উপর চলিয়া গিয়াছেন। জাতি-বৈরের কাব্য হিসাবে 'বৃত্রসংহার' বাঙ্গালায় অদ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ—ভাবে, রসে ও ঝাঁঝে যেন ফাটিয়া পড়িতেছে ; এমন হয় নাই, বুঝি-বা এমন হইবে না।"[১৯]

ভারত-সঙ্গীত হেমচন্দ্রের কবিকীর্তির নব্য কুতুব-মিনার। সৌন্দর্য কি তা প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার বিষয়, কিন্তু তাৎকালিক কাব্যামোদীদের আত্মহত্যার দুর্বার আকর্ষণ।

"সমসাময়িক বাঙ্গালী কবিদিগের মধ্যে হেমচন্দ্র সর্বপ্রধান। তাঁহার রচিত ভারত সঙ্গীত অতি চমৎকার। উহা স্বদেশ প্রেমাগ্নিতে চিত্তকে একেবারে প্রজ্জলিত করিয়া তুলে এবং তুরী-ধ্বনির ন্যায় মনকে উত্তেজিত করে।" [২০]

"বাঙ্গালী যাহা চায়, হেমচন্দ্রের প্রতিভা তাহাই দিয়াছে।"[২১]

হেমচন্দ্র বিধবা নারী,—অবহেলিত নারীর দুঃখের উপর কবিতা লিখেছেন, আবার কাদম্বিনী ও চন্দ্রমুখীর উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে হর্ষ প্রকাশ ক'রে কবিতা লিখেছেন। রেলগাড়ির উপর ছড়া কেটেছেন, দেশলাই-এর স্তব করেছেন। ১২৮০ সালের দুর্ভিক্ষের উপর তাঁর কবিতা বেরিয়েছে। ইউরোপ ও এসিয়ার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। অর্থাৎ সমসাময়িক জীবনের বিবিধ সংবাদ সাংবাদিকের মতই তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। এবং আমাদের কাছে পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এই যে, সাংবাদিকের মতই কবি যদি তার রূপ দান করতেন, তবে একপ্রকার সাফল্য তাঁর করায়ত্ত হ'ত। যেখানে তিনি সাংবাদিক, সেখানে তিনি সার্থক। 'হুতোম প্যাঁচার গান'-এ তিনি সরাসরি সাংবাদিকতা করেছেন —তাই ভাষায় ও ছন্দে যে চটুল পরিহাসপ্রিয়তা আছে, তা বাঙ্গালাকাব্যের এক রসাল সংযোজন। কিন্তু যেখানে সাংবাদিক হ'য়েও কবিত্বের ভাণ করেছেন, সেখানেই তাঁর আচরণ আমাদের অপরিসীম শোকের কারণ।

'হুতোম প্যাঁচার' গান'-এর প্রাকৃত বিষয়ে প্রাকৃত সুরেই কবি ছড়া কেটেছেন, এবং ঈশ্বর গুপ্তের পর এই ছড়া উনিশ শতকের শেষার্ধের নাগরিকদের কাছে মুখ (কর্ণ ?)-রোচক হয়েছিল।

"আমাদের দুইটি জগৎ আছে। এক জগতে আমরা বাস করি, আর এক অদৃশ্য জগৎ আমাদের সঙ্গেসঙ্গেই আছে। সে জগতের নাম আদর্শ জগৎ। * * সে জগৎ ভাবের জগৎ। সে জগৎ কবিতার জগৎ। বস্তুর জগতে আমাদের কার্যক্ষেত্র ও সেই ভাবের জগৎ আমাদের হৃদয়ের বিহারভূমি। যে ভাষায় আমরা কথা কই, সে ভাষা আমরা কবিতায় ব্যবহার করি না। যেমন কবিতার ভাষা চলিত ভাষা নহে, তেমনি কবিতার বিষয়ও চলিত বিষয় নহে।" [২২]

হেমচন্দ্র গম্ভীর ভাবে এই ভাব-জগতে প্রবেশের চেষ্টা ক'রেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। কিন্তু বস্তুজগতের স্থূল বৈষয়িকতাকে যখন পরিহাসের উলকি দিয়ে বিচিত্রিত করেন, তাতে তার গাম্ভীর্য নষ্ট হয়, কিন্তু সেই প্রাকৃত কাব্যের এক আলাদা আকর্ষণ থাকে।

তবে হেমচন্দ্রের এই কাব্য-ব্যর্থতা নিতান্ত তাঁর ব্যক্তিগত নয়।

"বলি এদেশে বীরবালা, ব্রজবালা, ফুলবালা, আঁচল আধঘোমটার কথা কিছুদিনের জন্য পরিত্যাগ করিলেই কি ভাল হয় না? বঙ্গে এসব অনেক হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে নূতন রস চাই, কবিকল্পনার ক্রীড়ার জন্যও নূতন ক্ষেত্র চাই। বর্তমান সময়ের একজন ক্ষণজন্মা ভারত-ভৃত্য বঙ্গীয় কাব্যকলাপ সম্বন্ধে আমাদিগকে কিছুদিন হইল লিখিয়াছিলেন যে, আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারে অন্যবিধ কবিতা যথেষ্ট আছে, এখন শিবাজী কবিতা আবশ্যক। ভারতীয় ভারতীর প্রথম অভাব,—উদ্দীপনা, দ্বিতীয় অভাব,—উদ্দীপনা, এবং তৃতীয় অভাব,—উদ্দীপনা।"[২৩]

এই পরিবেশে হেমচন্দ্র আত্মসমর্পন করেছেন, বা স্বয়ং এই পরিবেশকে সংহততর করেছেন।

॥ ৬ ॥

'চিন্তাতরঙ্গিনী'তে হেমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তকে অনুসরণ করেছিলেন। বৃত্র-সংহারে ঈশ্বর গুপ্তীয় ভাষা ও মাইকেলী ভাষার মধ্যে প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্ব দেখতে পাই। ভাষা ও ছন্দের ক্ষেত্রে যে দ্বিধা তিনি বৃত্রসংহার রচনা-মুহূর্তে প্রকাশ করেছিলেন, আশাকানন রচনাকালে তা তিনি প্রায় সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলে দিলেন। সমরবিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় 'সাফল্যজনক পশ্চাদপসরণ', এ হ'ল তাই। বাকী কাব্যজীবন মঙ্গলকাব্য ও ঈশ্বর গুপ্তই তাঁর প্রধান সম্বল; তার সঙ্গে কবির নিজস্ব ভাষা ও বাক্য-গঠন-রীতিও রয়েছে।

ছন্দে কবির একটা ক্রম-পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। কবি চিন্তাতরঙ্গিনীতে ঈশ্বর গুপ্তীয় পয়ার ব্যবহার করেছেন। বীরবাহুর পয়ার ত্রিপদীতে ভারতচন্দ্রের প্রতিধ্বনি। কিন্তু বৃত্রসংহারে এসে তিনি মাইকেল-আদর্শ গ্রহণ ক'রেও তাকে অনুধাবন করতে পারলেন না। বৃত্রসংহারের ছন্দ-বৈচিত্র্য কবির কাছে যতই প্রীতিপ্রদ হোক, বাংলাকাব্য তাতে উপকৃত হয় নি।

কখনও সমাসবদ্ধ বাক্যের সমাহারে নিছক গদ্য, কখনও ভাঙা অমিত্রাক্ষরের সাহায্যে গৈরিশ ছন্দের ঢাকের বাদ্য তিনি সৃষ্টি করেছেন। তা ছাড়া পয়ার ত্রিপদীর ব্যবহার ত রয়েছেই। বৃত্রসংহারের এই মিশ্রণ রীতি আশাকাননে পরিত্যক্ত হয়েছে। সমগ্র আশাকানন লঘু ত্রিপদী ছন্দে রচিত। ছায়াময়ীতে পয়ারের কলেবরে অভিনবত্ব আনলেন এক নতুন চৌপদী রচনা ক'রে। এ ছন্দ মূলত ছয় মাত্রামূলক; রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন তিন মাত্রামূলক ছন্দ বা অসম ছন্দ। বিহারীলালের ছন্দের সঙ্গে এই ছন্দের প্রচুর মিল আছে। বঙ্গসুন্দরীর ছন্দ দ্বিপদী; কিন্তু হেমচন্দ্রের ছন্দ চৌপদী। হেমচন্দ্রের চৌপদীর প্রথম দুটি চরণ বাদ দিলেই দুই কবির ছন্দ অবিকল একরূপ ধারণ করে। হেমচন্দ্রের ছন্দে যুক্তাক্ষরের বাহুল্য আছে; আর বিহারীলাল যুক্তাক্ষরকে সযত্নে (সভয়েও বটে) এড়িয়ে চলতেন। বীরবাহু কাব্যে যে উদাহরণটি আছে, তা অবশ্য বিহারীলাল-গোত্রীয়।

সেই আর্যাবর্ত এখন (ও) বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাচল এখন (ও) উন্নত,
সেই জাহ্নবীবারি এখন (ও) ধাবিত,
কেন সে মহৎ হবে না উজ্জ্বল।—(ভারত সঙ্গীত)

সুঠাম শরীর পেলব লতিকা
আনত সুষমা কুসুম ভরে,
চাঁচর চিকুর নীরদ মালিকা
লুটায়ে পড়েছে ধরণী 'পরে। —(বঙ্গ সুন্দরী)

ছায়াময়ীতে প্রস্তাবনা অংশে কবি সংস্কৃত রীত্যনুযায়ী ছন্দ ব্যবহার করেছেন।

সন্ধ্যা-গগনে নিবিড় কালিমা
অরণ্যে খেলিছে নিশি;
ভীত-বদনা পৃথিবী দেখিছে
ঘোর অন্ধকারে মিশি।

এখানে ভীত, নিশি, মিশি প্রভৃতি শব্দে মাত্রা গণনায় বাংলা ভাষার স্বভাব-ধর্মকে রক্ষা করা হয় নি। দশমহাবিদ্যায় এই রীতির ব্যাপক প্রয়োগ দেখা গেল। সেগুলি সংস্কৃত ছন্দের অবিকল অনুবাদও নয়, আবার বাংলা বর্ণোচ্চারণবিধির মর্যাদাও রক্ষিত হয় নি। কবি কতকগুলি স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ

চিহ্নিত করেছেন; সেগুলিকে গুরু উচ্চারণ করতে হবে। আর অকারন্ত পদের অন্তেস্থিত অকার, হসন্ত চিহ্ন না থাক্‌লে তাকে উচ্চারণ ক'রে পড়তে হবে।

রে সতি রে সতি, কান্দিল পশুপতি
পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ-মগন হর তাপস যত দিন,
ততদিন না ছিল ক্লেশ॥

দীর্ঘস্বরকে ও যুক্তাক্ষরের পূর্ববর্ণকে 'গুরু' ক'রে পড়লে বাংলাধ্বনি-তত্ত্বের ব্যাভিচার ঘটে, একথা নতুন ক'রে বলার প্রয়োজন নেই। সত্যেন্দ্রনাথ এই সংস্কৃত রীতি-প্রয়োগ-ইচ্ছার সঙ্গত পরিণতি ঘটিয়েছিলেন। তিনি হ্রস্ব-দীর্ঘের সন্নিবেশ-কৌশলে মোটামুটি একটি জায়গায় আসার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সাফল্য সীমিত। কিন্তু হেমচন্দ্র এ ক্ষেত্রে সেই সীমাবদ্ধ সাফল্যেরও অধিকারী নন।

কবি ছায়াময়ীতে ছয়মাত্রামূলক ছন্দ ব্যবহার করেছেন। বিশেষ ক'রে খণ্ড কবিতায় তিনি এই ছন্দ অধিকতর প্রয়োগ করেছেন। ভারতসঙ্গীত, ভারত-বিলাপ, ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী পূজা, ভারতভিক্ষা, প্রলয় প্রভৃতি কবিতায় এই ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু যুক্তাক্ষরের প্রাবল্যে প্রায়শই মাত্রা লঙ্ঘিত হয়েছে। কবি অনেক ক্ষেত্রেই বন্ধনীর মধ্যে বর্ণকে, তথা মাত্রাকে লুকিয়ে বা আড়াল ক'রে রাখার চেষ্টা করেছেন। বহু স্থলে নিতান্তই ক্রিয়াপদের মিল দেওয়ায় উৎকৃষ্ট মিলের দুইটি প্রধান গুণ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি—অভাবিতপূর্বতা ও কর্ণতৃপ্তিকরতা। তবু যুক্তাক্ষরের বাহুল্য থাকায় এ ছন্দে একটা ওজোগুণ সৃষ্টি হয়েছে; কবির জঙ্গী দেশপ্রেমমূলক বক্তব্য পরিবেশনে তার যথাযোগ্যতা ছিল। বিহারীলালের ছন্দ এই উদ্দীপনা সৃষ্টির অধিকারী ছিল না। হেমচন্দ্র কিন্তু তাঁর দশমহাবিদ্যার ছন্দ-ব্যায়ামকেই অপেক্ষাকৃত মূল্যবান প্রয়াস ব'লে মনে করতেন। সম্ভবতঃ বৃত্রসংহার কাব্যের সমালোচনায় বঙ্কিম-অভিমত তাঁকে সংস্কৃত রীত্যনুযায়ী ছন্দ সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ভারতচন্দ্র ও বলদেব পালিতের আদর্শ অনুসরণে বঙ্কিম-পরামর্শ হেমচন্দ্রকে বিপথগামী করেছে।

কবির ব্যক্তিগত ধারণা যাই থাকুক, তাঁর ছয়মাত্রামূলক ছন্দই পরবর্তীকালে বহুল পরিমাণে অনুকৃত হবে। বিশেষ ক'রে এই ছন্দে আত্ম-মুখীন কবিতার মগ্নচারিতা সার্থকতরভাবে প্রকাশিত হবে। এবং এই একটি কৃতিত্বই কাব্য-অঙ্গনে তাঁর স্থায়ী কীর্তিরূপে পরিগণিত হবে।

নবীনচন্দ্র সেন

"আমার মতে কলিকাতাবাসী হওয়া তাঁহার একটা দুর্ভাগ্যের কথা হইয়াছে। কলিকাতায় যাহা একটা হুজুগ উঠে, তিনি তাহাই লেখেন। তাহাতে তাঁহার শক্তির অপচয় হয়।"[২৪]

"তিনি কলিকাতায় না থাকিলে বোধ হয় কলিকাতার হুজুগ সম্বন্ধে এত কবিতা লিখিতেন না।[২৫] উক্তি দুইটি হেমচন্দ্র সম্পর্কে; এবং উক্তিকারী স্বয়ং নবীনচন্দ্র।

এই উক্তি দুইটির মধ্য থেকে হেম-নবীন পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠে কি?

নবীনচন্দ্রের প্রথম কাব্য খণ্ডকবিতা-সংগ্রহ। কাব্যগ্রন্থের নাম অবকাশরঞ্জিনী (১৮৭১)।

"পাখীর যেমন গীত, সলিলের যেমন তরুলতা, পুষ্পের যেমন সৌরভ, কবিতানুরাগ আমার প্রকৃতিগত ছিল। * * আমার বয়স যখন দশ এগার বৎসর, যখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি তখন হইতে গুপ্তজার অনুকরণ করিয়া কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিতাম।"[২৬] এডুকেশন গেজেটে তাঁর কবিতা প্রথম ছাপা হয়েছিল—শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ঔৎসুক্যের ফলে। প্রকাশিত কবিতাটির নাম 'কোনো এক বিধবা কামিনীর প্রতি।'

"অবকাশরঞ্জিনী সম্বন্ধে দুটি কথা বোধ হয় আমি বলিতে পারি। প্রথমতঃ এডুকেশন গেজেটে লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্বে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিষয়ে খণ্ড কবিতা বঙ্গ ভাষায় ছিল না। মধুসূদনের বীরাঙ্গনা ও ব্রজাঙ্গনায় খণ্ড কবিতা থাকিলেও তাহারা এক বিষয়ে। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী স্মরণ হয়, আমার এডুকেশনে লিখিতে আরম্ভ করিবার পরে প্রকাশিত হয়। তাহাও সমস্ত এক ছন্দে। এ সম্বন্ধে একমাত্র পথ প্রদর্শক প্রভাকর। তবে প্রভাকরও কাব্যাকারে প্রকাশিত হয় নাই। হেমবাবু, স্মরণ হয়, তখনও খণ্ড কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন নাই।[২৬ক] নবীনচন্দ্র খণ্ডকবিতা দিয়ে কাব্য জীবন শুরু করেছিলেন। আর মহাকাব্য দিয়ে অবসান করেছেন। এই একটিমাত্র

তথ্য থেকেই কবির মানস-পরিচয় পাওয়া যাবে। কবি হেমচন্দ্র প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্র এক হুজুগের কথা বলেছিলেন। তিনিও কম-বেশি সেই হুজুগের প্রভাবের মধ্যেই ছিলেন। "শুনিয়াছি তাঁহার বিশ্বাস বঙ্গভাষায় গীতিকাব্য ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। উহা সত্য হইলে তাঁহার ও বঙ্গভাষার উভয়ের দুর্ভাগ্য।"[২৭]

মহাকাব্য লিখিত না হওয়া বঙ্গভাষার দুর্ভাগ্য—অর্থাৎ তাঁর মতে মহাকাব্যই সে যুগের প্রধান কাব্য-ফসল। এ ধারণা শুধু তাঁরই ব্যক্তিগত ধারণা নয়; ঊনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ সাহিত্যসেবীর ছিল এই মত।

খণ্ড কবিতা

॥ ১ ॥

নবীনচন্দ্র গীতিকবিতা গাথাকাব্য ও মহাকাব্য তিন জাতীয় কাব্যই রচনা করেছেন। কবি অবশ্য মহাকাব্যের কবি হিসাবেই পরিচিত হ'তে চেয়েছেন। তাঁর রঙ্গিনী দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথম খণ্ড ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে; দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। মাঝখানে পলাশির যুদ্ধ (১৮৭৫) ভারত উচ্ছ্বাস (১৮৭৫) ও ক্লিওপেট্রা (১৮৭৭) প্রকাশিত হয়। পলাশির যুদ্ধ গাথাকাব্য; অপর দুইটি খণ্ড বা গীতিকবিতা মাত্র। পরবর্তী সংস্করণে ২য় খণ্ডে এই কবিতা দুইটি সংকলিত হয়েছে।

গীতিকবিতার সমস্ত রকম বৈশিষ্ট্যই অবকাশ রঙ্গিনীর দুইখণ্ডে সুস্পষ্ট-ভাবে দেখা যায়। ছন্দ-বৈচিত্র্য, স্তবক-বৈচিত্র্য, ও মিলের অভিনবত্ব ছাড়া, বিষয়বস্তুতে এই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। অধিকাংশ কবিতাই ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত নৈরাশ্য বা আশাবাদ এখানকার মূল স্বর। প্রণয়োচ্ছ্বাস বা দেশ-প্রেমকে অবলম্বন ক'রে এই আশাবাদ বা নিরাশাবাদের জন্ম। প্রথম খণ্ডের ১৬টি কবিতার মধ্যে ১২টি কবিতাই ব্যক্তিগত; দ্বিতীয় খণ্ডের ৩১টি কবিতার মধ্যে অর্ধেক সংখ্যক ব্যক্তিগত।

প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ডের কবিতার মধ্যে রচনা শৈলীগত পার্থক্য আছে। প্রথম খণ্ড থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া গেল ঃ

ভাঙ্গিয়াছে আশা নিদ্রা জানিয়াছি সার।
হবে না, হবে না তুমি, হবে না আমার। (প্রতিমা বিসর্জন)

রজনীর প্রতীক্ষায় প্রকৃতি-সুন্দরী,
ললাটে সিন্দুর বিন্দু পরিল তখন,
রবি অস্তমিত প্রায় স্বর্ণ মণ্ডিত কায়,
উজলিয়া গগনের সুনীল প্রাঙ্গণ,
ভাসিতেছে স্থানে স্থানে রক্ত কাদম্বিনী। (সায়ংচিন্তা)

দ্বিতীয় খণ্ডের ভাষা অনেক জটিল হয়েছে।

বুঝিব কি ?

একদা নিশীথে আমি দাঁড়ায়ে নির্জনে,
চেয়ে আছি অন্যমনে আকাশের পানে,
অমাবস্যা-অন্ধকার ঝিল্লীরবে বসুধার
করিতেছে নিদ্রাবেশ, পাইয়া নির্জন
প্রকৃতি দেখিছে খুলি নক্ষত্র রতন। (প্রেমোন্মাদিনী)

বক্তব্যে বা প্রেম-চিন্তায় তিনি কোথাও পৌছাতে পারেন নি; শুধুই প্রচলিত জিজ্ঞাসার পুনরুক্তি। ভাষায়,—উপমা-উৎপ্রেক্ষা প্রয়োগে জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁর প্রথম খণ্ডের অধিকাংশ কবিতাই ব্রজাঙ্গনার স্তবক-বিন্যাস গ্রহণ করেছে। সায়ংচিন্তা, হতাশ প্রভৃতি কবিতায়

ক
খ
গ———গ
খ
ক

এই প্রকার স্তবক রচনা দেখতে পাই। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডে স্তবক রচনায় বৈচিত্র্য আছে। তবে এগুলি যে খুব নিখুঁত স্তবক হয়েছে, তা বলা চলে না। কারণ অনেক ক্ষেত্রে স্তবক থেকে স্তবকে ভাব বেড়ে ওঠে নি, বিকশিত হয় নি, পুনরুক্তি হয়েছে মাত্র। উপমা-উৎপ্রেক্ষায় অভিনবত্ব কিছু নেই; অন্তত সম-সাময়িক যুগের কাব্যে এ জাতীয় উপমা-উৎপ্রেক্ষা প্রচুর ছিল। এগুলি নিতান্তই অলংকার, বহিরঙ্গের প্রসাধন। তবে এগুলি বক্তব্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়েছে; বক্তব্যের প্রচণ্ডতা বা প্রশান্তি বুঝবার অনিবার্য উপায়ও বটে।

এই খণ্ড কবিতায় ছন্দ-বৈচিত্র্যও কম নয়। কবি নবীনচন্দ্র সমিল ছন্দ

ছাড়াও অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছেন; এখানে অমিত্রাক্ষর ছন্দ-ব্যবহার হেমচন্দ্রের মত ত্রুটিপূর্ণ নয়। ক্লিওপেট্রা কবিতায় এই ছন্দের জোরালো কাঠামো বক্তব্যের তেজোদৃপ্ততা রক্ষা করেছে। এ ছাড়া কবি একাধিক কবিতায় বিহারীলালের ছয় মাত্রামূলক ছন্দ ব্যবহার করেছেন। এখানে তাঁর এই ছন্দ-ব্যবহার-রীতি বিহারীলালের মত নয়, অর্থাৎ যুক্তাক্ষরকে সযত্নে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা হয় নি।

ডুবিয়া সঙ্গীত সাগরে স্বজনি;
মজিয়া প্রণয়-পীযূষ পানে,
লভিয়াছি সুখ দিবস রজনী,
প্রাণেশে পবিত্র প্রণয় দানে। (নিরাশ প্রণয়)

একই বিদ্যালয়ে পড়েছি দুজনে
একই প্রাঙ্গণে করেছি খেলা,
সম সুখদুঃখে ভাসিয়াছি মনে
সরল হৃদয়ে শৈশব বেলা, (চিহ্নিত সুহৃদ)

'বিদ্যালয়', 'দুঃখে', 'শৈশব' শব্দগুলি মাত্রা-বিভ্রাট ঘটিয়েছে। কিন্তু তবু কবির লক্ষ্য ঐ দিকেই। সেকালের ছন্দ-শিথিলতার যুগে এই প্রকার মাত্রাগত গোঁজামিল খুবই সাধারণ ঘটনা। বিহারীলালের বঙ্গসুন্দরী ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সম্ভবত আত্মভাবনাসমৃদ্ধ কবিতা রচনার পক্ষে এই ছন্দই প্রকৃষ্টতর মনে ক'রে কবি এখান থেকে তাঁর আদর্শ সংগ্রহ করেন।

॥ ২ ॥

অধিকাংশ কবিতাতে প্রণয়ঘটিত হতাশাই প্রবল। এখানে কবির ব্যক্তিগত জীবনের নানা প্রসঙ্গ অভিব্যক্ত হয়েছে। 'আমার জীবনে' কবির একাধিক প্রণয়-লীলার সংবাদ আছে। নবীনচন্দ্রের প্রথম প্রেমিকার নাম 'বিদ্যুৎ'।[২৮] প্রথম খণ্ডের প্রেমকবিতার আনন্দ বেদনার উৎস বোধ হয় তিনিই। 'কি লিখিব' কবিতায় বিদ্যুতের বিবাহে শোকোন্মাদ প্রণয়ী কবির হৃদয়োচ্ছ্বাস অভিব্যক্ত হয়েছে।

নিদারুণ দেশাচার উপাড়িয়া বলে
অপর অদৃষ্টক্ষেত্রে করিল রোপন।

* * *

কিন্তু তোরে দোষী মিছে, দোষী দেশাচার
দোষী এ বাঙ্গালী জন্ম, দোষী এ ভারত।

দ্বিতীয় প্রেমিকা হলেন জ্যোৎস্না। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রেমকবিতার উৎস সম্ভবত তিনিই।

আশার সুদূর প্রান্তে তেমতি তোমায়
স্থাপিয়া জীবন মম
এই নীলসিন্ধু সম
ঝলসিব, সুখ দুঃখ তরঙ্গ নিচয়
সচঞ্চল, হবে তব প্রতিবিম্বময়। (কি করি)

কবি নানাভাবে নানা প্রেমিকার স্তুতি করেছেন। "আমি জীবনে দুইটি রমণী-রত্নের ভালবাসা পাইয়াছিলাম। এই ভালবাসার নাম আন্তরিক বন্ধুতা, নিষ্কাম, অনাবিল, পুণ্যময়, প্রেমময়।......এই আকুলতা, গভীরতা ও নিষ্কামতা পতি-পত্নীর প্রেমে সম্ভবে না।"[২৯] কবির কোন সংস্কার ছিল না; বৈধ প্রেমের তিনি অন্ধ স্তাবক ছিলেন না।[৩০] কবির এই স্বতন্ত্র প্রেমভাবনা সমালোচনার কারণ হয়েছিল। তাঁর 'জুমিয়া জীবন'-এর সহজ অনাবৃত প্রেমধর্ম আর্যসংস্কৃতির ধ্বজাবাহীদের দ্বারা ভৎর্সিত হয়েছিল।[৩১] কবি বহু প্রেমিকার স্তুতি করেছেন, কিন্তু কোন এক আদর্শ প্রেমিকা তৈরি করতে পারেন নি।

তাঁর ক্লিওপেট্রা, বিদ্যুৎ ও জ্যোৎস্না সকলেই মোহময়ী রমণী মূর্তি; কিন্তু চিরকালের আদর্শ রমণী নয়। তাঁর সব প্রেম বিচিত্র প্রেম, অনন্ত প্রেম নয়।

গাথা-কাব্য

নবীনচন্দ্রের পলাশির যুদ্ধ (১৮৭৫) ও রঙ্গমতী (১৮৮০) কাব্যদ্বয় প্রকাশের পূর্বে একাধিক গাথা-কাব্য প্রকাশিত হয়েছে।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে অক্ষয় চৌধুরীর 'উদাসিনী' কাব্য প্রকাশিত হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে কোন সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রনাথের 'বনফুল' কাব্য প্রকাশিত হয়। বনফুল গ্রন্থাকারে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

এছাড়া অনুবাদ হিসাবে গাথাকাব্য অনেকগুলি দেখা দেয়। তন্মধ্যে

হরিমোহন গুপ্ত, লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী ও ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক পার্ণেলের হার্মিট অনূদিত হ'য়ে প্রকাশিত হয়। আর গোল্ডস্মিথের হার্মিট অনুবাদ করেছিলেন স্বয়ং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

এ-ছাড়া ডিরোজিও রচিত 'ফকীর অব ঝঙ্গীরা' এবং অন্যান্য ইংরেজ লেখকের যুদ্ধকাব্য গাথাকাব্যের ঐতিহ্যকে পুষ্ট করে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মিনী উপাখ্যান ও অন্যান্য কাব্য, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বীরবাহুকাব্য হ'ল গাথা-কাব্যের অতি সাম্প্রতিক উদাহরণ। গদ্যে বঙ্কিমের মৃণালিনী (১৮৬৯) এই প্রসঙ্গ স্মরণীয়। এই সব গাথা-কাব্যের অবশ্য দুইটি রূপ আছে : একটি বাইরণ-ধর্মী, আর একটি স্কট-ধর্মী। স্কটধর্মী গাথা-কাব্যে মুখ্যত মধ্যযুগীয় গাথা-সাহিত্যের ধাঁচ রক্ষা করা হয়েছে।

নবীনচন্দ্রের 'পলাশির যুদ্ধ' বাইরণ-ধর্মী ; কিন্তু রঙ্গমতী স্কট-ধর্মী।

পলাশির যুদ্ধের ঘটনা সর্বজনবিদিত ঘটনা। ষড়যন্ত্র ও মন্ত্রনায় শুরু ক'রে সিরাজের হত্যায় কবি কাব্য শেষ করেছেন। মাত্র পাঁচটি সর্গে কাব্য সম্পূর্ণ। জগৎশেঠ, কৃষ্ণচন্দ্র, রাণীভবাণী, মোহনলাল, সিরাজদ্দৌলা ও ক্লাইভ চরিত্র সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত। সিরাজদ্দৌলা চরিত্রের বিরুদ্ধে আরোপিত সমস্ত অভিযোগই প্রায় কবি স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। ঐতিহাসিকপ্রবর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়কে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'সিরাজদ্দৌলা'য় নবীনচন্দ্র সেনের কবিভাষণের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করতে হয়েছিল।

কবি নবীনচন্দ্র রোম্যানটিক গাথা-কাব্যের বিবিধ বৈশিষ্ট্য এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন। চিন্তামগ্ন ক্লাইভের সম্মুখে বৃটিশ রাজলক্ষ্মী সশরীরে আবির্ভূতা হয়েছেন। পলাশির যুদ্ধক্ষেত্রে নবাব ছয়টি স্বপ্ন দেখলেন, প্রতিটি স্বপ্নই তাঁর অতীত কুকীর্তির সংবাদবহ।

স্বপ্নে সিরাজ তাঁর ভবিতব্য দেখতে পেলেন। তাছাড়া সিরাজ কারাগারে নরক-দর্শন-পর্বও শেষ করেছেন। এ সমস্ত আধিভৌতিক ঘটনা অতীত সাহিত্য-কলাকৌশলের লেজুড়।

কাব্যে চারিটি গান আছে ; তিনটি গানই ইংরেজদের গীত, একটি মাত্র নবাব শিবিরের নর্তকীদের গীত। গানগুলির মধ্যে "প্রিয়ে কেরোলাইনা আমার" গানটি স্বরচিত। এগুলি স্কটের অনুকরণে লেখা।

যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা এবং গানগুলি ব্যতীত কাব্যটিতে এক নতুন স্তবক

রচিত হয়েছে। কেউ কেউ একে স্পেন্সরীয় স্তবক বলেছেন। স্পেন্সরীয় স্তবক বিন্যাস এইপ্রকার—ক খ ক খ খ গ খ ঘ ঘ ; বাইরণের চাইল্ড হ্যারল্ডের স্তবক-বিন্যাসও এই জাতীয়। নবীনচন্দ্র বাইরণের অনুসরণ করেছেন; কিন্তু তাঁর স্তবক নয় পঙ্‌ক্তিতে সম্পূর্ণ নয়, দশ পঙ্‌ক্তিতে সম্পূর্ণ। তাঁর স্তবক-বিন্যাস এইরূপ ক খ ক খ গ ঘ গ ঘ ঙ ঙ। যথার্থ স্পেন্সরীয় স্তবক একে বলা চলে না। তবে নবীনকবি সমগ্র স্তবকে শব্দ ও বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তি ক'রে সঙ্গীত মাধুর্য সৃষ্টি করেছেন; নতুবা এত বড় স্তবক একঘেয়ে হ'য়ে উঠার সম্ভাবনা ছিল।

কবি নানাবিধ উপমা উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করেছেন; সবগুলিই পেশাদারী কবিতার রঙ-চটা অলংকার।

যথা শারদ গগন খচিত নক্ষত্র হারে (১ম সর্গ)
শুকতারা শোভে যেন আকাশের পটে (ঐ)
আনায় মাঝার কুরঙ্গ শাবক কাঁদে নীরবে যেমনি (২য় সর্গ)
যেমতি জলধি-জলে
প্রকাণ্ড তরঙ্গ দলে
ছুটে যায় বহে যবে ভীম প্রভঞ্জন। (৪র্থ সর্গ)

মাইকেলী প্রভাব অজস্রই পাওয়া যায়; বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যবহারে—যেমন ইরম্মদ, আনায় মাঝারে, জীমূতবৃন্দ; নামধাতুর ব্যবহারে—উপহাসিয়া, ভস্মিয়া; উপমা-উৎপ্রেক্ষার ব্যবহারে—যথা "আনায় মাঝারে কুরঙ্গ শাবক কাঁদে নীরবে যেমনি", "নিদাঘে পল্লব শূন্য তরুর মতন" ইত্যাদি।

রঙ্গমতী অপেক্ষাকৃত শিথিল রচনা। কবি উৎসর্গ-পত্রে বলেছেন, "ইহার প্রত্যেক সর্গে, প্রত্যেক পৃষ্ঠায়, প্রত্যেক অক্ষরে আমার বিপদের স্মৃতি, রোগের যন্ত্রণা, বিষাদের ছায়া, এবং শোকের অশ্রু জড়িত রহিয়াছে।" আমার জীবনে লেখক বলেছেন রঙ্গমতী দীর্ঘকাল ধ'রে লিখিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ কাব্যের গঠন শৈথিল্যের কারণ এইখানে নিহিত।

রঙ্গমতী কাব্যে আখ্যান অংশ অপেক্ষা বর্ণনা অংশ অধিক। কাব্যটি ছয় সর্গে সম্পূর্ণ। কাব্যটি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। শুধু ব্যতিক্রম পাঁচটি সঙ্গীত—চন্দ্রকলার গীত, দাঁড়ী মাঝিদের গীত, শিকারীর গীত, দেবমন্দিরে কুসুমিকার গীত, জুমিয়া রমণীর গীত। গীতগুলি ত্রিপদীতে রচিত।

প্রথম সর্গের ঘটনাস্থল নদীতীর, দ্বিতীয় সর্গ কানন, তৃতীয় সর্গ চন্দ্রশেখর, চতুর্থ সর্গ রঙ্গমতী বন, পঞ্চম সর্গ দেবমন্দির, এবং ষষ্ঠ সর্গ গিরিশিখর। ঘটনাস্থল থেকেই বুঝা যাবে, কাব্যের আখ্যান-বস্তু বাহ্যত পরিচিত জগৎ থেকে বহু দূরে স'রে গেছে।

দেশ-উদ্ধার-ব্রতী বীরেন্দ্রের নানারূপ বীরত্বব্যঞ্জক কার্য এই কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। পরিশেষে বাল্যসখী ও প্রণয়িনী কুসুমিকাকে উদ্ধার করতে গিয়ে কুসুমিকার মৃত্যু দেখে শোকের প্রাবল্যেই তার মৃত্যু হ'ল। এই কাব্যে মহাপুরুষ ও তপস্বিনী চরিত্র আমদানী করা হয়েছে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকে মহাপুরুষ ও পাগলিনী চরিত্র তখনও দেখা দেয় নি। সেকালের কোন কোন সমালোচক বীরেন্দ্রকে "অনাগত মহাপুরুষ" ব'লে সম্বর্দ্ধিত করেছিলেন। [৩১]

আকস্মিকতা ও অলৌকিকতা এই কাব্যের পাত্র পাত্রীদের মানবিক গুণ থেকে বঞ্চিত করেছে ; রোমান্স রসের আধিক্য ঘটায় বাস্তবতার হানি ঘটেছে,—যদিও এ কাব্যে আঞ্চলিকতার অভাব নেই। চন্দ্রশেখর পাহাড়ের বর্ণনা সত্যই প্রশংসনীয়। জুমিয়া জীবনের যে চিত্রটি কবি উপস্থাপিত করেছেন, তাও বিশ্বস্ত। কবি পূর্ববঙ্গের বহু উপভাষা এখানে ব্যবহার করেছেন। কাঁদিতা, করিতা, লইতা, গাঙ্গ, কিরা ইত্যাদি। কাব্যে উপমা-উৎপ্রেক্ষার ছড়াছড়ি ; তবে নতুনত্ব কিছু কিছু আছে।

স্বর্ণ রাজহংস যেন মানস সরসে (১ম সর্গ)

ভুজদ্বয় যেন দীর্ঘ সুবর্ণ কৃপাণ (ঐ)

যথা ধৃত বিহঙ্গিনী নিষাদ পিঞ্জরে
কাঁদিতে কাঁদিতে যায়। (ঐ)

শোভিতেছে রজত ত্রিশূল
অঙ্গুলি নির্দেশ যেন করিছে নীরবে! (২য় সর্গ)

পুষ্পবৃক্ষ-অন্তরালে
সরোবর তীরে ; কিংবা পল্লব-বিচ্ছেদে
স্থানে স্থানে বন মাঝে পড়েছে খসিয়া
অসংখ্য কৌমুদী খণ্ড, শ্যাম দুর্বাদলে। (ঐ)

সম্মুখে আমার
গিরিবর ভীম অঙ্গ অর্ধচন্দ্রাকারে
দিয়েছে ঢালিয়া যেন নীল কাঞ্চীজলে। (ঐ)
সলজ্জ কুমারী কুণ্ড আছে লুকাইয়া
বঙ্গের কুমারী যেন বঙ্গ অন্তঃপুরে। (৩য় সর্গ)

অগণ্য কুসুম রাশি, অম্লান, অবাসি ;
রেখেছে খুলিয়া অঙ্গ-আভরণ যেন। (ঐ)
তড়াগ দীর্ঘিকাগণ শোভে অগণন
প্রবালের ফোঁটা যেন বসুধাললাটে। (ঐ)
প্রপাতের মত
এক লম্ফে পড়ি তোর বক্ষের উপরে। (ঐ)

যে মূর্তিতে মহামায়া শারদ উৎসবে
বিরাজেন বঙ্গালয়ে। (৫ম সর্গ)

দূর হতে বোধ হয় নাচিছে সমীরে
রক্ত-জবা-হার উচ্চ পর্বত শেখরে। (৬ষ্ঠ সর্গ)
যেন সংখ্যাতীত তপ্ত কাঞ্চন সফরী। (ঐ)

রঙ্গমতীতেও বিহারী-ছন্দ দুইটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। রঙ্গমতী যদিও 'irregular type'-এর কাব্য, তবু এই কাব্য থেকেই নবীনচন্দ্রের দার্শনিক উচ্চ আকাঙ্ক্ষা প্রবল হতে থাকে, এবং অচিরেই মহাকাব্য রচনায় তিনি প্রবৃত্ত হলেন।

মহাকাব্য

রঙ্গমতীতে যে বক্তব্য ইতিহাস-আশ্রিত কাল্পনিক কাহিনীর আবেষ্টনীতে পরিবেশিত হয়েছে, সেই বক্তব্যই অধিকতর দার্শনিক অভিসন্ধিসহ পৌরাণিক পরিবেশে বর্ণিত হ'ল।

"বৃত্রাসুর মরিল কি বাঁচিল, আমাদের তাহাতে কিছু যায় আসে না। আমার মতে এ সকল পৌরাণিক উপাখ্যান ছাড়িয়া তিনি ভারতের ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া যদি তাঁহার শক্তি সঞ্চালন করিয়া কাব্য লেখেন, তবে লোকের হৃদয় অধিক স্পর্শ করিবে। অসুরের সহিত মানুষের সহানুভূতি হয় না।"[৬২]

কথাটা একদা তিনিই হেমচন্দ্র প্রসঙ্গে বলেছিলেন। কিন্তু তিনিই আর্য-অনার্য সংঘর্ষ দেখাতে গিয়ে নাগরাজ বাসুকীকে টেনে আনলেন। দানব বৃত্র যদি সহানুভূতি আকর্ষণে ব্যর্থ হয়, তবে নাগরাজ বাসুকীই বা কেমন ক'রে সহানুভূতি বা বিদ্বেষ আকর্ষণ করবে? শ্রীকৃষ্ণ অখণ্ড ভারত গঠনের পরিকল্পনা করেছেন—"এক ধর্ম এক জাতি এক সিংহাসন"। প্রতিহিংসাপরায়ণ দুর্বাসা সেই বাসুকীর সঙ্গেই ষড়যন্ত্র ক'রে শ্রীকৃষ্ণের এই স্বপ্ন ব্যর্থ করার প্রয়াসী হ'ল। যে সহানুভূতি আকর্ষণ করে না, সে বিদ্বেষও আকর্ষণ ক'রতে পারে না।

নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ী রৈবতক (১৮৮৬), কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩) ও প্রভাস (১৮৯৬) একত্রে উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত ব'লে কোন কোন সমালোচক মন্তব্য করেছেন।

এই কাব্যে উনবিংশ শতাব্দীর ভারত-চিন্তার সারকথা রয়েছে। কৃষ্ণ চরিত্রের এই নতুন ব্যাখ্যার অগ্রাধিকার কার প্রাপ্য, এ নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে এখনও মতবিরোধ আছে,—এ বিষয়ে নবীনচন্দ্রের জোরালো এবং তথ্য-ভিত্তিক দাবী থাকা সত্ত্বেও।

রৈবতকের এক বড় অংশ অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা। বাকী অংশ কখনও প্রচলিত পয়ারে, কখনও ত্রিপদীতে লেখা। কাব্যটি বিশ সর্গে সম্পূর্ণ। লেখকের উদ্দেশ্য মহৎ; কিন্তু কাব্য-রচনা-প্রণালী সর্বদা এত উচ্চমার্গীয় হয়নি। বৈরতকেই অন্ততঃ তিন জোড়া প্রেম-লীলা আছে—কৃষ্ণ-জরৎকারু, অর্জুন-সুভদ্রা, অর্জুন-শৈল। এই প্রণয় কখনও জ্বালাময়, যথা জরৎকারুর প্রেম; কখনও নীরব, যথা শৈলের; কখনও বড়ই সরব বা প্রগল্ভ, যথা সুভদ্রার। প্রণয়ের এই বিচিত্র বর্ণাবলী থাকায় কাব্যের মহাকাব্যিক সমুন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়েছে। আর নায়িকাদের আচরণ আদৌ গম্ভীর বা ক্লাসিকাল নয়, নিতান্তই অর্বাচীন কালের গাথা-সাহিত্যের নায়িকাদের মত। এমন কি প্রতিনায়ক চরিত্র দুর্বাসার দুষ্ট আচরণের মধ্যেও পৌরাণিক বলিষ্ঠতা আদৌ দেখা যায় না। একমাত্র অর্জুন কতকাংশে, ও শ্রীকৃষ্ণ কিছুটা মহাভারতীয় ঔচিত্যবোধ ধারণ করেছেন। তবে শ্রীকৃষ্ণ যতটা বচনপটু, ততটা কর্মপটু রূপে চিত্রিত হ'ন নি। শ্রীকৃষ্ণ তাই Bacon-এর Atlantis নতুন ক'রে বিবৃত করলেন; অনূদিত করলেন না। কুরুক্ষেত্র কাব্য ভীষ্মের পতনের পর আরম্ভ, এবং শেষ হয়েছে অভিমন্যুর মৃতদেহ-সংকারে। এখানে জরৎকারুর প্রণয়লীলার বিবরণ আছে।

নতুন ক'রে সংযোজিত হয়েছে উত্তরা-অভিমন্যু কাহিনী। শৈল ও সুভদ্রা ইতিমধ্যে অনেক শান্ত হ'য়ে পড়েছে, পৃথিবীর অভিজ্ঞতা তাদের প্রাজ্ঞ করেছে। তারা একসঙ্গে ব'সে ব'সে পরস্পরের হৃদয়-অনুভূতি উদ্ঘাটিত ক'রতে সঙ্কোচ-বোধ করছে না।

প্রভাসে জরৎকারুর প্রেমের চরিতার্থতা ঘটেছে, এবং কৃষ্ণের ভবলীলা সংবরণ বর্ণিত হয়েছে। জরৎকারু কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণেই কৃষ্ণের দেহত্যাগ, কিন্তু তৎপূর্বে জরৎকারুর স্বপ্নসাধ চরিতার্থ হবে। জরৎকারুকে দেখে যাদবগণের লালসা-মত্ততা সাগর-মন্থনে অসুরদের অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কাব্যটির উপসংহারে শৈল কর্তৃক শ্রীক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বর্ণিত হয়েছে। সমগ্র কাব্যে নানা চরিত্রই হাজির হয়েছে, কিন্তু সজীব হয়নি। তিনটি কাব্যেই কবির প্রাধান্য, চরিত্রের নয়। উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী হ'য়ে উঠেছিল। তার রণধ্বনি ছিল—এক জাতি, এক ধর্ম ও এক রাষ্ট্র। আমরা ইতিপূর্বে ধর্ম ও দেশপ্রেম কিভাবে এক সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল, সে প্রসঙ্গ বলেছি। আবার এই বিচিত্র দেশের শত ভাষাভাষী বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত নানা ধর্মাবলম্বী কোটি কোটি মানুষ একটি সাম্রাজ্যের শাসনাধীনে মিলিত হ'তে চাইছিল, সেই রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসও আমরা বর্ণনা করেছি। নবীনচন্দ্রের নবীন মহাকাব্য নেই নবীন জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার হৃদয়-স্পন্দনটি ঠিকই কান পেতে শুনেছিলেন। কিন্তু তার প্রকৃষ্ট মাধ্যম তিনি খুঁজে পাননি। মহাকাব্য তখন তার খাত পরিবর্তন করেছে। আধুনিক যুগে মহাকাব্য আর কাব্যাকারে আদৌ লিখিত হবে না। আধুনিক মহাকাব্য ফাউষ্ট নবীন মানুষের অনমনীয় আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধি। গ্যয়টে এই মহাকাব্য নাটকের আকারে লিখেছেন, দ্বিতীয় 'প্যারাডাইস লস্ট' লেখেন নি। বাংলা সাহিত্যেও বঙ্কিমের লেখনী-আঘাতে মহাকাব্য খাত পরিবর্তন করেছে—দেবী চৌধুরাণী, রাজসিংহ, আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর উপন্যাসে মহাকাব্যের প্রতিধ্বনি আছে। নবীনচন্দ্র সেই খাতে প্রবাহিত হন নি; তার ফলে তাঁর মহাকাব্য সমস্ত সদিচ্ছা সত্ত্বেও আঙ্গিক-দীনতার ফলে আজ হতমূল্য। নবীনচন্দ্র ব্যক্তি-জীবনে একটু বেশি আত্মসচেতন ছিলেন; তাঁর 'আমার জীবনে'র পাঠকের কাছে সম্ভবতঃ তিনি একটু আত্মম্ভরীও। কাব্যজীবনে কিন্তু তিনি তাঁর আত্মশক্তির যথার্থ হিসাব-নিকাশ করতে পারেন নি। তাঁর অবকাশরঞ্জিনী থেকে

রঙ্গমতী—নিঃসন্দেহে এক বিশেষ মনের মানচিত্র তুলে ধরে। সে মন অহং-বোধে উদ্বেল, অসন্তুষ্ট ও সম্প্রসারণকামী—মানব-জগতে ও প্রকৃতি-জগতে।

কিন্তু 'রঙ্গমতী'র মহাপুরুষ চরিত্রের ব্যাপকতর অন্ধ রূপায়নেই তাঁর পদস্খলন সম্পূর্ণ হ'তে চাইল। কবি যদি সর্বদাই নবী হতে চান, তবে কাব্যের পক্ষে তা বড়ই বিষাদজনক। তাঁর খৃষ্ট (১২৯৭), অমিতাভ (১৩০২), অমৃতাভ (১৩১৬) সেই ধারার বিপন্ন সৃষ্টি। অথচ নবীনচন্দ্র এই 'নবী' হবার মত মহাত্মা পুরুষ নন। তিনি নিতান্তই সাধারণ মানুষ; ঈর্ষাদ্বেষ, সম্ভোগেচ্ছা, বিতৃষ্ণাবোধ সব অনুভূতিই তাঁর মধ্যে প্রবল। আত্মজীবনীতে যে প্রাণবান অকৃত্রিম মানুষের হৃদয়পট তিনি উন্মোচিত করেছেন, সে মানুষ অনুভূতি-প্রবল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সে মানুষ যে কবি, তারও ত পরিচয় 'অবকাশরঞ্জিনী'তে অজস্র রয়েছে। তাঁর মানববোধ নানা ছত্রেই ফুটেছে; তাঁর প্রকৃতিবোধও বেশ প্রকটিত।

তিনি লিখেছিলেন, "নিরখি প্রকৃতি মূর্তি মনের নয়নে।" কথাটিকে তাঁর সমগ্র কাব্যে যাচাই করা যায়।

যামিনীর সুমধুর নূপুর নিক্কণ
ঝিল্লীরবে ভাসিতেছে দিগদিগন্তর,
পাখার প্রহার শব্দ করিছে কখন,
ভগ্ন-নিদ্র পক্ষিগণ বৃক্ষের উপর।
কলকল রবে গঙ্গা সাগর সদন
যাইতেছে অন্ধকারে ঢাকিয়া বদন। (পিতৃহীন যুবক)

সুদূর তরঙ্গমালা, বঙ্গ পারাবারে
তুলিয়া তরল শিরঃ, নীল কলেবর,
দেখিছে কেমনে অস্তে যায় প্রভাকর;
সে নীল সলিল লীলা কে বর্ণিতে পারে?
অদূরে সুবর্ণরেখা শান্ত স্রোতস্বতী,
সন্ধ্যালোকে শোভে যেন রজতের হার;
শোভে তীরে তরুরাজী শ্যামরূপবতী;
ভাসে নীরে ক্ষুদ্র তরী পক্ষীর আকার।

গাভীগণ অগণন চরিতেছে মাঠে ;
ছুটিতেছে বৎসগণ উচ্চ পুচ্ছ ক'রে ;
নীড় অন্বেষণে এবে দিগ্‌দিগন্তরে
উড়িতেছে পক্ষিগণ ; সরোবর ঘাটে
শোভিতেছে দীন হীনা কুলনারীগণ,
কলসী কোমল কক্ষে, বক্র কলেবর ;
বহিতেছে ধীরে ধীরে সন্ধ্যা সমীরণ
কাঁপে লতা, কাঁপে পাতা, কাঁপে সরোবর।

(পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী)

দিবা অবসান প্রায় ; নিদাঘ-ভাস্কর
বরষি অনলরাশি সহস্র কিরণ,
পাতিয়াছে বিশ্রামিতে ক্লান্ত কলেবর,
দূর তরুরাজি শিরে স্বর্ণ-সিংহাসন।
খচিত সুবর্ণ-মেঘে সুনীল গগন
হাসিছে উপরে ; নীচে নাচিছে রঙ্গিনী
চুম্বি মৃদু কলকলে মৃদু সমীরণ,
তরল সুবর্ণময়ী গঙ্গা তরঙ্গিনী।
শোভিছে একটি রবি পশ্চিম-গগনে
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্নবী-জীবনে।

(পলাশির যুদ্ধ—২য় সর্গ)

মধ্যস্থলে চন্দ্রনাথ ভীষণ মুরতি,
প্রকৃতির শৈলসৈন্য মহারথী যেন,
ভীমকায় বীরবর, সসৈন্য সজ্জিত
অনন্ত সমুদ্রসহ মহাযুদ্ধে যেন।
আবৃত বিপুল দেহ পাষান কবচে
দুর্ভেদ্য, সজ্জিত তনু অসংখ্য আয়ুধে,
মহামহীরুহে, মহা শিলাখণ্ডচয়ে।
জ্বলিতেছে রোষানল ধক্ ধক্ ধক্

জ্যোতির্ময় অগ্নিশিখা ; মহাযুদ্ধকালে
নির্গত হইয়া বহ্নি ঘটাবে প্রলয়। (রঙ্গমতী ৩য়—সর্গ)
সুচারুহাসিনী ঊষা, প্রসারিয়া কর
অবলম্বি গিরিশৃঙ্গ রঙ্গমতী বনে,
উঠিছে আকাশ পথে। সে কর পরশে
শৃঙ্গ হতে অন্ধকার পড়িছে খসিয়া
পর্বত গহ্বরে ধীরে, উঠিছে ভাসিয়া
কাননের সুশ্যামল শোভা মনোহর। (রঙ্গমতী—৪র্থ সর্গ)
বাল সূর্যালোকে
কোথাও বিশাল বট বিটপি-ঈশ্বর,
প্রসারি পল্লবছত্র আছে দাঁড়াইয়া,
সৃজি ছায়াতলে শাখাকক্ষ মনোহর।
স্থানে স্থানে রাজমন্ত্রী অশ্বত্থ, তমাল,
করিছে কানন-রাজ্য-মহত্ত্ব বর্ধন।
দূরদর্শী, শীর্ণকায়, জটাজূটশির
কানন-সমাজ হ'তে বহু ঊর্ধ্বে তুলি,
দাঁড়ায় খর্জুর, তাল, বন-ঋষিদ্বয়
ধ্যানে অবিচল দেহ নির্বাক উভয়। (রৈবতক—২য় সর্গ)

নবীনচন্দ্রের এ বর্ণনায় প্রকৃতি বর্ণনার নতুন স্তর সংযোজিত না হ'লেও বিশিষ্টতা আছে, এ কথা বলা চলে। এই বর্ণনাক্রম অনুসরণ করলে দেখা যাবে, কবির বর্ণনাশক্তি ক্রমশঃ প্রবীন হচ্ছিল। কিন্তু পরে নানা তত্ত্বের তাড়নায় এই শক্তি পূর্ণ বিকশিত হতে পারেনি। মাঝে মাঝে তিনি মানব-জগতের কবিতায় অনুরূপ রহস্য-মন্দিরের দ্বারে এসে উপনীত হয়েছেন। 'কেন ভালবাসি' কবিতায় ক্ষণকালের নায়িকাকে বুঝবার চেষ্টা করেছেন—

কি দিব উত্তর ? আমি কেন ভালবাসি ?
আজি পারাবার সম
হায়, ভালবাসা মম
কেন উপজিল সিন্ধু !—এই অম্বুরাশি,
কে বলিবে ? কে বলিবে, কেন ভালবাসি ?

'স্বপ্ন উন্মত্ততা' কবিতায় এই প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হয়েছে ; সে উত্তর সদুত্তর হ'তে পারে, কিন্তু সন্তোষজনক নয়। সেই একই জ্বালার পুনরুক্তি। 'কি করি' কবিতায়ও সেই অব্যবস্থিতচিত্ততা।

কবির ব্যক্তি-অনুভূতির হাহাকার সার্বজনীনতা লাভ করে নি। মহাকাব্যের নানা প্রেম-আখ্যানে শুধু সেই হাহাকার এলায়িত হয়েছে, সংহত হয়নি।

নবীনচন্দ্র নিঃসন্দেহে উনবিংশ শতাব্দীর প্রতিনিধি স্থানীয় কবি। তিনি একাধারে ঐ শতাব্দীর আশীর্বাদ ও অভিশাপ। কারণ তিনি মনে-প্রাণে রোম্যানটিক, আচরণে ক্লাসিকাল।

কোন যুগে দ্বিধাগ্রস্ত প্রতিভা আপন শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে না।

পাদটীকা

১। The Poetical Works of Lord Byron. London Oxford University Press, 1935. Don Juan. Canto I. পৃ—647.

২। কবি হেমচন্দ্র—অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ২য় সংস্করণ, পৃ—৭।

৩। হেমচন্দ্র—মন্মথনাথ ঘোষ। পৃ—৫০

৪। ঐ, পৃ—১০১।

৫। Principles of Literary Criticism—I. A. Richards. Routledge and Kegan Paul. 1955 পৃ—১৮১।

৬। ঐ—পৃষ্ঠা—ঐ

৭। বঙ্গবাণী—শশাঙ্ক মোহন সেন, ২য় খণ্ড পৃ—২২।

৮। ঐ

৯। সাহিত্য—১৩১৯ বঙ্গাব্দ—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—কবি হেমচন্দ্র।

১০। বাংলা কবিতার ছন্দ—মোহিতলাল মজুমদার—জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স—পৃ—৬।

১১। আর্যদর্শন, ১২৮১, ১ম বর্ষ, মাঘ।

১২। বঙ্গদর্শন—১২৮১, ৩য় বর্ষ, ফাল্গুন।

১৩। বঙ্গবাণী—শশাংকমোহন সেন—পৃ—১২।

১৪। কবি হেমচন্দ্র—অক্ষয়চন্দ্র সরকার।
২য় সংস্করণ—পৃ—৩১।

১৫। বঙ্গদর্শন—১২৮৮, কার্তিক।

১৬। কাব্যে রবীন্দ্রনাথ—২য় সংস্করণ—বিশ্বপতি চৌধুরী। পৃ—১৪।

১৭। ঐ, পৃ—১৬।

১৮। কবি হেমচন্দ্র—অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

১৯। সাহিত্য—১৩১৯ বঙ্গাব্দ—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০। বাঙ্গলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—রাজনারায়ণ বসু—১৮০০ শকাব্দ—পৃ—৩৮।

২১। হেমচন্দ্র—মন্মথনাথ ঘোষ রচিত গ্রন্থে উদ্ধৃত শিবনাথ শাস্ত্রীর উক্তি। পৃ—৩৫

২২। ভারতী—১২৮৮, বৈশাখ--বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা।

২৩। বান্ধব—১২৮২, পৌষ।

২৪। আমার জীবন—২য় ভাগ—নবীনচন্দ্র সেন—পৃ—১৯১—বসুমতী সংস্করণ।

২৫। ঐ—তৃতীয় ভাগ—পৃ—২৭১।

২৬। আমার জীবন—নবীনচন্দ্র সেন পৃ—১৩৩।

২৬ ক। ঐ

২৭। ঐ, ৪র্থ ভাগ—৮১।

২৮। আমার জীবন—নবীনচন্দ্র সেন

২৯। ঐ, ৪র্থ-৫ম ভাগ, পৃ—১০৩।

৩০। ক্লিওপেট্রা সম্বন্ধে কবির অভিমত বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। আমার জীবন ১ম, ২য়-৩য় ভাগ—পৃষ্ঠা—১৫৬।

৩১। আর্যদর্শন—১২৮৫,অগ্রাহায়ণ।

৩২। আমার জীবন—১ম-৩য় ভাগ, পৃ—২৭৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিহারীলাল ও আত্মমুখীন কবিতা

হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের যুগ নগদ বিদায়ের যুগ।

এই যুগে বিহারীলাল শুধু সাহিত্যই সৃষ্টি করলেন, অন্য কোন 'মহত্তর' উদ্দেশ্যে কাব্যচর্চায় মগ্ন হলেন না।

"বিহারীলাল তখনকার ইংরাজিভাষায় নব্য-শিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধ বর্ণনাসংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না—তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন। তাঁহার সেই স্বগত উক্তিতে বিশ্বহিত দেশহিত অথবা সভা মনোরঞ্জনের কোনো উদ্দেশ্য দেখা গেল না। এইজন্য তাঁহার সুর অন্তরঙ্গ রূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সহজেই পাঠকের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া আনিল।"[১]

বিহারীলাল এই অতি-প্রত্যক্ষ জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে অপ্রত্যক্ষ-জগতে, ভাবের-জগতে, আত্ম-জগতে প্রবেশ করলেন।

"আমাদের দুইটি জগৎ আছে। এক জগতে আমরা বাস করি, আর এক অদৃশ্য জগৎ আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছে। সে জগতের নাম আদর্শ জগৎ।.........সে জগৎ ভাবের জগৎ। সেই জগৎ কবিতার জগৎ। বস্তুর জগতে আমাদের কার্যক্ষেত্র, ও সেই ভাবের জগৎ আমাদের হৃদয়ের বিহারভূমি! যে ভাষায় আমরা কথা কই, সে ভাষা আমরা কবিতায় ব্যবহার করি না।......যেমন কবিতার ভাষা চলিত ভাষা নহে, তেমনি কবিতার বিষয়ও চলিত বিষয় নহে।"[২]

হেমচন্দ্র যে জগতে প্রবশে ক'রতে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত, বিহারীলাল হেলায় সে জগতে প্রবেশ করেছেন। বা এই জগৎ তিনিই সৃষ্টি করলেন। বিশ্বামিত্রের দ্বিতীয় ভুবনের মত!

সমসাময়িক পরিচিত বাস্তব জগতই হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের জগৎ। আর

বিহারীলাল পরিচিত জগতে প্রবেশাধিকার পান নি; বিহারীলালের জগৎ কল্পনার জগৎ।

হেম-নবীন ছিলেন বস্তু-জগতের প্রবল আঁধিতে দৃষ্টিবন্ধ্যা। অন্ততঃ নবীনচন্দ্র যে অন্য জগতের সংবাদ জানতেন না, তা নয়। কিন্তু সেই জগতে গমনের আকাঙ্খায় যে রথে তিনি চড়েছিলেন, সে রথ যেন কর্ণের দ্বিতীয় রথ।

হেমচন্দ্রের 'চিন্তা' ও 'কল্পনা' শীর্ষক দুইটি কবিতা আছে; এই কবিতা দুটিও প্রত্যক্ষ জগতের ভাষায় লেখা হয়েছে। এখানেও কবিদৃষ্টি ব্যক্তিগত নয়; সামাজিক, অর্থাৎ বারোয়ারী।

হেম-নবীনের সমগ্রদৃষ্টিই সাধারণ দৃষ্টি, বিশেষ দৃষ্টি নয়। তাঁদের প্রেমবোধ, ঈশ্বরবোধ ও প্রকৃতিবোধ ব্যক্তিগত বোধ নয়, সাধারণ বোধ মাত্র। তাঁদের অনুকৃত কাব্যবিষয় ও কাব্য-আঙ্গিক এবং তাঁদের ব্যবহৃত কাব্য-অলঙ্কার ও কাব্যভাষা ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক। এখানে ব্যক্তিগত শব্দটি বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হ'বে।

রেনেসাঁস যুগেও রোম্যানটিকতা অনুপস্থিত নয়, কিন্তু তার জাত আলাদা। মাইকেলের কাব্যেও রোম্যানটিকতা প্রবল। কিন্তু বিহারীলাল থেকে নব্য রোম্যানটিকতার সূচনা। এই রোম্যানটিকতা আত্মমুখীন রোম্যানটিকতা, বিশ্বমুখীন রোম্যানটিকতা নয়।

কি কাব্যে, কি জীবনে রোম্যানটিকতা বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয়, রোম্যানটিকতা একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ।

মাইকেল-সাহিত্যে মানব-শক্তির সম্ভাবিত প্রচণ্ড বিকাশে উল্লাসধ্বনি আছে, তেমনি আশাভঙ্গ জনিত আর্তনাদও আছে। বহিঃবিশ্বের মুক্ত অঙ্গন একবার যখন প্রত্যাখ্যাত হ'ল, তখন সেখানে অন্তঃজগতের দ্বার উন্মুক্ত হ'ল। বিহারীলাল এই অন্তর জগতের সাতমহলার দ্বার একটির পর একটি উদ্ঘাটিত করলেন।

"This world of Imagination is the World of Eternity; it is the divine bosom into which we shall go after the death of the Vegetable body. This world of Imagination

is Infinite and Eternal, whereas the world of Generation or Vegetation is Finite and Temporal."[৩]

ভাষা যাইহোক, এই উক্তি বিহারীলালও ক'রতে পারতেন।

কাব্যধারা

॥ ১ ॥

অথচ বিহারীলালের কাব্য-ধারা যদি আমরা পর্যালোচনা করি, তবে দেখব তিনি আকস্মিকভাবে এই নব্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন নি; ধীরে ধীরে এসে পৌঁছেছেন। কারণ তাঁর প্রথম দুই গ্রন্থ স্বপ্নদর্শন ও বন্ধুবিয়োগ পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গির নজির বহন করে। স্বপ্নদর্শনে আর বন্ধুবিয়োগে যথাক্রমে অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব।

স্বপ্নদর্শনে কবি দেশের নানা সমস্যাভারে পীড়িত, আত্মজিজ্ঞাসায় পীড়িত নন। "হা আমার প্রিয় জন্মভূমি! তোমার একি দশা হইয়াছে! হা আমার স্বদেশীয় ভ্রাতা সকল! তোমরা কোথায় গমন করিয়াছ!

* * আর কি আমার জন্মভূমির সৌভাগ্য দশা ফিরিয়া আসিবে, আর কি আমার ভাই সকল শ্মশানময় প্রান্তর হইতে উঠিয়া আসিয়া মহামহোৎসবে নগর আনন্দময় করিবে, আর কি মনোহর পক্ষীগুলিন্ প্রভাতে বসিয়া ললিত তানে গান করিতে পারিবে?"

(স্বপ্নদর্শন—গ্রন্থাবলী-২য় খণ্ড-শ্রীঅবিনাশ চক্রবর্তী সম্পাদিত—১৩২০, পৃ—২৭)

বন্ধুবিয়োগ কাব্যে পূর্ণচন্দ্র, কৈলাস, বিজয় ও রামচন্দ্র নামে চারিজন বন্ধুর এবং প্রথমা পত্নীর বিয়োগ-ব্যথা বর্ণনা করা হয়েছে। কবি এই কাব্যে বাস্তবতার মহোৎসব করেছেন। বন্ধুবর্গের প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটি বিবরণ ডায়রির ধাঁচে লেখা হয়েছে। সম্ভবতঃ ভিন্নজগতে মহাপ্রস্থানের পূর্বাহ্নে এই বাস্তবতার কুরুক্ষেত্রে কবি চরম সংগ্রাম ক'রে নিলেন।

॥ ২ ॥

কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ সঙ্গীত শতক ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; এবং এই কাব্যই প্রথম মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থ। সঙ্গীতশতকে একশতটি সঙ্গীত আছে, তৎসহ একটি সমাপ্তি সঙ্গীতও আছে। এই সমাপ্তি সঙ্গীতেই কবির এই কাব্যগ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে ব্যক্ত হয়েছে।

সঙ্গীত শতক প্রিয়ে!
হলো সমাপন!
তব বিনোদন তরে
ইহার রচন;
বুঝিলে ইহার ভাব,
পাইবে আমার ভাব,
প্রেম, ধর্ম, প্রকৃতির
হবে উদ্দীপন;
যতই ডুবিয়ে যাবে
ততই আস্বাদ পাবে,
নব নব ভাবে রসে
তৃপ্ত হবে মন। (পৃ—৯৫-৯৬)

কবি তাঁর নিজস্ব সুর এখনও খুঁজে পান নি; তবে দোর পানে চলেছেন! সঙ্গীতশতক যদিও সঙ্গীত-পুস্তক, কিন্তু সঙ্গীতের ধর্ম অপেক্ষা কাব্যের ধর্মই এখানে প্রবলতর। সারদামঙ্গলেরও বহু অংশ কবি স্বয়ং গাইতেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন স্মৃতিতে এই সাক্ষ্য দিয়েছেন।[৪]

কবিতায় সুর স্বতঃই বেজে উঠত না ব'লে মধ্যযুগের বাংলাকাব্যে সুর বসিয়ে দেওয়া হত। বিহারীলালের কবিতায় সুর আপনিই বেজে উঠত, বাজাতে হত না।

সঙ্গীতশতকের কবিতাগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ ১। প্রেম-মূলক; ২। প্রকৃতি-বিষয়ক ও ৩। আত্মচিন্তা-বিষয়ক।

প্রেমমূলক কবিতায় কবি পুরাতন প্রেম-গীতির প্রভাব এড়াতে পারেন নি।

হাসিতে হাসিতে দেখি
যাইছ প্রেমের বাসে!
দেখ না তোমার পাশে
বিচ্ছেদ দাঁড়ায়ে হাসে;

ব'লে দিতে হবে না যে, এই গঠন-রীতি কবিসঙ্গীতের অনুরূপ। প্রেমিকাকে 'প্রেম' বলে সম্বোধন-রীতিও কবিসঙ্গীতের রীতি। 'কোথায় রয়েছে প্রেম', 'এই যে সম্মুখে প্রেম মানসমোহন', প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিতেও ঐ

একই রীতির অনুসরণ। এই প্রেমসঙ্গীতে অকৃত্রিমতা আছে, কিন্তু মৌলিকতা নেই। এখানকার প্রকৃতিবিষয়ক সঙ্গীতগুলি কবির হৃদয়-রসে জারিত নয়।

২৩নং ও ২৪নং সঙ্গীতে ঝড়ের যে বর্ণনা আছে, তা নিতান্তই সাংবাদিকের বর্ণনা। ২৯ সংখ্যক সঙ্গীতে সমুদ্র-বর্ণনা, ৩৩ সংখ্যক সঙ্গীতে হিমালয়-বর্ণনা, ৬৫, ৬৬, ৬৭ সংখ্যক সঙ্গীতে অরণ্য-বর্ণনা একই জাতীয় বর্ণনা। যা কবির স্বাতন্ত্র্য, তা হ'ল কবির বাস্তব-ধর্মিতা, এবং ভাষার অভিনবত্ব। চলতি ও গ্রাম্য শব্দসম্ভারে সাজিয়ে কবি এই কবিতাগুলিকে প্রচলিত পেশাদারী সাহিত্য থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছেন। কিন্তু এই খুঁটিনাটি বর্ণনা ক'রতে ক'রতে কবি যখন লেখেন—

মানুষের ব্যবহারে
জ্বালায়েছে বারে বারে,
চোটে গিয়ে নির্জনেতে
করেছি গমন,
সেখানে প্রকৃতি এসে
সম্মুখে দাঁড়ায়ে হেসে
প্রেমভরে দিয়েছেন
গাঢ় আলিঙ্গন,
তাঁর প্রেমে মগ্ন হ'য়ে
দ্রবীভূত প্রায় র'য়ে
করি বটে কিছুদিন
আনন্দে যাপন,
পুরে ভাল নাহি লাগে,
কেবলই মনে যাগে
প্রিয়তম মানুষের
মোহন আনন।

তখন তিনি তাঁর কাব্য-জীবনের আংশিক সত্য তুলে ধরেন। ৯ সংখ্যক সঙ্গীতে তিনি গেয়েছেন:

প্রণয় করেছি আমি
প্রকৃতি রমণী সনে,

যাহার লাবণ্য ছটা
মোহিত করেছে মনে ;

* * *

আমার মতন লোকে
পূর্ণ কোরে সে আলোকে
সেই-রূপে দেখা দাও
হইয়া সদয়।

কবি বিহারীলালের কাব্যে প্রকৃতি সেই পূর্ণ আলোকে কি আদৌ দেখা দিয়েছে? কারণ এই দিব্যদর্শন ব্যতীত বাংলা গীতিকবিতায় প্রকৃতি-সম্ভোগ পূর্ণ হ'তে পারে না। 'সঙ্গীত শতকে' তার জন্য আর্তি আছে, কিন্তু একাত্মতা নেই। কারণ সেখানে বিস্ময়বোধই বড়।

আহা কি প্রকাণ্ড কাণ্ড
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপার।
অমেয় অনন্ত ব্যোম
অসীম বিস্তার ঃ (৮৫ সংখ্যক)

অপরিচিত ব্যক্তি আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। তার সঙ্গে প্রণয় করা বা একাত্ম হওয়া দুষ্কর।

॥ ৩ ॥

১৮৭০ সাল কবির জীবনে একটি স্মরণীয় বৎসর, সুবর্ণ বর্ষও বলা যায়। এই বৎসর কবির বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গ সন্দর্শন, ও প্রেম প্রবাহিনী প্রকাশিত হয়। বস্তুত এই তিনখানি কাব্য বিভিন্ন নামে প্রকাশিত হ'লেও একই কাব্যের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ। বা কবি একই বক্তব্য একই ভাষায় তিনখানি কাব্যে পরিবেশন করেছেন। আঙ্গিকটি আয়ত্ব করেছেন, কিন্তু সারদা-মঙ্গলের ভাব-জগতে এখনও প্রবেশ করতে পারেন নি। সাধারণতঃ একটি বক্তব্য মাত্র কবি বা শিল্পী সারাজীবনে ফুটিয়ে তুলেন। এবং গ্রন্থভেদে সেই বক্তব্য ধীরে ধীরে পরিষ্কার হ'য়ে ওঠে, স্ফুটতর ও অর্থধনী হ'য়ে ওঠে।

নিসর্গ সন্দর্শনে কবি প্রকৃতিকে বিবিধ রূপের মধ্য থেকে আস্বাদন ক'রতে চেয়েছেন। এখানে সেই আস্বাদন জনিত আনন্দ একমাত্র অনুভূতি

নয়। কোথাও বিস্ময়বোধ, (সমুদ্র দর্শন—একি, এ প্রকাণ্ড কাণ্ড সম্মুখে আমার), কোথাও উৎকণ্ঠাবোধ দেখা দিয়েছে। প্রকৃতির বিভিন্ন রূপকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখেছেন, এক ক'রে দেখেন নি। এই এক ক'রে দেখার তাঁর ক্ষমতা ছিল কি?

এই তিনখানি কাব্যের মধ্যে নিসর্গ সন্দর্শন প্রথমে লিখিত। "এ কাব্যের তৃতীয় ও চতুর্থ-সর্গ ১২৭০ সালে, প্রথম ও দ্বিতীয়-সর্গ ১২৭২ সালে, এবং পঞ্চম-সর্গ ১২৭৪ সালে লিখিত হয়।"

নিসর্গ-সন্দর্শনের কোন কোন সর্গ তাই সঙ্গীত শতকের বর্ধিত রূপ মাত্র। এবং সঙ্গীত-শতকের মতই কেন্দ্রীয় ভাবনাবিরহিত।

বঙ্গসুন্দরীতে দ্বিতীয় সর্গে নারী বন্দনা শেষ ক'রে কবি সুরবালা, চিরপরাধিনী, করুণাসুন্দরী, বিষাদিনী, প্রিয়সখী, বিরহিনী, প্রিয়তমা, অভাগিনী প্রভৃতি বিবিধ সর্গে একাধিক রমণীর স্তুতি গেয়েছেন। তিনি এক রমণীর বিচিত্র রূপ দেখেন নি। তিনি বিচিত্র রূপিনীর সন্ধান পান নি; বিবিধ রূপিনীর সন্ধান পেয়েছেন। প্রেম-প্রবাহিনী এই প্রবাহেরই নিশ্চল জলাশয়। বহমানতা এখানে অনুপস্থিত। সর্গ ভেদে কবি যে বিষাদ-সঙ্গীত গেয়েছেন, তার মূল কল্পনা 'বঙ্গসুন্দরী'রই অনুরূপ।

এঁকে দিল বিশ্বময় তোমার স্বরূপ,
আমারো চক্ষেতে তাহা ধরিল এরূপ
যে,—কি জলে, স্থলে, শূন্যে যে দিকেতে চাই,
বিরাজিত তব ছবি দেখিবারে পাই।

বঙ্গ-সুন্দরীর নারী-বন্দনার সঙ্গে তার কোন পার্থক্য নেই।

॥ ৪ ॥

সারদামঙ্গল তাঁর সমগ্র কাব্য-প্রয়াসের চরিতার্থতা। সারদামঙ্গলের দুরূহতা মীমাংসার জন্য 'সাধের আসন' লিখিত। কিন্তু টীকা চিরকালই মূল অপেক্ষা জটিল হয়। এ ক্ষেত্রে সাধের আসন টীকার সেই কুলবৈশিষ্ট্য সযত্নে রক্ষা করেছে।

সারদামঙ্গল কাব্যে কবি তাঁর কাব্যলক্ষ্মীকে, তথা সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে বিচিত্রতর রূপে দেখবার চেষ্টা করেছেন। প্রেম ও ভক্তি-একই ব্যক্তির উদ্দেশ্যে উৎসারিত হয়েছে।

সারদামঙ্গল পাঁচ সর্গে বিভক্ত। এখানে কবির আশ্রয় একটি কেন্দ্রীয় ঘটনা। অপরাপর কাব্যে কোন কেন্দ্রীয় ঘটনা নেই। ঐ সব কাব্যকে সুসংবদ্ধ রেখেছে কেন্দ্রীয় মন, সে মন কবির; কখনও জ্ঞাতারূপে যথা বঙ্গ-সুন্দরী, প্রেমপ্রবাহিনী; কখনও দ্রষ্টারূপে, যথা নিসর্গ-সন্দর্শন। 'সারদায়' কবি একটি আখ্যায়িকা নিমন্ত্রণ করেছেন; কিন্তু নির্ভর করেছেন এখানেও আপন হৃদয়-অনুভূতিরই উপর। কাব্যের আখ্যানাংশ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গেই ফুরিয়ে গেছে—ইতিমধ্যেই কবি বাল্মীকির কবিমানসে করুণা-রূপিনী সরস্বতীর আবির্ভাব বর্ণনা শেষ করেছেন। স্থূল কাহিনী ফুরিয়ে গেছে; কিন্তু মানসিক ঘটনা বা সূক্ষ্ম কাহিনী ব'লে যদি কিছু থাকে, তা শেষ হয় নি। দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ সর্গে কাব্যলক্ষ্মী তথা সৌন্দর্যলক্ষ্মীর বিরহজনিত বেদনা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব বর্ণিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পঞ্চম সর্গে হিমালয়ের উদার প্রশান্তির মধ্যে দ্বন্দ্বক্ষত কবিচিত্ত আনন্দ উপলব্ধি করেছে; অর্থাৎ প্রকৃতির উদার সত্তার মধ্যে কবির ধ্যানের ধন সমাধিলাভ করেছে। এইভাবে কবির ব্যক্তিগত সৌন্দর্যবোধ ও নারীবন্দনা বিশ্বসৌন্দর্যবোধে ও বিশ্ব নারী-বন্দনায় পরিণতি লাভ করেছে। বঙ্গ-সুন্দরীর 'বিবিধ রূপিনী' এখানে বিচিত্র রূপিনী হ'য়ে সম্পূর্ণতা পেয়েছে।

কিন্তু সাধের আসন এগুতে পারেনি; পিছু হটেছে কিনা, বলা শক্ত। একই জপের মালা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাম জপ করলে এগুনো-পিছানো বুঝা কষ্টকর; কারণ সত্যিই ত তার অগ্রগতি-পশ্চাদ্‌গতি নেই।

সাধের আসন লিখে একটি গুরুতর ক্ষতি কবি নিজেকে নিজে করলেন।

ধেয়াই কাহারে, দেবি, নিজে আমি জানিনে!
কবি-গুরু বাল্মীকির ধ্যান-ধনে চিনি নে।

*   *

কেবল হৃদয়ে দেখি, দেখাইতে পারিনে!

এ কথা বলার পরে দুরূহতার অভিযোগকারীদের মুখ আটকাবেন কি ক'রে? কিন্তু সারদামঙ্গলে কবি কি সত্যিই জানতেন না যে, তিনি কার ধ্যান করছেন? যদি তা না-ই জানতেন, তবে বিচিত্ররূপে তাকে দেখেও কাব্যের মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় ভাব-মেরুদণ্ড রক্ষা করলেন কি ক'রে?

আজি সে সকলি মম
মায়ায় লহরী সম
আনন্দ-সাগর-মাঝে খেলিয়া বেড়ায়।
দাঁড়াও হৃদয়েশ্বরী
ত্রিভুবন আলো করি,
দু'নয়ন ভরি ভরি দেখিব তোমায়।

বিশ্ব থেকে স্খলিত না হ'য়েও তিনি হৃদয়েশ্বরী, এবং তাঁর আলোকে ত্রিভুবন আলোকিত। এরই উদ্দেশ্যে কবির যত স্তব। সাধের আসন সারদামঙ্গলের উপসংহার নয়, টীকা। টীকা চিরকালই বিভ্রান্ত; এবং মূলগ্রন্থ অপেক্ষা দুরূহ।

॥ ৫ ॥

এ ছাড়া কবির কিছু খণ্ড কবিতা এবং বাউল বিংশতি প্রকাশিত হ'য়েছিল।

খণ্ড কবিতার মধ্য মায়াদেবী, শরৎকাল, নিশীথ সঙ্গীত ও নিশান্ত সঙ্গীত, ধূমকেতু, দেবরাণী, নিসর্গ সঙ্গীত ও গোধূলি উল্লেখযোগ্য।

মায়াদেবী তাঁর বঙ্গসুন্দরী-প্রেমপ্রবাহিনী-সারদামঙ্গল ও সাধের আসনের মূল বক্তব্যের উপর আর একটি নতুন সংযোজন।

কর, দেব! পুন শিশু কর মোরে,
আদরে মায়ের গলা ধোরে ধোরে,
দেখিব তাঁহার স্নেহের বয়ানে
তোমার মঙ্গল মুখ।

* * *

ধরি ধরি করি, ধরিতে না পারি,
চারিদিকে আমি কি যেন নেহারি।

প্রভাত-সঙ্গীত, সন্ধ্যা-সঙ্গীত, নিশীথ-সঙ্গীত, নিশান্ত-সঙ্গীত—এই চারি অধ্যায়ে 'শরৎকাল' লিখিত। এ যেন 'নিসর্গ সন্দর্শন' আর 'বঙ্গসুন্দরী' একত্রে লিখিত!

'ধূমকেতু' একটু দলছাড়া; এখানে নিসর্গ-রূপ-সম্ভোগসহ কবির মানব-প্রীতি স্ফূর্ত হয়েছে। দেবরাণী ক্ষুদ্রাকারে সারদামঙ্গল।

কবিতা ও সঙ্গীত পর্যায়ের খণ্ড কবিতাগুলি একই রসে আপ্লুত।

কবির 'বাউল বিংশতি' নামেই মাত্র বাউল। যথার্থ বাউল সঙ্গীতের পরিভাষা এখানে ব্যবহৃত হয়নি; ব্যবহৃত হয়েছে অকৃত্রিম বিহারীলালের কাব্যভাষা। দুই একটি বাউল শব্দ যে নেই, তা নয়; কিন্তু প্রধানতঃ নয়। কোন কোন গান আদৌ বাউল গান নয়; তারা সঙ্গীত শতক থেকে পথ ভুলে এখানে এসে জড়ো হয়েছে। এগুলি প্রকারান্তরে সারদামঙ্গলের গান। কবি বিহারীলাল সারদামঙ্গলের মত অবস্থা কোনদিন কি কাটাতে পেরেছেন?

দার্শনিক ভিত্তি

বিহারীলাল তাঁর সমগ্র কাব্যজীবনে একটি কথা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন—তখনকার ঢক্কা-নিনাদিত কাব্য-মণ্ডপে সে বিনম্র ভজন কারো মনোযোগ আকর্ষণ করেনি।

স্বপ্নদর্শন ও বন্ধুবিয়োগে প্রচলিত অবস্থার প্রতি অসন্তোষ আছে, অনাস্থা আছে; কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। নিসর্গ-সন্দর্শন ও বঙ্গসুন্দরী উভয়ে মিলে দুই দিক থেকে একটি শিখা জ্বালিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। নিসর্গ সন্দর্শনে নানা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বক্ষে (সৌন্দর্যের মধ্যে শুধু সুন্দর দৃশ্য নয়, ভয়ঙ্করও আছে) প্রকৃতির সাধারণ মূর্তিটি চিনে নেবার চেষ্টা আছে; আর বঙ্গসুন্দরীতে নানা নারীর সমাবেশে কবি নিত্যকালের নারীকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। এ এক অভিনব নওরোজের মেলা! নানান নারীকে কবি সংসারের তুচ্ছতার মধ্যে, দৈনন্দিন গৃহকর্মের মধ্যে উপস্থাপিত ক'রে তার চিরকালের অনিত্যরূপ সম্ভোগ করেছেন।

পদ্মিনী উপাখ্যানে রঙ্গলাল অসাধারণ রমণীকে দেখেছেন; সংযুক্তা কবিতায় বঙ্কিমও তাই করেছেন। মাইকেলের পুরাণ-পরিক্রমায় একই প্রবণতা। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের পৌরাণিক-নবীন (বা আধুনিক) জগৎ-পরিক্রমা একই উদ্দেশ্যমূলক। বিহারীলাল প্রথমেই বর্তমান জগতে, চারিপার্শ্বের জগতে তাঁর নায়িকাকে অন্বেষণ ক'রে ফিরেছেন। প্রত্যক্ষজ্ঞানে যাকে পেয়েছেন, কল্পনা বলে তাকেই পরে তিনি 'idealised' করবেন।

এখানে হয়ত তিনি কঁৎ-এর নারী-বন্দনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কঁৎএর নারী-বন্দনায় বৈধ-প্রেমের চরম মূল্য স্বীকৃত। বঙ্গসুন্দরীতে গৃহাঙ্গনা ও কুলনারীর মুখে নায়িকার ছবি খুঁজেছেন। কঁৎ-এর নারী-বন্দনা আপন প্রণয়িণীর

উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। কঁৎ-প্রণয়িনী Clotilde-কে নিয়ে কবিবন্ধু কৃষ্ণকমল একটি গল্প খাড়া করেছিলেন। বিহারীলাল তা পড়েছিলেন। "বিহারী কঁতের বিষয় যাহা কিছু পড়িয়াছিলেন, তাহা বড়ই সমাদরপূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্গসুন্দরীর মধ্যে কঁতের ভাব অনেক স্থলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।"[৪] কৃষ্ণকমল বলেছিলেন, "রামকমল, কবি বিহারীলাল, জজ দ্বারকানাথ, আমি Positivist, আমি নাস্তিক।"[৫] বিহারীলাল এক সময়ে Positivist ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কঁৎ-এর প্রভাব তাঁর ওপর দীর্ঘস্থায়ী হ'তে পারে নি।

কঁৎ নারী-মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন; তখনকার নারী-মুক্তি আন্দোলনে সে বন্দনা প্রভূত শক্তি সঞ্চার করেছিল। কিন্তু আত্মমুখীন কাব্যে এই বন্দনা অপ্রয়োজনীয়। এই অন্তর-জগতে প্রত্যক্ষ জগতের ভাষার প্রবেশাধিকার নেই। সারদামঙ্গলে কবি বর্তমান জগতের নয়, পুরাণের নারীকে চিরকালের নারী করলেন। খৃষ্টীয় মিষ্টিক যখন বলেন, "I will draw near to Thee in silence and will uncover Thy feet, that it may please Thee to unite me to Thyself, making my soul Thy bride! I will rejoice in nothing till I am in thine arms."—তখন তিনি নায়িকা। বিহারীলালের এ পথ নয়।

ক্রবাদুর কামনা করেছেন বিবাহিতা নারীকে; তাঁর প্রেম পরকীয়া স্থফী সাধকের সাধনা-'মাশুকে'র সঙ্গে 'আসিকে'র আশনাই।

বৈষ্ণব কাব্যে ভক্ত নিজেকে নারী রূপে কল্পনা করেছেন; তাঁর প্রধান ভাবনাই নায়কের জন্য ভাবনা; নায়িকার জন্য নয়।

বিহারীলাল এইরকম সখীভাবে সাধনা করেন নি। তিনি ক্রবাদুর প্রেমের বাংলা ভাষ্যকার; তাঁর পথ ভারতীয় পুরাণের দুঃসাহসী প্রেমের পথ, এবং তাঁর নিগূঢ় আত্মিক অন্তিম মিল তন্ত্র-ভাবনার সঙ্গেই।

শাক্তানন্দ তরঙ্গিনীতে প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে:

"ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণা সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে।"[৬]

আনন্দলহরীতে বলা হ'ল:

"কবীন্দ্রানাং চেতঃ কমলবন বালাতপরুচিং,
ভজন্তে যে সন্তঃ কতিচিদরুণামেব ভবতীম্।

বিরিঞ্চি প্রেয়স্যাস্তরুণতর শৃঙ্গারলহরী—
গভীরাভির্ব্বাগ্‌ভির্বদধতি সভারঞ্জনমমী।"[৭]

বিহারীলাল এই অভিজ্ঞতার কথা ব'লে সভা-রঞ্জনে সমর্থ হয়েছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু তাঁর মূল কল্পনা-উৎস যে এখানেই, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কঁতের চক্ষে নারী বিচিত্র শক্তির উৎস, সর্বশক্তির মূলাধার নয়।

বিচিত্র শক্তি পর্যন্ত প্রত্যক্ষবাদের সঙ্গে খাপ খায়; কিন্তু সর্বশক্তি বা অনন্ত শক্তি তার আওতার বাইরে।

॥ ২ ॥

ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে পরিচিতি, ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের উপরে আস্থা ব্যতীত এই চেতনা উপজাত হতে পারে না।

"আমি হিন্দু, যেহেতু হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। অতি সৌভাগ্য-ক্রমে অন্য ধর্ম গ্রহণ করি নাই, করিবও না। আমার বাটীতে বিগ্রহ আছেন। নিত্য তাঁহার পূজা-ভোগ হইয়া থাকে। তাঁহাকে লইয়া আমরা সপরিবারে সুখে আছি। বিনা চেষ্টায় আপনা আপনি সকলের মনে একটি নিঃস্বার্থ ভক্তিভাব বিরাজ করিতেছে।"[৮]

"দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিহারীলালকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন; দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ভ্রাতৃভাব ছিল। সে পরিবারের মহিলারাও বিহারীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।"[৯]

দুটি তথ্যই বিহারীলালের মানস-প্রকৃতি বিশ্লেষণে প্রয়োজন। কৃষ্ণ-কমলের মন্তব্য একমাত্র সহায় হ'তে পারে না। তিনি যে জগতে প্রবেশ করেছেন, যে জগতের আদিম অধিবাসীর সম্মান তাঁর; কিন্তু সার্থকতম শিল্পীর সম্মান তাঁর নয়। তার জন্য প্রয়োজন মহত্তর প্রতিভার আবির্ভাব।

॥ ৩ ॥

কবির প্রকৃতিবোধ সরস্বতী-কল্পনার সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে রয়েছে—কারণ সরস্বতী বিশ্বসৃষ্টির উৎস-মূলে আপন বেদী রচনা করেছেন।

কবির প্রকৃতিবোধ হঠাৎ অর্জিত চেতনা নয়। তাঁর নিসর্গ সন্দর্শনে প্রকৃতিকে বুঝবার জন্য একটা আকুলতা ছিল। তাঁর অবোধবন্ধু পত্রিকায় পৌল ও বর্জিনী গল্পে এই আকুলতার গদ্য রূপ ছিল: "তাহারা প্রকৃতির

নিয়মে সময় নিরূপন করিত। বৃক্ষের ছায়া দেখিয়া তাহারা বেলা নির্ণয় করিত, তদীয় ফলমূল দেখিয়া ঋতু নির্ণয় করিত, এবং কতবার ফল হইয়াছে সেই সংখ্যা ধরিয়া বৎসর গণনা করিত।

* * ফলত তাহাদের কথাবার্তা শুনিলে মনে হইত যে তাহারা যেন বনদেবতা; তাহাদের আয়ু যেন তরুগণের সঙ্গে সংমেলিত আছে।"[১০] কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের "দুরাকাঙ্খের বৃথাভ্রমণ" উপন্যাসে বর্ণিত প্রকৃতি-সম্ভোগের সঙ্গে বিহারীলালের বঙ্গসুন্দরীর প্রকৃতি-সম্ভোগের মিল আছে।

"আমি এমন স্থান চিরকাল বড় ভালবাসিতাম। শৈশবেই আমার এমন স্থানের পল্লবজালে আবৃত হইয়া শুইয়া থাকিতে, ঘুঘুর বিষাদজনক কলরব শ্রবণ করিতে এবং বায়ুর তীক্ষ্ণ হিল্লোলে স্পৃষ্ট হইতে বড় অভিলাষ হইত। আমার এমন স্থান মনে করিয়াই নয়ন জলার্দ্র হইত।"[১১]

"পুলিন্দদিগের সহিত মৃগয়ায় যাইতাম, নিকটবর্তী হ্রদে নৌকা বাহন দ্বারা মৎস্য ধরিতাম, কুম্ভীরের ন্যায় জলে সন্তরণ করিতাম, বরাহের অনুসরণে ন্যাগ্রোধ বৃক্ষের কোটরে বিলীন হইতাম, তথাকার ভুজঙ্গমের সবিষ মুখ হস্ত দ্বারা নিপীড়ন পূর্বক অতিদূরে নিক্ষেপ করিতাম, উড্ডীন ময়ূরের প্রতি শরক্ষেপ পূর্বক ভূতলে পাতিত করিতাম, পর্বত পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক জল প্রপাতের কল্লোল শব্দ শুনিতে শুনিতে মৃগয়ার যোগ্য পশু অন্বেষণ করিতাম, সরল নামক দেবদারুর টুনার দিগন্ত বিস্তৃত সৌরভে আমোদিত হইয়া বনে বিচরণ করিতাম এবং নিহত পশুর ভার স্কন্ধে বহন পূর্বক ক্ষুদ্র শৈলের শাদ্বলময় পার্শ্ব হইতে অবতীর্ণ হইতাম।"[১২] আর একটি গ্রন্থের নিসর্গ-চিন্তার সঙ্গে বিহারীলালের আদিপর্বের নিসর্গ চিন্তার মিল আছে। গ্রন্থটির নাম হল 'রাসেলাস'—লেখক জনসন; অনুবাদক (?) হলেন তারাশঙ্কর তর্করত্ন। সেখানেও অভ্যস্ত জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা থেকে প্রকৃতির স্বর্গরাজ্যে পলায়ন আছে। "আমি স্বচক্ষে পৃথিবী না দেখিয়া ক্ষান্ত হইব না।"[১৩] রাখালদের কুটির দেখে বলছে: "কবিগণ মোহিত হইয়া যাহার গুণ কীর্তন করিয়া থাকেন।" তারপর রাজকুমারী বললেন, "ইহলোকে সুখের পথ মনোনীত করা আমার আর গুরুতর কর্ম বলিয়া বোধ হইতেছে না।"

ঠিক এই কথাগুলিই অবোধবন্ধুতে প্রকাশিত 'হতাশ যুবক' নামক কথিকায় বলা হয়েছিল, "প্রয়োজন হইলে অপরিজ্ঞাত, ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক

পশুযূথ সমাকুল নিবিড় বন মধ্যে একাকীই সহাস্য বদনে প্রবেশ করিয়াছি; অলক্ষ্য পার তীব্র বেগ মহান সরিৎপ্রবাহ অনায়াসেই সন্তরণ করিয়াছি; ভেলামাত্র অবলম্বন করিয়া ঝঞ্ঝাক্ষোভিত নীরনিধি বক্ষে অক্ষুন্ন মনে ভাসমান হইয়াছি।"[১৪]

বঙ্গসুন্দরীও নিসর্গ-সন্দর্শনের নিসর্গ-চেতনা এই পর্যায়ের। কিন্তু সারদা-মঙ্গলের প্রকৃতি এত প্রত্যক্ষ নয়, বা আদৌ প্রত্যক্ষ নয়।

জ্যোতির প্রবাহ মাঝে
বিশ্ববিমোহিনী রাজে
কে তুমি লাবণ্য-লতা মূর্তি মধুরিমা।
মৃদু মৃদু হাসি হাসি
বিলাও অমৃত রাশি,
আলোয় করেছ আলো প্রেমের প্রতিমা। (৩য় সর্গ)

সারদার মধ্যে সমস্ত চরাচর ও সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি লুপ্ত হ'য়ে একাকার হয়েছে। বঙ্গসুন্দরীর নিসর্গ-চিন্তায় এই চৈতন্য সম্ভাবিত হয়নি।

"He never can be a Friend to the Human Race who is the Preacher of Natural Morality or Natural Religion."[১৫] এই উক্তি কবি ব্লেকের মত তাঁর মুখ থেকেও বেরুতে পারত। তিনি প্রকৃতি-বোধের নতুন যুগ পত্তন করলেন; কিন্তু প্রকৃতি তাঁর হাতে চূড়ান্ত রূপ পেল না। যত বড় তিনি যোগী, তিনি কবি নন তত বড়; যত বড় তিনি দার্শনিক, শিল্পী নন তত বড়।

বাংলাকাব্যে প্রকৃতি তাঁরই অন্তঃজগতে ভূমিষ্ঠ হয়েছে; এবং তখনই সে সম্পূর্ণ হল; ক্রোচের সেই উক্তি "A landscape is a state of mind", তার সঙ্গে কান্টের এই উক্তির সম্পূর্ণ মিল খুঁজে পাই, "Beauty is a state of mind, a satisfaction, which is purely subjective."

ধ্বন্যালোকে আর একটু এগিয়ে একই কথা বলা হোল, "ভাবান অচেতনান অপি চেতনবৎ চেতনান অচেতনবৎ। ব্যবহারয়তি যথেষ্টং সুকবিঃ কাব্যে স্বতন্ত্রতয়া।" (৩।৪৩ বৃত্তি, ২২২)

এই হল দ্বৈতাদ্বৈতবাদ।

নারী ও প্রকৃতি—দুই চিন্তাতেই কবি একই তত্ত্বে এসে উপনীত হয়েছেন। ভারতীয় তত্ত্বশাস্ত্রে নারী ও প্রকৃতি সমার্থক।

কাব্য-বিচার

যোগীর বক্তব্যে সব সময় পারম্পর্য থাকে না; বিহারীলালেও পারম্পর্য থাকে নি। এর থেকে কেউ কেউ বলতে পারেন যে, তিনি ত সৃষ্টি করতে বসেন নি, ব্যাখ্যা করতে বসেছেন। এক কথা হাজার ভাবে বলা—এই ত তত্ত্বজ্ঞানীর কাজ। বিহারীলাল সেই তত্ত্বজ্ঞানী। কিন্তু বিহারীলালের সমগ্র কাব্যে এই অভিযোগের অজস্র জবাব আছে।

কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর সারদামঙ্গল ও সাধের আসন কাব্যদ্বয় প্রথম সর্গেই পরিসমাপ্তি লাভ করতে পারত। কিন্তু তাঁরা প্রথমেই ভুল করেছেন এই আশা ক'রে যে, এখানে কাহিনীর একটি বিকাশ দেখা যাবে। দু'টিতেই আখ্যায়িকা আছে, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে।—সাধের আসনে আদৌ আছে কিনা, তা জোর ক'রে বলা কষ্টকর। আর সাধের আসন ঠিক পৃথক কাব্যও নয়; সাধের আসন সারদামঙ্গলের টীকা। এই ধরণের অভিযোগ শেলীর, কীটসের ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের কোন কোন কাব্যের বিরুদ্ধে কি উত্থাপিত হয় নি? ব্লেকের প্রসঙ্গ আর উত্থাপন করছি না। তবু সে কাব্যগুলির কবিত্ব বাতিল হ'য়ে যায় নি। আর অধিকন্তু বাংলাদেশের কাব্য-ইতিহাসে এ-কাব্যের কোন পূর্বতন নজির নেই।

Monologue সব সময়ই অসংলগ্ন; বর্তমান যুগের 'stream of consciousness' ব'লে যে বিশেষ কথাটি প্রচলিত ও প্রচারিত হয়েছে, বিহারীলালের সাহিত্যে তার আদিতম উদাহরণ।

বাংলাকাব্যের এতদিনকার বিন্যাস তিনি যেন ইচ্ছা ক'রেই শিথিল ক'রে দিলেন। একথা অস্বীকার করবে কে যে হেমচন্দ্র তাঁর তুলনায় বহুগুণ সংযত; এমন কি, নবীনচন্দ্র পর্যন্ত! এঁদের সংযম তাঁর অনুসরণীয় আদর্শ ছিল না। খণ্ড কবিতা পরস্পর সংলগ্ন হ'য়ে একটা বুনুনী (pattern) তৈরি করে। গীতি-কাব্যের কবিতাগুলিকে কবি বিশেষ মনোযোগ দিয়েই পরপর সাজিয়ে থাকেন। কোন একটি বিশেষ স্থানে বসলে সমগ্র কাব্যের অর্থ পরিষ্কার হ'য়ে ওঠে; অন্যত্র বসলে তা হয় না।

বিহারীলাল তাঁর কাব্যে কবিতা-সজ্জা এ-ভাবে করেন নি। প্রথমতঃ তাঁর কাব্যে একটা কাহিনী সূত্রাকারে আছে; দ্বিতীয়তঃ তাঁর যুগে খণ্ড কবিতাও সর্গবদ্ধ হত। কেউ কেউ বলেছেন, "বস্তুতঃ যা খণ্ডকবিতার সমষ্টি তাদের সর্গে-বদ্ধ করবার আকাঙ্ক্ষা মস্ত একটি যুগ-প্রভাব—সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি মধুসূদনের প্রভাব।" কথাটির গুরুত্ব আছে।

এখন কথা হচ্ছে, মাইকেল কেন ব্রজাঙ্গনায় ও বীরাঙ্গনায় সর্গ-বিভাগ করলেন? তাঁর ব্রজাঙ্গনার ১ম সর্গ শুধু প্রকাশিত হয়েছিল; বীরাঙ্গনার হয়েছিল ১১টি সর্গ। প্রকাশকের বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় যে ব্রজাঙ্গনা আরও অন্ততঃ দুই-তিনটি সর্গে সম্পূর্ণ হ'ত—সম্মিলন, সম্ভোগ ইত্যাদি। বীরাঙ্গনা ২১ সর্গে সম্পূর্ণ করার সাধ কবির ছিল। কিন্তু কবি চতুর্দশপদী কবিতাবলী সর্গ-ভেদে সাজান নি! তার কারণ কি? বিষয় যদি এক জাতীয় বা সমভাবাপন্ন না হয়, তাহলে সর্গবদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। ব্রজাঙ্গনার কবিতাবলীকে মাইকেল বলেছেন, ode; কিন্তু তবু সেগুলিকে সর্গের কুঠুরিতে পুরে পরিবেশন করলেন। মহাকাব্যের যুগে সর্গ-কামনা (স্বর্গ-কামনাও বটে—কাব্যের স্বর্গ) ছিল এমনই প্রবল। ওবিদকেও Metamorphoses ও Heroides কাব্যদ্বয়কে সর্গবিদ্ধ করতে হয়েছিল—ঐ এক বিষয় বা ভাবনা-আনুগত্যের জন্য। বিহারীলালের সঙ্গীত-শতক নানা ভাবনার সঙ্গীত-সমষ্টি; সেগুলিকে সঙ্গত কারণেই তিনি সর্গবদ্ধ করেন নি। কিন্তু সারদামঙ্গল ও সাধের আসনকে সর্গবদ্ধ করেছেন; তাঁর বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গ সন্দর্শন, প্রেম প্রবাহিনী, এমন কি বন্ধুবিয়োগ কাব্য পর্যন্ত সর্গবদ্ধ। এক সারদামঙ্গল ব্যতীত কোন কাব্যই এক ঘটনা-ভিত্তিক নয়। শেষ পর্যন্তও সারদামঙ্গলে সেই ঘটনার শৃঙ্খল টিকে গেছে; ছিঁড়ে যায় নি, শিথিল হয়েছে মাত্র।

"প্রকৃতপক্ষে সারদামঙ্গল একটি সমগ্র কাব্য নহে, তাহাকে কতক-গুলি কবিতার সমষ্টি রূপে দেখিলে তাহার অর্থবোধ হইতে কষ্ট হয় না।" (আধুনিক সাহিত্য-বিহারীলাল—রবীন্দ্রনাথ)

এ খণ্ড কবিতার জাত আলাদা; বাংলা কাব্যে এ জাতীয় খণ্ড কবিতা পূর্বে ছিল না। এরা আত্মমুখীন কাব্যের প্রাগৈতিহাসিক যুগের উপল খণ্ড। আর প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন সৃষ্টিই বা মসৃণ?

নবীনচন্দ্র মার্জিত ; হেমচন্দ্র মার্জিততর। তাঁদের সাফল্যে বিহারীলালের ঈর্ষা ছিল না। তাঁর জগৎ এবং তাঁর সৃষ্টি আলাদা ; মার্জিত নয়, বরং উবড়ো-খেবড়ো, অসমতল ও স্থূল।

কিন্তু একবার যদি এই জগতকে স্বীকার ক'রে নিই, তখন এই স্থূল অমসৃণ সৃষ্টির সৌন্দর্যে আমরা আকৃষ্ট ও বিমুগ্ধ না হ'য়ে পারবো না।

বিহারীলালের খণ্ড কবিতা যেন এক একটি ঋক্। কবির নিসর্গ-প্রীতি ও আকাশ-প্রীতি নিতান্ত আকস্মিক নয়। তাঁর নব্য ঋক্‌সমূহও ঋক্ষমণ্ডলের উদ্দেশ্যেই উৎসর্গীকৃত। সমুদ্র, পাহাড়, অরণ্য অপেক্ষা ঋক্ষ-মণ্ডলই প্রাধান্য পেয়েছে। অথচ 'অন্তরীক্ষের কবি' বলা হ'ল হেমচন্দ্রকে। ঋক্ আদিকাব্য ; বিহারীলাল আত্মমুখীন কবিতার আদি কবি।

তাঁর খণ্ড কবিতায় অখণ্ড ভাব আর খণ্ড চিত্রের সমাহার। চিত্রগুলি খণ্ড, কিন্তু মনোহারী। সমালোচক বলেছেন, অসংলগ্ন। য়্যালবাম কবে না অসংলগ্ন ?

বিহারীলালের য়্যালবাম থেকে আমরা কয়েকটি চিত্র উপহার দিচ্ছি—অবশ্য কালো কালির 'রিবণ' দিয়ে বেঁধে।

ফরফর নিশান চলেছে পোত শ্রেণী,
টলমল ঢলঢল, তরঙ্গ দোলায় ;
হাসিমুখী পরী সব আলুথালু বেণী,
নাচন্ত ঘোড়ায় চ'ড়ে যেন ছুটে যায়।
(নিসর্গ সন্দর্শন—২য় সর্গ)

হালি-গাথা ছায়াপথ; গোচ্ছা সেলিহার,
তোমার বিশাল বক্ষে সেজেছে উচিত ;
যেন এক নিরমল নির্ঝরের ধার,
সুবিস্তীর্ণ উপত্যকা বক্ষে প্রবাহিত। (ঐ—৪র্থ সর্গ)

ধরা অচেতনা হয়ে প'ড়ে ভূমিতলে,
ছিন্ন ভিন্ন কেশ-বেশ, বিকল, ভূষণ,
লাবণ্য মিলায়ে গেছে আনন-কমলে,
বুঝি আর দেহে এর নাহিক জীবন। (ঐ—৭ম সর্গ)

যে সময়ে কুরঙ্গিনীগণ,
সবিস্ময়ে মেলিয়ে নয়ন,
আমার যে দশা দেখে
কাছে এসে চেয়ে থেকে,
অশ্রুজল করিবে মোচন। —(বঙ্গ সুন্দরী—১ম সর্গ)

বিনে ওই মনোহারী
দেবদারু সারি সারি
দেদার চলিয়া গেছে কাতারে কাতার।
দূর দূর আলবালে,
কোলাকুলি ডালে ডালে,
পাতার মন্দির গাঁথা মাথায় সবার।
(সারদামঙ্গল—৪র্থ সর্গ)

শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঠেকে ঠেকে,
লম্ফে লম্ফে ঝেকে ঝেকে,
জেলের জালের মত হ'য়ে ছত্রাকার,
ঘুরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে ;
ফেনার আরশি ওড়ে,
উড়েছে মরাল যেন হাজার হাজার। (ঐ—৪র্থ স্বর্গ)

সিংহ দুটি শুয়ে তটে
আনন আবরি জটে,
মগন রয়েছে যেন আপনার ধ্যানে ;
আলসে তুলিছে হাই,
কা'কেও দৃকপাত নাই,
গ্রীবাভঙ্গে কদাচিৎ চায় নদী-পানে ! (ঐ—ঐ)

দেখিতে দেখিতে দেখ
কেবল অনল এক,
এক মাত্র মহাশিখা ওঠে নিরবধি ;
আগ্নেয় শিখর পরে

যেন ওঠে বেগ-ভরে
ভীষণ গগন-মুখী আগুনের নদী ! (ঐ—৫ম সর্গ)

নিথর সলিল পরি
ধীরে ধীরে চলে তরী,
দু-পাখা ছড়ায়ে পরী ভেসেছে আকাশে ;
মধুর মন্থর গতি,
চলিয়াছে গর্ভবতী
সম্পূর্ণ-যৌবনা সতী পতির সকাশে ! (শরৎকাল)

নৌকায় প্রদীপ জ্বলে,
তারকা ফুটেছে জলে,
জল-তলে ঝলমলে বিশাল মশাল ;
লুকান তপন-রেখা
ফের বুঝি যায় দেখা !
হারানো প্রণয় কেন এত লাগে ভাল। (ঐ)

কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চন্দ্রদ্বীপ
স্বভাবের সুধার প্রদীপ,
তেজস্বী মনের কাছে
স্নেহ যেন ফুটে আছে
হর্ষভরে করে দীপ্ দীপ্। (ধূমকেতু)

সহস্র-কেতকী-কুঞ্জ,
প্রফুল্ল চম্পক পুঞ্জ,
সোনার কদম্ব সব রসে রোমাঞ্চিত-কায় ;
উল্লাসে মাঠের কোলে
তৃণের তরঙ্গ দোলে,
কাশের চামর গুলি সোহাগে গড়িয়ে যায়। (সাধের আসন ৩য় সর্গ)

গন্ধবায়ু ঝুরু ঝুরু,
কাঁপে তরু রেখা-ভুরু
আরামে পৃথিবী দেবী এখনো ঘুমায় রে। (ঐ ৩য় সর্গ)

কে তোরা স্বর্গের মেয়ে
জ্যোৎস্না-সলিলে নেয়ে,
কিরণ-বসন পরি আলু করি কাল চুল,
নক্ষত্রের শিব গড়ি,
তান লয়ে মন্ত্র পড়ি,
অঞ্জলি পুরিয়া দিস্ প্রফুল্ল মন্দার ফুল? (ঐ-৫ম সর্গ)

কবি বলেছিলেন, "কেবল হৃদয়ে দেখি, দেখাইতে পারি নে।" এ-ই কি না-দেখার রূপ-বৃষ্টি? মাঝে মাঝে আমাদের দেশে পাঠক (সমালোচকেরা মাফ করবেন) কবির ভাষণের যাথার্থ্য বড় বেশি যান্ত্রিকভাবে দেখেন। হৃদয়ে দেখেও বিহারীলাল দেখাতে পারেন নি—একথা সত্য শুধু সমগ্রভাবে; বিচ্ছিন্নভাবে নয়। কবি বলেছেন,

না জানি কি ফুল দিয়া
গড়া, এ আমার হিয়া,
আপন সৌরভে কেন আপনি পাগল-প্রায়!

কবির হিয়া যে ফুল দিয়ে গড়া, এ বিষয়ে সন্দেহ কি? আমরা কয়েকটি হৃদয়জ কুসুম এখানে উৎকলিত করলাম। তার সুবাসে উন্মত্ত না হ'তে পারি; বিমুগ্ধ হ'তে বাধা কোথায়?

নবীন ভাষা

"সমসাময়িক কবিদিগের সহিত বিহারীলালের আর একটি প্রধান প্রভেদ তাঁহার ভাষা। ভাষার প্রতি আমাদের অনেক কবির কিয়ৎপরিমাণে অবহেলা আছে।"

আমাদের মতে শুধু প্রভেদ নয়, মৌলিক প্রভেদ।

বিহারীলালের কাব্য-ভাষা নিয়ে এখনও যথেষ্ট আলোচনা হয়নি।

বিহারীলালের কাব্য-ভাষার লক্ষ্য কি? এতদিনকার প্রচলিত কাব্য-ভাষার (পেশাদারী কাব্য-ভাষার) অবসান ঘটান? পরোক্ষ উদ্দেশ্য তাই। প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য কি? মাইকেল মহাকাব্য রচনার জন্য যে নৈর্ব্যক্তিক সাধারণ ভাষা তৈরী করেছিলেন, তার পরিবর্তে ব্যক্তিগত অ-সাধারণ ভাষা তৈরী করা। কারণ গীতিকবিতা ব্যক্তিগত, এবং অ-সাধারণ। নৈর্ব্যক্তিক ভাষায়

ব্যক্তিগত কথা বলা যায় না ; অলঙ্কৃত ভাষায় দেহের সৌন্দর্য বাড়ে, মনের খবর ধরা পড়ে না। চাই মনের ভাষা। মনের ভাষা কদাচিৎ মার্জিত। সেকালের কাব্য-ভাষা অতি মার্জিত। প্রচলিত কাব্য-ভাষার সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। হেম-নবীনের কাব্য-ভাষা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি ; মাইকেল ত তাঁর পূর্বসূরী। সংস্কৃত সাহিত্যের তিনি উৎসাহী পাঠক। তাঁর কাব্যে এইসব সাহিত্যের ভদ্র উন্নত অভিজাত ভাষা প্রাধান্য পেল না। অবহেলিত অবজ্ঞাত, অন্ত্যজ কথ্য ভাষা তাঁর কাব্য-ভাষার অস্থিপঞ্জর গঠন করল। যে ভাষা অতি সহজে আলাপ করা যায়, সে ভাষা সহৃদয় ভাষা। আড়ষ্ট পোষাকী ভাষা ছেড়ে সাবলীল কথ্য ভাষার সাহায্য নিলেন ! হৃদয়ের আবরণ-উন্মোচন-উৎসবে হৃদয়ের ভাষাই আমন্ত্রিত হল।

আমরা কাব্য পরম্পরায় তাঁর বিশিষ্ট শব্দের একটি তালিকা দিচ্ছি। এই সব শব্দ বারবার ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্ন কাব্যে। একটি শব্দ প্রথমে যে কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে, সে কাব্যেই শব্দটিকে প্রদর্শিত হয়েছে।

নিসর্গ সন্দর্শন—ঃ কাত্ হওয়া, খোঁচা, গাদা, চর্কা (চরকা), চাতর, চীচ্কার, চুর্মার (চুরমার), ছাতি (বুকের), ছিন্নেমো, জাহির, ঝকঝোকে, ঝটকা, ঝাকা, ঝাপোট, ঝালাপালা, ঠায়, ঠ্যাকা, ঠেকা, ঠেঁটা, ঠেশ, তালা (কানে), তোড়, দাগা, দেড়ে, দেড়েক, দো-ফাঁক, ফর্ফরী, ফাঁপর, ফুরফুরে, রত্তি (এক)।

বঙ্গসুন্দরী ঃ অফুট; আদরা, একেত্তর, উল্টতর, উথা, কুনো, থামকা, গারদ, গোজ, চিতোন, চুমকি, ঠেক, ঠোশেঠাশে, ছেলেপুলে, ডাঙ্গা, ধাঙ্ড়া-ভাঙ্ড়া, ঠ্যাকার, নচ্ছার, তরকরা, পাঙ্গাল, বকুন-সকুন, বুড়ো-সুড়ো, বেদড়া।

সারদামঙ্গল ঃ এঁদো, খোয়া, খেলাদেলা, খুদে, ধুন্ধুমার, বাছা, রোষারুষি।

অনেক সময় প্রচলিত বানান পর্যন্ত তিনি গ্রহণ করেন নি ; কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজে তদকালে যে উচ্চারণ চলিত ছিল, তাই তিনি গ্রহণ করেছেন। বক্তার কণ্ঠস্বরটুকু পর্যন্ত তিনি ধরতে চেয়েছেন—অ'নাসে, সুদ্ধু, মাজে (মাঝে) ছুদ, ভিকারী, চোক, (বঙ্গসুন্দরী), ধাঁদা, (নিসর্গ সন্দর্শন)! এই সব শব্দের উচ্চারণে ব্যক্তিবিশেষের "মুখমদের ছিটা"টুকু লেগে আছে।

কবি ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রচুর ব্যবহার করেছেন; নিসর্গসন্দর্শন ও বঙ্গসুন্দরীর তুলনায় অবশ্য এগুলির সংখ্যা সারদাসঙ্গলে অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু বঙ্গীয় যে কোন কবির কাব্য অপেক্ষা সারদামঙ্গলেও তাদের সংখ্যা অধিকতর। ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রথমত ভাষার বনেদী চাল নষ্ট ক'রে দেয়; দ্বিতীয়তঃ কবির শ্রুতি-ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা ঘটায়। বক্তার বর্ণনা এতে ব্যক্তিগত হয়। তাঁর এই নবীন শব্দ-ভাণ্ডারের সঙ্গে তাঁর বাক্য-রচনা-প্রণালীও সুসংবদ্ধ। নিসর্গ সন্দর্শন ও বঙ্গসুন্দরী কাব্যদ্বয় ছিল কিছুটা বিবরণ-ধর্মী এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট। কিন্তু সারদামঙ্গল-পরবর্তী কাব্যই সম্পূর্ণই অন্তঃধর্মী রচনা; এবং লক্ষ্যে উপনীত। কবি ইচ্ছা ক'রেই বঙ্গসুন্দরীর ছন্দ এই কাব্যে গ্রহণ করেন নি; তার কারণ এ ছন্দ যা বলে, তা নেচেনেচে বলে। যা বলে, তা সঙ্গোপনে বলে না।

তুমিই মনের তৃপ্তি
তুমি নয়নের দীপ্তি,
তোমা-হারা হ'লে আমি প্রাণ হারা হই;

করুণ কটাক্ষ তব
পাই প্রাণ অভিনব,
অভিনব শান্তি রসে মগ্ন হয়ে রই।

যে কদিন আছে প্রাণ,
করিব তোমার ধ্যান,
আনন্দে ত্যজিব তনু ও রাঙ্গা চরণ তলে। (১ম সর্গ)

একথা কানে কানে বলা যায়; কারণ ছোট গলায় ক্ষুদ্র বাক্য বলা সহজ। কবি শেষ কথায় বলেলেন,

"বিহঙ্গম, খুল প্রাণ ধর রে পঞ্চম তান।"

কিন্তু সারদামঙ্গল গান একান্ত নির্জনের কাব্য, নিরালার গান। সাধের আসনেও ঐ একই রীতি অনুসৃত। সাধের আসন সারদার টীকা। টীকা অবশ্য মূলগ্রন্থ অপেক্ষা সর্বদাই কোলাহলমুখর হয়। এ ক্ষেত্রে টীকাকার অপর ব্যক্তি নন; টীকাকার-স্বয়ং কবি। তিনি অভিনব বাক্যাংশের যোজনায় সঙ্গীত-মাধুর্য বৃদ্ধি করেছেন। ইংরেজীতে যাকে বলে 'phrasal music' সেই 'phrasal music' তিনি সৃষ্টি করেছেন এই অভিনব বাক্যাংশ যোজনা

ক'রে। শুধু অনুপ্রাস বা অন্ত্যানুপ্রাস বা মিল যোজনায় কবিতার সঙ্গীতসুষমা সম্পূর্ণ ফুটে ওঠে না।

নিসর্গ সন্দর্শন : হালী-গাঁথা, বিমোহিনী-বীণা, বীণা-বিগলিত, মুকুতাময়ী ফোয়ারার ধারা, পাতার মন্দির।

বঙ্গসুন্দরী : উষা-প্রায় দেবী, জল-কল কলে, তীর-তরু-তলে, প্রলয়ের মেঘজাল, আনন-বুক, চরণ-প্রতিমা, বিকচ-নয়ন, মৃণাল শ্যামল কর পদতলে, নমিত লোচন, তেজাল নয়ন, মনের তিমির, উষার আলা, শূন্যো শ্মশান, প্রেম-তরু তলে।

সারদামঙ্গল : মগনতারকারাজি, গগনের নীল জলে, তরল দর্পণ, দশদিকে দরপন, চরন্ত মৃগ, বিচিত্র-গগন-ফুল, কল্পনা-লতা, জড়িমা-জড়িত কথা, তপন-তর্পণ-আল, সোনামুখী তরী, সুধার সাগর, ভীষণ গগন-মুখী, স্নিগ্ধ-দরশন, দৃষ্টি-পথ-প্রান্ত ভাগে।

সাধের আসন : আকাশের নীল জল, ধাবন্ত অম্বুরাশি, দিগন্তের কালো গায়, মেঘ-মন্দির, স্বর্ণ-স্রোতস্বতী, জোৎস্না-সলিল, মেঘের মৃদঙ্গ, সোনার লতা (বিদ্যুৎ), ভ্রমর কলঙ্ক-কালো।

ধূমকেতু : তপনের কিরণ-সাগরে, স্বভাবের সুধীর প্রদীপ, প্রাণের মধুর জ্যোৎস্না।

শরৎকাল : স্নেহের নদী, মেদুর সমীর।

এগুলির সঙ্গীত মাধুর্য এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিচ্ছিন্নভাবে বুঝা যাবে না। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের পাশাপাশি বসিয়ে এদের মূল্য প্রণিধান করতে হবে। আমরা হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র থেকে অনুরূপ উদাহরণ সংগ্রহ করছি। এবং ইচ্ছা ক'রেই তাঁদের মহাকাব্য থেকে উদাহরণ তুলছি না। কারণ বিহারীলাল মহাকাব্যের কবি নন। তাঁর সঙ্গে উক্ত কবিদ্বয়ের গীতিকবিতার ভাষাই কেবল উপমিত হ'তে পারে। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের হাতে গীতিকবিতার ভাষায় কেমন 'phrasal music' ছিল, তা একবার বাজিয়ে দেখা দরকার।

হেমচন্দ্র :

আশাকানন : শুচিহৃদয়, দারিদ্র্য-শিখা, নন্দন-সদৃশ, চন্দ্রমার জ্যোতিসদৃশ কিরণ, জগজন-মনোলোভা, অপূর্ব সৌন্দর্যময়, বিস্ফারিত নেত্র, রোদন নিনাদ।

ছায়াময়ী ঃ চণ্ড আরাবে, কৃতান্ত করাল, ইহ-জন্মকথা, অতরল শৃঙ্গব্রাজী, সূক্ষ্মকাশাবৃত, দৌরাত্ম্য-পীড়িত নর, ভাদ্র শেষে রৌদ্রতপ্ত জলা।

দশমহাবিদ্যা ঃ চারি-বেদ-সাগর-অম্বু, ব্রহ্ম অণ্ড যেন খণ্ড, পূর্ণ বর্তুলাকার, প্রেমসঞ্চারি হৃদে, দারিদ্র্য-দলন-রূপী।

[illegible] ঃ চৌদিকে নিরাশা ঢেউ, প্রজ্বলিত অন্তরীক্ষে, কৃতঘ্ন নর, আলোক-মাহাত্ম্য, বিধি-সৃজন-প্রণালী, অবিচ্ছেদগতি, শ্বাপদ-আশ্রয়, রঙের ঢেউ, নৈপুণ্য চাতুরী।

কবিতাবলী ঃ অপূর্ব কোদণ্ড, কৃপাণ-বাঁশি, দেশাচার, সংসার-সমরাঙ্গন, সময়-সাগর-তীরে, কীর্তিধ্বজা, উন্নতি-দীপ, মহিমার কিরণউজ্জ্বল, ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার, প্রফুল্লবদনী, দুরাচার, ভবের মন্দির, কৌমুদীরাশি, জীবন পিঞ্জর, বৃন্তভাঙ্গা মন, ঈশ্বরের সিংহাসন, হৃদয়-খেপানো কথা, প্রকৃতি-কুন্তলসার্জি, চন্দ্রানন, চিকন দর্পণ, সংসারের সুখ-পদ্ম, বঙ্গনারীপুষ্প।

নবীনচন্দ্র ঃ

পলাশীর যুদ্ধ ঃ তৃষ্ণা নিবারণ, লোলজিহ্বা অট্টহাসি, ইহাদের হীনাবস্থা, অধীনতা অত্যাচার, বঙ্গমাতা উদ্ধারের পন্থা সুবিচার, আসুরিক রাজ্যের পিপাসা, দুরাকাঙ্খা-তরী, রাজপ্রাসাদের সজ্জা, সুসজ্জিত সুবাসিত হর্ম্যান্তরে, জাহ্নবী-তিমির-গর্ভ-খনির ভিতরে।

অবকাশরঞ্জিনী ঃ নিরপেক্ষভাবে, রাজ্যের পিপাসা, প্রকৃতি-গৌরবধ্বজা, রোমাঞ্চিত তনু, বীরেন্দ্র-ব্যূহ-নগর-প্রবেশ, সৌভাগ্যের সিংহাসন, পিতৃশোক-ছুরিকা, দারিদ্রতা তুলি শিরঃ, ভূধরসম্ভবা, সামান্য শরীর ক্লেশ, দরিদ্রসম্ভবা, গ্রাম-বাসি কোলাহল, গৌরবব্যঞ্জক, দীনতা-তাপে, নিরাশাভুজঙ্গ, বিরহ নিদাঘে, বিমোহিত মন অলি, দুর্ভাগ্য-জলদাবৃত, চিন্তা-বিষধরী, প্রণয়-পীযূষ-পানে, বিষাদ তরঙ্গ-মালা, সরল শৈশব ক্রীড়া, স্মৃতি-দূরবীক্ষণ, নবদুর্বাদলাকীর্ণ শ্যামল প্রাঙ্গণে।

উদাহরণ আরও বাড়ান যেত। কিন্তু অহেতুক ব'লেই আমরা নিরস্ত হয়েছি। এই বাক্যাংশসমূহে তাঁদের উদ্ভাবনী শক্তির কোন পরিচয় নেই। মঙ্গলকাব্যীয় রীতি এখানে অবলম্বিত হয়েছে। যেখানে মৌলিকতা আছে, সেখানেও সঙ্গীত-অবলুপ্তি ঘটেছে। যুক্তাক্ষরের ঢক্কানিনাদে সঙ্গীত দেশ-ছাড়া হয়েছে।

নবীনচন্দ্র গর্বভরে বলেছিলেন "সার্ধহস্ত লম্বমান সমাস বাঁধুনি" তিনি ব্যবহার করেন নি.। সে দাবী কতটা টেকসই, তা ঐ উদাহরণগুলি দেখলেই প্রতীয়মান হবে। তার উপর রয়েছে কর্কশভাষণের চরম প্রয়াস। কৃত্রিমতার জন্মই এই কর্কশতা এত স্পষ্ট হয়েছে। এই কৃত্রিমতার জন্যই তাঁদের বহু গম্ভীর কথাও পাঠকের কেবল হাসি উদ্রেক করে। বিহারীলাল এই কৃত্রিমতার অবসান ঘটিয়েছেন। গীতিকবিতার ভাষা হবে আন্তরিক ও অকপট ; বাহ্যিক ও কৃত্রিম নয়।

বিহারীলালের ভাষার একমাত্র অভাব সংহতির অভাব। গীতিকবিতা সর্বদা কলেবরক্ষুদ্র ; ক্ষুদ্র কলেবরে সবই হবে তির্যক এবং ঘনীভূত। ছন্দের বৈচিত্র্যের মতই গীতিকবিতার ভাষায় সংহতিরও প্রয়োজন।

বিহারীলাল গীতকবিতার,—আত্মমুখীন গীতিকবিতার আদিকবি। আর আদিম যুগে সংহতি আকাঙ্খিত হতে পারে, কিন্তু অর্জিত হয় না। বিহারীলালের প্রিয় বিষয়-বস্তু হ'ল আকাশ ; তাঁর সুরবালাও মৃত্তিকায় ভূমিষ্ঠা হয় নি ; তাঁর 'সারদা' নিতান্তই 'গগন-ফুল' কিনা, এ সন্দেহ শেষ পর্যন্ত কবিরও থেকে গেল। আকাশের নীহারিকাপুঞ্জের মতই বিহারীলালের ভাষা কুয়াশাময়।

সারদার কোন কোন অংশে একটা সংহতি এসেছে ; কিন্তু 'সাধের আসন' সে সংহতি শিথিল ক'রে দেয়। টীকা সর্বদাই মূলের শৈথিল্য।

গীতিকবিতায় সুরেন্দ্রনাথ বিহারীলালের প্রথম শিষ্য, সম্ভবত শ্রেষ্ঠ শিষ্য। সুরেন্দ্রনাথে সংহতি আছে, বা সংহতিই তাঁর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য সারদামঙ্গল থেকেই তিনি সন্ধান পেয়েছিলেন। তবু সমগ্র কাব্য-জগতের পরিপ্রেক্ষিতে সংহতি বিহারীলালের কাব্য-বৈশিষ্ট্য নয়, মুখ্য বৈশিষ্ট্য ত কদাচ নয়। আন্তরিক ভাষা তিনি সৃষ্টি করেছেন, সংহত ভাষা তিনি সৃষ্ট করতে পারেন নি।

বিহারীলালের ছন্দ

বিহারীলালের ছন্দ বাংলা ছন্দের ইতিহাসে অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়। সারা বিশ্বে আধুনিক কবিতার (শুধু বাঙলাদেশে নয়) প্রধান রূপ গীতিকবিতা ; আধুনিক বঙ্গদেশে গীতিকবিতাই রবীন্দ্রযুগের প্রধান সাহিত্য-ফসল।

সৃষ্টির প্রাচুর্য সত্ত্বেও উপন্যাস নাটক ও ছোট গল্প নিম্নমূল্য।

আধুনিক বাংলা গীতিকাব্য প্রায় তিরিশ বৎসর ধ'রে তার যোগ্য ছন্দবাহন খুঁজে ফিরছিল। বিহারীলালের ছন্দ এ বিষয়ে কতটা সহযোগিতা করেছে, যে অন্বেষণ নিঃসন্দেহে গুরুতর কাজ।

কবির বহু বৈশিষ্ট্যের যিনি সার্থকতম ভাষ্যকার, সেই রবীন্দ্রনাথের সাহায্য আমরা এখানে নিতে পারি।

প্রধানতঃ বিহারীলালের ছন্দ নামে একটি বিশেষ ছন্দই প্রচলিত ; সে ছন্দ 'বঙ্গসুন্দরী'র ছন্দ। "প্রথম উপহারটি ব্যতীত বঙ্গসুন্দরীর অন্য সকল কবিতার ছন্দই পর্যায়ক্রমে বারো এবং এগারো অক্ষরে ভাগ করা।"

এ ছন্দের উপযুক্ততা বর্ণনা ক'রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এ ছন্দ নারীবর্ণনার উপযুক্ত বটে—ইহাতে তালে তালে নূপুর ঝংকৃত হইয়া উঠে। কিন্তু এ ছন্দের প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহাতে যুক্ত অক্ষরের স্থান নাই। পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে লেখকের এবং পাঠকের অনেকটা স্বাধীনতা আছে। অক্ষরের মাত্রাগুলিকে কিয়ৎপরিমাণে ইচ্ছামত বাড়াইবার কমাইবার অবকাশ আছে। প্রত্যেক অক্ষরের একমাত্রার স্বরূপ গণ্য করিয়া একেবারে এক নিশ্বাসে পড়িয়া যাইবার আবশ্যক হয় না। কবি বঙ্গসুন্দরীতে যথাসাধ্য যুক্ত অক্ষর বর্জন করিয়া চলিয়াছেন।

কিন্তু বাংলা যে ছন্দে যুক্ত অক্ষরের স্থান হয় না, সে ছন্দ আদরণীয় নহে। কারণ, ছন্দের ঝংকার এবং ধ্বনিবৈচিত্র্য যুক্ত অক্ষরের উপরেই অধিক নির্ভর করে। একে বাংলা ছন্দে স্বরের দীর্ঘহ্রস্বতা নাই, তার উপরে যদি যুক্ত অক্ষর বাদ পড়ে, তবে ছন্দ নিতান্তই অস্থিবিহীন সুললিত শব্দপিণ্ড হইয়া পড়ে।

"বঙ্গসুন্দরীর ছন্দোলালিত্য অনুকরণ করা সহজ, সেই মিষ্টতা একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে তাহার বন্ধন ছেদন করা কঠিন।"

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দের বন্ধনের মধ্যে বেশ কিছুকাল আটক পড়েছিলেন। যেদিন মুক্তি পেলেন, সেদিনকার আনন্দবোধ সহজে বিস্মৃত হবার নয়।

"একদা এই ছন্দটাই আমি বেশী করিয়া ব্যবহার করিতাম। ইহা যেন দুই পায়ে চলা নহে, ইহা যেন বাইসিকেলে ধাবমান হওয়ার মতো।

এইটেই আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যাসংগীতে আমি ইচ্ছা করিয়া নহে কিন্তু স্বভাবতই এই বন্ধন ছেদন করিয়াছিলাম। তখন কোন বন্ধনের দিকে তাকাই নাই। * * * হঠাৎ স্বপ্ন হইতে জাগিয়াই যেন দেখিলাম, আমার হাতে শৃঙ্খল পরানো নাই।" (জীবন-স্মৃতি, পৃ—১৮২)

বিহারীলাল আরও একটি ছন্দ ব্যবহারে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, সে প্রচলিত ত্রিপদী। কিন্তু সারদামঙ্গলে কবি তাহা "সঙ্গীতে সৌন্দর্যে সিঞ্চিত করিয়া তুলিয়াছেন।"

"সূর্যাস্তকালের সুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মতো সারদামঙ্গলের সোনার শ্লোকগুলি বিবিধ রূপের আভাস দেয়, কিন্তু কোনো রূপকে স্থায়ীভাবে ধারণ করিয়া রাখে না, অথচ সুদূর সৌন্দর্য হইতে একটি অপূর্ব রাগিণী প্রবাহিত হইয়া অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে থাকে।

* * *

এমন নির্মল সুন্দর ভাষা, এমন ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।"

বিহারীলালের দুইটি ছন্দই তুল্যভাবে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিপথে পড়েছিল। কিন্তু এ যুগের যত আলোচনা বঙ্গসুন্দরীর ছন্দ সম্পর্কে। বঙ্গসুন্দরীর ছন্দের বিশিষ্টতা হচ্ছে তার ছয়মাত্রা-বিশিষ্ট পর্ব-বিভাগ। প্রচলিত পয়ারে ৮+৬ পর্ব-বিভাগ আমরা মেনে নিই; কিন্তু বিহারীলাল ছয়মাত্রার পর্ব-বিভাগ ঘটিয়ে বাংলা গীতিকাব্যের ভবিষ্যতের পর্ব-বিভাগ তৈরি ক'রে দিলেন। এ-ব্যাপারে অবশ্য হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র (পরিমাণে কম) তাঁর সহায়তা করেছেন। ছয়মাত্রার ছন্দ আগেও ছিল; দ্বারকানাথ রায় এবং কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের কাব্য থেকে আমরা তার উদাহরণ ইতিপূর্বেই হাজির করেছি। কিন্তু সেগুলি পর্ব-গঠনে সহায়তা করেনি। ফলে যে চলতা-ধর্ম বিহারী ছন্দের বৈশিষ্ট্য (কম-বেশি হেমচন্দ্রেরও, কারণ হেমচন্দ্রও এই ছন্দ তার অধিকাংশ আত্ম-উচ্ছ্বাসময় কবিতায়—যথা ভারতসঙ্গীত, ভারতভিক্ষা ইত্যাদিতে ব্যবহার করেছেন; কারণ এ ছন্দের চাল মৃদু মন্থর নয়, ত্বরিত-চকিত), তা এখানে স্ফূর্তি পায় নি। ছয়মাত্রার পর্বই গীতিকবিতার পর্ব। এই ছয়মাত্রার পর্বের কাছেই এতাবৎ কাল-ব্যবহৃত চারিমাত্রার পর্ব সিংহাসন ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রধান বাহন এই ছয়মাত্রামূলক পর্ব। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য যুগ্মধ্বনিকে গুরু বা দ্বিমাত্রক এবং অযুগ্ম-ধ্বনিকে লঘু বা একমাত্রক ব'লে গণ্য করা। বিহারীলাল যুগ্মধ্বনির গুরুত্ব প্রণিধান ক'রেছিলেন, এমন নজিরও আছে।

নাহি মণিময় সে রাজপ্রাসাদে
তোমার প্রতিমা বিরাজমান,
সে যেন মগন রয়েছে বিষাদে,
হাঁ হাঁ করে যেন শূন্যে শ্মশান।
—(বঙ্গসুন্দরী, ২য় সর্গ)

এ হ'ল অবশ্য নঞর্থক (Negative) সচেতনা। এই নেতিবাচক সচেতনতাও মাত্রাবৃত্তের রহস্য উদ্ঘাটনে সহায়তা করবে।

"বঙ্গসুন্দরীর ছন্দোলালিত্য অনুকরণ করা সহজ, * * * কিন্তু সারদামঙ্গলের গীতিসৌন্দর্য অনুকরণসাধ্য নহে।"

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এই ছন্দ অনুকরণ করেছেন, সে অনুকরণ বহু ক্ষেত্রে সার্থকতায় উজ্জ্বল ; যেখানে নিষ্প্রভ, সেখানে তাঁর আভিধানিক আনুগত্যই দায়ী। সমাসবদ্ধ যুক্তাক্ষরের পিণ্ডের মধ্যে প'ড়ে এই ছন্দের দেহবল্লরী স্থূল ও আড়ষ্ট হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথও বিহারীলালের কাব্যজিজ্ঞাসা ও কাব্য-কলাবিধিকে পূর্ণ পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন নি।

তরুণ যৌবনের বাউল
সুর বেঁধে নিল আপন একতারাতে,
ডেকে বেড়াল নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে
অনির্দেশ্য বেদনার খেপাসুরে।

বেদনার খেপাসুর অনির্দেশ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু মনের মানুষের উদ্দেশ পাওয়া গেল। বাংলা কাব্যের মুক্তি-লগ্ন আসন্ন।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

বিহারীলাল নির্জনতার কবি, নিঃসঙ্গতার কবি। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ সেখানেই তাঁর সঙ্গী হ'তে চেয়েছেন।

সুরেন্দ্রনাথ বিহারীলালের ভাবশিষ্য ; তাঁর 'মহিলা' কাব্য বঙ্গসুন্দরীর

নারী-বন্দনায় অনুপ্রাণিত। তিনি কি কেবল পথের নিশানাই নিয়েছেন? চলার ছন্দ কি তাঁর নিজস্ব?

মহিলা-পূর্ব যুগে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা কবিতায়, নাটকে ও ইতিহাস-অনুবাদে স্ফূরিত হচ্ছিল। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর 'ষড় ঋতু বর্ণন' কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। সাময়িক পত্রে তাঁর নানা পদ্য-সমাচার বের হ'ত। প্রথম যুগের পদ্য রচনায় ঈশ্বর গুপ্তই তাঁর আদর্শ। তাঁর দ্বিতীয় কবিতা 'সবিতা-সুদর্শন' গাথা জাতীয় রচনা। গল্প যাই হোক, এখানে সূর্য বন্দনায় তাঁর নিজস্ব ষ্টাইলের প্রথম সাক্ষাৎ মেলে। সেই উপমা-উৎপ্রেক্ষা প্রয়োগের তির্যকভঙ্গি, সেই সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দের বাহুল্য এবং মিলের অভাবিতপূর্বতা। সবিতা-সুদর্শন ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়;—ইতিমধ্যে মাইকেল এসেছেন, এবং তাঁর কাব্যজীবনের উপসংহার টেনেছেন। বিহারীলালের বঙ্গসুন্দরীর যুগ শুরু হয়েছে। কবির জীবনেও বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে; প্রথমা পত্নীর মৃত্যু, দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণ। কবির পূর্বতন 'মসীমণ্ডিত' জীবনের অবসান ঘটেছে। সবিতা-সুদর্শনের কাহিনীতে সেই পরিবর্তনের ইঙ্গিত আছে। সুদর্শনের প্রকৃত পরিচয় ঘোষণায় কবিরই নবজীবনের ইঙ্গিত বহন করে; মিথ্যার বেসাতি শেষ ক'রে কবি নবজীবনের পথে এগিয়ে চলেছেন। বাক্য-গঠনে, শব্দ-নির্মাণে এবং উপমা-উৎপ্রেক্ষা প্রয়োগে কবির বিশিষ্ট রীতি এখানেই প্রথমে দেখা দেয়।

সে পূর্ণ রূপের তুমি প্রতিমা আভাস,
স্ফূলিঙ্গ সে রুচির বহ্নির।
অনাদি, অনন্ত, কাল, ভুজঙ্গের কায়,
স্বর্ণ শরে না কাটিলে তুমি।
অসীম আকাশ ক্ষেত্রে বালক ক্রীড়ায়
সদা তব মণ্ডল ভ্রমণ।
কর শর, (বেগে বায়ু পরাজিত যায়,)
ঘনতূণে রাখি আবরিত,
ধানুকী প্রধান; তুমি দেখাও বর্ষায়,
ধনু কিবা যতন চিত্রিত।

শারদ মাথায় কেবা পারদ শরীরে
কাশ ফুল কাননে দোলায়

এই শক্তির পুনরুচ্চারণ ঘটল বর্ষাবর্তন কবিতায়।

তরুপত্র প্রান্তভাগে লম্বিত নীহার,
কামিনীর কটাক্ষ ইঙ্গিত,
সুচিত্রিত, চারু ইন্দ্রচাপ বরিষার,
উড্ডীন পাখার কলগীত,
সন্ধ্যার রক্তিম ঘটা, পতিত তারার ছটা,
সরোজল হিল্লোল নর্তন,
এ হতে ভঙ্গুর রম্য, মানব-জীবন।

প্রত্যয়বোধে পৃথিবীর বা জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব সম্পর্কে যত সরবতাই থাক, সৌন্দর্যের অমরাবতীর সৃজনে কবি ক্লান্তিহীন।

মহিলা কাব্য রচনার পূর্বেই কবির সর্ব ইন্দ্রিয়ের অনুভব ক্ষমতা জাগ্রত হয়েছে। পৃথিবী তাঁর কাছে বিষয়-পুরী মাত্র নয়, ধ্বনি বর্ণ গন্ধ ও স্পর্শের রঙ্‌মহল। প্রধানত দৃশ্যের ও বর্ণের।

কবির মৃত্যুর পরে অসামাপ্ত আকারে মহিলা কাব্য প্রকাশিত হয়; এমন কি কবির এই শ্রেষ্ঠধনের নামকরণও তাঁর নয়, প্রকাশকের। কবি তিন ভূমিকায় নারী-বন্দনা করেছেন; আর একটি ভূমিকার সূত্রপাত মাত্র ছিল। বিহারীলাল "আটখানি প্রতিমে" এঁকেছেন; এগুলির শ্রেণীবিন্যাস যথেষ্ঠ স্পষ্ট নয়, পৃথক নয়। বিহারীলালের ছবিতে ছিল পূর্ব পরিকল্পনার অভাব। সুরেন্দ্রনাথের এই 'over-lapping' নেই, কোন চিত্রই একে অপরের মধ্যে সিঁধিয়ে যায় নি। বিহারীলালের বিশৃঙ্খল ও পরিকল্পনাহীন উচ্ছ্বাস এখানে সুসংহত হ'য়ে মন্ত্রের গাঢ়তা অর্জন করেছে। এখানে চিত্র-আরতি অপেক্ষা স্তোত্রপাঠ বড়।

উপহার অংশে কবি নারী-সৃষ্টির আবশ্যকতা বর্ণনা করেছেন; দ্বিতীয়ভাগে মাতৃবন্দনা, তৃতীয়ভাগে জায়া বর্ণনা। ভূমিকা অংশে ও জায়া অংশে তত্ত্বের চাপ প্রবল; সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বই সুরেন্দ্রনাথের তত্ত্ব। প্রকারান্তরে বিহারীলালেরও তত্ত্ব।

তুমি স্বীয়া অগ্রগণ্য সর্ব-রসাধার,—
মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভা অধীরা ধীরাচার,
তুমি অবিতর্ক্য অম্বু পদার্থবিস্তার ;
শান্তা ঘোরা মূঢ়া নাম,
সুখ দুঃখ মোহ ধাম,
তুমি মূল প্রকৃতির সাংখ্যের তত্ত্বসার ;
বেদান্তের ভাবাভাব মায়ার সাকার।

অনেকে অক্ষয় বড়ালের সঙ্গে তাঁর মিল খুঁজে পেয়েছেন। মিল নিশ্চয়ই আছে। সে মিল ততটা সংযত বাণীর নয়, যতটা তত্ত্বের গুরুভারের। বিহারী-লালের বলবার ভঙ্গির মধ্যে একটা দুরূহতা ছিল ; সুরেন্দ্রনাথের বাগবিন্যাসে সংযম আছে, কিন্তু দুরূহতা নেই। সুরেন্দ্রনাথের কাব্যকলাপ্রসঙ্গে ক্লাসিক শব্দটি হামেশা ব্যবহৃত। বিহারীলালের কাব্যে স্থান-বিশেষের শিথিলতা (মূলতঃ পরিকল্পনার শিথিলতা, বাগ্‌ভঙ্গির শিথিলতা নয়) সমালোচকদের উষ্মার হেতু। সুরেন্দ্রনাথ সেই শিথিলতার অবসান ঘটিয়েছেন। বিহারীলাল তাঁর অধরার তল্লাস করেছেন নানা আখ্যায়িকার অন্দর মহলে দাঁড় করিয়ে। সুরেন্দ্রনাথের 'মহিলা' কোন চিকের আড়ালে দাঁড়ান নি—না খণ্ডখণ্ড কাহিনীর, না একটানা কাহিনীর। স্বভাবতই তার ফলে সংহতি বহুগুণ বেড়েছে এই কাব্যে।

লিরিক শব্দটির সঙ্গে ভাষা-শৈথিল্যের একটা সম্পর্ক উনিশ শতকের কবিতায় সহজলভ্য।

হেম-নবীনের গীতিকাব্যে গীতির অর্থই পুনরাবৃত্তি ও অতিকথন। সুরেন্দ্রনাথ সেই যুগে তির্যক ভাষণ, সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতের সহায়তা নিলেন। এবং তার জন্য তাঁকে কাব্যকলায় কয়েকটি নবীন রীতির (তখনকার জন্য নবীন, নইলে চিরকালের রীতি) প্রবর্তন করতে হ'ল। প্রথমতঃ চিন্তাগাঢ় দৃঢ়বদ্ধ বাক্য-সংগঠনের জন্য তিনি তৎসম শব্দের সহায়তা নিলেন, ক্রিয়াপদের,- বিশেষ করে অসমাপিকা ক্রিয়ার সংখ্যাহ্রাস করলেন। মাইকেলের বহু ভাষা অনুষঙ্গ তাঁর হাতে নবীন আকারে দেখা দিল। দ্বিতীয়তঃ কবিতার ভাবমূর্তি স্তবকের কঠিন কাঠামোতে আরও গাঢ়বদ্ধ হয়েছে। শুধু ভাষার গাঢ়বদ্ধতার জন্য তাঁর এই নিয়ন্ত্রিত আবেগ কাব্যসুষমায় মণ্ডিত হ'ত না। এই দুই

সাফল্য পরস্পরের পরিপূরক। এবং এইটুকু অভিনিবেশের জন্য তাঁর নারী-বন্দনা হেমচন্দ্রের দশমহাবিদ্যার মত পরের ভাষায় বা প্রচলিত ভাষায় পুস্তকের সত্য বলে নি; তিনি নিজের ভাষায় বা নতুন ভাষায় বুকের কথা বা অনুভবের কথা বলেছেন।

সুরেন্দ্রনাথের একটি কবিপ্রত্যয় ছিল, তাত্ত্বিক প্রত্যয় নয়। এ প্রত্যয় তাঁর বিষয়-নির্বাচনে এবং বিষয়-ভাষণ-রীতিতে ফুটে উঠেছে। ভাষণ-রীতির নমুনা দেখুন।

কৃশাঙ্গীর কলেবরে যৌবন কেমন?
হবির পরশভরে কৃশানু যেন
অথবা বসন্তে যেন কাননের কায়।
আত্মা-অশ্বে করে কশা-কটাক্ষ শাসন।
কাষ্ঠে কাষ্ঠ যেন দেহে দেহের মিলন,
মনে মনে—দীপশিখা যুগল-যোজন।
হৃদি-সিন্ধু-দোলে, অল্প হেতু-মৃদু-বায়।
বিনা নারী, নর-দৈত্য-তিমির-তপন।

এই উদাহরণের স্তূপ বাড়িয়ে লাভ নেই। কবির এই প্রত্যয়টি সিদ্ধির দোরে এসে পৌঁছেছে। তাঁর সারাজীবনের কাব্য-বক্তব্যের প্রতীক, বা প্রতিমা হবার জন্য দুই একটি প্রতিমা তিনি বেছে নিয়েছেন। সেই একই প্রতিমা বারবার ভজন পূজনের ফলে গভীর হয়েছে, নিবিড় হয়েছে, হয়ত বা প্রতিমা জীবন্ত হয়েছে। তাঁর সবিতা সুদর্শনেঃ

প্রদীপ লইয়া করে, সমীর শঙ্কায়
এলো বালা সুমন্দ গমনে,
দীপ্ত মুখ, দীর্ঘ রক্ত প্রদীপ শিখায়
চুম্বিত, চঞ্চল সমীরণে।

মহিলায় বলেছেনঃ

প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি সমীর শংকায়
আনিবে অঞ্চলে ঝাঁপি যখন সন্ধ্যায়
হেরে উচ্চ রক্ত-শিখা প্রকাশিত তার,

জেনো আমি রাগ ভরে
বসিয়া সে শিখা পরে,
চঞ্চল হয়েছি মুখ চুম্বিতে তোমার।
নিখিলে জানিবে, খেলা কৌতুক আমার॥

আর সন্ধ্যার প্রদীপ কবিতায় সেই অলংকারই ইন্দ্রিয়গম্য হ'তে গিয়ে কত অর্থঘন হয়েছে :

দেখ দেব জ্বলিয়াছে প্রদীপ সন্ধ্যার,
দেব-রূপ দৃশ্য ধরা পড়ে,
চারিদিকে ছায়া পড়ে কাঞ্চন কায়ার,
আলো-দ্বীপ আন্ধার-সাগরে।
ললিত লীলায় কায়,
হেলে দুলে বীণা বায়,
শিখার শরীর মাঝে নড়ে যেন প্রাণ,
দীপ নয়,—যেন কোন দেব বিদ্যমান।
দূর হতে রূপ কিবা হয় দরশন
চৌদিকে কিরণ পড়ে চিরে,
অন্ধকারের মাঝে তায় দেখায় কেমন,—
জবা যেন যমুনার নীরে।
আন্ধারের কাল কায়
তায় অস্ত্রাঘাত প্রায়,
দীপ দেখি রক্তমাখা ক্ষতস্থান যেন,
কাল কেশে কামিনীর পদ্মরাগ হেন।

এ যেন অলংকারের বৃষ্টি!

কবি যখন প্রত্যয়-সিদ্ধির সোপানে এসে পৌঁছেছেন—তখনই মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। বচনে ও বাচনিকতায় একদা তিনি বিহারীলালের দোর-গোড়ায় ব'সে গান গাইতে শুরু করেছিলেন। কখন যেন সকলের অলক্ষ্যে গুরুর পার্শ্বে শিষ্য উপবেশন করেছে। 'প্রদীপের শিখা' সারাজীবন ধ'রে তাঁকে আকর্ষণ করেছে। তাঁর পক্ষে এই কথাই শেষ পর্যন্ত সত্য নয়—

"ছায়াধরা খেলাতেই কাটালে জীবন!"

পাদটীকা

১। আধুনিক সাহিত্য—বিহারীলাল—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ সংস্করণ। পৃ—২৩

২। বস্তুজগৎ ও ভাবজগৎ—ভারতী, ১২৮৮, বৈশাখ।

৩। A Vision of Last Judgment—W. Blake. Modern Literary Edition. পৃ—৬৩৯

৪। পুরাতন প্রসঙ্গ-কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, ১ম পর্যায়—বিপিন বিহারী গুপ্ত।

৫। ঐ।

৬। শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী—প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ৩য় সংস্করণ, ১৩৬৭ প্রথমোল্লাস পৃষ্ঠা—৯

৭। আনন্দলহরী—শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত। ১৬ সংখ্যক শ্লোক।

৮। সাহিত্য সংহিতা-১৩২১, কার্তিক।

৯। পুরাতন প্রসঙ্গ—কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, ১ম পর্য্যায়—বিপিনবিহারী গুপ্ত

১০। অবোধ বন্ধু-২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা

১১। দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ—কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। পৃ—২৫-২৬।

১২। ঐ পৃষ্ঠা—৪৬।

১৩। রাসেলাস—তারাশঙ্কর তর্করত্ন; পৃ—৬৯, ২১৯;

১৪। অবোধ বন্ধু—২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।

১৫। The complete Poetry and Selected Prose of John Donne and the Complete Poetry of William Blake—Didactic and Symbolic Works—To The Deists পৃ—৯৫৫।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জন্মান্তরের পূর্বাহ্নে

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শেষাংশে বাংলা কাব্যের দুইটি প্রধান রূপ-ভেদ হ'ল মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য। এই দুইটির মধ্যে কোনটি প্রধান যুগ-বাহন, তা নিয়ে মতদ্বৈত দেখা দেয়। মতভেদ সত্ত্বেও খণ্ড কবিতা বা গীতিকবিতা সংখ্যায় মহাকাব্য অপেক্ষা বহুগুণ ছাড়িয়ে গেল। সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় গীতিকবিতার অব্যাহত আবির্ভাবে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তার জনপ্রিয়তার পরিমাণও খুব বেশি। শুধু সংখ্যায় ও পরিমাণে নয়, কাব্য উৎকর্ষেও গীতিকবিতা সার্থকতার পথে দ্রুত ধাবমান। সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে তখনও অবশ্য মহাকাব্যের উদ্দেশে পাদ্যঅর্ঘ্য সমর্পিত হচ্ছে, কিন্তু ছাপা হচ্ছে গীতিকবিতা বা খণ্ড কবিতা। বৃত্রসংহারের ন্যায় প্রখ্যাত মহাকাব্যও শেষ পর্যন্ত সাময়িক পত্রে সম্পূর্ণ মুদ্রণ সম্ভব হয় নি।

এই যুগে অবশ্য তিনপ্রকার কবিতা-রচনাই চলছিল—খণ্ড কবিতা, গাথা কবিতা ও মহাকাব্য। খণ্ড কবিতা ও গাথা কবিতার মাঝামাঝি দাঁড়িয়েছিল রূপক; এগুলি ঠিক পৃথক্ জাতীয় কবিতা নয়। এগুলি গাথা কবিতার মত আখ্যানপুষ্ট, কিন্তু তদসঙ্গে নীতিপুষ্ট। গাথা কবিতায় লক্ষ্য নীতি নয়, লক্ষ্য রোমান্স রস সৃষ্টি। সৌন্দর্য, বীর্য, মহত্ত্ব, বীরত্ব, ত্যাগ ও প্রেমনিষ্ঠার অনন্যতা দেখানই গাথা কবিতার উদ্দেশ্য। রূপকের প্রাচীরের আড়ালে এই কুসুমাবলী ফুটলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু আসল লক্ষ্য কোন সুস্পষ্ট মানবহিতকর নীতিকথা প্রচার করা।

রূপকের রূপকার

॥ ১ ॥

বাংলায় এই সময়ে রূপক কবিতা বেশ কিছু সংখ্যক লেখা হয়। ধর্মীয় আন্দোলন মুখ্যত এই রচনার হেতু। গৌণ কারণ, আখ্যান-বস্তুর মোহ খণ্ড কবিতার ভূখণ্ড থেকে লুপ্ত হ'তে চাইছে না।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধানত এই শাখার কবি। অন্যবিধ রচনা এঁদের লেখনী থেকে নিঃসৃত হ'লেও এঁদের রচনার প্রধানাংশ রূপক।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫—১৮৮৫) বঙ্গদর্শনের প্রখ্যাত লেখক। এই অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তিটি তাঁর স্বল্পকালীন জীবনে দেশ ও মাতৃভাষাকে নানা ভাবে সেবা করে গেছেন; দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস—বিবিধ আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁর স্বাক্ষর আছে, সে স্বাক্ষর আজও লুপ্ত হয় নি!

আমাদের তালিকার তৃতীয় কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানস-লীলার সঙ্গে তাঁর মিল আছে। তাঁর প্রথম কাব্য 'যৌবনোদ্যান' (রূপককাব্য) ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। মেঘদূতের অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে। প্রায় চৌদ্দ বৎসর কাল তিনি কাব্য-চর্চা করেছেন।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যখন কাব্য-চর্চা শুরু করেন, তখন অক্ষয়কুমার দত্ত ও সংবাদপ্রভাকরের বিশেষ প্রভাব। অক্ষয়কুমার তখনকার বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের গুরুস্থানীয়; আর সংবাদ প্রভাকরের কাব্য-আঙ্গিক তখনও আদর্শ স্থল। কবি "বঙ্গকবিকুল শিরোমণি শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয়কে" কাব্যখানি উৎসর্গ করতে গিয়ে বলেছেন "আপনার প্রদর্শিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বাগদেবীর পূজায় প্রবৃত্ত হই।" কবি কিন্তু-মাইকেল-অপেক্ষা অন্যত্র থেকেই অধিক অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন।

চমক, কল্পনা, আশা আর কৌতূহল মানব জীবনের উৎস। পুরুষের ইচ্ছা সংসার সাম্রাজ্য ভ্রমণ। বসন্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে তিনি বললেন, যৌবনোদ্যান ভয় শূন্য নয়। সেখানে ভীষণ মায়াবী রাক্ষস রয়েছে। এর পর ধৈর্য যত্ন সাহস ও সুমতির সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল।

বসন্ত সত্যব্রতকে বললেন, "এ চার সহায়ে যাও সংসার ভ্রমণে।" তারপর প্রলোভনের পালা শুরু হ'ল। কিন্তু শেষ পযন্ত ধর্মরাজের জয় ঘোষিত হ'ল।

কবি স্পেন্সরীয় স্তবক (কখ কখ গঘ গঘঘ) অনুসরণ করেছেন; সম্ভবতঃ বাংলা কাব্যে এই প্রথম স্পেন্সরীয় স্তবক ব্যবহার। মাইকেলী ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়। যথা, বদলিয়া, গুঞ্জরিয়া, আলিঙ্গিয়া ইত্যাদি।

মাঝে মাঝে ইংরেজী উপমা-উৎপ্রেক্ষার ভাষান্তর দেখা যায় 'ভাবনা-লাঙ্গলে ভাল গেছে যেন চষি।'

তাঁর দ্বিতীয় কাব্য মিত্রবিলাপ ও অন্যান্য কবিতাবলী ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এবং তৃতীয় কাব্য কাব্য-কলাপ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই দুইখানি কাব্যেই রূপক কবিতা দেখা যায়। এ-ছাড়া প্রকৃতি বিষয়ক কয়েকটি কবিতা রয়েছে। মাইকেলের বীরাঙ্গনা কাব্য কবিকে পৌরাণিক কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। উত্তানপাদের প্রতি সুনীতি ও গঙ্গাবতরণ কাব্য এই দুইটি পৌরাণিক কবিতা। এই কবিতা দুইটি পাঠ্য পুস্তকধর্মী রক্ত-শূন্যতা-রোগে আক্রান্ত। মিত্র বিলাপ রহস্য সন্দর্ভে অতিশয় প্রশংসিত হয়। (৫ম পর্ব, ৫৬ খণ্ড, পৃ ১২০—১২৮)

কবির চতুর্থ কাব্য হ'ল কবিতামালা (১৮৭৭)। এই কাব্যেও কবির বক্তব্য ও ভাষা প্রচলিত কাব্য গণ্ডীর বাইরে যেতে পারে নি। সূর্য, শান্তিহীন, সৃষ্টি, কাল, প্রভাতে যামিনী—সব কয়টি কবিতাতে একটা চাপা বিষাদভাব আছে। কাল, ভারতমাতা কবিতা দুটিতে জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ঘটেছে; হেম-নবীন কাব্যধারার তখন চরম বিস্তৃতি।

রাজকৃষ্ণ পুরাতন কাব্যরীতি ত্যাগ করতে পারেন নি; তাঁর 'কুঞ্জবনে' ভারত-অনুসরণ বড়ই প্রকট;—"কম্পমান অনুক্ষণ হিয়া থর থর"—অনায়াসেই মনে করিয়ে দেয় "রসে তনু ডগমগ মন টলটল"। কিন্তু এসব সত্বেও রাজকৃষ্ণবাবু যথার্থই কবি ছিলেন; তিনি যদি অনন্যমনা হতে পারতেন, তবে এক্ষেত্রে তাঁর সফলতা সত্যই অবিস্মরণীয় হ'ত। প্রমাণ স্বরূপ কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি।

নক্ষত্র-কুসুম নীলাম্বর শিরে
শ্যামাঙ্গী যামিনী লুকায় অচিরে
তোমার প্রভায়, যবে ঠারে ঠারে
উঁকি দাও তুমি উদয়াচলে।
ধরণীর দেহ করি পরিহার
পলাইয়া যায় ঘোর অন্ধকার,
নূতন সৌন্দর্য ছুটে অনিবার,
মুক্ত হেন শশী রাহু কবলে। (উষা)

রাজকৃষ্ণ বাংলা কাব্যের বিস্মৃতপ্রায় কবি; কিন্তু বাংলা গদ্যের তিনি অন্যতম প্রধান শিল্পী।

॥ ২ ॥

শিবনাথ শাস্ত্রীও রাজকৃষ্ণের মত নানা ব্রতে সাধনমগ্ন ছিলেন; কাব্যলক্ষ্মী তাঁর একনিষ্ঠ পূজা পান নি। "ইহার অন্তরবাসী কবি মানুষটি নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিবার মতো সুযোগ ও সুবিধা পায় নাই।"[১] কবির মনেও তার জন্য ক্ষোভ ছিল।[২]

শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ নির্বাসিতের বিলাপ (১৮৬৮), চারি কাণ্ডে সম্পূর্ণ। আন্দামানে নির্বাসনগামী দণ্ডিতের বিলাপোক্তি এই কাব্যের বিষয়। ভগবদভক্তিতে কাব্যের পরিসমাপ্তি। দ্বিতীয় কাব্য পুষ্পমালা (১৮৭৫) একশতটি খণ্ড-কবিতার সংকলন। এখানেও ভক্তিবাদ প্রবল। তৃতীয় কাব্য হিমাদ্রিকুসুমে (১৯৮৭) ধর্মবোধ অধিকতর প্রবল। "প্রতিদিন উপাসনা ও চিন্তাদ্বারা প্রাণে যে সকল ভাব পাইতাম, তাহা একখানি পুস্তকে লিখিয়া রাখিতাম, তাহারই কয়েকটি ভাব সেই সময়েই কবিতাতে নিবদ্ধ করিয়াছি।" (বিজ্ঞাপন) প্রকৃতি বর্ণনা ও নারী-রূপ বর্ণনায় কবির রসগ্রাহী মনের পরিচয় আছে।

চতুর্থ কাব্য পুষ্পাঞ্জলিতে (১৮৮৮) ভগবদভক্তির সঙ্গে মিশেছে সাধারণ দুঃস্থ দুর্গত মানুষের প্রতি অনুকম্পা।

অনুতাপ, বাসনাষ্টক, সেণ্ট অগস্তিনের দেশত্যাগ, ব্রহ্মমন্দির, সুমতি ও কুমতি, নিশান্তে ভজন প্রভৃতি কবিতায় ধর্মবোধ প্রবল। প্রেমের মিলন, জলঝড়ে, তুমি ঘরে এস না—কবিতাগুলিতে মানববোধই প্রধান। কৈবর্ত মহেশসর্দার বাংলা কাব্যের আসরের এককোণে এই বোধ হয় প্রথম ঈশ্বরী পাটনীর পাশে বসবার অনুমতি পেল।

কবি ভূমিকায় বলেছিলেন, "যে সকল ফুল সচরাচর ঠাকুর পূজার জন্য ব্যবহার হয়, ইহাতে সেই জাতীয় পুষ্প অধিক।" এ কাব্যেও মাঝে মাঝে সুন্দর বর্ণনা আছে।

সূর্যের তরল করে চাতক বিহার করে,
সুখে যেন দিতেছে সাঁতার,

নবীন স্বর্ণের জলে তরুগণ দলে দলে
যেন স্নান করে অনিবার। —(পৃ—৮০)

কবির সর্বশেষ কাব্য হোল 'ছায়াময়ী পরিণয়' (১৮৮৯)। কাব্যটি রূপক ধর্মী। নামপত্রে Newman থেকে উদ্ধৃতি আছে। এ কাব্যেও ধর্মবোধের জয় ঘোষণা করা হয়েছে। বিষয় হ'ল পিতার নাম; তার কন্যার নাম ছায়া। ছায়াময়ীকে ছায়া ত্যাগ করে আসবার জন্য আহ্বান করা হ'ল। আত্মনিবেদন, বিস্মৃতি, বিচ্ছেদ, প্রস্থান, তীর্থযাত্রা, কামপুরী বা প্রলোভন, এবং পরিণয় —এই সাত পরিচ্ছেদে কাব্যটি বিভক্ত। ছড়ার ছন্দে কাব্যটি সুরু হয়েছে;

ছায়াময়ী স্বর্ণলতা বাপ সোহাগী মেয়ে,
রূপের প্রভায় উঠলো ফুটে যৌবনে পা দিয়ে।
নধর নধর বাহু দুটি, আঙ্গুল চাঁপার কলি;
হাতের পাতায় দুধ আলতায় রাখিয়াছে গুলি।
মাড়ায় কি না মাড়ায় কোমল দুটি পা;
নখের আগায় মাণিক জ্বলে, উছলে পড়ে ভা।—(পৃ-১)

নখের আভায় মাণিক জ্বলে, উছলে পড়ে ভা— এই বাণীবন্ধ সম্পূর্ণই লৌকিক সাহিত্যের। রূপক এইভাবে মাঝে মাঝে রূপকথা হতে চায়। দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্ন প্রয়াণ সার্থক রূপকথা।

হিমাদ্রিকুসুমে প্রকৃতির শোভা দেখে তিনি লিখেছিলেন, "বিধির তুলিতে এতই কি বর্ণ ছিল।" (পৃ-১২৩) এই বর্ণের কিছুটা অংশ তাঁর তুলিতেও ছিল। সেই রং "ঈশ্বরে গিয়া বিশুদ্ধ হইয়া আবার তাহা যখন সংসারে ফিরিয়া আসে, তখন তাহার কি শোভা" অবশিষ্ট থাকে, তা আমরা জানিনা। নবীনচন্দ্র তাঁর ছাগলবধ, কাব্য নিয়ে রসিকতা করেছিলেন।২ক হিমাদ্রিকুসুমে 'বৈধব্য' নামক একটি কবিতা আছে। দুটি পাখিকে নিয়ে কবিতা; বিহঙ্গের মৃত্যুতে বিহঙ্গিনী আর কাউকে আত্মদান করল না। সে সতীধর্মের পরাকাষ্ঠা দেখাল। রূপকের খাতিরেও বাস্তববোধের এমন অপহ্নতিতে আমাদের পক্ষেও অট্টহাস্য করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। একটি যথার্থ কবির এইভাবে আত্মঘাতী হ'তে দেখে শোক হয়।

॥ ৩ ॥

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর কাব্য জীবনের শেষ টেনেছিলেন মেঘদূত অনুবাদ ক'রে ; আর দ্বিজেন্দ্রনাথ সুরু করলেন তাই দিয়ে ; অর্থাৎ মেঘদূতের অপরূপ পুরীতে প্রবেশ ক'রে তিনি রূপ-অভিজ্ঞ হ'য়ে এলেন। তাঁর মেঘদূত (১৮৬০) অনুবাদ সেকালে প্রশংসিত হয়েছিল। মেঘনাদ-পূর্ববর্তী এই অনুবাদ কাব্যেও ভারতচন্দ্রীয় ভাষা অনুকৃত হয়নি। সম্ভবতঃ মাইকেল প্রশংসা এই কারণেই উচ্চারিত হয়েছিল।

স্বপ্নপ্রয়াণ

তাঁর দ্বিতীয় কাব্য 'স্বপ্নপ্রয়াণ' (১৮৭৫) বাংলা কাব্যের নিঃসঙ্গ উদাহরণ ; অথচ উনিশ শতকের কাব্যে রূপকের ছিল ছড়াছড়ি।

স্বপ্নপ্রয়াণ রূপক কাব্য ; কিন্তু রূপ বর্জিত রূপক নয়। কবি ইচ্ছা ক'রেই স্পেন্সারের আদর্শ নিয়েছেন ; কারণ স্পেন্সারের রূপক রূপবান। বোধেন্দু-বিকাশের রূপকের নিজের কোন রূপ নেই ; সে রূপবান ও রূপসীদের বর্ণনা করে মাত্র, তাদের নীতিনিষ্ঠা ব্যাখ্যা করে। শুধু রূপে নয়, অরূপেও তিনি সমান সার্থক। সঙ্গীতের কোন রূপ নেই ; আছে ধ্বনি। স্বপ্নপ্রয়াণ শুধু রূপে নয়, ধ্বনি সুষমায়ও ধনী। এই ধ্বনিসুষমা শুধু ছন্দের লালিত্যে আবদ্ধ হয়নি ; শব্দের অস্থিমজ্জায়ও পরিপূরিত। সমগ্র কাব্যে নানা অনুপ্রাস ও মিলের সমবায়ে তিনি এই সঙ্গীততরঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। স্তবকের স্থাপত্য-কলায় তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা পরিস্ফুট ; কোন কোন শব্দ বারবার উচ্চারিত হ'য়ে কোন কোন পঙক্তিকে বারবার উৎক্ষিপ্ত ক'রে তিনি বর্ণের ও ধ্বনির এক অপূর্ব মিশ্রণ ঘটিয়েছেন।

আর নানা রূপকের কুশীলব পরিচিত জগৎ থেকে অলংকৃত হ'য়ে অপরিচিত অনির্দেশ্য জগতে প্রবেশ করেছে, এবং তখনই ত হয়েছে 'স্বপ্নপ্রয়াণ'।

শিবনাথের কাব্যের ন্যায় 'স্বপ্ন প্রয়াণে'র উদ্দেশ্যও আধ্যাত্মিক ; কিন্তু পরিণতি স্পেন্সারের মত সৌন্দর্যসৃষ্টিতে। শিবনাথ এখানে বহুদূরে স'রে গেছেন।

সাতটি সর্গে সম্পূর্ণ এই কাব্য দ্বিজেন্দ্রলালের আধ্যাত্মিক চেতনার ক্রমবিকাশের এক ইতিবৃত্তিকা। মনোরাজ্যে যে কাহিনীর সূত্রপাত, নন্দনপুর

বিলাসপুর হ'য়ে বিষাদপুরে কবি এসে উপনীত হলেন তৃতীয় সর্গে। সেখান থেকে পথহারা কবি বিষাদারণ্যে এসে উপনীত হলেন। কবির আধ্যাত্মিক জগতের বহু সংগ্রাম তখনও বাকি; রসাতলে এসে সেই সংগ্রাম সম্পূর্ণ হ'ল। দাক্ষ্যের সঙ্গে দুর্ভিক্ষের, স্বাস্থ্যের সঙ্গে মারীর, মৈত্রের সঙ্গে হিংসার, এবং কৌশলের সঙ্গে অত্যাচারের যুদ্ধে শেষাক্ত দল পর্যুদস্ত হল।

সপ্তম সর্গ শান্তি প্রয়াণ। এখানে করুণা কবির ডাকে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। সব দিক থেকেই শান্তিপূর্ণ সমাধান হ'ল। আখ্যায়িকা যাই হোক, এ কাব্যের প্রকৃত সৌন্দর্য গল্প-কথন-নৈপুণ্যের উপর নির্ভরশীল নয়। সে ক্ষেত্রে 'আশাকানন' বা 'ছায়াময়ী' থেকে তিনি যে নিপুণতর শিল্পী, তা বলতে পারব না। কিন্তু অলংকরণ-শিল্পে বা মণ্ডনকলায় তাঁর দক্ষতা অনস্বীকার্য। এ কাব্যের কাব্য-ভাষা ও ছন্দ "অনুকরণের অতীত।"

"স্বপ্নপ্রয়াণ যেন একটা রূপকের অপরূপ প্রসাদ। তাহার কতরকমের কক্ষ গবাক্ষ চিত্র মূর্তি ও কারুনৈপুণ্য। তাহার মহলগুলিও বিচিত্র। তাহার চারিদিকের বাগানবাড়ীতে কত ক্রীড়াকৌশল, কত ফোয়ারা, কত নিকুঞ্জ, কত লতা বিতান। উহার মধ্যে কেবল ভাবের প্রাচুর্য নহে, রচনার বিপুল বিচিত্রতা আছে।"[৩]

হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র অধ্যুষিত কাব্য জগতে তিনি এক স্বতন্ত্র পুরী নির্মাণ করলেন। এ পুরী সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যে ভরপুর। ছন্দের ঐশ্বর্য বিবিধ—এক অসম যতির মিশ্রাক্ষর ব্যবহারে বলাকার ছন্দ-নৈপুণ্যের যেন প্রতিধ্বনি। মাইকেলের অবদান তাঁর কাছে যান্ত্রিক অনুসরণের কারণ হয়নি। আর বাংলা কাব্যে মিল প্রয়োগে এতদিন যে অবহেলা চলছিল, বিহারীলালের কাব্যে তার আংশিক অস্বীকৃতি। দ্বিজেন্দ্রনাথে তার পূর্ণ অস্বীকৃতি, এবং সচেতনভাবে; আমরা তাঁর কয়েকটি বিচিত্র মিলের উদাহরণ এখানে সংগ্রহ করেছি।

করে পদ্মফুল করে ঢুলঢুল (সূচনা)
কবি কহে ওহো, ঘুচি গেল মোহ (১ম সর্গ)
কহিল কল্পনা "এসেছ অল্প না" (২য় সর্গ)

শান্তি-ধামে যাব আমি, হইয়াছে বাসনা উদ্রেক
সংসার-বন্ধন-সেতু তুমি শুধু এক। (২য়)
হৃদয়ে খিল আঁটি একলা-টি (২য়)
রসরাজ কি বকিছ বিড়বিড়
মজাইল পীন-স্তন ক্ষীণ মাজা নিতম্ব নিবিড়। (৩য়)
দ্রোণাচার্যে দিতে পারে বাণ শিক্ষা
এমনি মুখের তেজ! চক্ষে তার বিরাজে কামিখ্যা (৩য়)
মরণের করিয়াছে পরাণের প্রিয়
কথায় এখন কারো কান দিবে কিও! (৩য়)
গাধায় চড়ি, লাগায় ছড়ি
অদভূত-রস কিম্পুরুষ
দুটি অধরে হাসি না ধরে,
লম্ব-উদর বেঁটে মানুষ। (৪র্থ)
বসে কাগাতোয়া, ফুলাইয়া রোঁয়া;
টুক-টাকু আহারে রসনা নড়ে, কালো যেন লোহা। (ঐ)
দন্ত করি' বলি' উঠে ভণ্ড-তপ
সহস্র না পের'তেই ঘুচিবে দরপ। (৪র্থ)
আর আমি হেতায় না রই।
দেঁতো মুখ আজি তোর না যদি থেঁতই। (৫ম)
পাতাল অবধি গগন স্পরধি' (৬ষ্ঠ)
দাঁত মেলি' উঠিল সঙ্গীন-ছুরি
নিবিড়-জলদ যেন দিশি-দিশি উঠিল চিকুরি'। (৬ষ্ঠ)
হেনকালে দিব্য এক ছাড়া পশু
দেখা দিলে সম্মুখে; সুসঙ্গ বলে 'পরশু-পরশু।' (৭ম)
সুরাসুর প্রিয় সুরা এই পিও। (৭ম)
সঙ্গে লয়্যে-যাও, পিতা অপেক্ষাও (৭ম)

উদাহরণে স্তূপাকার করা যেতে পারে। "বড়দাদার কবিকল্পনায় এত

প্রচুর প্রাণশক্তি ছিল যে, তাঁহার যতটা আবশ্যক তাহার চেয়ে তিনি ফলাইতেন অনেক বেশি। এইজন্য তিনি বিস্তর লেখা ফেলিয়া দিতেন।"

দ্বিজেন্দ্রনাথের এই মিলের অনুপমতার রহস্য হ'ল তাঁর অভাবনীয়তা। এই অভাবনীয়তাই শ্রোতা ও কবি উভয়ের নিকট যুগপৎ উচ্চহাসির কারণ। "বড়দাদা লিখিতেছেন আর শুনাইতেছেন আর তাঁহার ঘন ঘন উচ্চহাস্যে বারান্দা কাঁপিয়া উঠিতেছে।"[৪]

ধ্বনির সঙ্গে রঙের মিলটাও আশ্চর্য রকমের।

সরিৎ ত্বরিত বহে তট চুমি' চুমি'। (২য়)
কল্পনা সুধীরে উঠি, ধরি কপাট দু'টি,
আঁখির দিল ছুটি বাহির পানে। (২য়)
কভু বাদুড়ের পাখা, ঝাপটি তরু শাখা
গতি করিয়া বাঁকা বাজিয়া যায়। (৪র্থ)
ভাঙা জানালায় বায়ু ফুসলায় (৪র্থ)
পদশব্দ শুনায় এমনি ধীর—
মন্দানিলে তরঙ্গ পদার্পে যেন তীরে জলধির! (৫ম)
দাঁত মেলি উঠিল সঙ্গীন-ছুরি!
নিবিড়-জলদ যেন দিশি দিশি উঠিল চিকুরি। (৬ষ্ঠ)
ছিন্ন মেঘ-মাঝে তারা-রত্ন রাজে,
ভীরু দিগঙ্গনা-গণে বিতরি' সাহস। (৬ষ্ঠ)
মাঠ-ময় বাজি'-ওঠে ভেকের ডমরু (৬ষ্ঠ)

এখানেও সেই একই প্রকার অজস্রতা। আর শব্দ-নির্বাচনে কবি যেন ইচ্ছা ক'রেই এবং কিছুটা কালাপাহাড়ী মনোভাবে চালিত হ'য়ে কথ্য ভাষার 'ইডিয়ামে'র মহোৎসব ঘটিয়েছেন। এই কথ্য-ভাষাই বিষয়-বস্তুর বক্ষে এক আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে। 'আশাকানন'ও 'ছায়াময়ী' বা সমসাময়িক মহাকাব্যগুলি এর তুলনায় নিতান্তই হতমূল্য। কারণ হেমচন্দ্র উক্ত কাব্যদ্বয়ে রূপক দুইটির একটিকেও রূপবান করতে পারেন নি; অথচ ঈশপ বা বিষ্ণু শর্মার গল্পের সারল্যও তাঁর কাহিনীতে নেই। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' সে-ক্ষেত্রে মহাকাব্যের বিরুদ্ধে একটা 'চ্যালেঞ্জ'। যে জগৎ স্পর্শাতীত, দ্বিজেন্দ্রনাথ শব্দে অলঙ্কারে ও কাহিনীর ধ্রুপদী আলাপে তাকে পাঠকের হাতের মুঠোয় এনে দিলেন—কোন

বীরবরের পুণ্য কাহিনী বর্ণনা ক'রে নয়, মনোজগতের এক বিচিত্র রূপকের ফানুস উড়িয়ে। উড়েছে মর্ত্য থেকে, কিন্তু উধাও হ'ল কোথায় কে জানে! রূপকথার ত ঘরের ঠিকানা নেই!

গীতিকবিতা

এই যুগে গীতিকবিতা প্রধান হ'য়ে উঠ্‌ছে—তত্ত্ববিদ্‌দের অনিচ্ছা সত্ত্বেও, মহারথীদের সমালোচনা সত্ত্বেও। গাথাকবিতা ও মহাকাব্যও লিখিত হচ্ছে—কিন্তু গীতিকবিতার অজস্র আবির্ভাবে তারা পিছু হঠ্‌ছে। অজস্রতা সর্বদা কাব্যগত উৎকর্ষের কারণ নয়। বিশেষ ক'রে সমালোচকের পক্ষে নির্বাচন কাজ কঠিন হ'য়ে পড়ে।

গীতিকবিতা ও গাথাকবিতা এ যুগে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। গীতিকবিদের আনুকূল্যের ফলেই গাথাকবিতার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে।

রূপকের অঙ্গনে একটা রক্ষণশীলতার তর্জনী উত্তোলিত ছিল। এই সতর্ক প্রহরার মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর অতিভাষণ স্ফূর্তি পেতে পারে না। গাথা ও গীতিকবিতাই তার যোগ্যবাহন। এই যুগের কাব্যে দুইটি বিষয় প্রধান—এক জাতীয়তাবাদ, আর এক নারী-প্রেম। এই দুইটি প্রসঙ্গেই অতিশয়তা ছিল। এই অতিশয়তার সমগ্র কারণ জাতীয় পরিবেশের মধ্যে খুঁজলে সঙ্গত ব্যাপার হবে না, বিদেশী প্রভাবও রয়েছে। এ যুগের কাব্য-আদর্শ হলেন বাইরণ ও মূর। লংফেলো, গোল্ডস্মিথ ও কাউপার এঁদের সহযোগী, কিন্তু নেতা নন। নীতিবাগিশতার ক্ষেত্রে শেষোক্ত দল সক্রিয়। বাইরণ ও মূর দেশপ্রেম ও নারীপ্রেমের অতি মুখর কীর্তনিয়া। এই দুই কবির রচনা স্থূলতায় ও কৃত্রিমতায় পরিপূরিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মুখ্য গীতিকবি হলেন বলদেব পালিত, রাজকৃষ্ণ রায়, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরিশচন্দ্র নিয়োগী, আনন্দচন্দ্র মিত্র, অধরলাল সেন, দীনেশচরণ বসু ও ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় এঁদের নামই বারবার দেখা যায়। গাথাকবিতা ও গীতিকবিতা উভয় ক্ষেত্রেই এঁরা বিচরণ করেছেন।

॥ ১ ॥

বলদেব পালিত প্রবাসী; তাই তাঁর কাব্যে সমসাময়িক বাংলা কাব্যের

প্রচুর প্রাণশক্তি ছিল যে, তাঁহার যতটা আবশ্যক তাহার চেয়ে তিনি ফলাইতেন অনেক বেশি। এইজন্য তিনি বিস্তর লেখা ফেলিয়া দিতেন।"

দ্বিজেন্দ্রনাথের এই মিলের অনুপমতার রহস্য হ'ল তাঁর অভাবনীয়তা। এই অভাবনীয়তাই শ্রোতা ও কবি উভয়ের নিকট যুগপৎ উচ্চহাসির কারণ। "বড়দাদা লিখিতেছেন আর শুনাইতেছেন আর তাঁহার ঘন ঘন উচ্চহাস্যে বারান্দা কাঁপিয়া উঠিতেছে।"[৪]

ধ্বনির সঙ্গে রঙের মিলটাও আশ্চর্য রকমের।

সরিৎ ত্বরিত বহে তট চুমি' চুমি'। (২য়)
কল্পনা সুধীরে উঠি, ধরি কপাট দু'টি,
আঁখির দিল ছুটি বাহির পানে। (২য়)
কভু বাদুড়ের পাখা, ঝাপটি তরু শাখা
গতি করিয়া বাঁকা বাজিয়া যায়। (৪র্থ)
ভাঙা জানালায় বায়ু ফুসলায় (৪র্থ)
পদশব্দ শুনায় এমনি ধীর—
মন্দানিলে তরঙ্গ পদার্পে যেন তীরে জলধির! (৫ম)
দাঁত মেলি উঠিল সঙ্গীন-ছুরি!
নিবিড়-জলদ যেন দিশি দিশি উঠিল চিকুরি। (৬ষ্ঠ)
ছিন্ন মেঘ-মাঝে তারা-রত্ন রাজে,
ভীরু দিগঙ্গনা-গণে বিতরি' সাহস। (৬ষ্ঠ)
মাঠ-ময় বাজি'-ওঠে ভেকের ডমরু (৬ষ্ঠ)

এখানেও সেই একই প্রকার অজস্রতা। আর শব্দ-নির্বাচনে কবি যেন ইচ্ছা ক'রেই এবং কিছুটা কালাপাহাড়ী মনোভাবে চালিত হ'য়ে কথ্য ভাষার 'ইডিয়ামে'র মহোৎসব ঘটিয়েছেন। এই কথ্য-ভাষাই বিষয়-বস্তুর বক্ষে এক আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে। 'আশাকানন'ও 'ছায়াময়ী' বা সমসাময়িক মহাকাব্যগুলি এর তুলনায় নিতান্তই হতমূল্য। কারণ হেমচন্দ্র উক্ত কাব্যদ্বয়ে রূপক দুইটির একটিকেও রূপবান করতে পারেন নি; অথচ ঈশপ বা বিষ্ণু শর্মার গল্পের সারল্যও তাঁর কাহিনীতে নেই। 'স্বপ্নপ্রয়াণ' সে-ক্ষেত্রে মহাকাব্যের বিরুদ্ধে একটা 'চ্যালেঞ্জ'। যে জগৎ স্পর্শাতীত, দ্বিজেন্দ্রনাথ শব্দে অলঙ্কারে ও কাহিনীর ধ্রুপদী আলাপে তাকে পাঠকের হাতের মুঠোয় এনে দিলেন—কোন

বীরবরের পুণ্য কাহিনী বর্ণনা ক'রে নয়, মনোজগতের এক বিচিত্র রূপকের ফানুস উড়িয়ে। উড়েছে মর্ত্য থেকে, কিন্তু উধাও হ'ল কোথায় কে জানে! রূপকথায় ত ঘরের ঠিকানা নেই!

গীতিকবিতা

এই যুগে গীতিকবিতা প্রধান হ'য়ে উঠ্‌ছে—তত্ত্ববিদ্‌দের অনিচ্ছা সত্ত্বেও, মহারথীদের সমালোচনা সত্ত্বেও। গাথাকবিতা ও মহাকাব্যও লিখিত হচ্ছে—কিন্তু গীতিকবিতার অজস্র আবির্ভাবে তারা পিছু হঠ্‌ছে। অজস্রতা সর্বদা কাব্যগত উৎকর্ষের কারণ নয়। বিশেষ ক'রে সমালোচকের পক্ষে নির্বাচন কাজ কঠিন হ'য়ে পড়ে।

গীতিকবিতা ও গাথাকবিতা এ যুগে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। গীতিকবিদের আনুকূল্যের ফলেই গাথাকবিতার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে।

রূপকের অঙ্গনে একটা রক্ষণশীলতার তর্জনী উত্তোলিত ছিল। এই সতর্ক প্রহরার মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর অতিভাষণ স্ফূর্তি পেতে পারে না। গাথা ও গীতিকবিতাই তার যোগ্যবাহন। এই যুগের কাব্যে দুইটি বিষয় প্রধান—এক জাতীয়তাবাদ, আর এক নারী-প্রেম। এই দুইটি প্রসঙ্গেই অতিশয়তা ছিল। এই অতিশয়তার সমগ্র কারণ জাতীয় পরিবেশের মধ্যে খুঁজলে সঙ্গত ব্যাপার হবে না, বিদেশী প্রভাবও রয়েছে। এ যুগের কাব্য-আদর্শ হলেন বাইরণ ও মূর। লংফেলো, গোল্ডস্মিথ ও কাউপার এঁদের সহযোগী, কিন্তু নেতা নন। নীতিবাগিশতার ক্ষেত্রে শেষোক্ত দল সক্রিয়। বাইরণ ও মূর দেশপ্রেম ও নারীপ্রেমের অতি মুখর কীর্তনিয়া। এই দুই কবির রচনা স্থূলতায় ও কৃত্রিমতায় পরিপূরিত।

উনবিংশ শতাব্দীর মুখ্য গীতিকবি হলেন বলদেব পালিত, রাজকৃষ্ণ রায়, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরিশচন্দ্র নিয়োগী, আনন্দচন্দ্র মিত্র, অধরলাল সেন, দীনেশচরণ বসু ও ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় এঁদের নামই বারবার দেখা যায়। গাথাকবিতা ও গীতিকবিতা উভয় ক্ষেত্রেই এঁরা বিচরণ করেছেন।

॥ ১ ॥

বলদেব পালিত প্রবাসী; তাই তাঁর কাব্যে সমসাময়িক বাংলা কাব্যের

দুন্দুভিনিনাদ প্রতিধ্বনিত হয়নি। তাঁর রচিত গ্রন্থ হ'ল কাব্যমঞ্জরী (১৮৬৮), কাব্যমালা (১৮৭০), ললিত কবিতাবলী (১৮৭০), ভর্তৃহরিকাব্য (১৮৭২), ও কর্ণার্জুন কাব্য (১৮৭৫)।

এই পাঁচখানি কাব্যকে মোটামুটি দুইশ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে—খণ্ডকবিতা বা গীতিকবিতা এবং আখ্যায়িকা-কাব্য।

কাব্যমঞ্জরী বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিল। (বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১২৭৯)। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসার কারণ সম্ভবত এই কাব্যের নীতিপ্রবণতা।

এই কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই রূপকধর্মী। সূচীপত্র থেকেই আমরা এর চরিত্র-ধর্ম অনুমান করতে পারব : ভূমিকা, কবিতার জন্ম, স্বীয়া ও পরকীয়া নায়িকা, কাম-বন, প্রভাত মধ্যাহ্ন প্রদোষ এবং রজনী, জাগৃতি সুষুপ্তি ও স্বপ্ন, আশা প্রমোদ ও প্রেম, বিদ্যা এবং ধন, আলস্য এবং পরিশ্রম, কাল এবং আশা, দুঃখ, ঈশ্বরস্তোত্র, পরিবর্তন, তমিস্রার প্রতি, আকাশের প্রতি, চন্দ্রের প্রতি, মেঘের প্রতি, গঙ্গার প্রতি।

'কবিতার প্রতি'তে ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুপ্রসঙ্গ আছে। 'স্বীয়া ও পরকীয়া নায়িকা' মঙ্গলকাব্যীয় আঙ্গিকে লেখা। 'কাম-বন' কবিতাও রূপক। শুধু বর্ণনায় আদিরসের কিছু বাড়াবাড়ি। সর্বত্রই এই আদিরস। তার মধ্যে কবির কৃতিত্ব এই যে, তিনি বাস্তব বর্ণনা দিয়েছেন ; কবির চোখ ছিল দেখবার চোখ, আর সেই দৃষ্টিশক্তির সঙ্গে মিলেছে প্রকাশ-শক্তির।

> বিধু আস্যে, মৃদু হাস্যে, কৌমুদি প্রকাশে ;
> সিঁথীছলে তারাগণ শোভে ভালাকাশে। (রজনী)

> তরঙ্গের ছলে ক্রমে বৃদ্ধি পায়,
> মদন তপন তাপে ঈষত্তপ্ত কায় !
> বরষায় পুষ্ট দেহ দেখিয়া তোমার,
> ভাবে তারা প্রগল্‌ভার যৌবন-বিস্তার ;
> নির্মল বালিকা ভাব থাকে না তখন,
> সঙ্গম-লালসা-লোল পঙ্কিল জীবন।
> বিভ্রমেতে নাভী যথা দেখায় যুবতী,
> জলভ্রমি দৃষ্ট হয় তোমাতে তেমতি ;

নয়ন-হিল্লোলে ধনী যুব-মন কাড়ে,
তোমার তরঙ্গ-রঙ্গে পাড় ভাঙ্গি পড়ে। (গঙ্গার প্রতি)

রূপকের আড়ালে এই আদিরসের বাড়াবাড়ি বঙ্কিমচন্দ্র সহ্য করেছিলেন ; সম্ভবত এই জাতীয় রূপকের সঙ্গে গুপ্তজার শিষ্য বঙ্কিমের আন্তর মিল আছে। নইলে "আদিরসের সংশ্রব মাত্র নাই" এই প্রশংসাপত্র তিনি দিতে পারতেন না।

কিন্তু যেখানে তিনি রূপকের নির্মোক ত্যাগ করলেন, সেখানে তিনি ভৎর্সিত। তাঁর কাব্যমালা ও কাব্যমঞ্জরী প্রায় একই সময়ে লেখা।

কবি তাঁর কাব্য-সাধনার মূল উদ্দেশ্য সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন :

বড় বড় কবি যাঁরা, বীর-রস-ভক্ত তাঁরা
সে রসে মজিতে ধনি পারে কি সবাই ?
বহিতে গাণ্ডীব-ভার, পার্থ বিনা সাধ্য কার,
আমি প্রেম ফুলধনুঃ কেবল নোয়াই।
মধুর পিরীতি রস আমি ত ইহারি বশ,
অন্য রস কটু বলে স্পর্শিতে না চাই।
আশা করি ভালবাসা, গাঁথিয়া কোমল ভাষা,
আদি রসে ডুবাইয়া তোমারে যোগাই।
(প্রিয়তমা শ্রীমতী-র প্রতি)

পালিত মহাশয়ের 'চুম্বন', 'নারীর প্রেম' কবিতা দুইটি যথাক্রমে Shelley-র Love's Philosophy এবং Keats-এর La bella Dame Sans Merci কবিতাদ্বয়ের অনুপ্রেরণায় লিখিত। কবিতা দুটিতেই প্রেমতত্ত্বের দুইদিক আলোচিত হয়েছে। আসঙ্গলিপ্সা বিশ্ববিধানের অপরিহার্য অংশ ব'লে বর্ণিত হয়েছে।

এইরূপ দেখ যত রমণী, রমণ ;
চুম্বন রসেতে মত্ত সবাকার মন।
প্রকৃতির যদি এই হইল নিয়ম,
তুমি আর কেন তার কর ব্যতিক্রম ?
And the sunlight clasps the earth
And the moonbeams kiss the sea :

What is all this sweet work worth
If thou kiss not me?

দ্বিতীয়টি হ'ল এই ঃ

একদিন অস্তগামী দিবাকর করে,
স্নানান্তে বসিয়া কোন সরসীর ধারে,
দেখিলাম এক নারী, নম্রা কুচভারে,
ভাঙিল মৃণাল এক মৃণালিণী-করে।
জলে তারে পুনরায় ডুবায়ে সাদরে,
সোপানে বসিয়া ধনী, স্বেচ্ছা অনুসারে
লিখিল একটি কথা দেখায়ে আমারে,
'যাক প্রাণ তবু প্রেম থাকুক অন্তরে?'
যে লেখা পড়িয়া, তার রূপ-রত্নাকরে
মগ্ন হয়ে তারে আমি সপিলাম মন।
কিন্তু কি আশ্চর্য! তারি দু-দিনের পরে
আমারে ত্যজিয়া বালা করিলা গমন;
উভয় সমান জ্ঞান হইল তখন,
নারীর পিরীতি আর বালির লিখন।

কীট্‌সের ঐ কবিতাটি যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই দেখবেন এখানে নারী-প্রেমের সেই একই রহস্যময়তা অপেক্ষাকৃত দুর্বলতর ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

কবির 'পয়োধর' কবিতাটি বঙ্কিমচন্দ্রের কটূক্তির কারণ হয়েছিল। পয়োধর পুরাতন রীতির কবিতা। এখানে সংস্কৃত কাব্যের বিখ্যাত অলংকার ব্যবহৃত হয়েছে। আর তা ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত অলংকার ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলিও ভারত-অনুযায়ী। কাব্যমালায় পুরাতন রীতি ও নবীন রীতির একত্র সাক্ষাৎ মেলে।

একই বৎসর প্রকাশিত হয় কবির 'ললিত কবিতাবলী' (৩০ ডিসেম্বর ১৮৭০)। কবি সংস্কৃত ছন্দ এই প্রথম পুরোপুরি গ্রহণ করলেন। উপজাতি, মালিনী প্রভৃতি ছন্দ বঙ্গভাষায় অনূদিত হল। এই কাব্য বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক প্রশংসিত হল। "দেখা যাইতেছে যে, লেখকের কবিত্বশক্তি এবং শিক্ষা, দুই-ই আছে। তবে কেন তিনি কাব্যমালা লিখলেন?" (বঙ্গদর্শন, পৌষ,

১২৭৯) পালিত মহাশয়ের অপর দুইটি কাব্য 'ভর্তৃহরি কাব্য' (১৮৭২) ও 'কর্ণার্জুন' কাব্য (১৮৭৫), সংস্কৃত ছন্দে লেখা।

ভর্তৃহরি কাব্যকে বাংলা কাব্য বলা যুক্তিহীন। তাহলে চর্যাগীতিকা-পূর্ববর্তী গাথা-সাহিত্যও বাংলা কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে। ডাঃ সুকুমার সেন বলেছেন, "ভর্তৃহরির ভাষা বিভক্তিহীন সংস্কৃত।"[৪ক]

ফুল সম সুকুমারী, দীর্ঘ-কেশা, কৃশাঙ্গী
অচপল-তড়িতাভা সুন্দরী, গৌরকান্তি,
মধুর নব-বয়স্কা, পদ্মিনী অগ্রগণ্যা,
যুবক নয়ন-লোভা কামিনী কামশোভা।

"তিনি (ভারতচন্দ্র) যদি এই সকল ছন্দে স্বীয় কাব্যগুলিকে অলংকৃত করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে এতদিন অস্মদেশীয় কবিতার যে কত উন্নতি হইত, তাহা বলা যায় না। কবি-তিলক শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদনকে ইংরাজী মতে অমিত্রাক্ষর পয়ার লিখিতে হইত না..." (ভর্তৃহরি কাব্য, ভূমিকা)।

কবির কর্ণার্জুন কাব্য তাঁর এই নবীন প্রাচীন রীতি-প্রেমের সর্বশেষ সন্তান। এই কাব্যের বিষয়-নির্বাচনে তাঁর স্বকীয়তা আছে। "পাণ্ডবদিগের পক্ষপাতী হইয়া মহর্ষি দ্বৈপায়ন মহানুভব কর্ণের প্রতিকৃতি তদনুরূপ বর্ণে চিত্রিত না করাতে আমি এই কাব্যখানি লিখিতে বাধ্য হইয়াছি।" কর্ণার্জুন কাব্যে কবি-দৃষ্টির বিশিষ্টতা সত্ত্বেও এই সংস্কৃত-ছন্দ-আসক্তিই এই কাব্যকে বিপথগামী করেছে।

তাঁর প্রবাস জীবন বাংলা কাব্যের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ ছিল। এই প্রবাসী কবির মধ্যে বাংলা কাব্যের ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতার এক নবীন রূপ ফুটে উঠেছিল।

কিন্তু সমসাময়িক কালের তথাকথিত নীতিবোধের চাপে এই উদ্ভিন্ন কাব্য অংকুরটি বিনষ্ট হয়।

॥ ২ ॥

হরিশচন্দ্র নিয়োগী, রাজকৃষ্ণ রায় এবং নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের তিনখানি কাব্য একদা বালক রবীন্দ্রনাথ একত্রে সমালোচনা করেছিলেন। সেই থেকে এই তিনজন কবির নাম একত্রে উচ্চারিত হ'য়ে আসছে।

রাজকৃষ্ণ রায় যথার্থই একজন দ্রুত কবি। ঈশ্বর গুপ্ত ও দাশরথি রায়—উভয়ের কিছু কিছু বিশিষ্টতা তাঁর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল।

তখনকার কাব্য-বিষয় তাঁর কবিতাসমূহেরও বিষয়-বস্তু—স্বদেশ, প্রকৃতি ও রমণী। কিন্তু কোনটি সম্পর্কেই তিনি দৃষ্টি-স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিতে পারেন নি।

রাজকৃষ্ণের কাব্য-গ্রন্থের সংখ্যা কম নয়। নিম্নে তালিকা দেওয়া হ'ল: (১) বঙ্গভূষণ—১৮৭৪; (২) মহন্ত বিলাপ—১৮৭৫; (৩) কবিতা কৌমুদী দুই ভাগ—১৮৭৫; (৪) ভারতে যুবরাজ—১৮৭৫; (৫) অবসর সরোজিনী—প্রথম দুইভাগ—১৮৭৬, ১৮৭৯; (৬) স্তবমালা—১৮৭৬, (৭) ভারত-ভাগ্য—১৮৭৭; (৮) নিশীথ চিন্তা—১৮৭৭; (৯) নিভৃত নিবাস—১৮৭৮; (১০) ভারত গান—১৮৭৯; (১০) দেব-সঙ্গীত—১৮৭৯ (?); (১১) ভারত-সান্ত্বনা—১৮৭৯ (?); (১২) শিশু কবিতা—১৮৮১; (১৩) শ্মশান ও জীবন—১৮৮৩; (১৪) কেশব বিয়োগ—১৮৮৩; (১৫) পূজার বাজার—১৮৮৮; (১৬) কানাকড়ি—১৮৮৮; (১৭) সরল কবিতা—১৮৯২। এ ছাড়া (১৮) রামায়ণ—১৮৭৭-৮৫; (১৯) মহাভারত—১৮৮৬-৯১; (২০) কল্কি পুরাণ—১৮৯২ পদ্য-অনুবাদ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থগুলির মধ্যে বেশ এক অংশ শিশুপাঠ্য কবিতা; অপরাংশ সাময়িক ঘটনার উপর লিখিত; আর এক অংশ ভক্তিসূচক স্তব মাত্র; বাকী অংশ কাব্য-আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে।

অক্ষয়কুমার বড়াল সম্পাদিত তাঁর কবিতা-সংকলন মোটামুটি তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতারই সংগ্রহ। তাঁর দেশপ্রেমমূলক কবিতায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভারত-জননী বিধবা বা কাঙালিনীর রূপ ধ'রে এসে ভারতের দুঃখে অশ্রুপাত করছেন, যথা ভিখারিণী (অবসর সরোজিনী—১ম ভাগ); কখনও "শূন্য কৌটা" দেখে কবি বলছেন, কৌটাটিও সিন্দূরশূন্য, ভারতও সম্পদশূন্য। দুইখানি চিত্রপট, অশনি পতন, এই সেই ভস্মরাশি, দৈববাণী, শুকপক্ষী, কালের শৃঙ্গবাদন, ভূতলে বাঙ্গালীজাতি, ভারতভাগ্য, বঙ্গবধূর কুন্তল, প্রতিধ্বনি প্রভৃতি কবিতা দেশপ্রেমমূলক। এখানে ভঙ্গিটি পুরোপুরিই হেমচন্দ্রীয়। বঙ্গবধূর কুন্তল বর্ণনা করতে গিয়েও চিতোর রমণীর কর্তিত কুন্তলে কেমন ক'রে রাজপুত বীরের ধনুকের ছিলা হয়েছিল, এই

প্রসঙ্গ বলার লোভ সংবরণ করতে পারলেন না। প্রতিধ্বনি কবিতায় হঠাৎ 'সাবুদ্দিনে'র প্রবেশ হ'ল; কারণ তিনি প্রথম মুসলমান বিজয়ী।

আনুষ্ঠানিক কবিতাও অনেক লিখেছেন; 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র অভিনয় দর্শন, সারস্বত সম্মেলন (কলেজ রি-য়ুনিয়ন), মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু, মোহান্ত মামলা, রাজপ্রতিনিধির আগমন, ভাওয়ালের রাজা কালীনারায়ণ রায় ও কবিরাজ রমানাথ সেনের মৃত্যু উপলক্ষে কবিতা লেখা হোল। এই ধরণের রচনার সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। এগুলি সংবাদ-প্রভাকরের ঈশ্বর গুপ্তীয় পদ্য-সাংবাদিকতার সমগোত্রীয়।

প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতাও তিনি বহু লিখেছেন; এগুলির অধিকাংশই কখনও ইংরেজীর অনুসরণ, যেমন নিভৃত নিবাসে শেলীর অনুবাদ; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিহারী-অনুকরণ, যথা একটি কুসুম, নলিনী, ঊষা, প্রভৃতি।

মাঝে মাঝে নায়িকা-জিজ্ঞাসা আছে:

কে তুমি লতিকা কুঞ্জে বসি একাকিনী
গুন্ গুন স্বরে গীত
গাইয়া আপন চিত
করিতেছে পুলকিত, অয়ি সুহাসিনী!
(—কে তুমি, অবসর সরোজিনী—২য় ভাগ)

উজ্জল বরণময়ী মধুর হাসিনীবালা
সুনীল গগন কোলে করিছে প্রভাত খেলা। (ঊষা—ঐ)

এই জিজ্ঞাসা সম্পূর্ণই বিহারী-জিজ্ঞাসা; এমন কি ভাষা পর্যন্ত।

মাঝে মাঝে আত্ম-জিজ্ঞাসাও আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে জিজ্ঞাসা দেশের দুর্ভাগ্য-কীর্তনে সদ্গতি লাভ করে। আন্তরিকতার স্পর্শ কোথাও যে পড়েনি, তা নয়।

জনম আমার ওই গঙ্গার সুন্দর কূলে;
যেখানে বিহঙ্গদল গান গায় মন খুলে; (স্বদেশ-প্রিয়ের শেষ দেখা)

গাথাকবিতা তিনি একাধিক রচনা করেছেন; এবং নিভৃত নিবাস নানা রকম অভিনবত্ব প্রদর্শন-প্রয়াসের জন্য উল্লেখযোগ্য। পরে নিশীথ চিন্তা কাব্যখানি এই কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এখানে কবি নানা রকম দীর্ঘপদী ছন্দ রচনা করেছেন। একটির নমুনা এখানে তুলছি—

পবিত্র জাহ্নবী-জল, বিজয় লইয়া করে, নয়নের জল সহ সুগভীর শোকোচ্ছ্বাসে।
খাওয়াইল নলিনীর, প্রাণশূন্য দেহখানি, পড়িল গড়ায়ে জল ঝর ঝরে চারিপাশে।

কবি একে বলেছেন, বহুপদী-দীর্ঘরেখা ছন্দ।

বস্তুতঃ এটি পয়ারেরই রকমফের। ভারত-সান্ত্বনা কাব্যে তৃতীয় দৃশ্যে নতুন ছন্দ দেখতে পাই। কিন্তু ছন্দটি আসলে স্বরবৃত্ত বা লৌকিক ছন্দ।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের তরল সংস্করণও তিনিই প্রথমে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন; গিরিশচন্দ্রের হাতে তার "উন্নতি" শুধু অধিকতর জনপরিচিতি সৃষ্টি করেছিল।

গন্ত-কবিতার নমুনাও তাঁর হাত থেকে বেরিয়েছে। কাব্যমূল্য তার যাই থাক, এই প্রয়াস দুঃসাহসিক সন্দেহ নেই। তবে অভিনব বলা চলে না; কারণ শুধু নামটুকুই তাঁর অভিনব। আসলে এ বঙ্কিম-অনুকৃতি। বঙ্কিমের গন্তপন্ত ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গদর্শনেই এগুলি মুদ্রিত হয়।

রাজকৃষ্ণ রায় ব্রজবুলি পদ লিখেছেন, সনেট লিখেছেন—অর্থাৎ তিনি প্রমাণিত করেছেন যে, তিনি অক্লান্তকর্মা; কিন্তু অনন্যমনা নন।

হরিশচন্দ্র নিয়োগী এক সময়ে সাধারণী, আর্যদর্শন ও বান্ধবের জনপ্রিয় কবি ছিলেন। তাঁর দুঃখসঙ্গিনী (১৮৭৫), ভারতে সুখ (১৮৭৫), বিনোদমালা (১৮৭৮), মালতীমালা (১৮৯৯), ও সন্ধ্যামণি (১২২৬)—সবগুলিই গীতিকবিতার সংকলন।

দুঃখসঙ্গিনীর কবি হিসাবেই তিনি সর্বাধিক খ্যাত। "দুঃখসঙ্গিনীতে আর্য সঙ্গীত নাই, আর্য রক্ত নাই, যবন নাই, রক্তারক্তি নাই; ইহাতে হৃদয়ের অশ্রুজল, হৃদয়ের রক্ত ও প্রেম ভিন্ন আর কিছুই নাই।"[৪খ]

বান্ধবপত্রিকায় সমালোচনাছলে বলা হ'ল: "বঙ্গে কুলকামিনী উপাস্য দেবতা, কবিতা উপাসনা মন্ত্র।" পরে উপদেশ দেওয়া হ'ল: "বলি এদেশে বীরবালা, ব্রজবালা, আঁচল ও আধঘোমটার কথা কিছুদিনের জন্য পরিত্যাগ করিলেই কি ভাল হয় না।" ভাষা সম্পর্কে বলা হল, "সৌন্দর্যের এবং মাধুর্যের এই একরূপ হেলান দোলান বর্ণনায় এদেশের অল্প লোক তাঁহার সমকক্ষ।"[৪গ] আর্যদর্শনে পূর্ণচন্দ্র বসু লিখলেন, "পদগুলি সমান ওজনে

বহিয়া যায়। কোথাও থামে না।"[৫] ভারতীয় পত্রিকায় অবশ্য ভাষা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপিত হ'ল : "শব্দের ঘোরঘটা একটু বেশি প্রবল।"[৬]

এ কাব্যে দেশপ্রেমপ্রসঙ্গ একেবারে নেই তা ঠিক নয়। তখন দেশপ্রেম-প্রসঙ্গ পরিহার করা অসম্ভব ছিল।

তাহাতে বাঙ্গালী জন্ম
দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধা আছে চিরদিন ;
ভীমতুঃখ পারাবার, উচ্ছ্বসিছে অনিবার
তুঃখেতে কাঁদিয়া প্রাণ হইবে বিলীন। (আক্ষেপ)

এ ছাড়া জন্মভূমির উপরও কবিতা আছে। 'সরস্বতী পূজা' কবিতায় পরাধীন দেশের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হ'ল। বান্ধবের দেশভক্ত সমালোচক লিখলেন, "উল্লিখিত পংক্তিচয় পাঠ করিলে কাহার আশা না উথলিয়া উঠে ? কে না কবিকে পুনঃ পুনঃ আশীর্বাদ করে ?" 'ভারতে সুখ' আনুষ্ঠানিক কবিতা, রাজপ্রতিনিধির অভ্যর্থনা-সূচক। দেশভক্তি ও রাজভক্তি তখন যে কোন সময় স্থান পরিবর্তন করত।

কবির তৃতীয় কাব্য 'বিনোদমালা'। উপহার কবিতায় কবি লিখলেন :

তোমাতেই বিনোদিনী,—তুমি প্রিয়তমে
প্রাণময়ী, প্রেমময়ী, প্রীতিস্বরূপিনী
পূর্ণ-প্রভা ধ্রুবতারা সংসার-গগনে ;
তুমিই বিপন্ন প্রাণে কবিত্ব রূপিনী।

বলা বাহুল্য, বিনোদিনী কবির স্ত্রী বিনোদকামিনী দেবী। বিনোদমালার বহু কবিতা, যেমন, আক্ষেপ, সরস্বতী পূজা প্রভৃতি তুঃখসঙ্গিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে কবি এগুলিকে বিনোদমালার অন্তর্ভুক্ত করেন।

বিনোদমালা ও মালতীমালা একই সুরে ধনী। বক্তব্যে সেই একই অস্থিরতা। বিনোদমালায় বলেছেন :

ও হৃদয় পুড়ে কভু হবে না অঙ্গার ;
মরমের প্রেম তব অমর অক্ষয় ;
অনলে পুড়িলে হেম বাড়ে শোভা তার,
মেঘমুক্ত শশধর কত জ্যোতির্ময় !
(ভালবাসার তুলনা, পৃ—১৭৯)

মালতীমালায় বলেছেন :

গঙ্গা যমুনার মত মিলিত দু'জনে
বহিবে সলিল চিহ্ন কিন্তু আমরণ ;
দুই স্রোত এক হ'য়ে বহিবে মিলনে,
অতৃপ্ত বাসনা কিন্তু হবে না পূরণ। (অতৃপ্ত বাসনা, পৃ-১০)

ভাষায় ও বক্তব্যে বড় বেশি পার্থক্য নেই। দুই একটি কবিতায় একটু রক্তমাংসের উত্তাপ পাওয়া যায়।

আর নয়, বিদায় লো! যাই এইবার ;
সুরক্ত অধরোপরি
বিদায়-চুম্বন করি,
চাপিয়া উরসে বর শ্রীঅঙ্গের ভার,
হাসিয়া বিদায় দাও, প্রেয়সি! আমার। (পৃ—২৭)

সাধারণী পত্রিকায় দুঃখসঙ্গিনী সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয় : "দুঃখসঙ্গিনী পাঠ করিয়া যাঁহার দুঃখবেগ উচ্ছলিত না হয়, তিনি হয় দেবতা, না হয় পশু।"[৭]

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩-১৯২২) 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' (দুইখণ্ডে ১৮৫৭ ও ১৮৭৭),'আর্যসঙ্গীত' (দুইখণ্ডে, ১৮৮০-১৯০২), ও 'সিন্ধুদূত' (১৮৮৩) কাব্যের কবি। তবে তিনি 'ভুবনমোহিনী প্রতিভার' কবি হিসাবেই সমধিক খ্যাত। এবং খ্যাতির সমসাময়িক কারণ যাই হোক, বর্তমান কারণ রবীন্দ্রনাথের বালকবয়সের সমালোচনা। 'জীবনস্মৃতি'তে এই ঘটনাটির রবীন্দ্রনাথ এক সরস বর্ণনা দিয়েছেন।[৮]

সত্যই ভুবনমোহিনী প্রতিভা তখন প্রচুর অভ্যর্থনা লাভ করেছিল। শুধু স্ত্রীলোক ভ্রমেই এই অভ্যর্থনা নয়। এই কাব্যের বক্তব্য এবং ভাষার মধ্যে এমন একটা সরবতা (loudness) আছে, যা তখনকার কালের সমাজমনের নিকটবর্তী। ঠিক একই কারণে হরিশচন্দ্র নিয়োগীর দুঃখসঙ্গিনী সাহিত্যিক মহলে সম্বর্ধনা লাভ করেছিল। ভুবনমোহিনী প্রতিভাতে দেশপ্রেম ও নারীপ্রেম প্রধান বিষয়-বস্তু। প্রথমোক্ত বিষয়ে উদ্দীপনার অভাব নেই। দ্বিতীয় বিষয়ে আক্ষেপই প্রধান। ভুবনমোহিনী প্রতিভার 'পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী' তৎকালে বিশেষ প্রশংসিত হয়। এই কবিতাটি আলোচনা করলেই কবির কাব্য-বৈশিষ্ট্য দীপ্যমান হবে। খাঁচার

পাখির মুক্ত জীবনের জন্য আকূতি স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু সে পাখি বাঙ্গালীর চারিত্রিক দুর্বলতা নিয়ে জ্ঞানগম্ভীর আলোচনার পর বলছে :

বীরের সঙ্গীত, বীরের মত, গাইব তখন পারিব যত,
এই পক্ষপুট তুলিয়া উল্লাসে !
হবে প্রতিধ্বনি, প্রান্তর সাগরে, নদনদী হ্রদ ভূধরে গহ্বরে
পবনে বহিয়া সে ধ্বনি সত্বরে
বিলয় করিবে অনন্ত আকাশে।

এই ধরনের বিলাপ ও দেশপ্রেম নিম্নলিখিত কবিতাগুলিতেও দেখা যায় : অকৃতজ্ঞ শুক, অলস-যুবক, দরিদ্র-যুবক, শৈশব-স্বপন, হিমালয়-বিলাপ।

পশু পক্ষী, এমন কি পাহাড় পর্বত পর্যন্ত বিলাপ করছে—এমনই বিলাপের সার্বজনীনতা ও প্রচণ্ডতা। দুই-একটি গাথাকবিতাও আছে, যেমন দুঃখিনী মহিষী। একটি কবিতায় রামমোহন প্রশস্তি আছে। কবির বলার ভঙ্গির মধ্যে একটা সতেজ ভাব আছে; তাছাড়া বিবৃতির মধ্যে একটা গতি আছে।

আর্যসঙ্গীতে'র দুইটি অংশ—দ্রৌপদী নিগ্রহ ও জাতীয় নিগ্রহ। জাতীয় নিগ্রহের বক্তব্য ও ভঙ্গি 'ভুবনমোহিনী'র মতই; যে কোন বিষয় অবলম্বন ক'রে দেশের দুর্ভাগ্যে অশ্রুমোচন।

'সিন্ধুদূত'-এ কবির উচ্চাশা প্রকাশ পেয়েছে। প্রকাশকের নিবেদনে ছন্দের নূতনত্ব দাবী করা হয়েছে; এবং ছন্দের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গ্রন্থের নামপত্রে ইংরেজীর আশ্রয় নেওয়া হয়েছে—

"Ocean Messenger.

Or The Message to his Own country, through ocean from an exiled French Martyr to national liberty."

সাগর শুনিলে নাকি মিনতি আমার, তাই হয়েছি সুস্থির ?
উত্তাল তরঙ্গমালা কম্পিত করে না বেলা,
অনন্ত নীলাম্বুরাশি নীলাম্বরসম এবে প্রশান্ত গম্ভীর !
নীরব প্রকৃতি, ধীরে বহিছে সুগন্ধসিক্ত প্রদোষ-সমীর। (পৃ—৬)

কবি একে নতুন ছন্দ ব'লে দাবী করেছেন; কিন্তু এ ছন্দ মূলত পয়ার; এবং সাজালে এই রকম দাঁড়ায় :

সাগর শুনিলে নাকি মিনতি আমার তাই
হয়েছে সুস্থির ?
উত্তাল তরঙ্গমালা
অনন্ত নীলাম্বুরাশি নীলাম্বরসম এবে
প্রশান্ত গম্ভীর !
নীরব প্রকৃতি, ধীরে বহিছে সুগন্ধসিক্ত
প্রদোষ-সমীর !

তাহ'লে ব্যাপারটি দাঁড়াল মাইকেলের নিম্নোদ্ধৃত কবিতার স্তবক-বিন্যাসের মত :

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়।
তাই ভাবি মনে
জীবন-প্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে ধায়
ফিরাব কেমনে ?

বেশ বুঝা যায় যে, তখন ছন্দ-পরিবর্তন-ইচ্ছা প্রবলভাবে অনুভূত হচ্ছে। এই কারণে নানা কবি নানাভাবে নবীনত্ব আনার চেষ্টা করছেন। প্রয়োজন অনুভব করা আর প্রয়োজন সাধন করা এক নয়।

॥ ৩ ॥

আনন্দচন্দ্র মিত্র (১৮৫৪-১৯০৩) পূর্ববঙ্গের খ্যাতনামা কবি। মিত্রকাব্য (১৮৭৪-১ম খণ্ড ; ১৮৭৭-২য় খণ্ড), হেলেনা কাব্য (১৮৭৬-১ম খণ্ড ; ১৮৭৮-২য় খণ্ড), ভারতমঙ্গল (১৮৯৪), প্রেমানন্দ কাব্য (১৮৯৭), ভিক্টোরিয়া গীতিকা (১৯০১) ও মাতৃমঙ্গল (১৯০১) তাঁর প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থাবলী।

মিত্রকাব্য দুইখণ্ডেই দেশপ্রেম ও নারীপ্রেমমূলক কবিতা ও আনুষ্ঠানিক কবিতা আছে। দেশপ্রেমমূলক কবিতায় হেম-নবীনের আদর্শ অনুকৃত হয়েছে। দেশপ্রেমের জয় ঘোষণা ক'রে কখনও গাথা-কবিতা রচনা করেছেন, যথা শিবাজীর যুদ্ধযাত্রা ; কখনও আত্ম-উচ্ছ্বাসমূলক কবিতা রচনা করেছেন, যথা আশার সঙ্গীত ; কখনও রূপক, যথা বালবিধবার স্বপ্ন। সমাজসংস্কার-বিষয়ক কবিতাও আছে ; যেমন সুরারাক্ষসীর প্রতি। এগুলির মধ্যে কাব্যমূল্য অন্বেষণ পণ্ডশ্রম। সম্ভবতঃ কবি প্রচারক-বৃত্তির লোভে কবিধর্মের বিরুদ্ধতায় অসম্মত নন।

বরং নারী-প্রেম বর্ণনায় কিছু কিছু সাফল্য আছে। উদাহরণ দিচ্ছি।

দূর থেকে চোখের দেখা
দেখেই যদি এমন হয়,
স্পর্শ হলে কি যে হ'ত,
ভেবেই আমার হচ্ছে ভয়।
কি আর হ'ত ? পা দুখানি
যদি তোমার বক্ষে পেতেম,
প্রেমভরে শত খণ্ড
হয়ে না হয় ভেঙ্গে যেতেম।
মাটির দেহ পড়ে থাকতো
বেরিয়ে যেতো অমর প্রাণ ;
অমর লোকে গিয়ে আমি
গেতেম তোমার প্রেমের গান। (পৃ—১৭২)

এখানে অন্ততঃ আন্তরিকতার ছাপ পড়েছে।

আনন্দচন্দ্র মিত্রের প্রেম-ভাবনায় একটু স্বাতন্ত্র্য ছিল। শুধু ভোগ-বাসনার কথা নয়, বা ভোগ-বঞ্চনা-জনিত হাহাকার নয়, কবির প্রেম-কবিতায় ত্যাগের প্রসঙ্গই স্পষ্টতর। অবশ্য এর মধ্যেও একটা উৎকট আতিশয্য আছে—

তোমার প্রেমে যোগী হয়ে
তোমার নামে দীক্ষা লব ;
যে ঘাটেতে স্নান করেছ
সেই ঘাটেতে করবো স্নান ;
যে জলেতে পা ধুয়েছ
সে জল আমি করবো পান। (পৃ—১৭৫)

ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় এই কাব্যের "Smoothness of diction, loftiness of conception and earnestness of purpose" সমালোচকের প্রশংসা কুড়িয়েছিল। বেঙ্গল ম্যাগাজিনেও বলা হ'ল, 'The author is evidently a wild nightingale।" বান্ধব পত্রিকায় 'মিত্রকাব্য' প্রশংশিত হয়।[৯]

কবির হেলেনা কাব্যে ইলিয়াদের গল্প অবলম্বিত হয়েছে ; কবিধর্ম নয়।

মাইকেলের ছন্দ ও ভাষার অনুসরণ আছে। এ কাব্য বঙ্গদর্শনে (১২৮০, বৈশাখ সংখ্যা) সমালোচিত হয় ; বান্ধব পত্রিকায় (১২৮৩, আশ্বিন সংখ্যায়) প্রশংসিত হয়। ভারতমঙ্গল-কাব্য রামমোহন রায়ের জীবনী অবলম্বনে রচিত। ভাষা মাইকেলী ; কিন্তু কাব্যরীতি মঙ্গলকাব্যীয়। "বিষাদে জাহ্নবী তীরে কাঙালিনী বেশে ভ্রমিছেন বঙ্গলক্ষ্মী ;" এবং তাঁকে লক্ষ্মীদেবী বললেন, "শোন বঙ্গে, মম সঙ্গে পূর্ব পরিচয় নাহি তব ; তব তরে সতত আমার সম স্নেহ ; এ জগত সকলেরি তরে।" প্রেমানন্দ কাব্যে কবির ভক্তিবাদ আরও ব্যপক হয়েছে ; সঙ্গততর পরিণতি লাভ করেছে ; ঈশ্বরে এসে পৌছেছে। যিশু প্রসঙ্গ পর্যন্ত আছে। কবি ব্যক্তিগত জীবনে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য ছিলেন। তাঁর এই ভক্তিবাদ সম্ভবত কেশব সেন-অনুপ্রাণিত।

এঁদের মধ্যে অধরলাল সেন (১৮৫৫-৮৫) ছিলেন একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির কবি। তাঁর কাব্য-ভাষায় বিহারীলাল এবং স্থানে স্থানে হেমচন্দ্রের প্রভাব থাকলেও তিনি সম্পূর্ণই বিদেশীকাব্য থেকে তাঁর বিষয় ও কাব্যরীতি আমদানী করেছেন।

ভালবাসি বিলাতের কাব্য মনোহর,
ভালবাসি বিলাতের মধুর বিজ্ঞান,
ভালবাসি বিলাতের রমণীর রূপ
ভালবাসি বিলাতের বিজ্ঞের পরাণ। (কুসুমকানন—পৃ-৭৯)

এই স্পষ্ট স্পর্ধিত উক্তি থেকেই কবির মনোভাব বুঝা যাবে।

কবির প্রথম কাব্য 'মেনকা' (১৮৭৪) ; এখানি তাঁর উনিশ বৎসর বয়সের রচনা ; কাব্যটি সেকালের জনপ্রিয় ইংরেজ কবি মূরের Lalla Rookhএর অন্তর্গত Paradise and the Perry কবিতার অনুসরণ। কবির অন্যান্য কাব্য, যথা, ললিতাসুন্দরী, কবিতাবলী (১৮৭৪), নলিনী (১৮৭৭) এবং কুসুম-কাননেও (১৮৭৭) ইংরেজী কাব্যের অনুসরণ ছিল। অধরলাল সেন যৌবনেই পরলোকগমন করেছিলেন। তাঁর এই চারিখানি কাব্যই ভারতী পত্রিকায় সমালোচিত হয় ; এবং নির্মমভাবে সমালোচিত হয়।[১০]

অধরলাল ইংরেজী কাব্যের উৎসাহী পাঠক ; কিন্তু ছাত্রজনোচিত

উৎসাহের উপরে উঠতে পারেন নি। তাই তাঁর লেখায় শেলী, বাইরণ, কীট্‌স, ও মূরকে একই সঙ্গে অনুসরণ করার চেষ্টা।

'ললিতাসুন্দরী ও কবিতাবলী'গ্রন্থে প্রথমে ললিতাসুন্দরী নামক গাথাকাব্যের ১ম সর্গ আছে; এটি বাইরণের আদর্শে লেখা। এ ছাড়া তিরোধান, সুধীর-স্মৃতি, আমার হৃদয় প্রভৃতি কবিতা স্থান পেয়েছে। কাব্যটি তদানীন্তন বঙ্গের লেঃ গভর্ণর লেসলি ইডেনের নামে উৎসর্গীকৃত। ললিতাসুন্দরীতে সিরাজদ্দৌলার নিন্দা আছে। ১২৮১ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ সংখ্যায় বঙ্গদর্শন কাব্যটির সমালোচনা করে।

'নলিনী' কাব্যের উৎসর্গ-কবিতাটি ইংরেজীতে লেখা। তিনটি পল্লবে কাব্য সম্পূর্ণ। বাল্য-প্রেমের ব্যর্থতা বর্ণনা করা হয়েছে। কাব্যটি সুইনবার্ণের নামে উৎসর্গীকৃত। বঙ্গদর্শনে (১২৮৪, শ্রাবণ) কাব্যটি সমালোচিত হয়। কবিকে সুইনবার্ণের উপাসক ব'লে অভিহিত করা হয়।

পৃথিবী পার্থিব
নশ্বর পদার্থ রাশি, আমিই অমর ;
আমার মনের কর, খর তীব্র দীপ্ত তর,
তাহাতে জনম—আমি তোমার ত্রিদিব,
ওরে পরাণ পার্থিব। (নলিনী)

ফিরে দাও আঁখি মোর, করিব দর্শন,
মদন চপল,
ফিরে দাও কর্ণ মোর, করিব শ্রবণ,
হয়েছি পাগল,
ফিরে দাও, প্রিয়তম, অধর আমার,
করিব চুম্বন,
ফিরে দাও প্রাণ মোর, করিব ধেয়ান
তোমার মদন। (কুসুমকানন—পৃ-৬১)

এ আকুলতা পর-অনুকরণজাত হ'তে পারে ; তবে তাৎকালিক গীতি-কবিতার আসরে খুব তুচ্ছ নয়।

অধরলাল সেন বাইরণ ও মূরের ভক্ত ; এবং বাংলা কাব্যের এক বিশেষ

স্তরে এই ভক্তির তাৎপর্য আছে ; রবীন্দ্রনাথের কবিকাহিনী থেকে শৈশবসঙ্গীত এই আবহাওয়ায় পুষ্ট।

দীনেশচরণ বসু (১৮৫১-১৮৯৮) তাঁর প্রথম কাব্য লিখেই খ্যাতির অধিকারী হন ; কারণ ঐ কাব্যগ্রন্থ বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক অতিশয় প্রশংসিত হয়।

তাঁর মানস-বিকাশ (১৮৭৩), কবি-কাহিনী (১৮৭৬), মহাপ্রস্থান কাব্য (১৮৮৭) প্রকৃতপক্ষে ঐ যুগের বিশিষ্ট কবিদের অনুসরণ। মানস-বিকাশে দেশপ্রেম ও প্রণয়োচ্ছ্বাস যুগপৎ দেখা দিয়েছে। কবিকাহিনী খণ্ড কবিতার সংকলন। এখানেও দ্বিবিধ ভাবনাই প্রবল ; তবে ভগবৎ ভাবনাও দেখা দিয়েছে। বীণা, ধবলশিখরে, ও জাহ্নবী কবিতায় হেমচন্দ্রীয় প্রভাব সুস্পষ্ট।

মহাপ্রস্থান কাব্যে মহাভারত কাহিনী একুশ সর্গে বর্ণনা করা হয়েছে, অবশ্য বিলম্বিত পয়ারে। দীনেশচরণের রচনায় পূর্ববঙ্গীয় আঞ্চলিকতা কিছু কিছু ফুটেছে।

> ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর ; ভীষণ আকার
> দেখিনু চৌদিকে পদ্মা বহিছে কল্লোলে ;
> কেবল একটি সূক্ষ্ম রেখার আকারে
> ধূ ধূ করিতেছে তরু বিপরীত পারে। (কবি-কাহিনী, পৃ—৭)

তবে কবির কাব্যে প্রণয়োচ্ছ্বাসই প্রধান। এবং তাঁর কাব্যকে অবলম্বন ক'রেই এই যুগের গীতিকবিতার উপরে বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি মৌলিক নীতি ব্যাখ্যা করেন।

এঁদের মধ্যে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৬-১৮৯৭) সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কবি। কবির প্রথম কাব্য চিত্তমুকুর ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত হ'ল। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন এ যুগের প্রখ্যাত কবি হেমচন্দ্রের অনুজ।

ঈশানচন্দ্রের চিত্তমুকুর (১৮৭৮), বাসন্তী (১৮৭৮), যোগেশ (১৮৮১) ও চিন্তা (১৮৮৭)—এই কাব্যচতুষ্টয় একই সুরে বাঁধা। প্রেমের বেদনা-উচ্ছ্বাসে এগুলি মুখরিত। কিন্তু তখনকার দেশপ্রেম-উচ্ছ্বাসও অনুপস্থিত নয়। আনুষ্ঠানিক কবিতাও কবি একাধিকবার লিখেছেন। তাঁর বাঙ্গালী চীফ জাষ্টিস (১৮৮২), কলেজ রি-য়ুনিয়ন ; হিতকরী সভার সাম্বাৎসরিক সম্মেলন, মহাত্মা কৃষ্ণদাস পালের স্মৃতি-বিষয়ক কবিতা উল্লেখযোগ্য।

ঈশানচন্দ্র প্রবল হৃদয়বৃত্তিসম্পন্ন কবি ছিলেন। এই হৃদয়বৃত্তির প্রাবল্যেই তাঁর বহু সৃষ্টি ব্যর্থ।

কেউ কেউ তাঁর ব্যর্থতার জন্য হেমচন্দ্রীয় এবং নবীনচন্দ্রের প্রভাবকে দায়ী করেন। তাঁর দেশপ্রেমমূলক কবিতা অপেক্ষা প্রেম-বিষয়ক বা আত্ম-ভাবনামূলক কবিতাসমূহই তাঁর বিশিষ্ট রচনা। খুঁজলে এখানেও হেমচন্দ্রীয় বা নবীনচন্দ্রীয় প্রভাবের সন্ধান পাওয়া কষ্টকর নয়।

চিত্তমুকুরে 'চিতা-শয্যা' কবিতায় হেমচন্দ্রীয় কাব্য-রীতি অনুসৃত।

"চিনিলে কি চিতা কার,— চিতা ভারতমাতার—"

এই উক্তিতে যে নাটকীয়তা আছে, তা ঐ যুগের প্রায় অধিকাংশ কবিই কোন না কোন কবিতায় ব্যবহার করেছেন। 'কলঙ্কীচাঁদ' ঐ হেম-নবীন অনুগত দেশপ্রেমমূলক কবিতা।

বাসন্তী কাব্যে প্রেম-চিন্তা, তথা আত্ম-চিন্তাই প্রবল। দুই একটি কবিতা ব্যতিক্রম; ব্যতিক্রম বলেই তাদের একটু মিষ্টতা আছে; মহাশ্বেতা কবিতাটি কবি কামিনী রায়ের 'আলো ও ছায়া'র পূর্বে রচিত। 'সন্তান-দর্শনে' কবিতাটিতেও পিতৃহৃদয়ের উত্তাপ কিছু আছে। কিন্তু সেই যুগে কাব্য আর নীতিবাক্য—উভয়ের মধ্যে সীমারেখা বিশেষ সুস্পষ্ট ছিল না ব'লে কবির এই কবিতাটিও শেষ পর্যন্ত নীতিকুসুমাঞ্জলিতে পর্যবসিত হয়েছে।[৫]

বাসন্তী কাব্যের অসংযত হৃদয়োচ্ছ্বাস যোগেশ কাব্যে এসে বাস্তব কাহিনীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বা যা ছিল গগনবিহারী মেঘলা হৃদয়োচ্ছ্বাস, তা যেন বাস্তবের যুগল তটরেখার মধ্যে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো। যোগেশ পদ্যে সামাজিক উপন্যাস নয়, যোগেশ এ-যুগের কাহিনী নিয়ে রচিত 'metrical romance'। উপন্যাস রচনার সাধ্য ঈশানচন্দ্রের ছিল না। উপন্যাস হ'ল বাস্তব জীবনের রূপময় অভিব্যক্তি; জন্ম-ক্ষণ থেকেই সে রোম্যান্স রসের প্রতি বিদ্রূপের কষাঘাত বর্ষণ করেছে।

যোগেশ বারো সর্গে সম্পূর্ণ। আরম্ভ আকস্মিকভাবে; গিরিশিখরে স্বপ্নভঙ্গ যোগেশের আত্ম-উচ্ছ্বাস দিয়ে কাব্যের শুরু। যোগেশ বিবাহিত; কিন্তু বিবাহ-রাত্রেই পত্নীর সখী মন্দাকিনীকে দেখে আত্মহারা হয়েছে। পরে সুযোগ বুঝে একদিন পত্র মারফৎ প্রেম নিবেদন করল; মন্দাকিনী যোগেশকে ভাই-এর মত দেখে; সে যোগেশের প্রেম প্রত্যাখ্যান করল। তার সঙ্গে করল

তীব্র ভর্ৎসনা। যোগেশ তখন পলাতক হ'ল। এই পলাতক যোগেশ যখন মৃতকল্প অবস্থায় মালাবার পর্বতে প'ড়ে আছে, তখন কাব্যের যবনিকা উত্তোলিত হয়েছে।

ব্যাধ এই অচেতন যোগেশকে কুটীরে নিয়ে এল; এখানে শুশ্রূষার ফলে তার জ্ঞান ফিরলে ব্যাধ তার জীবনের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করল।

> অনন্য নয়নে চাহি আকাশের পানে
> উঠিলা দাঁড়ায়ে যুবা,—পুনঃ মৃদুস্বরে
> কহিলা আপন মনে, "আমার জীবন।"
> সেইভাবে চাহি শূন্যে কুটীর ত্যজিয়া
> নামিলা প্রাঙ্গণে, ঊর্ধ্বে অঙ্গুলি তুলিয়া
> কহিলা চীৎকারে, "ওই আমার জীবন।" (২য় সর্গ)

তৃতীয় সর্গে দ্বন্দ্বকাতর যোগেশ পিতৃ-আত্মার সাক্ষাৎ পেল। মেঘনাদবধ কাব্যের রামের অভিনব দ্বিতীয় সংস্করণ! পিতা তার বিবেক বুদ্ধি জাগ্রত করার চেষ্টায় পাঁচখানি চিত্র দেখালেন। জননী, স্ত্রী, সপুত্র স্ত্রী, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, এক মধ্যবয়সী রমণী মূর্তি। চিত্র দর্শনের পর যোগেশ আত্ম-চিত্র দর্শন করলেন।

> হৃদয়ের শুষ্ক সিন্ধু উঠিল উথলি
> হেরি পাঠাগার মম—নারিনু শাসিতে
> ভগ্ন হৃদয়ের এই দুরন্ত আবেগ। (৩য় সর্গ)

এই সময় এক ভৈরবীর সঙ্গে যোগেশের সাক্ষাৎ হ'ল। তিনি যোগেশকে ঘরে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন, কিন্তু কোন ফল হ'ল না। মৃত্যু-মুহূর্তে মন্দাকিনীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হবে; এবং মন্দাকিনী তাকে গৃহে ফিরতে অনুরোধ করলে সে বলল:

> মন্দাকিনী! বৃথা যত্ন বৃথা কেন ক্লেশ।
> কাহারে ফিরিতে গৃহে কর অনুরোধ!
>
> * * *
>
> দেখ চেয়ে দেহে মোর—কি আছে ইহায়,
> দেখিছ না—মৃত্যু-ছায়া ব্যাপ্ত কলেবরে। (১১শ সর্গ)

তারপর যোগেশের মৃত্যু হ'ল। "মন্দাকিনী দিলা বহ্নি যোগেশের মুখে।"

শেষ মুহূর্তে মন্দাকিনীর হৃদয় একটু কেঁপেছিল! “চিতা যে নিবিল নাথ! বলিয়া আবার মন্দাকিনী উচ্চৈঃস্বরে করিলা রোদন।” সতী নর্মদার বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করতে হ'ল না; কারণ “সতীর বৈধব্য নাই।” নরক-যাত্রী যোগেশের আত্মা স্বর্গ-যাত্রী নর্মদার আত্মাকে দেখতে পেয়ে ডাকতে লাগল; সে ডাকে নর্মদা সাড়া দিল না। যোগেশের আত্মা নরকের যন্ত্রণা সহ্য করতে লাগল—

তদবধি যোগেশের অধরে কেবল
নর্মদে নর্মদে শব্দ হৈত অবিরত।

কিন্তু নর্মদা সে রব শুনতেও পেল না; সে তখন সতীকুঞ্জধামে বিপুল আনন্দে বসবাস করছে।

কবি এইভাবে সতীধর্মের জয় দেখিয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তখন যিনি যে-রূপ আচরণই করুন না কেন, কাব্যে তাঁদের সবাইকে নীতিবাগীশ হ'তে হ'ত। এই ছিল সে সময়কার সমাজ-জীবনের দাবী।

কবির চিন্তা কাব্যেও একই প্রকার হৃদয়োচ্ছ্বাস ও নীতি-প্রবণতা দেখা যায়। হৃদয়বৃত্তির দুরন্ত প্রকাশ ঈশানচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু হৃদয়োচ্ছ্বাস যদি নিয়ন্ত্রণাধীনে না আসে, তবে তা কাব্যরূপ অর্জন করতে পারে না। নবীন সেনের কাব্যেও অহংবোধের অপ্রতুলতা নেই; কিন্তু আত্মচেতনা আশানুরূপ কাব্যমূর্তি লাভ করতে পারে নি। বাংলাকাব্যের আত্মমুখীন কাব্যের ইতিহাসে এই প্রকার আদিম অস্বস্তি-প্রাবল্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। কিন্তু কাব্যের শেষ বিচার ঐতিহাসিকতার উপরে নয়, কাব্যগত উৎকর্ষের উপরই নির্ভর করে। 'চিন্তা' কাব্যে 'আমার প্রাণ' শীর্ষক একটি কবিতা আছে। কবিতাটি নিঃসন্দেহে ঈশানচন্দ্রর বিশিষ্ট কবিতা।

কল্পনাকে সম্বোধন ক'রে কবি বলছেন, এ জ্যোৎস্নায় তাঁর বুকের পাষাণ সরিয়ে নেওয়া হোক, তিনি প্রকৃতির প্রীতিমাখা মধুর হৃদয়ের সঙ্গে মিশে যেতে চান। এবং ভূতলের যা কিছু কঠিন, প্রাণের অমৃতে তাকে কবি দ্রবীভূত করতে চেয়েছেন।

প্রাণের নিভৃত ব্যথা, নর নারী হৃদে যাহা—
আমার মতন,

আমার পরাণ সনে, উথলি উঠুক তাহা
আকুলি ভুবন। (পৃ—২৫)

কবির আকাঙ্ক্ষা কবিজনোচিত; কিন্তু কবি শেষ পর্যন্ত তাঁর বিশৃঙ্খল হৃদয়কে সুস্থির করতে পারেন নি।

সেই স্বর্গচ্যুত প্রাণ একাকী আমার
ক্ষিপ্ত উল্কা লতা প্রায়,
কেবল কাঁদিয়া ধায়,
জগতে তাহার স্থান কোথাও না মিলে;
কি করি তুলিলে দেবি! কি করি ফেলিলে।
(কোথা রাখি প্রাণ, পৃ—৩৩)

কবির ব্যর্থতা এইখানেই। তাঁর প্রাণ তাঁর আত্ম-ভুবনের ব্যাসার্ধ উত্তীর্ণ হ'তে পারে নি।

এযুগের গীতিকবিতা আত্মমুখীনতার আলোয় পরিস্নাত; কিন্তু বৃহত্তর জগতের সঙ্গে যথেষ্ট সঙ্গতি সাধন করে নি। একান্ত আত্মনিমগ্ন ব্যক্তি হয় যোগী, না হয় উন্মাদ। ঈশানচন্দ্রের কাব্যে উন্মত্ততার উচ্ছৃঙ্খল উল্লম্ফনই বেশি। হৃদয়ানুভূতির দাবদাহে নিজেকেই শুধু প্রজ্বলিত করেছেন, সে আগুনে কাব্য-জগৎ বিশেষ আলোকিত হয়নি। যে আগুনে ঘর পুড়ে, সে আগুনে আলোকসজ্জা সম্ভব কি?

কবির 'চিন্তা' কাব্য রবীন্দ্রনাথের 'ছবি ও গানে'র (১৮৮৯) পরবর্তী এবং 'কড়ি ও কোমলে'র (১৮৮৬) সমসাময়িক রচনা। 'চিন্তা' কাব্যের বহু কবিতার ভাষায় ও ভঙ্গিতে 'ছবি ও গানে'র প্রতিধ্বনি আছে। চিন্তা কাব্যের বাচন-ভঙ্গির উঁচু পর্দার সঙ্গে ছবি ও গানের সুর-প্রখরতার মিল আছে। কিন্তু কড়ি ও কোমলের সঙ্গে তিনি গলা সাধতে পারেন নি। চিন্তা কাব্যের 'আমার প্রাণ' কবিতাটির সঙ্গে ছবি ও গানের 'নিশীথ জগৎ' কবিতাটির সাদৃশ্য আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঈশানচন্দ্রের অতি আত্ম-আনুগত্য কবিতাটির ভাব-উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ হয়েছে। ঈশানচন্দ্র শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির চৌকাঠ পেরুতে পারেন নি। কিন্তু ব্যক্তি থেকে যাত্রা ক'রে কাব্য যেখানে গিয়ে পৌছায়, সেখানে সর্ব ব্যক্তির উদার আমন্ত্রণ। ঈশানচন্দ্রই বা শুধু কেন, এ যুগের কোন গীতিকাব্যেই সে আমন্ত্রণ ছিল না।

ঠিক এঁদের পংক্তিতে না বসিয়েও আর একজনের প্রসঙ্গ উল্লিখিতব্য। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০-১৮৯৮) বাংলা সাহিত্যে গাথাকাব্যের প্রবর্তক ব'লে পরিচিত। তাঁর এই খ্যাতির কারণ সম্প্রতিকালে কয়েকজন সাহিত্যের ঐতিহাসিকের প্রচারকার্য। বস্তুতঃ রোম্যান্টিক গাথা-কবিতা তাঁর মৌলিক রচনায় সমৃদ্ধ হয়নি ; তাঁর উদাসিনী Parnell-এর Hermit-এর অনুসরণ। সে যুগে Parnell-এর Hermit ও Goldsmith-এর Hermit-এর একাধিক অনুবাদ বেরিয়েছিল। কারণ গ্রন্থদুটিই সেকালে নানা সময়ে পাঠ্যতালিকা-ভুক্ত ছিল। তাছাড়া, এ যুগে গাথাকবিতার জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ মূর। মূরের Lalla Rookh-এর বিভিন্ন আখ্যান অংশ অবলম্বনে একাধিক গাথা-কবিতা রচিত হয়েছে। মূরের প্রভাবেই গাথা-কবিতার এত জনপ্রিয়তা ! তাঁর গাথা-কবিতায় একটা সস্তা রোম্যানটিক আবহাওয়া ছিল। শহর বা আধুনিক সভ্য সমাজ থেকে পালিয়ে কবি অরণ্য পর্বতে অসভ্য বনচারীদের মাঝখানে তপস্বী ও রাজন্যবর্গের সঙ্গে কালাতিপাত করার সুযোগ তৈরি ক'রেছেন। এই মধ্যযুগীয় পরিবেশ-প্রেম হালকা রোম্যানটিক বাসনাপ্রসূত।

উদাসিনী ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রচয়িতার নামহীন অবস্থায় প্রকাশিত হয় ; কিন্তু তাতেই সুনাম অর্জিত হয়। এই কাব্যে সরলা নাম্নী পিতৃহারা বালিকা এবং সুরেন্দ্রনাথ নামক এক যুবকের মিলন বর্ণিত হয়েছে—অবশ্য গাথা-সাহিত্যে যেমনটি ঘটে, তেমনি এখানেও নানা বিপদ আপদ দেখা দিয়েছে। প্রথমেই আত্মহত্যা-উদ্যত এক তরুণীর সঙ্গে পাঠকের সাক্ষাৎকার ঘটে। সেই তরুণীই হ'ল সরলা। তার মুখে সমস্ত কাহিনী 'flash back'এ বলা হয়েছে। এখানে অরণ্য বা অন্যান্য প্রাকৃতিক অনুভব সম্পর্কে 'পৌল ও ভর্জিনী' প্রভৃতির দৃষ্টিই দেখতে পাই। অক্ষয়চন্দ্র পোপ-এর 'Eloisa to Abelard' নামক বিখ্যাত কবিতার অনুসরণে মাধবমালতী কাব্য রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া ঐতিহাসিক কবিতা, খণ্ডকবিতা এবং গানও তিনি রচনা করেছিলেন। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে সেগুলির ভাষায় নিজস্ব দৃষ্টির দায়ভাগ ছিল। যেমন "অগুচ্ছ করিয়া ফেলি করবী বন্ধন" (পৃ—৫৭) বা "অস্ফুরিত দামিনী" (পৃ—৫৩) প্রভৃতি নতুন নতুন বাণী তিনি তৈরি করেছেন।

এসব সত্ত্বেও বলব, অক্ষয়চন্দ্র সাহিত্যের মজলিশে উদার সমজদার, লক্ষ্যভেদক্ষম নবীন তীরন্দাজ নন।

মহাকাব্যের ব্যঙ্গ

হেম-নবীন ছাড়াও এ-যুগে অনেকে 'মহাকাব্য' লিখেছেন। দীননাথ ধরের কংসবিনাশ কাব্য (১৮৬১), প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দময়ন্তী বিলাপ (১৮৬৮), সম্বরণ বিজয়, মহেশচন্দ্র শর্মার নিবাতকবচ বধ (১৮৬৯), ব্রজনাথ মিত্রের কাদম্বরী কাব্য (১৮৬৯), অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমন্যুবধ কাব্য (১৮৬৮), হরিচরণ চক্রবর্তীর ভদ্রোদ্বাহ কাব্য (১৮৭১), বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের শক্তিসম্ভব কাব্য (১৮৭০), রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দানব-দলন কাব্য (১৮৭৩), হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের মুকুট-উদ্ধার (১৮৭৩), ও অদৃষ্ট বিজয় (১৮৮১), শ্যামাচরণ শ্রীমানীর সিংহলবিজয় (১৮৭৫), নবীনচন্দ্র দাসের পিশাচোদ্ধার (১৮৭৬) ও কালিদাসের বিদ্যালাভ (১৮৭৬) প্রভৃতি কাব্য প্রকাশিত হয়। এগুলি আধুনিক বা সংস্কৃত আদর্শঅনুযায়ী 'মহাকাব্য'। মাইকেল-ভারবী-হেমচন্দ্র প্রভৃতি নানাভাবে এঁদের প্রভাবিত করেছেন।

গদ্য তাঁদের হাত থেকে সমস্ত শক্তি কেড়ে নিয়েছে। বঙ্কিমের উপন্যাস সেদিন সঙ্কীর্ণ অর্থেও 'মহাকাব্যে'র প্রয়োজন পূর্ণ করছিল।

এমন কি পদ্যেও দ্বিতীয় 'বিষবৃক্ষ' লিখিত হ'ল। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যোগেশ' তদানীন্তন মহাকাব্য-সাহিত্যের বিরুদ্ধে এক অসচেতন প্রতিবাদ।

ঈশানচন্দ্র মহাকাব্য-রচনার শেষ ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন এই 'যোগেশ' রচনা ক'রে। পুরাণের নায়ক-নায়িকার একাধিপত্য লুপ্ত করা হোল; আধুনিক নরনারী আখ্যায়িকা-প্রধান পূর্ণাঙ্গ কাব্যেও আসন সংগ্রহ করল। বঙ্কিমের লেখনীমুখে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা গদ্যে সিদ্ধ হচ্ছিল, পদ্যে তা ঈশানচন্দ্র সম্পূর্ণ করলেন 'যোগেশ' কাব্য রচনা ক'রে। 'যোগেশ' মহাকাব্য-যুগের উপসংহার এবং উপহাস। শুধু বিষয়ে নয়, ব্যক্তিচরিত্রের অবতারণাতেও। নতুন কোন দৈত্য বধ করার দরকার নেই, নতুন কোন দধিচীরও প্রয়োজন নেই। নিতান্তই ত্রিকোণ প্রেম, আর প্রবৃত্তির হাতে ক্রীড়নক হতাশ যুবকের আত্মহত্যা। রৈবতক কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস তখনও প্রকাশিত হয়নি; ইতিমধ্যে আখ্যায়িকা-প্রধান কাব্যের এই 'অধঃপতন' ঘটে গেল!

বিপরীত কোণ থেকে আক্রমন চালালেন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভারত-উদ্ধার কাব্য (১৮৭৮) রচনা ক'রে। ভারত-উদ্ধার কাব্য সমগ্র-

ভাবে বীররসপ্রধান দেশোদ্ধারমূলক কাব্যের প্যারডি, ব্যক্তি বিশেষের রচনার প্যারডি নয়। এবং জগদ্বন্ধু ভদ্রের মত তিনি মানবেতর বা মানবোত্তর জগতে কাহিনীর কুশীলব খুঁজতে যান নি। তাঁর কাহিনীর কুশীলব এই যুগের মানবসন্তান, তদুপরি বঙ্গীয় যুবক। ফলে এই কাব্যের লক্ষ্য যাই হোক, আবেদন প্রতিপক্ষের কাছে আদৌ সুখকর হয় নি। জগদ্বন্ধু ভদ্রের রচনা যদি হয় 'পরিহাস বিজল্পিতম,' এ রচনা বিদ্রূপের বিষাক্ত বাণ।

তখনকার বাংলা দেশে দেশপ্রেম যে প্রকার বুলি-প্রধান হ'য়ে উঠেছিল, হৃদয়ের ধর্ম অপেক্ষা ফ্যাশানের ধর্ম হ'য়ে উঠেছিল, এবং ঝুড়ি ঝুড়ি 'যবন-বিরোধী' বা 'দৈত্য-বিরোধী' মহাকাব্য রচিত হচ্ছিল, তাতে শুধু দেশ নয়, কাব্য-অঙ্গনও মিথ্যার বেসাতিতে ভ'রে উঠ্ছিল। শুধু দেশকে নয়, কাব্যকেও তাই কিছুটা উদ্ধার করার প্রয়োজন ছিল এই দুঃসহ পরিবেশ থেকে।

পঞ্চম সর্গে সম্পূর্ণ এই কাব্যটি আগাগোড়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা; ঠিক মাইকেলী অমিত্রাক্ষর ছন্দ একে বলা চলে না। সম্ভবত মাইকেলকে পরিহাস করা কবির উদ্দেশ্য ছিল না; তাই কবি মাইকেলী বৈশিষ্ট্য-সমূহের পুনরাবৃত্তি করেন নি। আভিধানিক শব্দের কোলাহল নেই, যমক-অনুপ্রাসের অস্ত্র-ঝনঝনি নেই, 'যেমতি তেমতি'র ব্যূহ রচনা নেই। প্রস্তাবনা ও সরস্বতীর স্তব দিয়ে গ্রন্থ শুরু ক'রে নায়ক বিপিনকৃষ্ণ ও তস্যবন্ধু কামিনীকুমারের সঙ্গে কবি আমাদের পরিচয় সাধন করিয়ে দিলেন। তাঁরা নিতান্তই সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের সন্তান, গৃহগত বলিভুক্। কিন্তু হ'লে কি হবে? তাঁদের সংকল্প হ'ল ভারত-উদ্ধার! "অর্থকরী সভার বৈঠকে" নায়ক বিপিনকৃষ্ণ এবং তস্যসখা কামিনীকুমার দেশোদ্ধারের 'প্ল্যান' ও 'ষ্ট্রাটেজি' দাখিল করলেন। চতুর্থ সর্গে সেই মহৎ পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ-উদ্যোগ; বটি, পিচকারী ও বস্তা বস্তা ছাতু—এই অভিনব লোমহর্ষক সংগ্রামের আয়ুধ। যুদ্ধে গমনের প্রাক্কালে বীরের নয়নে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল।

"ভয় নাই যদি তবে চক্ষে কেন জল?"

—পত্নীর এই অতি বাস্তব সওয়ালের জবাবে নায়ক উত্তর দিলেন, "যাত্রাকালে নেত্রজল বাঙ্গালী কল্যাণ।" গৃহিণী স্বামীকে চিনতেন; বললেন, যদি নিতান্তই যেতে হয়, তবে খেয়ে যাও। "আলুভাতে ভাত দিই চড়াইয়া।" তারপর সেই অভিনব যুদ্ধ ও রণকৌশল! ছাতুর বস্তা

ফেলে স্যুয়েজ খালের জল শুকিয়ে দেওয়া হল, ইংরেজের পালাবার পথ হ'ল বন্ধ! বঙ্গবীরেরা তারপর বঁটি হস্তে, পিচকারী হস্তে অসীম সাহসে আক্রমণ করল। ইংরেজ সৈন্যের বন্দুকের দুই একটি ফাঁকা আওয়াজে তারা বিমূঢ় কিঞ্চিৎ যে না হ'য়েছিল, তা নয়। কিন্তু পরক্ষণেই পূর্ব-পরিকল্পনানুযায়ী লংকার ও পটকার স্তূপে আগুন লাগিয়ে দিল। সেই আগুনে ইংরেজ সৈন্যই শুধু আত্মসমর্পণ করল না। এই নির্দয় বিদ্রূপ-আগুনে মহাকাব্য-প্রেমিকের আত্মাও ভীষণ দগ্ধ না হ'য়ে পারে না। ভারত-উদ্ধার শৌখীন ভারত-প্রেমিকেরই শুধু সমালোচনা নয়, শৌখীন মহাকাব্য-রচয়িতারও সমালোচনা।

ঠিক অনুরূপ সমালোচনা করেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০—১৯২৬(তাঁর গুম্ফ-আক্রমণ কাব্যে (১৮৮৮)। অবশ্য এটি একটি পূরা কাব্য নয়। একটি ক্ষুদ্র কবিতা, তবে মহাকাব্যের আদর্শে (?) লেখা। আদর্শ সর্বদাই অনুসৃত হবার জন্য উপস্থাপিত হয় না, উপহসিতও হ'তে পারে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথ এক বিরল প্রতিভা। বাংলা কাব্য এঁর কাছে কতটা ঋণী, তা তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু বাংলার ভাব-জগৎ তাঁর কাছে যে অসীম পরিমাণে ঋণী, সে-প্রসঙ্গ আমরা পরিচ্ছেদান্তরে আলোচনা করব।

গুম্ফ-আক্রমণ কাব্য কবির কাব্যমালার (১৯২০) অন্তর্গত। কবিতাটি লেখা হয়েছিল উনিশ শতকের শেষপাদে। কবি গম্ভীরভাবে তদানীন্তন মহাকবিদের কাব্যরীতি-অনুকরণে গুম্ফ-সংহারে আগুয়ান হয়েছেন। আর সত্যই গুম্ফ ত সাধারণ চিহ্ন নয়—পৌরুষের প্রতীক; পুরুষের জাতীয় চিহ্ন! কবি এহেন গরিমাযুক্ত পৌরুষের প্রতীকের বিরুদ্ধে বিবিধ আয়ুধ নিয়ে আক্রমণ চালিয়েছেন।

মহাকাব্য এতেও যে টিকে ছিল, সে কেবল সমালোচকদের মহত্ত্বে।

সাময়িকপত্র ও গীতিকাব্য

সাময়িক পত্রিকায় স্বদেশের জন্য অতি অনুরাগ থাকলেও প্রণয়মূলক কবিতাই প্রচুর প্রকাশিত হ'ত। মহাকাব্যের জন্য ওকালতি থাকলেও গীতি-কবিতাই ছাপা হ'ত। বান্ধব পত্রিকায় খেদের সঙ্গেই স্বীকার করা হ'ল যে, "বাঙ্গালা ভাষা এইক্ষণ খণ্ড কবিতায় পরিপ্লাবিত।" (১২৮৩, কার্ত্তিক)

সংবাদপ্রভাকর, রহস্য সন্দর্ভ, বিবিধার্থ সংগ্রহ, এমন কি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও খণ্ড কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রধান প্রধান সাময়িক পত্রিকা হ'ল বঙ্গ-দর্শন, আর্যদর্শন, নব্যভারত, বান্ধব ও ভারতী। বঙ্গদর্শনে শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, নবীনচন্দ্র সেন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির কবিতা প্রকাশিত হয়। রঙ্গলালের কবিতা অবশ্য সংস্কৃত নীতিমূলক পদ্যের অনুবাদ; কিন্তু শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ ও ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায় তদানীন্তন গীতি-কবিতার মূল সুর অভিব্যক্ত হয়েছে।

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের কবিতা নিম্নরূপ ঃ

ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঝরিতেছে পাতা
শ্বসিয়া শ্বসিয়া বহিছে বায়ু
কাল হতে পল পড়িছে খসিয়া
ক্রমশঃ যেতেছে জীবের আয়ু। (কালবৃক্ষ—১২৮৪, ফাল্গুন)

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে কয়টি কবিতা প্রকাশিত হয়, তার সব কয়টিতে একই প্রকার আত্মজিজ্ঞাসা উপস্থিত ছিল।

সাধারণী পত্রিকায় গঙ্গাচরণ সরকার, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরিশচন্দ্র নিয়োগীর অজস্র কবিতা প্রকাশিত হয়। গঙ্গাচরণ সরকারের কবিতা অবশ্য ঈশ্বরগুপ্তীয় কবিতা; এগুলি বর্ণনামূলক প্রকৃতিবিষয়ক পদ্য। কিন্তু নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ও হরিশচন্দ্র নিয়োগীর ভুবনমোহিনী প্রতিভা ও দুঃখসঙ্গিনীর একাধিক কবিতা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

আর্যদর্শন পত্রিকাতেও প্রধানত এই কবিসম্প্রদায়ই আসর জমিয়ে বসে-ছিলেন। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরিশচন্দ্র নিয়োগী ছাড়া রসিকলাল দত্ত, প্রসন্নময়ী দেবী, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায়, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, সারদাচরণ মিত্র, নিত্যকৃষ্ণ বসু প্রভৃতির কবিতা প্রকাশিত হয়। এঁদের মধ্যে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও নিত্যকৃষ্ণ বসু নবাগত; এবং এঁরা উভয়েই পরবর্তীকালে খ্যাতনামা সাহিত্যসেবী।

নব্যভারত ও বান্ধব পত্রিকাতেও এই কবিগোষ্ঠীই আসর জাঁকিয়ে বসেছেন। এবং তাঁদের বিশিষ্ট সুরেই তাঁরা কাব্যালাপ করেছেন।

নব্যভারতের কবিদের মধ্যে গোবিন্দচন্দ্র দাস দেখা দিয়েছেন। সরোজকান্তি মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রকান্ত সেন, আনন্দচন্দ্র মিত্র, অটলবিহারী বসু, দেবেন্দ্রবিজয় বসু, বরদাচরণ মিত্র, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার বড়াল, রেবতীমোহন রায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, নবকৃষ্ণ ভট্টচার্য, প্রকাশচন্দ্র ঘোষ, কিশোরীলাল গুপ্ত, প্রেমদাস বৈরাগী, বেণোয়ারীলাল গোস্বামী, যদুনাথ ঘটক, প্রিয়বালা রায়, প্রমীলা বসু, মোহিনী দেবী, যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত, বিনয়কুমারী বসু, চিত্তরঞ্জন দাস, শ্রীশ-গোবিন্দ সেন, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ সেন, বিপিনবিহারী সেন, মনোমোহন সেন, চুনীলাল গুপ্ত, হারাণচন্দ্র রক্ষিত, বীরেশ্বর চক্রবর্তী, মোহনবিহারী আঢ্য, হারাণ রক্ষিত, অবিনাশচন্দ্র গুহ, মধুসূদন সরকার, আনন্দমোহন ঘোষ, শৈলেন মজুমদার প্রভৃতি বহু নবীন কবির কবিতা প্রকাশিত হয়।

ভারতীতে প্রথম থেকেই খণ্ড কবিতা প্রকাশিত হ'তে থাকে। ঠাকুর পরিবারের সমস্ত কবিই গীতিকবি; দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে সুরু ক'রে স্বয়ং সম্পাদিকা মূলত গীতিকবি। স্বর্ণকুমারী দেবীর কিছু গাথাকবিতা প্রকাশিত হ'লেও তাঁর মেজাজ মূলত গীতিকবির মেজাজ। তাছাড়া ভারতী পত্রিকার বুকেই রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশ ঘটে। রবীন্দ্রনাথের বিকাশের ইতিহাসই নব্য গীতিকবিতার বিকাশ-ইতিহাস। ভারতী পত্রিকায় যাঁরা কবিতা লিখতেন, তাঁরা প্রচলিত শৌখীন গীতিকবি-সমাজ থেকে মোটামুটি পৃথক্ ছিলেন। বিহারীলাল, হিরণ্ময়ী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অবিনাশ চক্রবর্তী, অক্ষয় বড়াল, প্রিয়নাথ সেন, অক্ষয় চৌধুরী, মোহিনী-মোহন চট্টোপাধ্যায়, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরোজকুমারী দেবী, সুরেন্দ্র গোস্বামী, বিনয়কুমারী বসু, দেবেন্দ্র সেনের কবিতা প্রকাশিত হয়। আরও দু'জনের কবিতাও প্রকাশিত হয়—তাঁরা হলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হরিশচন্দ্র নিয়োগী ও রাজকৃষ্ণ রায়ের কবিতা আদৌ প্রকাশিত হয় নি। ভারতীর কাব্যবোধ ভিন্ন প্রকার ছিল। তথাকথিত জনপ্রিয় কবিদের কবিতা ছাপিয়ে তাঁরা উৎসাহ দেন নি; তৎপরিবর্তে হিরণ্ময়ী দেবী, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবিনাশ চক্রবর্তী,

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অক্ষয় বড়াল ও দেবেন্দ্র সেনের মত নবীন কবিদের উৎসাহ দিয়েছেন।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অবিনাশ চক্রবর্তী ছিলেন বিহারী-শিষ্য; হিরণ্ময়ী দেবী, সরোজকুমারী দেবী, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্র-অনুসারী; আর দেবেন্দ্র সেন ও অক্ষয় বড়ালের কবিতার শুরুতে অন্য অনুপ্রেরণা থাকলেও শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্র-অনুপ্রেরণাই প্রধান হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ তৎকালের প্রচলিত কাব্য-বোধ থেকে এঁদের কবিতাসমূহ দূরে দাঁড়িয়ে থাকছে; এবং পুরাতনের প্রতিদ্বন্দ্বী এক নবীন কাব্যধারাকে পুষ্ট করছে।

অক্ষয়কুমার সরকার ছড়া কেটে ঠাকুর-বাড়ির ভাষায় বিদেশী ধাঁচের কথা বলেছিলেন; ড্যাফোডিল পুষ্পে মনসা পূজার মত। শুধু কবিতাই নয়, ভারতীর কাব্য-বিষয়ক সমগ্র দৃষ্টিই স্বতন্ত্র ছিল।

হরপ্রসাদ বলেছিলেন, "শোভাবাজারের রাজবাড়ী যেমন ভট্টাচার্যদের উৎসাহদাতা, ঠাকুরবাড়ি তেমন নব্য সাহিত্যের উৎসাহদাতা।" কথাটা গভীরভাবে প্রণিধান করা উচিত।

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কবিতা আর সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কাব্য বিষয়ক মতামত এক পথে চলেনি।

বান্ধবের কাব্য-সমালোচনার নমুনা কিছু কিছু উদ্ধৃত করছি। দুঃখসঙ্গিনী সমালোচনা প্রসঙ্গে উদ্দীপনার উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, তা আমরা পূর্বেই বলেছি। ১২৮৩ বঙ্গাব্দে অগ্রহায়ণ সংখ্যায় কয়েকখানি খণ্ডকবিতা-গ্রন্থ সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হল, "কাব্যের প্রধান গুণ দুই,—সৌন্দর্যের সৃষ্টি আর উদ্দীপনা।" দীনেশচরণ বসুর রচনা সম্পর্কে বলা হল, "ইহার লেখায় মাদকতা আছে।" বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতাপুস্তক সমালোচনা করতে গিয়ে বলা হলঃ "অভাবের মধ্যে ইহাতে উদ্দীপনা নাই; কিন্তু আবেগ আর উদ্দীপনা একত্রে থাকিতে পারে কিনা, তাহা সন্দেহের কথা।" (শ্রাবণ, ১২৮৫) আর্যদর্শন পত্রিকায় বলা হ'ল, "বঙ্গবাসী কাব্যপ্রিয় ও কাব্যপটু হইলেও আয়াসভীত ও দুর্বল, এইজন্য গীতিকাব্যই বাঙ্গালী হৃদয়ের স্বাভাবিক উৎস।" (১২৮১, আষাঢ়)। অবশ্য একই প্রকার তত্ত্ব বঙ্গদর্শনে মানস-বিকাশ সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন; সেখানে তিনি বাংলা কাব্যের প্রকৃতি-বিশ্লেষণ-প্রয়াসী হয়েছিলেন; এই প্রবন্ধের বক্তব্য আমরা গ্রন্থারম্ভে আলোচনা

করেছি। সম্ভবতঃ তিনি এই যুগের গীতিকাব্য দেখেই সর্বযুগের গীতিকাব্য সম্বন্ধে এই উক্তি করেছিলেন: "সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখপরায়ণ। সে কাব্য-প্রণালী অতিশয় কোমলতাপূর্ণ, অতি সুমধুর, দম্পতিপ্রণয়ের শেষ পরিচয়।" (বঙ্গদর্শন, ১২৮০, পৌষ)।

আর্যদর্শন, বান্ধব, বঙ্গদর্শন ও সাধারণীতে একই প্রকার বক্তব্য হাজির করা হ'ত। ভারতী পত্রিকায় প্রচলিত গীতিকাব্যের দুর্বলতা সঠিকভাবে ধরার চেষ্টা করা হ'ত। ভারতীর সমালোচক এই গীতিকাব্যের ধারাকে অকৃত্রিম ব'লে মেনে নিতে রাজী ছিলেন না।

"পূর্বেকার কবিদিগের প্রেম ব্যক্তিগত ছিল, হাত পা নাক মুখ চোখ অবলম্বন না করিয়া যে ভালবাসা থাকিতে পারে, ইহা তাঁহাদের কল্পনার অতীত ছিল। তাঁহারা ব্যক্তি বিশেষকে লইয়া মাতিয়া উঠিতেন। এইজন্য তাঁহাদের প্রেমের ধর্মে পৌত্তলিকতার উন্মত্ততা ছিল। (ভারতী-যথার্থ দোসর, ১২৮৮, পৌষ)

বস্তুগত ও ভাবগত কবিতার পার্থক্য নির্ণয় ক'রে বলা হল: "বস্তুর জগতে আমাদের কার্যক্ষেত্রের ও ভাবের জগতে আমাদের হৃদয়ের বিহারভূমি।" (ভারতী, ১২৮৮, বৈশাখ)

শুধু প্রত্যক্ষ জগৎ নয়, অপ্রত্যক্ষ জগতে প্রবেশের পাশপোর্ট না থাকলে প্রকৃত কাব্য সৃষ্টি অসম্ভব। তার পূর্বে প্রয়োজন এই ভাব-জগতের স্বরূপ উপলব্ধি।

পাদটীকা

১। বা-সা-ই-২য় খণ্ড—সু. সেন। পৃঃ ৩৫৭
২। আমার জীবন, নবীনচন্দ্র সেন-বসুমতী সং ৩য় ভাগ-পৃ-২৭১।
৩। জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ-পৃ. ৭৩। ৪। জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ-পৃ. ৭৩।
৪। (ক) বা-সা-ই, ২য় খণ্ড—সু. সেন, পৃ. ৪। (খ) জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব
৪। (গ) বান্ধব, ১২৮২, পৌষ। ৫। আর্যদর্শন, ১১৮২, ফাল্গুন।
৬। ভারতী, ১২৮৪, চৈত্র।
৭। সাধারণী, ১২৮২, ১৫ই কার্তিক।
৮। জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ৭৫।
৯। বান্ধব, ১২৮৩, আশ্বিন।
১০। ভারতী, ১২৮৪, অগ্রহায়ণ।

চতুর্থ অধ্যায়

"তিনি প্রকৃতিরূপ বীণাযন্ত্র বাদন করিয়া এইরূপ গান করিবেন যে মর্ত্যলোক স্তব্ধ হইয়া শুনিবে, বোধ হইবে যেন কোন স্বর্গলোকবাসী দেবপুরুষ গান করিতেছেন।"

—রাজনারায়ণ বসু, একমেবাদ্বিতীয়ম্।

প্রথম পরিচ্ছেদ

অন্তঃধর্মের উন্মেষ ও গীতিকবিতার প্রাধান্য

॥ ১ ॥

উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে চলেছে অধিকার হরণের পালা তীব্রতরভাবে। ১৮৬১—৯১ খৃষ্টাব্দে সপারিষদ বড়লাটের ক্ষমতা বাড়ান হ'ল। কিন্তু শাসন পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধি গ্রহণের দাবী প্রত্যাখ্যাত হ'ল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় শাসন পরিষদ সংক্রান্ত আইনেও নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বের দাবী স্বীকৃতি পেল না।

সিভিল সার্ভিস সংক্রান্ত আন্দোলনের কথা পূর্বেই বলেছি। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডাফরীন 'পাবলিক সার্ভিশ কমিশন' নিয়োগ ক'রে তাদের হাতে এ ব্যাপারে তদন্ত করার দায়িত্ব দিলেন। তাঁরা প্রাদেশিক ও সর্বভারতীয় সিভিল সার্ভিস গঠনের সুপারিশ করলেন। কিন্তু তাতে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ইংরেজ আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হ'ল না। এমন কি ১৮৯৩ সালে কমন্স সভায় এক প্রস্তাবে বিলেতে ও ভারতে একই সঙ্গে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণের সুপারিশ করলেও, "They maintained that material reduction of the European staff then employed was incompatible with the safety of the British rule."

সৈন্যবাহিনীতেও ঐ একই নীতি। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ৬৫,০০০ বৃটিশ সৈন্য ভারতে মোতায়েন ছিল; আর ভারতীয় সৈন্য ছিল ১৪০,০০০ জন। গড়পড়তা হিসাবে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত একই রকম থাকল। আবার ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহে প্রদেশ বিশেষের উপর পক্ষপাতিত্ব দেখান হল। গোর্খা, পাঠান ও শিখের প্রাধান্য দেখা দিল; মারাঠী, মাদ্রাজী ও হিন্দুস্থানী সৈনিকের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেল।

ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রেও একই প্রকার নীতি অনুসরণ করা হ'তে লাগল। বাংলায় পাট চাষের উৎসাহ দেওয়া হ'ল; কারণ বৃটিশ পুঁজির

কল্যাণে বহু পাটকল গঙ্গার দুই তীরে ধূম উদ্গীরণ করতে সুরু করেছে। কিন্তু মজুর নিয়োগ করা হোল বিহার ও উত্তর ভারত থেকে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভব হ'ল। শাসকশ্রেণী প্রথমে একটু আনুকূল্য দেখালেও পরে 'microscopic minority' ব'লে ঠাট্টা করলেন। তখনকার বিখ্যাত ব্যবহারজীবী স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত ভারত-বাসীকে 'Brain and conscience of country' ব'লে অভিহিত করলেন। এবং কংগ্রেসকে 'legitimate spokesman of the illiterate masses, the natural custodian of their interests' ব'লে দাবী করলেন। এ দাবী বৃটিশ সরকার মানল না; ফলে হতাশা দেখা দিল। এই সময়ে বাল গঙ্গাধর টিলক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন, আন্দোলনের আহ্বান জানিয়ে। তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আধুনিক জীবনের সঙ্গে অতীত জীবনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বাংলা দেশ থেকেই টিলকের সংগ্রামী ও ভারতবাদী রাজনৈতিক চিন্তাদর্শ অধিকতর সমর্থন পেয়েছিল।

॥ ২ ॥

বুদ্ধিসর্বস্বতার বিরুদ্ধে উনিশ শতকে ভাববাদ ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করছিল, এ সংবাদ আমরা ইতিপূর্বেই দিয়েছি। কিন্তু ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত হিউম-কঁৎ-মিল-এর প্রভাব খর্ব হয় নি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত উপলব্ধির কথা আমরা পূর্বেই বলেছি।

এখানে দেবেন্দ্রনাথের সাধনার তাৎপর্য একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব। কারণ পরবর্তীকালে বাংলা গীতিকাব্য যে প্রধান হ'য়ে উঠল, তার পিছনে এই সাধনার পরোক্ষ দান রয়েছে।

শঙ্করের মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করতে গিয়ে মহর্ষি দ্বৈতমতাবলম্বী হ'য়ে পড়েছিলেন।

জীবাত্মা থেকে পরমাত্মা ভিন্ন—এই মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি বললেন, "জড় হইতে জীবাত্মা যত ভিন্ন, তাহা অপেক্ষা অনন্ত গুণে জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা ভিন্ন। তাঁহার সমান আর কেহ নাই, তিনি অদ্বিতীয়।"[১]

এই মত রামমোহনের মতেরই প্রতিধ্বনি। "তিনি (রামমোহন রায়

মীমাংসা করিলেন যে ব্রহ্ম, জীব ও জগতের মধ্যে পরস্পরের ভেদ আছে। ভেদই সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য। উপনিষদে যে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' কহিয়াছেন, সে ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্ব প্রতিপাদনার্থে। নানা দেবতাকে যে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, সে ব্রহ্মের সর্বত্র বর্তমানতা দেখাইবার জন্য এবং দুর্বলাধিকারীর হিতের নিমিত্তে। প্রত্যেক পদার্থে বা দেবতাকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্রহ্ম কহা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে।"[২]

এই দ্বৈতমত তিনি ক্রমশঃ পরিত্যাগ করতে থাকেন; "সমুদয় জগতে তাঁহার প্রতিরূপ, কিন্তু আত্মাতেই তাঁহার রূপ দেখা যায়। সৃষ্টির সৌন্দর্যে, মানুষের মুখশ্রীতে, ধার্মিকের কল্যাণতর অনুষ্ঠানে তাঁহার ভাবের প্রতিরূপ মাত্র দেখা যায়। আত্মাতেই তাঁহার সাক্ষাৎরূপ বিরাজ করিতেছে।"[৩] এই মত অদ্বৈত-মতের প্রায় কাছাকাছি। "কোন কোন পণ্ডিতেরা বলেন, জীবত্ব গিয়া ঈশ্বর হইয়া গেলে জীবের মুক্তি হইবে। ব্রাহ্মধর্মের মুক্তি ঈশ্বরের অধীন হইয়া থাকা; তাঁহাদের মুক্তি ঈশ্বর হইয়া যাওয়া নয়। অন্ততঃ তাহাতে জীবের ঈশ্বরত্ব হয় না, তাহাকে বিনাশ করিয়া ফেলা হয়। সংসারের অধীন না হইয়া ঈশ্বরের যে মুক্তি, তাহাতেই—যথার্থ মুক্তি।"[৪] মহর্ষি এইভাবে দ্বৈতাদ্বৈতবাদে এসে পৌছুলেন। মহর্ষির এই ক্রমবিবর্তনে পাশ্চাত্ত্য যুক্তি-বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রভাব ছিল। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের একটি উক্তি আমরা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করেছি: "The Cartesian philosophy has been thought to be associated with the Brahmo Samaj as organised by Mahorsi Devendranath Tagore." দেকার্তে দ্বৈতবাদী বা বহুবাদী (pluralist)। তবে তিনি অধ্যাত্মচিন্তাকে সমাজ-আনুগত্য থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে ব্যক্তিগত করেছিলেন। Cogito Ergo Sun—I think, therefore I am.—" এই উক্তির ফলে দর্শন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী হ'য়ে পড়ল। মহর্ষির আত্মগত সত্য উপলব্ধির পক্ষে এ মত সহায়ক হয়েছিল।

দ্বৈতবাদ থেকে অদ্বৈতবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদে যখন মহর্ষি এসে পৌছাচ্ছেন, তখনও য়ুরোপীয় দর্শন-চিন্তা তাঁকে সহায়তা করেছিল। এক্ষেত্রে কাণ্ট ও হেগেল তাঁর সহযাত্রী। হেগেল অদ্বৈতবাদী; তিনি বলেন, প্রজ্ঞানরূপী অদ্বৈত সর্বগ এবং তিনি বিশ্বের অন্তর্নিহিত (immanent) সত্য। আর কাণ্টও অদ্বৈতবাদী। তাঁর বিখ্যাত উক্তি "The starry heaven above, and

the moral law within,"—মহর্ষিকে প্রচুর অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। তাঁর জীবনীকার বলেছেন যে, দেবেন্দ্রনাথ "কান্ট ও ফিক্তের নীতিশাস্ত্রের কাছে খুবই ঋণী।"[৫] কান্টের কর্তব্য-সাধননীতি (Rigorism) তিনি গ্রহণ করেছিলেন, "ধর্মকে ধর্মের জন্যই আলিঙ্গন করিতে হইবে। আমরা যদি ভাবী সুখের প্রত্যাশায় বর্তমান সুখ পরিত্যাগ করি, তবে তাহা ধর্মসাধন হইল না, স্বার্থসাধন মাত্র।"[৬]

মহর্ষির সাধনায় কান্ট ও বেদান্ত মিলিত হবার চেষ্টা করছিল। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এই মিলন সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ ক'রে তোলেন। তাঁর অদ্বৈতমতের প্রথম ও দ্বিতীয় সমালোচনায় কাণ্টীয় দর্শনের সঙ্গে ভারতীয় বেদান্তের কোথায় মিলনের সুযোগ আছে, তা বিশ্লেষণ ক'রে দেখান। হেগেলীয় মতের সঙ্গেই বা কোথায় ঐক্য, তাও তিনি দেখান। "অদ্বৈতবাদের ভিতরের কথা ব্যক্ত করিলেই তাহা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ হইয়া পড়ে।"[৭] "দ্বৈতাদ্বৈতবাদ আমার মতের পূর্ণাবয়ব।"[৮] মহর্ষির এক পুত্র অদ্বৈতবাদের সঙ্গে আধুনিক ইংরেজী কাব্যের ঘনিষ্ঠতা ব্যাখ্যা করলেন। শেলী, টেনিসন, ম্যাথ্যু আরনল্ড হলেন এই অদ্বৈতবাদী কবিগোষ্ঠী।

ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে জার্মান দর্শনের সমন্বয় সাধনের পূর্বে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনুরূপ প্রয়াস মহর্ষি গভীরভাবে অনুধাবণ করেছিলেন। রীড ও হ্যামিলটন তাঁর প্রিয় দার্শনিক। রীড বস্তুতন্ত্রতার বিরুদ্ধে "reasserted mind and external objects."

হ্যামিলটন রীডের ভাবশিষ্য; তিনি "overcame the provincialism of English thought and brought it into connection with the greatest of the new German philosopher."[১০] মিল ত হ্যামিলটনের বিরুদ্ধে এক বই-ই লিখে ফেললেন; এবং বললেন "it is a species of obscurantism."[১১]

দেবেন্দ্রনাথ আত্মপ্রত্যয়মূলক সত্যের উপর জোর দিলেন। বাঙ্‌লা সংস্কৃতির ইতিহাসে তার একটি বিশেষ দান আছে। ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ সম্পাদনাকালে তিনি লিখলেন, "ইহাতে এমন একটি বাক্য নাই, যাহা আত্ম-প্রত্যয় সিদ্ধি সত্যমূলক নহে। এখানে যাহার বিশ্বাস নাই, তাহার ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিবার অধিকার হয় না, এবং তাহাকে ব্রাহ্ম বলিয়া গণ্য করাও যায় না।"[১২]

মহর্ষির উত্তরসাধক রাজনারায়ণ বসু লিখলেন, "ইহা যথার্থ বটে যে রামমোহন রায় সেই আত্মপ্রত্যয় দ্বারা ধর্মগ্রন্থ সকলের পরীক্ষা করিতেন। তিনি কোন ধর্মগ্রন্থের সকল বাক্যেতে বিশ্বাস করিতেন না; কিন্তু এক্ষণে আত্মপ্রত্যয়কে যেমন ব্রাহ্মধর্মের একমাত্র পত্তনভূমি বলিয়া স্পষ্ট উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তখন এরূপ হয় নাই। এক্ষণে যেমন ব্রাহ্মধর্মকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন করা হইয়াছে, তখন সেরূপ হয় নাই।"[১৩] "ব্রাহ্মধর্ম সর্ব সামঞ্জস্যীভূত ধর্ম। ইহাতে আত্মপ্রত্যয় ও বুদ্ধির সামঞ্জস্য আছে, ইহাতে জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য আছে। এতদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম প্রথম প্রচারকালে জ্ঞানের প্রতি অধিক ভর দেওয়া হইত। ক্রমে সমাজপ্রীতি ও ভক্তিভাবের সঞ্চার হইতে লাগিল।"[১৪] এই আত্মপ্রত্যয় উপলব্ধি ও ভক্তিভাব দেশকে বুদ্ধিসর্বস্বতার মরুভূমি থেকে উদ্ধার করল। "ব্রাহ্মধর্মের দুইটি ভাগ আছে—একটি মধুর ভাগ, একটি কঠোর ভাগ"।[১৪ক] এই আত্মপ্রত্যয়-বোধের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবাবেগের স্থান বড় ক'রে দেখান হ'ল।

রুশো ইউরোপে নবীন ভাবাবেগের উদ্বোধক। তাঁর অনুভূতি-অতিশয়তা তখন দেশে দেশে নবীনভাবে রোম্যানটিক চেতনা সঞ্চার করেছিল। "Voltaire is the end of the world, and Rousseau is the beginning of the new."—গ্যয়টে বলেছিলেন এ কথাটি। রুশো সত্য উপলব্ধির একটি মাত্র পথ বাত্‌লে দিলেন—সে পথ আত্ম-অনুভূতির পথ। কাণ্ট এই কারণে বলেছিলেন, "He set me right."[১৪খ]

দেবেন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। নিউম্যান ও অক্‌স্‌ফোর্ড আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি পরিচিত ছিলেন।[১৫]

রেনেসাঁস আন্দোলন যদি মানুষকে নতুন ক'রে আবিষ্কার ক'রে থাকে, তবে রোম্যানটিক আন্দোলন প্রকৃতিকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করেছে: "Nature is nothing but a symbolic development of his own individual life." এবং "Rousseau's Love of Nature was not a retrospective elegy, but a prospective prophecy।"[১৫ক] প্রকৃতি-সম্ভোগ নতুন গতিপথ নিল। পূর্ব যুগের পর্যটকের দৃষ্টি নয়, উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদের অনুশীলনী বৃত্তিও নয়, বা ধর্মগুরুর ভগবদ্‌ প্রতিচ্ছায়া দর্শনও নয়, প্রকৃতি আজ বিশ্বসত্তার অংশ, মানবসত্তার প্রতীক। রুশো, কাণ্ট এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ

এই নব্য প্রকৃতিবোধ উদ্বোধন করলেন। দেবেন্দ্রনাথও প্রকৃতিকে সম্ভোগ করেছেন—প্রায় প্রেমিক-প্রেমিকার মতই। "অরুণোদয় প্রভাতে আমি যখন সেই বাগানে বেড়াইতাম, যখন অফিমের শ্বেত পীত লোহিত ফুল সকল শিশিরজলের অশ্রুপাত করিত, যখন ঘাসের রজতকাঞ্চন পুষ্পদল উদ্যানভূমিতে জরির মছলন্দ বিছাইয়া দিত, যখন স্বর্গ হইতে বায়ু আসিয়া বাগানে মধু বহন করিত, যখন দূর হইতে পাঞ্জাবীদের সুমধুর সঙ্গীতস্বর উদ্যানে সঞ্চরণ করিত, তখন তাহাকে আমার গন্ধর্বপুরী বোধ হইত।"[১৬] "প্রাতঃকালে শিশিরবিন্দুরূপ মুক্তামালাধারিণী কুসুম-কুন্তলা ধরণীতল দর্শন করিয়া যে পবিত্র আনন্দ উপভোগ করি, তজ্জন্য আমরা তোমাকে কৃতজ্ঞতা-পুষ্প প্রদান করিতেছি। নয়ন-রঞ্জন আরক্ত ঊষার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

ললাটে একটি মাত্র তাররত্নধারিণী গোধূলির ন্যায় মধুর ম্লান সৌন্দর্য জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হইতেছি।"[১৭]

ফরাসী রোম্যানটিক আন্দোলনের রণধ্বনি—La Sensibilite-এইভাবে বঙ্গদেশে সাদরে গৃহীত হল। যে মরমিয়াবাদ বা অতীন্দ্রিয়বাদ (mysticism) এতকাল সাধু-সন্তদের ধর্মীয় জীবনের অংশীভূত ছিল, এইবার তা ধর্ম-নিরপেক্ষ হ'ল।

মহর্ষির মরমিয়াবাদ ধর্ম-সম্পৃক্ত হলেও পূর্বতন যুগের সংসার-বিরহিত সন্ন্যাস জীবনের নিগূঢ় অংশ ব'লে আর প্রতিপন্ন হ'ল না।

শিখগুরু নানকের দোহা, মারাঠা কবি তুকারামের অভঙ্গ, সুফী সাধক সাদী-হাফেজের বয়েৎ এই বিশেষ হৃদয়ধর্মের জাগরণে আমন্ত্রিত হ'ল। তার সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীও পরিত্যক্ত হ'ল না। বৈষ্ণব পদাবলীর আবেগ-অন্বিষ্টতা মরমী ব্যক্তির কাছে সাদরে গৃহীত হ'ল। এই সময় বৈষ্ণব পদাবলীর এক ভদ্র সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

রামকৃষ্ণদেব ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ধর্ম আন্দোলনও মুখ্যত হৃদয়-ধর্মের আন্দোলন। "কলিযুগে ভক্তিযোগ, ভগবানের নামগুণগান আর প্রার্থনা। ভক্তিযোগই যুগধর্ম।"

"ইচ্ছা ক'রে বেশী কাজ জড়ানো ভাল নয়;—ঈশ্বরকে ভুলে যেতে

হয়। কালীঘাটে দানই কর্তে লাগলো ; কালীদর্শন আর হ'লো না।"[১৭ক] ধর্মের এই নির্বিকল্প রূপ কাণ্টেরও অভিলষিত।

॥ ৩ ॥

এই অনুভূতি তখনও সাহিত্যে ভাষা পায়নি। শ্রীচৈতন্যের নব উপলব্ধির সাহিত্য-রূপ বৈষ্ণব পদাবলী। জীবনীসাহিত্য তার ইতিহাস, এবং তত্ত্বব্যাখ্যা। পদাবলী তত্ত্ব নয়, ব্যক্তি-অনুভূতির অমৃত ফল।

এযুগে মহাকাব্য হতমূল্য, এবং ব্যঙ্গের লক্ষ্য। এ অনুভূতি মহাকাব্যের বিষয়বস্তু হতে পারে না! কারণ এ অনুভূতি বাহ্যতঃ কোন ঘটনা নয় ; সংবাদ নয়। যা ঘটনা নয়, তা বিস্তৃত সাহিত্যের বিষয়ীভূত হ'তে পারে না। গাথাকবিতা কোনদিনই সর্ব অনুভূতির বাহন নয়, শুধু কোন কোন অনুভূতির তীব্রতর প্রকাশ বা কাব্যরূপ দান গাথাকবিতায় সম্ভব। টেনিসন আর্থার-গাথায় একজাতীয় গভীরতা আনার চেষ্টা করেছেন ; এবং সেই চেষ্টায় গাথাকবিতা তার গাথা-ধর্ম হারিয়ে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হয়েছে। এখানে ঘটনা অপেক্ষা আর্থারের বিলাপই প্রধান হয়েছে ; এ বিলাপ আত্ম-কথন (monologue) মাত্র। গীতিকবিতার সোনার হাতের স্পর্শ এখানেও দৃশ্যমান। রূপক কবিতাও বিগত যুগের। দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণ, নবীনচন্দ্রের রঙ্গমতী আর অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর উদাসিনী এই নবীন আকাঙ্ক্ষার ভাষা দিতে পারে নি, আর রঙ্গমতী ব্যতীত অপর দুটি কাব্যে সেই ভানও ছিল না।

বরং গীতিকবিতায় সেই চেষ্টা চলছিল ; কিন্তু সমসাময়িক গীতিকবিতার বৃহত্তর অংশ ছিল ধর্মভ্রষ্ট ; তাই গীতিকবিতার মাধ্যমে শুধু সাংবাদিকতার দায় পালন করা হয়েছে। সংখ্যালঘু বা পরিমাণলঘু হ'তে পারে, কিন্তু বিহারীলালের গীতিকাব্যে তার প্রতিধ্বনি ছিল। বক্তব্যে গভীরতা এসেছে, কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে সর্বদা সেই গভীরতা রক্ষিত হয়নি। বিহারীলালের কাব্য নবীন যুগ-চেতনার অস্ফুট আদিম প্রকাশ। অথচ নবীন কাব্যের জন্য উৎকণ্ঠা তখন কতই না আন্তরিক!

"হায়! কবে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বাল্মীকির ন্যায় অসাধারণ কবিত্বসম্পন্ন মহাকবি উদিত হইবেন। * * * তিনি দেশভেদে কালভেদে ঈশ্বরের অসীম রচনা সকল অবিনশ্বর কবিতাতে কীর্তন করিবেন। তিনি যেমন

নৈসর্গিক পদার্থ সকল বর্ণনা করিবেন তেমনি পুরাবৃত্তে বিবৃত ঘটনা সকলেও ঈশ্বরের হস্ত আমাদিগকে সন্দর্শন করাইবেন। তিনি এই সকল বর্ণনাকালে এইরূপ মধুর হিতোপদেশ প্রদান করিবেন যে, লোকের মন তাহা শ্রবণ করিয়া একেবারে বিমুগ্ধ হইবে। কখন বা বজ্রের ন্যায় তাঁহার কবিতা তেজস্বী ও গম্ভীরস্বন হইবে; কখন বা সুমন্দ মারুতহিল্লোল স্পন্দিত গোলাবের ন্যায় তাহা সুললিত হইবে। তিনি প্রকৃতিরূপ বীণাযন্ত্র বাদন করিয়া এইরূপ গান করিবেন যে মর্ত্যলোক স্তব্ধ হইয়া শুনিবে, বোধ হইবে যেন কোন স্বর্গলোকবাসী দেবপুরুষ গান করিতেছেন। হা! এমন কবি কবে আমাদিগের মধ্যে উদিত হইবেন? জগদীশ্বর আমাদিগের এই প্রত্যাশা কোনদিন অবশ্য পূর্ণ করিবেন।"[১৮]

রবীন্দ্রনাথ তখন সাত বৎসরের বালক মাত্র।

পাদটীকা

১। আত্মতত্ত্ববিদ্যা—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২য় সংস্করণ, ১৮৫২, পৃ—১৪।

২। বেদান্ত প্রবেশ—চন্দ্রশেখর বসু, ১৮৮২, পৃ—১৫২

৩। ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান—দেবেন্দ্রনাথ—১৮৭৮, প্রথম প্রকরণ, পৃ—১৫

৪। ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস—ঐ, পৃ—৯২।

৫। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অজিতকুমার চক্রবর্তী, পৃ—৬৭৯

৬। ঐ, পৃ—৬৮০

৭। অদ্বৈতমতের প্রথম ও দ্বিতীয় সমালোচনা—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩০৪, অগ্রহায়ণ, পৃ—৪৩

৮। ঐ, পৃষ্ঠা—৪৮

৯। A History of English Philosophy—W. R. Sorley. Cambridge University Press, 1951, পৃ—২০৫.

১০। ঐ, পৃ—২৪৩

১১। A Hundred Years of Philosophy—John Passmore. Gerald Duckworth and Co Ltd., 1957., পৃ—২৮

১২। ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—১৭৭২ শক, পৃ—১১৩

১৩। রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা—১ম ভাগ, ১৭৮৩ শক, পৃ—১০৬

১৪। রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ২য় ভাগ, পৃ—৩৭

১৪ক। আত্মজীবনী—রাজনারায়ণ বসু, ওরিয়েন্ট বুক কোং

১৪খ। Rousseau, Kant and Goethe—Ernest Cassirer. 1945. পৃ—১

১৫। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রাবলী—প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত, ১৮ ও ৪৭ সংখ্যক পত্র।

১৫ক। Rousseau, Kant and Goethe. পৃ—১০

১৬। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী—সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, ১৯২৭। পৃ—২৩৫-২৩৬

১৭। আলাহাবাদ বক্তৃতা—রাজনারায়ণ বসু—১৭৮৭, শক, পৃ—১০৬

১৭ক। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত—শ্রীম কথিত, ১৩শ সংস্করণ, ১৩৪৯—প্রথম ভাগ, ২য় খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ, পৃ—৫৯-৬০

১৮। একমেবাদ্বিতীয়ম্—রাজনারায়ণ বসু, ১৭৮৩ শক, পৃ—১৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পুরাতনের বুকে নবীনের পদধ্বনি

"ছাপার অক্ষরে 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' এই নামযুক্ত যে কবিতা সর্বপ্রথমে প্রকাশিত হয়, সেটি হইতেছে 'হিন্দুমেলার উপহার'।[১] 'অভিলাষ' ও 'প্রকৃতির খেদ' তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যথাক্রমে 'দ্বাদশবর্ষীয় বালকের রচিত' ও 'বালকের রচিত' ব'লে প্রকাশিত হয়। প্রতিবিম্ব পত্রিকায় 'প্রকৃতির খেদ' 'ক্রমশঃ' লিখিত হ'য়ে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ কবির প্রথমে সংকল্প ছিল, এই বিষয়বস্তুকে আরও অনুসরণ ক'রে দীর্ঘতর কবিতা রচনা করবেন।[২] তত্ত্ববোধিনীতে পুনঃ প্রকাশের সময় ক্রমশঃ কথাটি পরিত্যক্ত হয়; সম্ভবতঃ কবি ঐ সংকল্প ত্যাগ করেছিলেন।

এই তিনটি কবিতা ছাড়াও দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সরোজিনী নাটকে 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' ও স্বপ্নময়ী নাটকে অপর একটি গান তাঁর রচনা। এছাড়া কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীত তিনি রচনা করেন ব'লে তাঁর জীবনীকার অনুমান করেছেন।[৩]

বনফুল-পূর্ব সমস্ত রচনাই এক বিশেষ সুরে বাঁধা। সে-সুর জাতীয়তাবাদের সুর, জঙ্গী জাতীয়তাবাদের সুর,—হিন্দুমেলার অধিবেশনে যার প্রকাশ, 'স্বাদেশিকদের সভা'য় যার উদ্ভব। এই বিশেষ সুরটির সঙ্গে মিল ছিল কিছু পূর্বে রচিত 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' কাব্যের। "তৃণহীন কঙ্করশয্যায় বসিয়া রৌদ্রের উত্তাপে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' বলিয়া একটা বীররসাত্মক কাব্য লিখিয়াছিলাম। তাহার প্রচুর বীররসও উক্ত কাব্যটাকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই।"[৪] বনফুল-পূর্ব সমস্ত কবিতাই এই 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়ে'র সুরে বাঁধা—জঙ্গী জাতীয়তাবাদের সুরে। পৃথ্বীরাজ-প্রসঙ্গ অন্যত্রও রয়েছে, যথা হিন্দুমেলার উপহার।

আর হেমচন্দ্র এই জঙ্গী জাতীয়বাদের সর্বাধিক খ্যাতনামা কবি। তাঁর বিভিন্ন কবিতার রচনা-রীতি, ছন্দ এবং ভাষা এখানে অনুকৃত হয়েছে।

'হিন্দুমেলার উপহার' কবিতায় 'ঝংকারিয়া বীণা করিবর গায়'—এই গানের আদর্শ হল নিম্নোদ্ধৃত রচনা।

এই কথা বলি মুখে শিঙ্গাতুলি
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী,
নয়ন-জ্যোতিতে হানিয়ে বিজলী
গায়িতে লাগিল জনৈক যুবা।

এই প্রকার আত্ম-উচ্ছ্বাসের সঙ্গেই হিন্দুমেলার উপহার' কবিতাটির রচনাভঙ্গীর মিল। প্রকৃতির খেদ কবিতাটিতে হেমচন্দ্রের 'ভারতবিলাপ' কবিতাটির আদর্শে বালক কবি লিখেছেন—

অভাগী ভারত! হায়, জানিতাম যদি,
বিধবা হইবি শেষে
তা হলে কি এত ক্লেশে
তোর তরে অলঙ্কার করি নিরমান।

হেমচন্দ্র লিখেছেন—

রূপে নিরুপম নিখিল ধরায়
করিয়া বিধাতা সৃজিলা তোমায়
দিলা সাজাইয়া অতুল ভূষায়—
তোর কিনা আজি এ হেন দশা।

এই মিল আরও বিস্তৃততরভাবে দেখান যেতে পারে। শুধু হেমচন্দ্র নন। জঙ্গী দেশপ্রেমের একাধিক কবি একই প্রকার প্রতীক ব্যবহার করেছেন। একাধিক কবিতায় বৈধব্য-দশার সঙ্গে পরাধীনতা উপমিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ একবার যখন অনুরূপ বিষয়ে হস্তার্পণ করেছেন, তখন অনুরূপ কাব্য ও রীতি তাঁকে স্বতঃই ব্যবহার করতে হয়েছে। হেমচন্দ্র-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় এই কারণে যে, হেমচন্দ্র এই বিশেষজাতীয় কবিতা রচনার ক্ষেত্রে প্রধান কবি।

'অভিলাষ' কবিতাটিতে দেশপ্রেম নেই; রূপক-প্রিয়তা আছে।

জনমনোমুগ্ধকর উচ্চ অভিলাষ!
তোমার বন্ধুর পথ অনন্ত অপার!

অতিক্রম করা যায় যত পান্থশালা
তত যেন অগ্রসর হতে ইচ্ছা হয়।

এই কবিতাটিতে হিমালয় প্রসঙ্গ আছে। সদ্য হিমালয়-প্রত্যাগত বালক কবির স্বপ্ন হিমালয়ের চারপাশেই গুন গুন ক'রে ফিরছিল। কবিতাটি মিলহীন পয়ারে লিখিত।

এগুলি নিতান্তই বালকের পদ্য-চর্চা। তবে এ বালক যেহেতু ভবিষ্যতের কবিসার্বভৌম, এই কারণে অতি অল্প বয়সেই তিনি পুরাতন কাব্য-রীতি চূড়ান্তভাবে অনুকরণে সক্ষম হয়েছেন। 'অভিলাষ' কবিতা সেকালের যে কোন স্বনামধন্য কবির রচনাসংগ্রহে স্থান পেতে পারে।

॥ ২ ॥

বনফুল কবির প্রথম সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ, অবশ্য 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' কাব্যটি ব্যতীত। 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' কোনকালেই মুদ্রিত হয় নি। কাজেই বনফুলের স্বতন্ত্র মর্যাদা অলঙ্ঘ্য থাকছে।

বনফুল আখ্যায়িকা কাব্য।

রবীন্দ্রনাথ জঙ্গী জাতীয়তাবাদের জোয়াল বেশিদিন বহন করতে পারেন নি; আর যখন সে জোয়াল তাঁর কাঁধে চেপে ছিল, তখনও তিনি কাঁধ বদলাতেন। বনফুল সেই কাঁধ বদলানোর কাব্য।

বনফুল অক্ষয় চৌধুরীর নয়, বিহারীলালের কাব্য-মেজাজের সঙ্গে সুসংবদ্ধ। সম্ভবতঃ তখনও বিহারী-প্রভাব তত সুস্পষ্ট হয় নি। গাথা জাতীয় নানা কবিতা তখনকার প্রিয় সাহিত্য-রূপ। 'হার্মিটের' একাধিক অনুবাদে এই সত্য প্রমাণিত। বনফুল আট সর্গে বিভক্ত। কাহিনী নিম্নরূপ: মাতৃহীনা কমলা শিশুকাল থেকে পিতার কাছে বিজন কাননের এক কুটিরে প্রতিপালিত। তরুলতা ও পশুপাখিই তার সঙ্গী, খেলার সাথী। কমলা যখন ষোড়শী, তখন এক রাত্রে তার পিতার মৃত্যু হ'ল। সেইদিন প্রভাতে পথভ্রান্ত পথিক বিজয় এসে দুয়ারে করাঘাত করল; বিজয়ের শুশ্রূষায় কমলার চৈতন্য সঞ্চার হ'ল।

মেলিয়া নয়ন পুটে, বালিকা চমকি উঠে,
একদৃষ্টে পথিকেরে করে নিরীক্ষণ

পিতামাতা ছাড়া কারে, মানুষ দেখেনি হারে
বিস্ময়ে পথিকে তাই করিছে লোকন!

বৃদ্ধের মৃতদেহ তুষারের মধ্যে সমাহিত করা হ'ল; তারপর কমলা বিজয়ের সঙ্গে বনভূমি ত্যাগ করল। লোকালয়ে এসে প্রকৃতি-কন্যা কমলা সুখী নয়। বার বার অরণ্যের স্মৃতি তাকে ব্যাকুল করে—সেই পাতার কুটির, সেই হরিণশাবক! সবাই তাকে আকর্ষণ করছে। তারপর একদিন কমলাকে বিজয় বিবাহ করল; এখান থেকেই আগুন জ্বলে উঠল। কারণ কমলা বিয়ে করল বিজয়কে, কিন্তু ভালবাসল বিজয়ের বন্ধু নীরদকে। চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে সুরু হ'ল বিরোধ। নীরোদকে সে তার মনের কথা বলল; নীরদও সেই প্রণয়ে সাড়া দিল; কিন্তু কর্তব্যবুদ্ধি তর্জনী তুলে তাকে নিবৃত্ত হতে বলল। বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে সে চাইল না। বিজয় তার স্বামী; তাকেই গ্রহণ করতে নীরদ অনুরোধ জানাল। স্বামী, সংসার, পাপ, পুণ্য—এ সব কমলার কাছে অর্থহীন। নীরদ যখন বঝিয়ে পারল না, তখন ভৎর্সনা ক'রে চলে গেল। কমলার পক্ষে তখন ক্রন্দন ভিন্ন আর কি করণীয় থাকতে পারে!

বিবাহ কাহারে বলে জানি নে তা আমি
কারে বলে পত্নী আর কারে বলে স্বামী,
কারে বলে ভালবাসা আজিও শিখিনি।

গল্পের জটিলতা ক্রমশই বেড়ে চলল। বিজয়কে আবার সখী নীরজা ভালবেসে ফেলল। নীরজার ভালবাসা নীরব ভালবাসা। বিজয় এ বিষয়ে অনবহিত। নীরদের হাবভাবে বিজয়ের মনে সন্দেহ দেখা দিল। পরিশেষে একদিন গোপনে তাকে বিজয় হত্যা করল।

নীরদের মৃত্যুর পর কমলার একমাত্র আশ্রয় হল সেই পূর্ব-পরিত্যক্ত বন। পুরাতন অরণ্যকুটিরে সে ফিরে এল, কিন্তু পুরাতন অরণ্য তাকে আর গ্রহণ করল না; সে প্রত্যাখ্যাত হ'ল। তুষার শিলায় পদস্খলনে তার মৃত্যু হ'ল। কাব্যের উপসংহার—অক্ষয় চৌধুরীর উদাসিনীর বিপরীত। সেখানে সুরেন্দ্র ও সরলার মিলন হয়েছে; এবং বনদেবী হয়েছেন রতিদেবী।

হের হের ওই দেখিতে দেখিতে
কি শোভা উদয় মেদিনী মাঝে,

বনদেবী ওই দেখ রে চকিতে
রতিদেবী রূপে সম্মুখে রাজে। (১০ম সর্গ)

রঙ্গমতী এবং উদাসিনী থেকে এই কাব্যের মূল কল্পনায় অধিকতর গভীরতা আছে। এ-কাব্য সামাজিক ঘটনা-ভিত্তিক ; কিন্তু ঈশানচন্দ্রের 'যোগেশ' কাব্যের (১৮৮১) পূর্বে লিখিত।

বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলার যেন 'বনফুল' এক সমালোচনা। কপালকুণ্ডলাও অরণ্য ত্যাগ ক'রে সংসারী হয়েছিল ; সে আবার প্রকৃতির কোলে ফিরে গেলে কি দাঁড়াত, কবি যেন তাই দেখাতে চেয়েছেন।

এ কাব্যের ভাব-পরিমণ্ডলে সেক্সপীয়র, কালিদাস, এবং পার্ণেল রয়েছেন। কিন্তু পার্ণেলের প্রকৃতি হ'ল মিলন-ভূমি ; সংসারে বেদনাহত হৃদয়ের আশ্রয়স্থল। সেক্সপীয়র প্রকৃতিকে মানব-জগতের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে খাড়া করেছেন ; প্রকৃতির বিধানকে লঙ্ঘন করলে সে নির্মমভাবে প্রতিশোধ নিতে পারে। কালিদাস প্রকৃতিকে বিশ্বজগতের পরিপূরক হিসাবে দেখেছেন। শুধু মাত্র বানপ্রস্থের আশ্রয়স্থল নয়।

বালক কবি এখানে একটু বিপর্যস্ত ; তিনি এখনো নানা বিরোধী দৃষ্টির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারেন নি। নানা মতের দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খেতে খেতে এই নবীন কবি একদা এই ময়দানবের পুরীর সঙ্গে পরিচিত হবেন। মূল ভাবনায় নানা আদর্শ জট পাকিয়ে থাকলেও এখানে-ওখানে ছোটখাট প্রভাবও রয়েছে। অরণ্য-বর্ণনায় কালিদাসের পাশাপাশি মাইকেল মধুসূদনও রয়েছেন।

কুটির! তোদের সবে ছাড়িয়া যাইতে হবে
পিতার মাতার কোলে লইব আশ্রয়।
হরিণ! সকালে উঠি, কাছেতে আসিত ছুটি,
দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে আঁচল চিবায় ;
ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি, মুখেতে দিতাম তুলি,
তাকায়ে রহিত মোর মুখপানে হায়।
তাহারে করিয়া ত্যাগ যাইব কোথায় ?

(অচলিত সংগ্রহ, ১ম খণ্ড, পৃ—৬৩)

এ বর্ণনায় কালিদাস আছেন পরোক্ষভাবে, প্রত্যক্ষভাবে রয়েছেন মাইকেল ;

তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গে সীতা ও সরমার কথোপকথনটি এখানে আদর্শ। এই প্রকার প্রকৃতি-সম্ভোগে বিহারীলালও রয়েছেন ; তাঁর হিমালয়-বর্ণনা বালক কবির আদর্শ। সমালোচক হিসাবে পরবর্তী জীবনে তিনি এই বর্ণনার স্তুতি করেছেন ; বালক জীবনে তার অনুসরণ করেছেন।

গিরিরাজ হিমালয়, ধবল তুষারচয়
অয়ি গো কাঞ্চন-শৃঙ্গ মেঘ-আবরণ ! (ঐ, পৃ—৫৫)

আবার অরণ্য-বিহারেও এই সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়—

মালা গাঁথি ফুলে ফুলে, জড়াইব এলোচুলে
জড়ায়ে ধরিব গিয়ে হরিণীর গল !
বড় বড় দুটি আঁখি, মোর মুখপানে রাখি
একদৃষ্টে চেয়ে রবে হরিণ বিহ্বল ! (১০৮)

এগুলি বিহারীলালের নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিচয়ের প্রতিধ্বনি।

সে সময়ে কুরঙ্গিনীগণ,
সবিস্ময়ে ফেলিয়ে নয়ন,
আমার সে দশা দেখে,
কাছে এসে চেয়ে থেকে,
অশ্রুজল করিবে মোচন,—
সে সময়ে আমি উঠে গিয়ে
তাহাদের গলা জড়াইয়ে,
মৃত্যুকালে মিত্র এলে,
লোকে যেম্নি চক্ষু মেলে
তেম্নিতর থাকিব চাহিয়ে। (বঙ্গসুন্দরী, ১ম সর্গ)

কাব্যটিতে নানা ছন্দের পরীক্ষা আছে। যেমন, প্রথম সর্গে মাইকেলের বীরাঙ্গনার প্রতিধ্বনি—অবশ্য মিত্রাক্ষর। পয়ার এখানে নিরন্তর প্রবহমান—যতি স্থাপনে স্বাধীনতা আছে।

কুসুম-ভূষিত বেশে, কুটিরের শিরোদেশে
শোভিছে লতিকা মালা প্রসারিয়া কর,
কুসুম স্তবকরাশি, দুয়ার উপরে আসি
উঁকি মারিতেছে যেন কুটির ভিতর। (৫৩)

আবার বিহারীলালের বঙ্গসুন্দরীর সেই বিখ্যাত ছন্দটিরও অনুসরণ আছে।

চাই না জোয়ান, চাই না জানিতে
সংসার, মানুষ কাহারে বলে
বনের কুসুম ফুটিতাম বনে
শুকায়ে যেতেম বনের কোলে। (৬৯)

আবার হেমচন্দ্রের ভারত-সঙ্গীতের ছন্দেরও অনুরণন আছে। অভিলাষ, হিন্দুমেলার উপহার, প্রকৃতির খেদ—এই তিনটি কবিতাতে বালক কবি তিনটি ছন্দ অনুসরণ করেছেন—অভিলাষ কবিতায় ১৪ মাত্রার পয়ার অবলম্বিত হয়েছে; হিন্দু মেলার উপহারে হেমচন্দ্রের ছন্দ। পার্থক্য এই 'হিন্দুমেলার উপহারে' প্রতি স্তবকের প্রথম দুইটি চরণে মিল। আর অভিলাষ মিলহীন পয়ার। প্রকৃতির খেদ ত্রিপদীতে রচিত—এটি বিহারীলালের সারদামঙ্গল এবং হেমচন্দ্রের কালচক্র কবিতার অনুসরণ। নিঃসন্দেহে এই তিনটি কবিতা অপেক্ষা বনফুলে কবি ছন্দ ব্যাপারে বহুগুণ দক্ষতা অর্জন করেছেন। এমন কি মিল অনেক লাগসই হয়েছে।

অভিলাষ-এ কবি মিল দেন নাই। হিন্দুমেলার উপহারে প্রতি স্তবকে দুই চরণে মাত্র মিল দিয়েছেন—সে মিলও দরিদ্রের মিল; বিবাদ লেগেই আছে। যেমন কিরণ—কানন, গায়—হায়, সুখ—সুখ, ভাল—ভাল, নয়—সময়, হয়ে—হিমালয়ে, আর—আর। প্রকৃতির খেদ-এ মিল অনেক উন্নত; সম্ভবতঃ বিহারীলাল সম্মুখে ছিলেন। এখানে কিরণের সঙ্গে পবনের মিল দিয়েছেন; তাহারা চিত্রিত—ব্যাপৃত, সাগরের তলে—কমণ্ডলে, অরুণের কর—পর্বত-শিখর প্রভৃতি মিলে কবির শব্দজ্ঞান প্রমাণিত করে। একই শব্দের মিল মাত্র দুইটি: হিমালয়—হিমালয়, হিমালয়—পাউক লয়। কিন্তু মনে রাখা উচিত ২৭টি বৃহৎ স্তবকে ২১১টি চরণে কবিতাটি সম্পূর্ণ। বনফুলে মিলের কুশলতা আছে, লোকন—আস্ফালন, যায়—প্রায়, হরিণীর গল—হরিণ বিহ্বল, ইত্যাদি। কোন কোনটি বিহারীলালের মিল—যেমন লোকন। অবলোকন শব্দটিকে 'লোকন' রূপে তিনিই প্রথম ব্যবহার করেন। বনফুল ১৫৮২ চরণে সমাপ্ত।

প্রথমোক্ত তিনটি কবিতা অপেক্ষা এখানে কবির ব্যবহৃত ভাষার গদ্যাত্মকতা অনেক কেটেছে। অত্যাচারচয়, পর্বতের অত্যুন্নত শিখর, লোভনীয়, প্রজ্বলিত

অনুতাপ (অভিলাষ), স্বাধীন নৃপতি, আর্য সিংহাসন, চিতাভস্মরাশি (হিন্দুমেলার উপহার), কবরী-কুসুম-গন্ধ, তুষার-মুকুট, নীহার-নীর, তরু-স্কন্ধ, সংহার-শিঙ্গা, সুদুর্গম অরণ্য, সুবিস্তৃত অন্ধকূপ, ভাগ্যচক্র (প্রকৃতির খেদ) প্রভৃতি শব্দ বা বাক্যাংশ থেকে 'বনফুলের' শব্দ ও বাক্যাংশে সাঙ্গীতিকতা অনেক উন্নত। প্রকৃতির খেদে কবির সমাস-গঠন-ক্ষমতার প্রকাশ ঘটেছে; তবু আভিধানিক শব্দের প্রলোভন কাটাতে পারেন নি। সম্ভবতঃ শহুরে বিষয়ের উপর কবিতা লিখতে গিয়ে প্রচলিত মুখ্য কাব্যভাষার দায় গ্রহণ করতে হয়েছে। কিন্তু বনফুলে এসে সে-দায় কবি ঝেড়ে ফেলেছেন। এখানে তৎসম শব্দ অপেক্ষা তদ্ভব শব্দের ও চলতি শব্দের সংখ্যাধিক্য। এবং সমাস-গঠনে ও বাক্য রচনায় অধিকতর সংগীত-উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অনুকূল বিষয়ের জন্যই বিহারী-আদর্শ এখানে কার্যকরী হয়েছে। বনফুলের এই শব্দ বা বাক্যাংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য: কুসুম-ভূষিত-বেশ, সলিল-দর্পণ, কবরী, আঁখিপুট, হৃদয়পুট, রেখা রেখা প্রায়, নিশীথিনী, পাতার অঙ্গুলি তুলি ইত্যাদি। কবি ইতিপূর্বে গীতগোবিন্দ পড়ছেন, প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ পড়েছেন; কুমারসম্ভব ও মেঘদূতের অংশবিশেষ অনুবাদ করেছেন। এই সময়ই কবি বিহারীলালের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে।

কবির আদিযুগের অন্যতম প্রধান রসজ্ঞ পাঠক মোহিতচন্দ্র সেন তৎসম্পাদিত কাব্যগ্রন্থে কবির কিশোর বয়সের রচনাসমূহকে 'যাত্রা' খণ্ডে স্থান দেন।

বনফুলে এসে কবির যাত্রাপথটি দৃশ্যমান হ'য়ে পড়ল। অপর তিনটি কবিতা রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহের সুসঙ্গত অংশ নয়। প্রক্ষিপ্ত অংশ। বালক কবি স্বল্পকালের জন্য সমসাময়িক প্রত্যক্ষবাদী কাব্যের বাদ্যতাণ্ডবে স্বকীয় তাল ভুল করলেন।

॥ ৩ ॥

কবিকাহিনী, প্রলাপ কবিতাগুচ্ছ, ভগ্নহৃদয়, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ও রুদ্রচণ্ড পরবর্তী রচনা।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত সমালোচনা প্রবন্ধ 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী' জ্ঞানাঙ্কুরে প্রকাশিত হয়। এই সমালোচনা

রচনা-কালে রবীন্দ্রনাথ আপন পথটি বুদ্ধি দিয়ে ঠিকই অনুধাবন করেছেন। আপন কাব্যে তিনি এই উপলব্ধি অনুবাদ ক'রে চললেন। "মহাকাব্য আমরা পরের জন্য রচনা করি, আর গীতিকাব্য আমরা নিজের জন্য রচনা করি।" তখনকার গীতিকবিতা বা খণ্ড কবিতা অধিকাংশই পরের জন্য রচিত হত। বনফুলে আত্ম-উপলব্ধির মাত্রা কম; বহু কাব্য-ধারণার সংমিশ্রণে কবির নিজস্ব ধারণাটি—জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ভালো করে ফোটেনি।

কবিকাহিনীর গল্পাংশ সামান্য; প্রকৃতির কোলে লালিত কবি একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে প্রকৃতি মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। এবং "মানুষের মন চায় মানুষেরি মন" (পৃ—১৪)। তখন তিনি ভ্রমণে বের হ'য়ে পড়লেন; এবং সেই ভ্রমণ-পথে নলিনী নাম্নী এক বালিকার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হ'ল। সে বালিকার জীবনও নিঃসঙ্গতার জীবন। কবিকে পেয়ে সে নিজেকে সার্থক মনে করল। কিন্তু নলিনীর হৃদয়-সান্নিধ্য কবিকে অধিককাল তৃপ্তি দিতে পারল না। কবি এবার বিশ্বভ্রমণে বহির্গত হলেন। কিন্তু নলিনীবিহীন প্রকৃতি কবির কাছে শুষ্ক ব'লে মনে হ'ল। কবি ফিরে এলেন নলিনীর কাছে। কিন্তু ইতিমধ্যে নলিনীর মৃত্যু হয়েছে। কবি তখন হিমালয়ে গিয়ে জীবন অতিবাহিত করলেন। প্রকৃতির মধ্যে কবি প্রত্যক্ষ করলেন:

> উচ্ছ্বসিত করি দিয়া কবির হৃদয়
> অসীম করুণাসিন্ধু পোড়েছে ছড়ায়ে
> সমস্ত পৃথিবীময়। মিলি তাঁর সাথে
> জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী ভারতী
> কাঁদিলেন আর্দ্র হোয়ে পৃথিবীর দুখে,
> ব্যাধ শরে নিপীড়িত পাখীর মরণে
> বাল্মীকির সাথে যিনি করেন রোদন!

এখানে বিহারীলাল কবিকে অধিকার ক'রে আছেন। কবি আশা প্রকাশ করলেন—"একদিন মিলিবেক হৃদয়ে হৃদয়"। "যে বয়সে লেখক জগতের আর-সমস্তকে তেমন করিয়া দেখে নাই, কেবল নিজের অপরিস্ফুটতার ছায়া-মূর্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে, ইহা সেই বয়সের লেখা। সেই জন্য ইহার নায়ক কবি। **সে কবি যে লেখকের সত্তা তাহা নহে—লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে**

ইহা তাহাই। ঠিক ইচ্ছা করে বলিলে যাহা বুঝায় তাহাও নহে—যাহা ইচ্ছা করা উচিত, অর্থাৎ যেরূপটি হইলে অন্য দশজনে মাথা নাড়িয়া বলিবে, হাঁ কবি বটে, ইহা সেই জিনিসটি। ইহার মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে। তরুণ কবির পক্ষে এইটি বড় উপাদেয়, কারণ ইহা শুনিতে খুব বড়ো এবং বলিতে খুব সহজ। নিজের মনের মধ্যে সত্য যখন জাগ্রত হয় নাই, পরের মুখের কথাই যখন প্রধান সম্বল, তখন রচনার মধ্যে সরলতা ও সংযম রক্ষা করা সম্ভব নহে। তখন, যাহা স্বতঃই বৃহৎ তাহাকে বাহিরের দিক হইতে বৃহৎ করিয়া তুলিবার দুশ্চেষ্টায়, তাহাকে বিকৃত ও হাস্যকর করিয়া তোলা অনিবার্য।"[৫]

কবিকাহিনী প্রসঙ্গে এই আত্ম-সমালোচনা; কিন্তু মোটামুটি এ যুগের অন্যান্য 'মহৎ' ভাবনাসমৃদ্ধ কাব্য সম্বন্ধে সত্য।

বনফুল অপেক্ষা এ কাব্য অধিকতর রবীন্দ্র-ভাবনা অনুগত। সম্ভোগের দৃষ্টিতে বা পলাতক বৃত্তির দ্বারা চালিত হ'য়ে কবি এ কাব্য লেখেন নি। উভয় জগত মিলিত হ'য়েই সম্পূর্ণ জগৎ সৃষ্টি করে, এ বিশেষ বক্তব্যটি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের বক্তব্য; বনফুল অপেক্ষা এখানে এই বক্তব্য অধিকতর রবীন্দ্র-পথে পরিবেশিত। বনফুলে কমলা-বিজয়ের প্রজ্বলিত হৃদয়বৃত্তির আগুনে এই বক্তব্য ঝলসে গেছে—তার মধ্যে আলো অপেক্ষা উত্তাপ বেশি। ফুটন্ত আগ্নেয়গিরিতে আলোর সন্ধানে কেউ যায় না।

কবিকাহিনীতে কবি আপনার বক্তব্যের মোহে একপ্রকার আত্মরতিতে মগ্ন; আপনার সৌন্দর্যে আপনি বিভোর। এই মোহান্ধতা বুঝা যাবে বিভিন্ন অবস্থায় কাব্যের নায়কের মনোভঙ্গি বিশ্লেষণে :

শীর্ণ নির্ঝরিণী যেথা, ঝরিতেছে মৃদুমৃদু
উঠিতেছে কুলুকুলু জলের কল্লোল,
সেখানে গাছের তলে একাকী বিষণ্ণ কবি
নীরবে নয়ন মুদি থাকিত শুইয়া,
তৃষিত হরিণশিশু সলিল করিয়া পান
দেখি তার মুখপানে চলিয়া যাইত। (১৫)

এ একবারে তন্ময় অবস্থা। এই আবেশ, বিভোরতা ও প্রমত্ততা রাধিকার,—চণ্ডীদাসের রাধিকার 'দশা'র সঙ্গেই উপমিত হতে পারে।

জীবনে সত্য কখনও স্বতঃই অর্জিত হয় না, সত্যে বসবাস ক'রে সত্যকে অর্জন করতে হয়। কবির সেই অভিজ্ঞতার পুঁজি খুবই কম। ভাষায় ও বক্তব্যে সমসাময়িক কবিতার প্রতিধ্বনি আছে।

হিমালয় দেখে অনেক মূল্যবান কথা কবির মনে পড়ল। নবীনচন্দ্র-হেমচন্দ্রের কাব্যে প্রকৃতির কোন বিশেষ রূপ দেখলে এই ধরনের মূল্যবান তথ্য সর্বদাই উদ্গত হত।

> দাসত্বের পদধূলি অহংকার ক'রে
> মাথায় বহন করে পরপ্রত্যাশীরা!
> যে পদ মাথায় করে ঘৃণার আঘাত
> সেই পদ ভক্তিভরে করো গো চুম্বন।
> যে হস্ত ভ্রাতারে তার পরায় শৃঙ্খল,
> সেই হস্ত পরশিলে স্বর্গ পায় করে।

তারপর কবি এক ভবিষ্যতের চিত্র দিলেন :

> স্নান করি প্রভাতের শিশিরসলিলে,
> তরুণ রবির করে হাসিবে পৃথিবী।
> অযুত মানবগণ এককণ্ঠে দেব,
> এক গান গাইবেক স্বর্গ পূর্ণ করি!
> *　　　*　　　*
> সেই দিন এক প্রেমে হইয়া নিবদ্ধ
> মিলিবেক কোটি কোটি মানবহৃদয়।

এই হ'ল কবির কল্পিত 'সব পেয়েছির দেশ'!

এই কাব্যে কবি নানা ছন্দ ব্যবহার করেছেন, শুরুতে অমিত্রাক্ষর, তারপর পয়ার ও ত্রিপদী। অমিত্রাক্ষর ত্রিপদীও ব্যবহার করেছেন—সে এক অভিনব পদার্থ! বালকের অভিনবত্ব প্রয়াস! এ কাব্য বনফুল অপেক্ষা আকারে ছোট; ১১৮৫ চরণে চারি সর্গে কাব্যটি সম্পূর্ণ। বর্ণনা অপেক্ষা বক্তৃতার ভাগ বেশি; এবং শুধু এই কারণেই হেম-নবীনের ভাষা এ কাব্যে বনফুল অপেক্ষা অধিকতর ব্যবহৃত।

উষার ভূষা, দাসত্বের পদধূলি, পর-প্রত্যাশার, মর্যাদার অপমান, নিবদ্ধ—এই ধরণের শব্দ বা বাক্যাংশ তিনি অভিলাষ ও হিন্দুমেলার উপহার ব্যতীত বড়

বেশি ব্যবহার করেন না। ঐ দুটি কবিতা রবীন্দ্রকাব্যজগতে অবৈধ প্রবেশকারী। একদিকে হেম-নবীনের কাব্যপ্রভাব, অন্যদিকে বিহারীলালের কাব্যপ্রভাব যুগপৎ তাঁর উপরে সন্ধ্যাসংগীত পর্যন্ত অনুভূত হয়েছে। মাইকেলের কাব্য-ভাষার সন্ধানও মিলবে—

বিমল সরসী যবে হত তারাময়ী।
প্রভাতের সমীরণ যথা চুপি চুপি
কহে কুসুমের কানে সরম-বারতা।

এ কাব্যে বৈদেশিক প্রভাবের প্রসঙ্গ উঠলে শেলীর কথাই প্রথমে মনে পড়ে। শেলীর Alastor—কবির কৈশোর জীবনের আত্ম-বিলাস। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ ঐ কাব্যের বস্তুকল্পনা থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। Alastor কবিতাটির বিকল্পনাম হল 'The Spirit of Solitude'—। বঙ্গসুন্দরীর উপহার অংশে নিঃসঙ্গতার প্রলোভন বর্ণাঢ্য ভাষায় পরিবেশন করা হয়েছে। কবি উভয় সূত্র থেকেই অনুপ্রেরণা পেয়েছেন; কিন্তু শেলীর বিষয়-কল্পনা তাঁকে অধিকতর প্রভাবিত করেছে। কবি-কাহিনীর আখ্যানাংশের সঙ্গে আলাষ্টরের সবিশেষ সাদৃশ্য আছে। তবে শেলীর নিসর্গ-চেতনা তাঁর বক্তব্যে ধরা পড়েছে কিনা, তা বিবেচনা ক'রতে হবে। গল্পাংশ অনুকরণ করা সহজ; মূল পরিকল্পনা নয়। শুধু অনুকরণে আয়ত্তাধীন হয় না। ইতিপূর্বে অবোধবন্ধু পত্রিকায় শেলীর এই কবিতাটির এক গদ্য-কথিকা-রূপ প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে শেলীর দুঃখবাদই প্রাধান্য পেয়েছিল; শেলীর কবিতার যে প্রশান্তি, তা সেখানে উহ্য থেকে গেছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই প্রশান্তির অভাব। নিজের মনের মধ্যে সত্য জাগ্রত না হ'লে অপরের সবটুকু গ্রহণ করাও যায় না—অনুকরণ কিয়ৎদূর যেতে পারে মাত্র। আর একটি কথা, Alastor-এ গল্পাংশ গৌণ, কবির আত্মসমীক্ষাই প্রধান ও প্রবল। কবিকাহিনীতে আত্মসমীক্ষা রয়েছে; কিন্তু তাই একচ্ছত্র ও প্রবল নয়। ফলে আত্মসমীক্ষা অনেক ক্ষেত্রে আত্মপ্রচার ব'লে মনে হয়। উনিশ শতকের বাংলা গীতিকবিতার প্রচারসর্বস্বতা অজ্ঞাতসারে বালককবির সৃষ্টিতে প্রভাব ফেলেছিল।

কবিকাহিনীর সঙ্গে সুসংবদ্ধ এমন কয়েকটি কবিতা হল 'প্রলাপগুচ্ছ'—এই কবিতা কয়টি কবিকাহিনীর কোন অংশে ঢুকে পড়লে বেমানান হত না।

আয় কল্পনা মিলিয়া দু-জনা
ভূধরে কাননে বেড়াব ছুটি।
সরসী হইতে তুলিয়া কমল
লতিকা হইতে কুসুম লুটি।

*   *   *

বলিব দুজনে—গাইব দুজনে,
হৃদয় খুলিয়া, হৃদয় ব্যথা;
তটিনী শুনিবে, ভূধর শুনিবে
জগৎ শুনিবে সে সব কথা।

আর একটি 'প্রলাপে' ঐ একই কথা—

গাইব রে আজ হৃদয় খুলিয়া
জাগিয়া উঠিবে নীরব রাতি।
দেখাব জগতে হৃদয় খুলিয়া
পরাণ আজিকে উঠেছে মাতি।

হৃদয় নিয়ে এত মাতামাতি, যখন বহির্বিশ্বের অভিজ্ঞতার পরিমাণ প্রায় শূন্যে দাঁড়িয়ে! আর পৃথিবীর অনুশাসন ব্যতীত হৃদয়-লিপিরও পাঠোদ্ধার হয় না, কারণ কিছুই যে প্রস্তরে লিখিত হয় না। মহাকাল সে কাহিনীর একমাত্র লিপিকার। ভগ্নহৃদয়েও সেই হৃদয়-বিলাস, যে হৃদয়কে এখনও কবির জানবার সাধ্য হয়নি। কবি ভূমিকায় বলেছেন, "এই কাব্যটিকে কেহ যেন নাটক মনে না করেন। নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, এমন কি কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা চাই।"

ভগ্নহৃদয় চৌত্রিশ সর্গে সম্পূর্ণ; ভগ্নহৃদয়ের কাহিনী কবি-কাহিনীর অনুরূপ, বরং হৃদয়ের দাবদাহে অধিকতর প্রোজ্জ্বল। এখানেও কাহিনীর নায়ক হচ্ছেন কবি। কবির বন্ধু অনিল ললিতাকে ভালবাসে, তাদের বিয়ে হল। কিন্তু এত অল্পে কৈশোর প্রেমের পরিসমাপ্তি হ'তে পারে না! অনিলের বোন মুরলা ভালবাসে কবিকে; কবি কিন্তু তাকে বাল্যসখী মাত্র মনে করে! নইলে গল্পের জটিলতা থাকে না।

কবির ভালোবাসা অনির্দেশ্য; পরে নলিনী নাম্নী এক ছলনাময়ীর দিকে ধাবিত হ'ল।

এদিকে মুরলা কবির জন্য পাগল ; আর অনিলের প্রেম-পিপাসা বিবাহিত জীবনে তৃপ্ত হ'ল না। সে-ও নলিনী নাম্নী আলোকবর্তিকার চারপাশে খদ্যোতের ন্যায় ঘুরতে লাগল। মুরলা ও ললিতার আশা পূরল না ; তারা দেশত্যাগ করল। মুরলার দেশত্যাগে কবি বুঝল যে মুরলার প্রেমের মূল্য কতখানি। মৃত্যুপথযাত্রী মুরলার সঙ্গে অবশেষে কবির অবশ্য মিলন হ'ল ; আর অনিলও ললিতার সাক্ষাত পেল। আর নলিনী মানুষের সত্যকার মনের অনুসন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ভগ্নহৃদয় খণ্ড হৃদয়ের মেলা ; কবি প্রবৃত্তি-বিশেষকে উগ্র করে এঁকেছেন ; তাতে সেই প্রবৃত্তি দীপ্ত হয়নি ; শুধু হৃদয়েকে মসীলিপ্ত করেছে। ক্ষুদ্র চিমনীতে সবটুকু পলিতা বাড়ালে তাতে আলো অপেক্ষা কালিই বেশি পড়ে।

হৃদয়-বিলাসের কিছু নমুনা এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

বুকের ভিতর কি যে উঠে উথলিয়া
বুঝায়ে বলিতে তা পারি না সজনি ! (১২৫)

বহুদিন হতে সখি আমার হৃদয়
হয়েছে কেমন যেন অশান্তি-আলয়। (১৩৫)
প্রাণের সমুদ্র এক আছে যেন এ দেহ-মাঝারে,
মহাউচ্ছ্বাসের সিন্ধু রুদ্ধ এই ক্ষুদ্র কারাগারে
মনের এ রুদ্ধ স্রোত দেহখানা করি বিদারিত
সমস্ত জগৎ যেন চাহে সখি করিতে প্লাবিত !
অনন্ত আকাশ যদি হ'ত এ মনের ক্রীড়াস্থল,
অগণ্য তারকারাশি হ'ত তার খেলনা কেবল
চৌদিকে দিগন্ত আসি রুধিত না অনন্ত আকাশ,
প্রকৃতি জননী নিজে পড়াত কালের ইতিহাস। (১৩৬)

উলটি পালটি দু দণ্ড ধরিয়া
পরখ করিয়া দেখিতে চায়,
তখন ধুলিতে ছুঁড়িয়া ফেলিবে
নিদারুণ উপেখায়। (১৯১)

তুমি আমি মোরা থাকিতে দু'জন

বল দেখি, হৃদি, কিবা প্রয়োজন
অন্য সহচরে আর? (২০৯)
তিলেক রহে না আমার কাছেতে
যতই কাঁদিয়া মরি,
এমন দুরন্ত হৃদয় লইয়া
সজনি, বল্ কি করি? (২১০)
সখি লো, শোন্ লো তোরা শোন্,
আমি পেয়েছি এক মন!
সুখ দুঃখ হাসি অশ্রুধার,
সমস্ত আমার কাছে তার। (২২৫)

এখানে কবি বিহারীলালের বিশ্বস্ত অনুচর মাত্র হয়েছেন। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও বিহারীপুত্র অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তীর উপরে কবি বিহারীলালের প্রভাব প্রায় অনুরূপ। গুরুর মন্ত্রে পথ চলবার চেষ্টা, যদিও পথ ব্যক্তিভেদে পালটায়, কালভেদে ত কথাই নয়। কাব্যের বিশ্বস্ততা দাসসুলভ আনুগত্য নয়।

'রুদ্রচণ্ড' নাটকের আকারে লেখা কেবল নয়। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কালের বিবিধ শ্রেণীর নাটকের মধ্যে এখানে একটির অন্তর ও বাহির প্রকৃতির পূর্বাভাস আছে। এখানকার কাহিনীতে আছে সেই হৃদয়কে উলটে-পালটে দেখবার প্রয়াস। এখানে ঘটনাটি ইতিহাস-ভিত্তিক। কিন্তু কবি অসামান্য কুশলতার সঙ্গে হেম-নবীনের কাব্য-ভাষাকে পরিহার করেছেন। 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়ে'র কাহিনী হয়ত এখানে ফিরে এসেছে; কিন্তু 'অভিলাষ' ও 'হিন্দু-মেলার উপহারে'র ভাষা আর ফিরে আসতে পারেনি।

আমাদের আলোচনার বিষয় হ'ল কবিতা; কিন্তু নাটকে পদ্য-ব্যবহারে যে ভাষা ও ছন্দ অনুসৃত হয়েছে, সে বিষয়ে আমাদের কৌতূহল স্বাভাবিক। এই ঐতিহাসিক আখ্যান-অংশে কবি কথ্য ভাষার ইডিয়ম ভুরি ভুরি ব্যবহার করেছেন। রুদ্রচণ্ড আখ্যান-অংশের মূল ভিত্তি প্রণয়-জ্বালা নয়, মূল ভিত্তি ভ্রাতৃপ্রেম। এদিক থেকে রুদ্রচণ্ড কৈশোরক পর্যায়ে অভিনব রচনা। এবং কবির অন্য অনুভূতির উপরে দাঁড়াবার চেষ্টার নিঃসঙ্গ সাক্ষ্য।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ভাষায় ও বিষয়ে পৃথক্; কিন্তু হৃদয় ভাবনায় একই গোত্রীয়। এখানে দেখা দিয়েছে কবির স্থলে রাধিকার

হৃদয়-বিলাস। রাধিকার বয়ানে সেই একই প্রকার আত্মরতি। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী বেনামী কবিকাহিনী বা ভগ্নহৃদয়। এবং দুঃখপ্রসঙ্গেরই অতিশয়তা। এখানে তাঁর আদর্শ মাইকেল ছিলেন কিনা, তা বলা শক্ত। তবে রাধিকার বিরহ-পর্বই কেবল মাইকেল বর্ণনা করেছিলেন; ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে বিরহই প্রধান গীত-লক্ষ্য।

ব্রজবুলি কৃত্রিম ভাষা; এবং ভানুসিংহ ঠাকুরের হাতে কৃত্রিমতর। কারণ ব্রজবুলি পদ এক বিশেষ যুগে যখন লিখিত হয়েছিল, তখন বাংলা কাব্য-জগৎ বৈষ্ণব ভাবপ্লাবনে আকণ্ঠ মগ্ন। সেই ভাব-প্লাবনে ভাষার কৃত্রিমতা ভাব-রসে জারিত হয়েছিল। ভানুসিংহ যখন ব্রজবুলিতে পদ লিখছেন, তখন সে প্লাবনের পলিমৃত্তিকাও ধুয়ে মুছে গেছে।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর কিন্তু অন্য তাৎপর্য আছে। রবীন্দ্র-কাব্যে পদাবলীর ভাষা ও পদাবলীর পদ-রচনা-কৌশল বিশেষ মূল্যে ধনী। তাঁর কাব্য-ভাষার একটি বড় অংশ বৈষ্ণব পদাবলী থেকে রসদ সংগ্রহ করেছে। বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা আন্তরিক ভাষা বা ব্যক্তিগত ভাষা, নৈর্ব্যক্তিক ভাষা নয়।

বিহারীলাল বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে অবহিত ছিলেন; কিন্তু সে ভাষার যাদু কোথায় লুকিয়ে, সেটুকু ঠিক অনুধাবন করতে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্য ও কৈশোর রচনায় পদাবলীর ভাষা বিশেষ ব্যবহার করেন নি; ভানুসিংহের পদাবলী ত সচেতন অনুসরণ! বিহারীলালের শব্দ-সুষমা থেকে তাঁর চোখের ঘোর যতদিন না কেটেছে, ততদিন এই অবহেলা চলবে। যেদিন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র কাব্যভাষা রচিত হবে, সেদিন অন্যান্য সূত্রের সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীরও ডাক পড়বে।

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর স্তবক-গঠন-কৌশল লক্ষণীয়। কৈশোরক কাব্যে স্তবক নেই; আছে ছন্দের স্বাভাবিক গতি অনুযায়ী অনুচ্ছেদ-নির্মাণ-প্রয়াস। পরবর্তী জীবনে বৈষ্ণব কাব্যের গঠন-কৌশলই রবীন্দ্রনাথের আদর্শ যোগাবে।[৫ক] অন্যান্য সূত্রের মত এই সূত্রও তখন কবিতার যথাযথ দেহ-রচনায় সহায়তা করবে।

"ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণগলানো

ঢালা স্বর নাই; তাহা আজকালকার সস্তা আর্গিনের বিলাতি টুংটাং মাত্র।"৬

ভানুসিংহের কবিতার এই মূল্যায়নের যথার্থতার বিরুদ্ধে আমাদের নালিশ নেই। শুধু ভবিষ্যৎ কাব্য রচনার ক্ষেত্রে তার মূল্যটুকুই ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করা গেল।

॥ ৪ ॥

শৈশবসঙ্গীত ও সন্ধ্যাসঙ্গীত দুইখানিই খণ্ড কবিতার সমষ্টি। শৈশব-সঙ্গীতের রচনাকাল নির্দিষ্ট করা কঠিন; কবির মতে, "এই গ্রন্থে আমার তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের কবিতাগুলি প্রকাশ করিলাম।" তেরো থেকে আঠারো—পার্থক্যটা বড় বেশি। কারণ তেরো বৎসর বয়সে যে প্রবৃত্তি স্বাভাবিক, আঠারো বৎসর বয়সে তা বেমানান।

শৈশবসঙ্গীতে তিনশ্রেণীর কবিতা আছে—(১) গাথা; (২) গান; (৩) ফরমায়েসী ও আধ্যাত্মিক কবিতা।

ফুলবালা, দিকবালা, লীলা, ফুলের ধ্যান, অপ্সরা প্রেম, ভগ্নতরী—গাথা পর্যায়ের কবিতা।

হরহৃদে কালিকা ও ভারতী বন্দনা ভিন্ন জাতের রচনা। শেষোক্ত কবিতাটি ভারতী পত্রিকায় ফরমায়েজী কবিতা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

অবশিষ্টগুলি গান। এই গানগুলিও গাথাকবিতার অংশ; যেন কোন অলিখিত বা পূর্ব-লিখিত গাথার অনুচ্ছেদ। আর, সমস্ত গাথারই প্রায় একই জগৎ এবং একই বক্তব্য। সেই ব্যর্থ প্রেমের হা-হুতাশ, দীর্ঘনিঃশ্বাস ও অশ্রুজল। ব্যতিক্রম হ'ল প্রতিশোধ।

কবিতার ভাষায় ও বক্তব্যে পূর্বেকার মোহাচ্ছন্নতা পুরোপুরিই রয়েছে। বিহারীলালের কাব্য-প্রভাব কবির পক্ষে যেমন শুভ হয়েছিল, তেমনি অশুভ প্রতিক্রিয়াও কিছু কিছু ছিল। 'সাধের আসনে'র কবি বলেছিলেন, 'কেবল হৃদয়ে দেখি দেখাইতে পারিনে'। এই বালককবি হৃদয়েও তখন দেখেন নি, দেখেছেন গ্রন্থে। এবং তাতেই তাঁর প্রমত্ত বা আবিষ্ট অবস্থা। একেই সুধী সমালোচক 'হৃদয়ারণ্য' বলেছিলেন।

গাথাগুলির সবকয়টি প্রায় একই আঙ্গিকে লেখা; দু-একটিতে একটু অভিনবত্ব আছে। যেমন পথিক; এখানে সমস্ত ঘটনা সময়-অনুক্রমে সাজান

হয়েছে—প্রভাত, মধ্যাহ্ন, এবং সায়াহ্ন। সায়াহ্ন অবশ্য অমুক্ত থেকে গেছে, কিন্তু ঘটনার শেষাংশ সায়াহ্নে ঘটেছে!

অপ্সরাপ্রেম কবিতাটি নায়ক-নায়িকার উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সুন্দর-সুন্দরীর' ন্যায়।

প্রতিশোধ কবিতাটি রুদ্রচণ্ডগোত্রীয় রচনা; কাল্পনিক ইতিহাস এই কবিতার পটভূমিকা। বিবাহসভায় পিতার উপছায়া নিতান্তই হ্যামলেটীয় প্রভাব।

পরবর্তীকালের গাথাকবিতার সঙ্গে এই কবিতাটির তুলনা করলে বুঝা যাবে যে এই জাতীয় কবিতার কী আমূল পরিবর্তনই না রবীন্দ্রনাথের হাতে সাধিত হবে! গীতিকবিতার সামগ্রিক প্রভাব তার উপরে তখন অনুভূত হবে।

'হরহৃদে কালিকা' হেমচন্দ্র-অনুকৃতি। ভাষায়-ছন্দে হেমচন্দ্রের প্রতিধ্বনি; ব্রহ্মাণ্ড বর্ণনার মৌলিকতা অল্প; তবু বিহারীলালের আবেশ বিনাশে এই ভিন্ন জগতে পদচারণার প্রয়োজন আছে।

গানগুলিতে দুইপ্রকার প্রভাব স্পষ্টাঙ্কিত; অক্ষয় চৌধুরীর মাধ্যমে কবিগানের প্রভাব পড়েছে। অক্ষয় চৌধুরী কবির কৈশোরক কাব্য-চর্চার সহৃদয় সমজদার এবং পথ নির্দেশক; অক্ষয় চৌধুরীর কবিগানের প্রতি বিশেষ টান ছিল। ভারতীতে প্রকাশিত তাঁর 'দেশীয় প্রাচীন কবি ও নবীন কবি' প্রবন্ধে সমসাময়িক কবিদের প্রচুর নিন্দাবাদ থাকে, অপর পক্ষে কবিওয়ালা ও রামপ্রসাদের প্রশংসাধ্বনি ছিল।[৭]

"তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ.। সে-সাহিত্যে তাঁহার যেমন ব্যুৎপত্তি তেমনি অনুরাগ ছিল। অপর পক্ষে বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদকর্তা, কবিকংকণ, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, হরু ঠাকুর, রাম বসু, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক প্রভৃতির প্রতি তাঁহার অনুরাগের সীমা ছিল না।" সে যুগে অবশ্য এই রকম অনুরাগীর সংখ্যা কম ছিল না। কিন্তু তবু ইংরেজি শিক্ষিত মহলে এই অনুরাগের বিশেষ দাম আছে। "অক্ষয়বাবুর সেই অপর্যাপ্ত উৎসাহ আমাদের সাহিত্যবোধশক্তিকে সচেতন করিয়া তুলিত।"[৮]

শৈশবসঙ্গীতের 'কামিনী ফুল', 'প্রেম-মরীচিকা', 'লাজময়ী', 'ছিন্ন লতিকা' কবিগানের আদর্শে লিখিত। অপর পক্ষে 'দেখে যা—দেখে যা—দেখে যা লো

তোরা,' 'গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে', 'শুন নলিনী খোল গো আঁখি' (প্রভাতী), ও 'গোলাপবালা' মুরের মেলোডীজের নবতর সংস্করণ। এ-গুলির রচনা প-দ্ধতি শুধু নয়, প্রেমবোধেও একটু বিদেশী সুবাস আছে। বাংলা সাহিত্যে এগুলি তখন সম্পূর্ণই অভিনব। সমস্ত রচনায় ছড়িয়ে রয়েছে সেই একই অস্থিরতা।

আমি "কেবল হৃদয়াবেগের চুলাতে হাপর করিয়া করিয়া একটা মস্ত আগুন জ্বালাইতেছিলাম। সে কেবলই অগ্নিপূজা; সে কেবলই আহুতি দিয়া শিখাকেই বাড়াইয়া তোলা; তাহার আর কোন লক্ষ্য নাই। ইহার কোন লক্ষ্য নাই বলিয়াই ইহার কোনো পরিমাণ নাই; ইহাকে যত বাড়ানো যায় তত বাড়ানো চলে।"[৯]

সন্ধ্যাসঙ্গীতও এই মেজাজের অন্তর্গত। এবং এই মেজাজের বর্হিভূর্ত। কবির মানস-পরিবর্তনের প্রথম দলিল, এবং তীব্রতম দলিল।

সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবিতাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি স্তর পাওয়া যায়; প্রথমে স্তরে দুঃখের বিলাসই প্রধান; দ্বিতীয় স্তরে দুঃখ থেকে অব্যাহতির আকৃতি এবং সৃষ্টি ও জীবনের আহ্বানে সাড়া দিতে কবির উৎকণ্ঠা; তৃতীয় স্তরে দেখতে পাই দুঃখবাদ ও জীবন-আসক্তির মধ্যে সংঘর্ষ, এবং কবির মনে সংশয়।

প্রথম স্তরের চেতনার প্রকাশ ঘটেছে 'সন্ধ্যা','সুখের বিলাপ','দুঃখ আবাহন', 'তারকার আত্মহত্যা' কবিতায়। এ-গুলিকে শৈশবসঙ্গীত-কবিকাহিনী-ভগ্নহৃদয় পর্যায়ের কবিতা বলা চলে।

দ্বিতীয় স্তরে দেখতে পাই 'আশার নৈরাশ্য','হৃদয়ের গীতিধ্বনি','শান্তিগীত', 'অসহ্য ভালোবাসা','হলাহল' 'অনুগ্রহ', 'আবার' প্রভৃতি কবিতা। এগুলিতে দুঃখকে পরিহার ক'রে জীবনের পথে এগিয়ে যাবার কামনা ব্যক্ত হয়েছে।

এই কামনার প্রকাশ তীব্র হওয়া সত্ত্বেও সন্দেহ দ্বিধা ও ভয় একেবারে নিবারিত হয়নি—সন্ধ্যাসঙ্গীত শেষ পর্যন্ত আশা ও নিরাশার, আলো ও অন্ধকারের সঙ্গমস্থল।

হৃদয়ের প্রতিধ্বনি কবিতায় তিনি প্রথম স্পষ্ট ভাষায় বললেন:

হৃদয় রে আর কিছু শিখিলিনে তুই
শুধু ওই গান!

প্রকৃতির শত শত রাগিণীর মাঝে
শুধু ওই তান।

একবার যখন আপনার অতীত জগতের রক্তশূন্যতা সম্পর্কে কবি অবহিত হয়েছেন, এবং তার মুক্তির উপায় প্রণিধান করেছেন, তখন আশ্বস্ত হবার কারণ আছে।

যেখানে জীবনের অনুরাগ কবিকে প্রলুব্ধ করছে, নবীন জগতের আহ্বান কবিকে হাতছানি দিচ্ছে, প্রথম উপলব্ধির মুহূর্তে সেখানে বক্তব্যে সরবতা অধিকতর।

দূর করো, দূর করো, বিকৃত এ ভালোবাসা,
জীবনদায়িনী নহে, এ যে গো হৃদয়নাশা। (হলাহল)

অথবা

আজ তবে হৃদয়ের সাথে
একবার করিব সংগ্রাম।
ফিরে নেব, কেড়ে নেব আমি
জগতের একেকটি গ্রাম।
ফিরে নেব রবি শশীতারা,
ফিরে নেব সন্ধ্যা আর ঊষা,
পৃথিবীর শ্যামল যৌবন,
কাননের ফুলময় ভূষা।
ফিরে নেব হারানো সঙ্গীত,
ফিরে নেব মৃতের জীবন,
জগতের ললাট হইতে
আঁধার করিব প্রক্ষালন।
আমি হ'ব সংগ্রামে বিজয়ী,
হৃদয়ের হবে পরাজয়,
জগতের দূর হবে ভয়। (সংগ্রাম সংগীত)

এখানে ঘোষণা খুব স্পষ্ট, কিন্তু কাব্য তত স্ফুট নয়। বরং 'জগতের ললাটের সেই অন্ধকারে'র কবিতায় কাব্য-স্ফূর্তি সুন্দরতর। তার কারণ এ জগত যে কবির পরিচিত ; এই পরিমণ্ডল কবির বহুদিনের বাসকেন্দ্র।

আজ বিদায়ের দিনে ঐ ভুবনের মাধুর্যটুকু দানা বেঁধেছে কবির সৃষ্টিতে, এবং বাক-প্রতিমায়। প্রতিমা পরিচিত; তাই বচনে ধরা দিয়েছে এতখানি।

তারকার আত্মহত্যা ত সারা রবীন্দ্র-কাব্য-ভাণ্ডারের অমূল্য রতন। এমন সাহসিক (দুঃসাহসিকও বলা যায়) কবিকল্পনা রবীন্দ্র কাব্যে বড় বেশি নেই। দ্বিতীয়ত ছন্দ ও চরণ সংস্থাপনে এ কবিতাটির অভিনবত্ব লক্ষণীয়।

৮ (৪+৪) মাত্রা ও ৬ (৩+৩) মাত্রাকে নিয়ে কবি যদৃচ্ছ বিচরণ করেছেন। মাঝে মাঝে যে পদস্খলন ঘটেছে, তা যুক্তাক্ষরঘটিত। "জলন্ত অঙ্গার খণ্ড ঢাকিতে আঁধার হৃদি"—এই পংক্তি বহন করতে ছন্দের কোমর বেঁকে গেছে। কিন্তু এই বিপত্তি সমগ্র বাংলা ছন্দ-ইতিহাসের বিপত্তি। যথাসময়ে তারও নিরাকরণ হবে।

দ্বিতীয় কবিতাটি হল 'উপহার'। কবি প্রথম এই কবিতায় প্রেমিকা ও প্রেমকে বিশ্লিষ্ট ক'রে দেখলেন। কবির হৃদয়-ভাবনা ও কবিকল্পনা ব্যক্তি থেকে নৈর্ব্যক্তিক স্তরে উপনীত হ'ল—'কংক্রীট' এইভাবে 'এ্যাবষ্ট্রাকৃট' রূপ পরিগ্রহ করল, চেতনায় এসে বস্তু দিব্যদেহ ধারণ করল।

আগে কে জানিত বলো কত কী লুকানো ছিল
হৃদয় নিভৃতে,
তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া
পাইনু দেখিতে।

বাংলা কাব্যের ব্যক্তিগত প্রেমের এতদিনকার সীমিত লীলাবিলাস এইভাবে অবলুপ্ত হ'তে লাগল।

"পূর্বেকার কবিদিগের প্রেম ব্যক্তিগত ছিল। হাত পা নাক, মুখ, চোখ অবলম্বন না করিয়া যে ভালবাসা থাকিতে পারে, ইহা তাঁহাদের কল্পনার অতীত ছিল। তাঁহারা ব্যক্তিবিশেষকে লইয়া মাতিয়া উঠিতেন। এইজন্য তাঁহাদের প্রেমের ধর্মে পৌত্তলিকতার উন্মত্ততা ছিল। * *

* সভ্যতা বৃদ্ধি সহকারে হৃদয়ের বৃত্তিসকল মার্জিত ও সূক্ষ্ম হইয়া আসিয়াছে। * তখন বিরহিণী গান করিত, "আসার আশা রবে, কিন্তু নবযৌবন রবে না।" * * এখনকার কবিরা বলিতেছেন প্রেমে তৃপ্তি নাই, সে-অতৃপ্তি নিরাশার অতৃপ্তি নহে, অভাবের অতৃপ্তি। তাঁহারা কাহাকে ভালবাসিবেন খুঁজিয়া পান না, অথচ হৃদয়ে ভালবাসার অভাব নাই। * * *

এমনতর প্রেম পূর্বকার কবিদিগের ছিল না, এমনতর প্রেম সাধারণ লোকে বুঝে না।"[১০]

* * *

সন্ধ্যাসঙ্গীত থেকে রবীন্দ্র-কাব্যের স্বাতন্ত্র্য শুরু। তার অর্থ এই নয় যে, সন্ধ্যাসঙ্গীত-পূর্ব সাহিত্যে রবীন্দ্র-বৈশিষ্ট্য আদৌ দেখা দেয় নি।

অভিলাষ ও হিন্দুমেলার উপহার কবিতা দুইটি ব্যতীত অন্য সব কবিতাতেই রবীন্দ্র-কাব্যের বিশিষ্টতা ধরা পড়েছে।

কবি ইচ্ছা করলেই (বিশেষ ক'রে যখন এই প্রকার 'উন্নতি'র উদার সুযোগ ছিল) আর এক হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্র হ'তে পারতেন। কারণ দেশে স্বাদেশিকতার উগ্রতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু সে পথে না গিয়ে তিনি বিহারীলালের অন্তঃমুখী পথ অনুসরণ করলেন। এবং এই অনুসরণ আন্তর তাগিদেই ঘটেছে।

যুদ্ধবিগ্রহ-বর্ণনা-সংকুল কাব্য না লিখে তিনি যে আত্মনিষ্ঠ কাব্য রচনায় মগ্ন হলেন, এর পিছনে কোন ফ্যাশান নয়, আত্মতাগিদই বড়। তার প্রমাণ 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়ে' প্রচুর বীররস ছিল, এবং তা সত্ত্বেও কাব্যটি রক্ষা পায়নি; এবং আমরা তার পাঠের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। কিন্তু রুদ্রচণ্ড ঐ ঘটনারই সঙ্গে জড়িত। সেখানে তাঁর বীররস অনেকটা বিচলিত হ'য়ে গেছে। তা সত্ত্বেও এই কাব্যনাট্য রক্ষা পেয়ে গেছে। এবং এখান থেকেই তাঁর স্বাদেশিকতা সোজা 'বউ ঠাকুরাণীর হাটে' গিয়ে উপস্থিত হয়েছে, সেখানে প্রতাপাদিত্য অপেক্ষা বসন্ত রায় মহত্তর ব্যক্তি এবং নায়ক।

এগুলির প্রকাশে হৃদয়াবেগের গদ্‌গদভাষী আন্দোলন থাকতে পারে, সেই স্বতন্ত্র হৃদয়াবেগের মূল্য কিন্তু তুচ্ছ নয়।

এবং সেই স্বতন্ত্র হৃদয়াবেগকে ধারণ ক'রে এক স্বতন্ত্র ভাষাও গ'ড়ে উঠছিল। সন্ধ্যাসঙ্গীতের ভাষা হঠাৎ গ'ড়ে ওঠেনি। বনফুল-কবিকাহিনী-রুদ্রচণ্ড শৈশবসঙ্গীত থেকে সন্ধ্যাসঙ্গীতের ভাষা অনেক পুষ্ট; কিন্তু জাতে এক। সন্ধ্যাসঙ্গীত-পূর্ব ভাষা বিহারী-ভাষা। কিন্তু মাঝে মাঝে স্বকীয়তার চমক আছে।

ভাষার ক্ষেত্রে সন্ধ্যাসঙ্গীতে যে স্বাতন্ত্র্য দৃশ্যমান, তা যেন প্রচলিত বাংলা কাব্য থেকে পৃথক্। এ পার্থক্য কবির বহু সাধনালব্ধ।

ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে "কত শত বদ্ধমূল বিশ্বাসের গোড়া হইতে মাটি

খসিয়া যাইতেছে, কত শত নূতন বিশ্বাস চারিদিকে মূল প্রসারিত করিতেছে।" এবং "প্রেমের সেই কানাকানি ঢাকাঢ়াকি লুকোচুরি, সেই শাশুড়ি-ননদি ভীতিময় পিরীতির" পরিবর্তে সমালোচক "প্রকাশ্য নির্ভীক" প্রেমের প্রসার কিভাবে ঘটছে, তা বলছেন।[১২]

বালকবয়সে গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সেক্সপীয়ার, কুমারসম্ভব প্রভৃতি অনুবাদে তাঁর হাতেখড়ি হয়েছিল।

ভারতী পত্রিকা প্রকাশের পর কবির লেখনী গদ্যপদ্যের জুড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে অভিসারে বেরুল। "ভারতীর পত্রে পত্রে আমার বাল্যলীলার অনেক লজ্জা ছাপার কালির কালিমায় অঙ্কিত হইয়া আছে। কেবলমাত্র কাঁচা লেখার জন্য নহে—উদ্ধত অবিনয়, অদ্ভুত আতিশয্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতার জন্য লজ্জা।"[১২] কৃত্রিমতা পরিহারের স্বাক্ষরও সেখানে আছে। কৃত্রিমতা আর বৈদেশিক আদর্শ-অনুকরণ এক নয়।

বাংলা কাব্য-ভাষার এক বিশেষ রূপ তখন প্রচলিত ছিল। আমরা ইতিপূর্বে তার রূপ-বর্ণনা করেছি। সে ভাষা নিশ্চয়ই কৃত্রিম ভাষা, কারণ জীবনের চল্‌তি পথ থেকে তা ভ্রষ্ট।

আদিযুগে রবীন্দ্রনাথ অনুবাদের মধ্য দিয়ে বিকল্প ভাষার সন্ধান কার্য চালাচ্ছেন এবং সৃজন করছেন।

১২৮৫, ভাদ্রের ভারতীতে তাঁর "বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য" নিবন্ধে নানা আলোচনার পর দান্তের কাব্য থেকে কিয়দংশ অনূদিত হয়েছে; অনূদিত অংশ একটি সনেট। সেখানকার এই সনেটটি বিশেষভাবে স্মরণীয়;—এই সনেটে "মোর হৃৎপিণ্ড রহে করতলে তাঁর"—এই প্রকাশভঙ্গি এতকাল অনায়ত্ত ছিল; রবীন্দ্রনাথের তাৎকালিক মৌলিক রচনায়ও তার প্রতিধ্বনি ছিল না। ১২৮৬, জ্যৈষ্ঠের ভারতীর প্রবন্ধের অনুবাদ অংশে নতুন ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়—

তুমি মোরে ভালবাস যদি
ওই অধরের শুধু একটি চুম্বন মধু
হবে মোর দুখের ওষধি।

ঐ বৎসরই আষাঢ় মাসে প্রকাশিত 'চ্যাটারটন ও বালক কবি" প্রবন্ধে সমিল

অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার ক'রে কবি তাঁর কাব্যের এক বিশেষ বাহনকে অধিকতর দুরন্ত ক'রে নিলেন।

এই সময়ই চলেছে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী রচনা।

তারপর কবি বিলেত গেলেন; সেখানে তাঁর পরিচয় হ'ল বৃটেনের নানা কবির কাব্যের সঙ্গে। ১২৮৬, কার্তিক সংখ্যায় শেলি, টেনিসন, লর্ড সেণ্টালুপে প্রভৃতির কবিতা অনূদিত হ'ল। তার সঙ্গে রয়েছে আইরিশ মেলোডিজ এবং ওয়েলস দেশীয় কবিতার অনুবাদ।

১২৮৮ সালে জ্যেষ্ঠ সংখ্যায় 'যথার্থ দোসর' প্রবন্ধ সুরু হ'ল শেলীর অনুবাদ দিয়ে। শেষ হল মাথ্যু আর্নল্ড, রসেটি, আর্থার ও সেগনেশীর কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে। ১২৯১, শ্রাবণ সংখ্যায় শেলী, শ্রীমতী ব্রাউনিং, আর্নেস্ট মায়ার্স, আগাষ্টা ওয়েবষ্টার, পি. বি. মারসটন, ভিক্টর হুগো ও অব্রি দ্য ভের (Aubrey De Verr) অনুবাদ প্রকাশিত হ'ল।

এই অনুবাদগুলি থেকে ধীরে ধীরে কবি একটা নতুন বাক্য-রচনা-প্রণালী, নতুন 'phrase' গঠন-নৈপুণ্য ও শব্দ-চয়ন দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্তবক ও মিল প্রয়োগের অভিনবত্ব দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

একটি অনুবাদের উদাহরণ এখানে উপস্থাপিত করছি:

মোদের অধর দুটি কথা ভুলি গিয়া
কবে শুধু উচ্ছ্বসিত চুম্বনের ভাষা,
দুজনে দুজন আর রব না আমরা,
এক হোয়ে যাব মোরা দুইটি শরীরে।
দুইটী শরীর? আহা তাও কেন হ'ল?
যেমন দুইটি উল্কা জ্বলন্ত শরীর,
ক্রমশঃ দেহের শিখা করিয়া বিস্তার
স্পর্শ করে, মিশে যায়, এক দেহ ধরে,
চিরকাল জ্বলে তবু ভস্ম নাহি হয়,
দুজনের গ্রাস করি দোঁহে বেঁচে থাকে;
মোদের যমক-হৃদে একই বাসনা,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে বাড়িয়া বাড়িয়া,
তেমনি মিলিয়া যাবে অনন্ত মিলনে।

এইভাষা তখনও কবির মৌলিক রচনায় আসে নি; এমন কি যে-কাব্যে এইগুলি স্থান পেয়েছে, সে কাব্যের কাব্য-ভাষাও এইরূপ পরিপক্কতা লাভ করেনি। কড়ি ও কোমলে এই ভাষার সাক্ষাৎ পাবো, এবং কবিতাবিশেষে প্রায় তার প্রতিধ্বনি পাবো। ছন্দের ক্ষেত্রে ও ভাষার ক্ষেত্রে কবি দেশীয় সূত্রের সঙ্গে পরিচয় সাধনে উদ্‌গ্রীব। বাউল সঙ্গীত-সংগ্রহ সমালোচনা কালে তিনি লিখলেন, "যে ব্যক্তি নিজের ভাষা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, যে ব্যক্তি নিজের ভাষায় নিজে কথা কহিতে শিখিয়াছে, তাহার আনন্দের সীমা নাই। ......তাহার এক একটি কথা তাহার এক একটি জীবন্ত সন্তান।" আরও বলা হ'ল, "সংস্কৃত ব্যাকরণেও বাঙ্গালা নাই, আর ইংরাজী ব্যাকরণেও বাঙ্গলা নাই, বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালীদের হৃদয়ের মধ্যে আছে। ... ... হৃদয়ের ভাষা হৃদয়ের স্তন্যপান করিয়া, হৃদয়ের সুখ দুঃখের দোলায় দুলিয়া মানুষ হইতে থাকে।" ১৩ সিন্ধুদূতের সমালোচনা প্রসঙ্গে বললেন, "ভাষার উচ্চারণ অনুসারে ছন্দ নিয়মিত হইলে তাহাকেই স্বাভাবিক ছন্দ বলা যায়, কিন্তু বর্তমানে কোন কাব্য গ্রন্থে তদনুসারে ছন্দ নিয়মিত হয় নাই।"[১৪] সমালোচনার একটিতে বাউল-সঙ্গীত-ভাষা ও অপরটিতে রামপ্রসাদী ছন্দের প্রশস্তি থাকল।

শুধু ছন্দ ও ভাষা নয়, কবি তাঁর জীবন-দৃষ্টিও নানা সূত্র থেকে সংগ্রহ করেছেন। তিনি যে ভাবময় জগৎ সৃষ্টি করতে চান, তার উপাদান নানা দেশ থেকে সংগ্রহ করেছেন। 'বিয়াত্রীচে দান্তে ও তাঁহার কাব্য" প্রবন্ধে তিনি লিখলেন, "ইতালিয়ার এই স্বপ্নময় কবির জীবনগ্রন্থের প্রথম অধ্যায় হইতে শেষ পর্যন্ত বিয়াত্রীচে। তাঁহার জীবনের দেবতা বিয়াত্রীচে, তাঁহার সমুদয় কাব্য বিয়াত্রীচের স্তোত্র।" আমাদের কবিও অনুরূপ জীবন-দায়িনী নায়িকার সন্ধানে ফিরেছেন, মানসীতে এসে যে অন্বেষণের চরিতার্থতা।

'গ্যেটে ও তাঁহার প্রণয়িণীগণ' প্রবন্ধে একই উদ্যম; গ্যেটের মানবীকরণ-নীতি প্রকৃতি-অবলোকনে তাঁরও জীবন-মন্ত্র। অবশ্য তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যা, এবং পিতার প্রভাব।

জীবন ও নারী সম্পর্কে মোহাচ্ছন্নতার অবসান ঘটবে বিলেত-ভ্রমনের পর। 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'তে তাঁর সেই সংস্কার-বর্জিত মনেরই পরিচয় মুদ্রিত রয়েছে।

এডওয়ার্ড টম্‌সন একটি মূল্যবান কথা বলেছিলেন, "But it is the

prose of this period which shows best how alert and eager his mind was."[১৫]

এ-যুগের কাব্য-ফসল অপেক্ষা কাব্য-আলোচনার গুরুত্ব কম নয়; কারণ কবি শুধু স্রষ্টা নন, তিনিই বাংলা গীতিকাব্যের যুগান্তরকারী প্রতিভা—তত্ত্বে ও প্রয়োগে।

পাদটীকা

১। রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক-শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সংশোধিত সংস্করণ, ১৩৬৭ পৌষ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। পৃ—৪৫

২। বিশ্বভারতী পত্রিকা—কার্তিক-পৌষ—ভোরের পাখি—প্রবোধচন্দ্র সেন, পৃ—১১৭

৩। রবীন্দ্র জীবনী, পৃঃ ৪৬—৫০

৪। জীবনস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—১৩৬৮ সংস্করণ, পৃ—৪৮

৫। ঐ, পৃ—৮৩

৬। ঐ, ৭৭

৭। ভারতী, ১২৮৯, শ্রাবণ।

৮। জীবনস্মৃতি—পৃ—৭০

৯। ঐ; পৃ—১০৩

১০। ভারতী, ১২৮৮, জ্যৈষ্ঠ

১১। ঐ

১২। জীবনস্মৃতি—পৃ—৮৭

১৩। ভারতী, ১২৯০, বৈশাখ।

১৪। ঐ, ঐ, শ্রাবণ।

১৫। Rabindranath Tagore Poet and Dramatist—Edward Thompson. Oxford University Press. 1948. পৃ—২৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তীর্থের সমীপে

"আমার কাব্য লেখার ইতিহাসের মধ্যে এই সময়টাই আমার পক্ষে সকলের চেয়ে স্মরণীয়। কাব্যহিসাবে সন্ধ্যাসঙ্গীতের মূল্য বেশি না হইতে পারে। উহার কবিতাগুলি যথেষ্ঠ কাঁচা। উহার ছন্দ ভাষা ভাব, মূর্তি ধরিয়া, পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। উহার গুণের মধ্যে এই যে, আমি হঠাৎ একদিন আপনার ভরসায় যা-খুসি তাই লিখিয়া গিয়েছি! সুতরাং সে-লেখাটার মূল্য না থাকিতে পারে, কিন্তু খুশিটার মূল্য আছে।" (জীবন স্মৃতি, পৃ—১১২)

সন্ধ্যাসঙ্গীতে কবির মৌলিক সৃষ্টির স্বাক্ষর আছে; কিন্তু বিশ্বজগৎ ও প্রকৃতিজগৎ সম্পর্কে তিনি কোন নবীন চেতনার উদ্বোধন করতে পারেন নি।

তার কারণ কি? তখন পর্যন্ত কবি সম্পূর্ণভাবে মুর, বাইরণের প্রভাব কাটাতে পারেন নি। বাইরণ ইউরোপের সর্বাপেক্ষা চড়া গলার কবি নারীপ্রেম ও দেশপ্রেম প্রসঙ্গে তাঁর সমান কৌতুহল, এবং সমান প্রচারধর্মী ভাষায় তিনি সৌখীন দুঃখবাদ এবং ভোগলিপ্সার কথা ব'লে গেছেন। মুর বাইরণের সুলভ সংস্করণ। বাইরণের দুঃখবিলাস তাঁর নেই। পরিবর্তে—তাঁর কাব্যে এশীয়ঃ রোম্যান্স রসের পরাকাষ্ঠা দেখান হয়েছে। এই সময়ে মুরের প্রভাব তাঁর সঙ্গীতে সবিশেষ অনুভূত হয়েছে।[১]

মুরের সঙ্গে তাঁর সম্প্রীতি সাধন করিয়েছিলেন অক্ষয় চৌধুরী।[২]

গানের ক্ষেত্রে এই প্রভাব সোনা ফলালেও কবিতার ক্ষেত্রে এই প্রভাব শুভ হয় নি। বরং এই প্রভাবের ফলে তিনি সত্যকার সোনা ফেলে আঁচলে কাঁচ গেরো দিয়েছেন। শেলী এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ইতিপূর্বেই ঘটেছে; কিন্তু তাঁর সাহিত্যে তাঁরা অধীশ্বর নন। কবিকাহিনীতে শেলী দেখা দিয়েছেন বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু কবিকাহিনীতে না বিষয়বোধ, না ভাষা ও কাব্য-নির্মাণে এই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এখানে যে প্রভাব স্পষ্টভাবে রয়েছে, তা হ'ল পৌল ও ভর্জিনীর প্রভাব, যে আখ্যায়িকা

তিনি অবোধবন্ধু থেকে বিমুগ্ধচিত্তে পাঠ করেছিলেন।৩ দ্বিতীয় প্রভাব বঙ্গসুন্দরীর উপহার অংশ। তৃতীয় প্রভাব সম্ভবত ঐ অবোধবন্ধু পত্রিকায় প্রকাশিত Alastor-এর অনুসরণে লেখা 'হতাশ যুবক'। চতুর্থ প্রভাব 'রাসেলাস'। ঐ গ্রন্থ তিনি বিলেতে যাত্রার পূর্বে পাঠ করেছিলেন কিনা, তার পক্ষে স্পষ্ট প্রমাণ নেই। বিলেতে তাঁকে ঐ গ্রন্থ তাঁর প্রিয় অধ্যাপক মর্লি সাহেবের কাছে পড়তে হয়েছিল। আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁর এই সময়কার জীবন ও নিসর্গ-চেতনায় পরিবর্তন-ইচ্ছা আছে, কিন্তু পথ-অনুসন্ধান সম্পূর্ণ হয় নি। এযুগের শুধু নয়, তাঁর কোন যুগের সাহিত্যই জীবনের বহির্ভাগের সংবাদে মুখর নয়। তবু তখনও অন্তরের সেই বিশেষ কথাটির উপলব্ধি ঘটেনি। কার্লাইল সেই যে চীৎকার ক'রে বলেছিলেন, "Close thy Byron, open thy Goethe"।৩ একথা আর কিছুই নয়—যুগ-পরিবর্তনের ঘোষণা।

সন্ধ্যাসঙ্গীতে পরিবর্তনের আকুতি আছে, কিন্তু তখনও পুরাতনের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে অপসারিত হচ্ছে না। আর নতুনের আবির্ভাব মনোজগতে চকিতে ঘটে, কিন্তু কাব্যে তার প্রকাশ ধীরগতি।

॥ ১ ॥

প্রভাতসঙ্গীত সেই চেতনার প্রথম সুস্থ সবল কাব্য-প্রকাশ। এবং এই স্বাস্থ্য ও সবলতা ব্যতীত আত্মমুখীন কাব্যের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সম্ভব হ'ত না। "সদর ষ্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রি-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া

গেল, কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনি হইতে আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না।"[৪]

প্রভাতসঙ্গীতে সমস্ত বিশ্বচরাচরের এমনই আমন্ত্রণ আছে।

ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর, হাসিছে গলাগলি।

শুধু মানবজগৎ নয়, নিসর্গজগৎও অনুরূপ প্রীতির চন্দনে লিপ্ত। আকাশ, সমুদ্র, কানন, গ্রহজগৎ কবির ভালোবাসার স্পর্শে আত্মীয় হ'য়ে উঠছে।

প্রভাতসঙ্গীতে শুধু আনন্দবার্তা নয়, কয়েকটি জীবন-জিজ্ঞাসার কথাও আছে। অনন্তজীবন, অনন্তমরণ ও প্রতিধ্বনি কবির এই জীবন-জিজ্ঞাসার আলাপে মুখর! এই তিনটি কবিতায় কবি তাঁর সমগ্র কাব্য-জীবনের তিনটি মৌলিক তত্ত্বচিন্তার সূত্র বয়ন করেছেন। আবার এই তিনটি তত্ত্ব পরস্পরে মিলে একটি তত্ত্ব সৃজন করেছে।

এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে,
নিস্তব্ধ তাহার জলরাশি,
চারিদিকে হতে সেথা অবিরাম অবিশ্রাম
জীবনের স্রোত মিশে আসি। (অনন্ত জীবন)

আমাদের অনন্ত মরণ,
মরণের হবে না মরণ।

* * *

জীবন যাহারে বলে মরণ তাহারি নাম,
মরণ তো নহে তোর পর। (অনন্ত মরণ)

জগতের গানগুলি দূর-দূরান্তর হতে
দলে দলে তোর কাছে যায়,
যেন তারা বহ্নি হেরি পতঙ্গের মতো
পদতলে মরিবারে চায়।
জগতের মৃত গানগুলি
তোর কাছে পেয়ে নব প্রাণ

সংগীতের পরলোক হতে
গায় যেন দেহ মুক্ত গান। (প্রতিধ্বনি)

এই তিনটি বক্তব্যই পৃথক ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবির বিশ্বদৃষ্টির সঙ্গে সুসংবদ্ধ। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে যে তরঙ্গ আলোড়িত হয়েছে, আহ্বানসঙ্গীত, চেয়ে থাকা, সাধ, সমাপন, প্রভাত উৎসব এবং স্রোত কবিতায় তারই আনন্দ-উচ্ছ্বল প্রতিঘাত।

এই উচ্ছ্বলতার প্রসঙ্গটি আমরা ইচ্ছা ক'রেই উল্লেখ করেছি। প্রভাত-সঙ্গীতে যতটা নবীন চেতনার জয়ধ্বনি আছে, ততটা কাব্য-সাফল্য নেই। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ শুধু হৃদয়াবেগের প্রচণ্ডতায় আমাদের অভিভূত করে। নতুবা এই প্রকার ভাষা ও কাব্যরীতি সন্ধ্যাসঙ্গীতের 'হৃদয়ের প্রতিধ্বনি' কবিতাটিতে প্রকাশমান। তবু 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের'ই জিত হ'ল হৃদয়ের অকৃত্রিম গান হিসাবে ; 'হৃদয়ের গীতিধ্বনি'র নয়, এমন আন্তরিক নামকরণ সত্ত্বেও। নৈরাশ্যে ও ব্যর্থতার হৃদয়ের প্রকাশ ঘটে না। শুধু-'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' নয়, সমগ্র কাব্য হিসাবে 'প্রভাতসঙ্গীত' যে সান্ধ্যসঙ্গীত অপেক্ষা মূল্যবান, তার কারণও এইখানে। নইলে কবি তাঁর জীবনের চলতা-ধর্মের যোগ্যতম বাহন কোন প্রতীকটি, তা প্রভাতসঙ্গীতে এখনও স্থির করতে পারেন নি ; নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে নির্ঝর হয়েছে প্রতীক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত :

হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে,
দিকে দিকে নাইকো কিনারা,
তারি মাঝে হনু পথ হারা।

কিন্তু মুক্তি হ'ল কিভাবে ?

আজি একটি পাখি পথ দেখাইয়া মোরে
আনিল এ অরণ্য-বাহিরে
আনন্দের সমুদ্র তীরে।

আনন্দের সমুদ্রের তীর খুঁজে নিতে ভুল হয়নি ; কিন্তু কোন্ প্রতীক তাঁর এই অভিযানী আত্মার বাণীবহ, তা তিনি স্থির করতে পারেন নি। কারো কারো জীবনে কোন কোন স্তরে একটি বিশেষ প্রতীক প্রধান প্রতীক হ'য়ে ওঠে। প্রভাতসঙ্গীতে নির্ঝর বা পাখি কোনটিই মুখ্য প্রতীক নয়, মুখ্য প্রতীক প্রভাত। প্রভাত-উৎসব, সাধ, সমাপন প্রভৃতি কবিতায়

প্রভাত-ই পটভূমিকার কাজ করেছে। কবি বারবার শিশুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন, সে-ও ঐ প্রভাত-অর্থকে ঘনীভূর করার জন্য। প্রভাতসঙ্গীত তাই রবীন্দ্র-কাব্যের নবীন বোধের প্রথম কাকলী। কাকলীর ভাষা পরিপুষ্ট ভাষা নয়।

প্রভাতসঙ্গীতের ভাষায় অতিকথন অতিশয় স্পষ্ট। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, প্রভাত-উৎসব প্রভৃতি অতিপরিচিত কবিতা কবির অনেক কাটা-ছাঁটার পরেই পাঠকের কাছে এত হৃদয়গ্রাহী। সঙ্গীত নিঃসঙ্গ হ'লেই প্রলম্বিত হয়।

॥ ২ ॥

'ছবি ও গানে' সঙ্গীতসহ চিত্র এল। 'প্রভাতসঙ্গীতে' যেখানে শুধু আবেগের উচ্ছ্বাস, যেখানে 'ছবিও গানে' চিত্রের স্থিরপটে তাকে বেঁধে রাখা হ'ল। ছবি ও গানে সঙ্গীতসহ শুধু চিত্রই এল না,তার সঙ্গে আরও কয়েকটি নতুন কথা এল।

রবীন্দ্র-কাব্যে বিচিত্র রূপিনী রমণীর উদ্দেশে বন্দনাগীত আছে,—ছবি ও গানে তার আগমনের সঙ্কেতধ্বনি শোনা গেছে। কে ?, সুখস্বপ্ন, জাগ্রত স্বপ্ন, সুখের স্মৃতি, বিদায়, স্মৃতি-প্রতিমা, স্নেহময়ী কবিতায় সেই অধরা নানাভাবে ধরা দিয়েছে; কখনও 'বসন্তের বাতাসটুকুর মতো' প্রাণের উপর তার স্পর্শ, কখনও বিস্মরণমোহে আঁধারে আলোকে তাকে মনে পড়ে যায়, কখনও বা সে বকুলগাছের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, কখনও বা সুকোমল শিথিল আঁচলে প'ড়ে আছে আরামে ঘুমিয়ে। কিন্তু ছবি ও গানের বিভিন্ন কবিতার মধ্যেই সেই অধরা অনেকটা কীটসীয়' 'Fatal Woman'-এর রূপ ধ'রে দেখা দিয়েছে।

সন্ধ্যাসঙ্গীতের

> দূর, করো, দূর করো, বিকৃত এ ভালোবাসা
> জীবনদায়িনী নহে, এ যে গো হৃদয়নাশা।

—ঠিক এই পর্যায়ের নয়। তবু প্রভাতসঙ্গীতের নির্মল আনন্দ এখানে নেই। কোন অশান্তি যেন কবির চিত্তকে ভারাক্রান্ত করেছে। এখানকার প্রেমভাবনায় একটা ক্রন্দন-সুর রয়েছে। কবির প্রণয়-পাত্রীর আচরণে একটা বঞ্চনার ভাব আছে। তারই পরিণতি হ'ল 'রাহুর প্রেম' কবিতা। এখানে কবি তাঁর ঈপ্সিতার প্রতি যে উদগ্র কামনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তা সুস্থ নয়।

সুস্থ নয় বলেই এত তীব্র। সন্ধ্যাসঙ্গীতের জ্বালাময় ভাষায় এখানে আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটেছে। অবশ্য 'রাহুর প্রেম' তারকার আত্মহত্যার মতই সার্থক কবিতা ; কড়ি ও কোমল পূর্ব-যুগে এ দুটিই প্রধান রচনা।

এই কাব্যে প্রভাতসঙ্গীতের যুগপৎ স্বীকৃতি ও তার প্রতিবাদ রয়েছে। কবির মন কখনও বিষাদে দীর্ণ, কখনও আনন্দে উদ্বেল। এই দুই বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় এই কাব্যের সংহতি—ভাবের ও রূপের সংহতি ব্যাহত হয়েছে।

পাগল, মাতাল, মধ্যাহ্নে ও পূর্ণিমা কবিতায় আত্মভাবনার মধ্যে একটা অতি উচ্ছ্বাসময়তা ও বিহ্বলতার ভাব আছে। নিসর্গ-মূলক কবিতায়ও সেই কালো ছায়ার প্রতিবিম্ব আছে। নিশীথ জগৎ, নিশীথ চেতনা, বাদল, গ্রামে, পোড়োবাড়ি, একাকিণী—সব কয়টি কবিতাই আনন্দ-বার্তা বহন করেনি।

এই কবি তাগুলির কোনটি ছবি বা চিত্র মাত্র, কোনটি বা চিত্রের অধিক। 'পোড়োবাড়ি' বিবরণমূলক কবিতা, 'নিশীথজগৎ' কবির আত্মভাবনার রঙ্গভূমি। আবার কোথাও নিসর্গ স্বতন্ত্র সত্তা হ'য়ে উঠেছে।

কে তুমি গো উষাময়ী আপন কিরণ দিয়ে
আপনারে করেছ গোপন,
রূপের সাগর-মাঝে কোথা তুমি ডুবে আছ
একাকিনী লক্ষ্মীর মতন। (আচ্ছন্ন)

এ যেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের জগতে এসে নৌকা ভিড়েছে। সেখানে এই নবীনা একাকিনী হ'য়েও দেশ বিদেশের সঙ্গিনী লাভ করেছে।

আর সত্যই ছবি ও গানের 'একাকিনী' কবিতা অনেকটা পর্যন্ত ওয়ার্ড-সওয়ার্থের 'Solitary Reaper'-এর অনুকরণ। আর 'Solitary Reaper' রবীন্দ্রনাথের প্রিয় কবিতা। স্যাডলার সাহেব শিক্ষা-কমিশনের কর্তা হিসাবে শান্তিনিকেতনে গেলে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্মুখে ইংরেজী পাঠদানকালে এই কবিতাটিই পড়িয়েছিলেন। এইভাবে দুই বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়া এই কাব্যে দেখা যায়।

অবশ্য এ কাব্যে প্রভাতসঙ্গীতের বিশ্বস্ত অনুকরণও রয়েছে। মানব-প্রেমমূলক কয়েকটি কবিতা আছে—আদরিণী, খেলা, ঘুম, আবছায়া, স্নেহময়ী, অভিমানিনী।

কড়ি ও কোমলে 'কাঙালিনী', 'খেলা' প্রভৃতি কবিতায় তারই অধিকতর কাব্যময় রূপ ফুটে উঠেছে।

তথাপি ছবি ও গানে প্রভাতসঙ্গীত অপেক্ষা কাব্যগত কুশলতার পরিমান বেশি।

"যেখান দিয়ে হেসে গেছে
হাসি তার রেখে গেছে।"—(কে ?)

এমন অপূর্ব হাসি বাংলা কাব্যে ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নি, শোনা শুধু নয়।

অধরের কোণে হাসিটি
আধখানি মুখ ঢাকিয়া,
কাননের পানে চেয়ে আছে
আধমুকুলিত আঁখিয়া। (সুখস্বপ্ন)

মিলের খাতিরেও অর্ধমুকুলিত আঁখিকে এত দীঘল কবে আর দেখেছি ?

এ অনন্ত অন্ধকারে কেরে সে, খুঁজিছে কারে,
তন্ন তন্ন আকাশ গহ্বর।
তারে নাহি দেখে কেহ শুধু শিহরায় দেহ
শুনি তার তীব্র কণ্ঠস্বর।

শ্রাবণের গভীর রাত্রির এই মানবী-রূপ অভিনব। রূপকের বেড়ি কেটে এ বর্ণনা রূপ-জগতে বেরিয়ে পড়েছে—প্রজাপতির মত। তুলনা করুন সন্ধ্যা-সঙ্গীতের ভাষার সঙ্গে :

আকাশের দৈত্যবালা উন্মাদিনী চপলারে
বেঁধে রাখে দাসত্বের লোহার শিকলে।(—গান সমাপন)

সমীর কোমল মন আসে হেথা অনুক্ষণ
যখন সে পায় অবকাশ,
যখনি প্রভাত ফুটে, যখনি সে জেগে উঠে
ছুটিয়া সে আসে মোর পাশ। (—আবার)

এ ভাষা সবই স্পষ্ট ক'রে বলে, পাঠকের কল্পনার উপর বিন্দুমাত্র আস্থা রাখে না। কিন্তু ছবি ও গানের ভাষা এত প্রত্যক্ষ নয়। ভাবজগতের বিষয়বস্তুকেও ভাবময় বা রূপময় বা সঙ্কেতগভীর ভাষায় তিনি বর্ণনা করেছেন।

এইভাবে ছবি ও গানে নবীন গীতিকবিতার কাব্য-ভাষায় উদ্ভাবনা ঘটল বলা যায়। এই কারণেই বোধ হয় কবি বলেছিলেন, "আমার ভাষায় ও ছন্দে এই একটা মেলামেশা আরম্ভ হ'ল। 'ছবি ও গান' 'কড়ি ও কোমলে'র ভূমিকা ক'রে দিল।" (সূচনা)।

* * * * * ৭

'কড়ি ও কোমল' প্রভাতসঙ্গীতের দীপ্ততর সংস্করণ, পূর্ণতর পরিণতি।

ছবি ও গানে কাব্য-কুশলতা নিঃসন্দেহ বেড়েছে, কিন্তু জীবন-জিজ্ঞাসায় এই কাব্য দ্বিধাগ্রস্ত। সম্ভবত কবির ব্যক্তি জীবনে কোন সংকট দেখা দিয়েছিল, আজও যা অনুদ্ঘাটিত রয়েছে।

'কড়ি ও কোমলে' প্রভাতসঙ্গীতের জীবন-অনুরাগ নতুন ক'রে ফিরে এল।

"প্রথম উচ্ছ্বাসের একটা সাধারণভাবের ব্যাপ্ত আনন্দ ক্রমে আমাদিগকে বিশেষ পরিচয়ের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যায়—বিলের জল ক্রমে যেন নদী হইয়া বাহির হইতে চায়—তখন পূর্বরাগ অনুরাগে পরিণত হয়।"[৫]

সংশয় ও দ্বিধার মধ্যেও ছবি ও গানে একটি সাহিত্যধর্ম ধীরে ধীরে গ'ড়ে উঠেছে। ইতিপূর্বে কবি 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকটি রচনা করেছেন। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ এমন এক নায়কের কাহিনী আমাদের শুনিয়েছেন, যে "সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল।" পরে একটি ক্ষুদ্র বালিকা তার এই ভ্রান্তির অবসান ঘটায়; "ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি।"[৬] প্রেমের সেতুতে দুই পথের ভেদ ঘুচল এবং গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর মিলন হ'ল। তখন সীমায় অসীমে মিলিত হ'য়ে সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হ'য়ে গেল।

কবি এইখানে উপনিষদের তত্ত্বকে প্রথম আত্মস্থ করলেন; এবং তা কাব্যে সোনার কমল ফুটালো। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এই নবীন দৃষ্টি কবি উত্তরাধিকার সূত্রে পেলেও এখন থেকে তাঁর অনুভূতির অচ্ছেদ্য অংশ হ'য়ে থাকল। বা উপনিষদের তত্ত্ব তাঁর জীবন থেকেই নবীন দ্যোতনা লাভ করল।

কবি বলেছেন, "আমার কাব্যরচনার এই একটি মাত্র পালা। সে-

পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।"[৪]

আমরা দেখিয়েছি, সন্ধ্যাসঙ্গীত থেকেই কবির সৃষ্টি ক্ষমতা এক বিশেষ পথে প্রবাহিত হ'তে থাকে। তিনি প্রেম এবং প্রেমের পাত্রকে পৃথক্ ক'রে দেখতে সক্ষম হলেন। তাঁর লক্ষ্য নির্বিশেষ; কিন্তু যাত্রা করেছেন বিশেষ থেকে।

প্রভাতসঙ্গীতে এই বিশেষ দৃষ্টির সম্মিলন আর কেবল স্থানবিশেষে কবির দক্ষতাজনিত নয়, এটাই হ'য়ে দাঁড়াল কাব্য-রীতি। এই রীতি তাঁর কাব্য-ধর্মের সঙ্গে বিশেষ সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই রীতির ফলে কবিও যেমন তাঁর প্রভাতসঙ্গীত-পূর্ব সাহিত্যের গদ্‌গদভাষী কাব্য-রীতি থেকে নিষ্ক্রমনে সক্ষম হলেন; বাংলা কাব্যও এক নতুন পথে যাত্রা সুরু করল। "তখন তাহার চিত্ত প্রত্যক্ষ বিশেষের মধ্য দিয়াই অপ্রত্যক্ষ অশেষের মধ্যে আপনাকে প্রসারিত করিয়া দেয়।"[৮]

ছবি ও গানেও এই যোগসাধনের পালা চলেছে, যদিও সেই সাধনায় আলো অপেক্ষা আঁধারের ভাগ বেশি। ছবিও গানে আমরা দেখিয়েছি, কবি নানা বিষয়ে কাব্য চর্চা করেছেন। এগুলি নিঃসন্দেহে তাঁর অনুভব শক্তির সাবালকত্ব অর্জনের উপায়। বাইরের সঙ্গে, প্রত্যক্ষের সঙ্গে একান্ত মিলিত হ'য়ে তাঁর হৃদয়-ভাবটি এইভাবে ক্রমশই সবাঙ্গীন সত্য হ'য়ে উঠেছে।

কিন্তু কড়ি ও কোমল থেকেই সেই প্রত্যক্ষ জগতের সঙ্গে কবির হৃদয়জ ভাবের মিলন সাধনের প্রয়াস ব্যাপকতর ও গভীরতরভাবে দেখা যাচ্ছে।

কড়ি ও কোমলের কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করলেই কবির এই অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যাবে। কবিতাগুলি চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে —১। আত্মভাবনামূলক; ২। প্রত্যক্ষ জগতমূলক; ৩। নিসর্গমূলক; ৪। এবং উপকথা জাতীয়।

কবির আত্মভাবনা ও অন্যান্য গভীর ভাবনা একসূত্রে রয়েছে।

প্রত্যক্ষ জগৎমূলক কবিতায় স্বদেশের সঙ্কটে কবির আত্ম-চিন্তার স্ফুরণ আছে; আবার নিগৃহীত মানবসন্তানের জন্য ক্রন্দনও আছে। সবগুলিরই রচনা পদ্ধতি এক নয়; যেমন প্রথমোক্ত শ্রেণীর কবিতার মধ্যে 'পত্র' শীর্ষক কবিতায় লঘুহাস্য পরিহাসের কুশাংকুর আছে। "ছুঁচোলো সব জিবের ডগা কাঁটার মতো পায়ে ফোটে।" আবার কোনটি আবেগের টোপর

মাথায় দিয়ে দিবালোকে জ্বল জ্বল করছে—বঙ্গভূমির প্রতি, বঙ্গবাসীর প্রতি ও আহ্বানগীত এই পর্যায়ের কবিতা। এই দুইশ্রেণীর কবিতাই পরে 'মানসী'তে লেখা হবে, প্রায় তুল্য সার্থকতার সঙ্গে। আর একশ্রেণীর কবিতা এখানে দেখা যায়, সেগুলি প্রত্যক্ষভাবেই দেশপ্রেম, এবং মানবপ্রেমমূলক। 'কাঙালিনী' কবিতাটি রবীন্দ্র-সাহিত্যে দিকপরিবর্তনের পরিচয়-পত্র। 'প্রভাত-সঙ্গীত' রচনার প্রাতরুষাতে সদর স্ট্রীটের দিব্যালোকে মুটেমজুর পর্যন্ত তাঁর নয়ন সম্মুখে প্রেম-আলোকে ঝলসিত হ'য়ে উঠেছিল। আজ তারাই উপলব্ধির সোপান উত্তীর্ণ হ'য়ে সৃষ্টির প্রকোষ্ঠে ধরা দিল।

'প্রভাতসঙ্গীতে'র সেই দিব্যভাষণের অধিকতর রসপূর্তি ঘটেছে নিসর্গমূলক কবিতায়। বনের ছায়া, পাষাণী মা, বসন্ত-আবাহন পৃথক্‌ভাবে নতুন কোন নিসর্গচিন্তার প্রকাশ ঘটায় নি।

'কড়ি ও কোমলে'র নিসর্গচিন্তায় একটি অদ্বয়বোধ দেখা যায়, 'প্রভাত-সঙ্গীতে' তা বর্তমান ছিল। সৃষ্টির একটা অখণ্ড রূপ তখন থেকেই তাঁর হৃদয়ে জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে; আর এই জাগরণের সঙ্গে একটা আনন্দবোধও দেখা দিয়েছিল 'প্রভাতসঙ্গীতে'। মাঝখানে 'ছবি ও গানে' তা বিঘ্নিত হয়েছিল। আবার 'কড়ি ও কোমলে' সেই আনন্দবোধ দ্বিগুণ তেজে ও গভীরতায় দেখা দিল। আর এই নিসর্গ-চিন্তার সঙ্গে কবির নায়িকা-চিন্তা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে।

> আমার যৌবন-স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ
> ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মতো।
> পরাণে পুলক বিকাশিয়া বহে কেন দক্ষিণা বাতাস
> যেথা ছিল যত বিরহিণী সকলের কুড়ায়ে নিশ্বাস।
>
> *　　*　　*
>
> যেন কার আঁচলের বায় উষায় পরশি যায় দেহ,
> শত নূপুরের রুনুঝুনু বনে যেন গুঞ্জরিয়া বাজে।
> মদির প্রাণের ব্যাকুলতা ফুটে ফুটে বকুল-মুকুলে;
> কে আমারে করেছে পাগল—শূন্যে কেন চাই আঁখি তুলে,
> যেন কোন্ উর্বশীর আঁখি চেয়ে আছে আকাশের মাঝে।
>
> (—যৌবন-স্বপ্ন)

কবির আত্মভাবনায় এক গভীর প্রত্যয়বোধ দেখা দিল। জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টির দুই বিপরীত প্রকাশ ; কিন্তু মৃত্যু বা জীবন—তার কোনটিই কবির কাছে আজ শোকের কারণ নয়। "হেথায় নতুন খেলা আরম্ভ হয়েছে"—এইটুকুই সব যুক্তি নয়। 'কোথায়' ও 'শান্তি' কবিতাদ্বয়ে মৃত্যুর ব্যথা কখনও শোকাচ্ছ্বাসে, কখনও সান্ত্বনার বাক্যে প্রকাশিত হয়েছে। সান্ত্বনা বা শোকোচ্ছ্বাস সব কিছুই বৃহত্তর জীবনের অংশ।

মিছে শোক, মিছে এই বিলাপ কাতর,
সম্মুখে রয়েছে পড়ে যুগ যুগান্তর। (ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি)

*   *

সমগ্র অনন্ত ওই নিমেষের মাঝে
একটি বনের প্রান্তে জুঁই হয়ে উঠে।
পলকের মাঝখানে অনন্ত বিরাজে।
যেমন পলক টুটে ফুলে ঝরে যায়
অনন্ত আপনা মাঝে আপনি মিলায়॥ (ক্ষুদ্র অনন্ত)

'প্রভাতসঙ্গীতে'র 'অনন্ত জীবন' 'অনন্ত মরণ' অপেক্ষা শেষোক্ত ক্ষুদ্র কবিতার গর্ভে এই প্রত্যয়টি গভীরতর অর্থে প্রকাশিত হয়েছে।

কবির নায়িকা-ভাবনা যে এই কাব্যে ব্যক্তিক থেকে নৈর্ব্যক্তিক ধারণায় প্রথম পৌঁছাল, একথা বলা যায় না। 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' এই সফলতার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। কিন্তু 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে', এমন কি 'ছবি ও গানে' একটা বেদনার জ্বালা সব সময়ই ছিল। প্রেম জীবন-সীমাকে খাটো কখনই করে না, বাড়িয়ে দেয়। কাঁটায় না ভরিয়ে কুসুমে আকীর্ণ করে। 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুলি সেই অপূর্ব কুসুম—যেমন শোভা, তেমনি সৌগন্ধ্য।

এখানে প্রেমিকার সহিত প্রেমিকের হৃদয় বিনিময়ে এমন কোন বিপত্তি নেই, যার ফলে কবিকে বলতে হবে :

দূর করো দূর করো, বিকৃত এ ভালোবাসা,
জীবনদায়িনী নহে, এ যে গো হৃদয়-নাশা।

এখানে সে-প্রেম "তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর-সংগমে।"

এখানে প্রেমে উৎকণ্ঠা আছে, উদগ্রতা রয়েছে। কিন্তু আনন্দও আছে। 'ছবি ও গানে' নায়িকা ও নায়কের উপস্থিতি শুধু দাহ-ই সৃষ্টি করে।

এ বিষাদ ঘোর, এ আঁধার মুখ
হতাশ নিশ্বাস, এই ভাঙ্গা বুক—

ভাঙ্গা বাদ্য-সম বাজিবে কেবল
সাথে সাথে দিবানিশি। (রাহুর প্রেম)

অথচ সেই মুখ, সেই নিশ্বাস এখানে কত আনন্দ ও পরিতৃপ্তির উৎস। বাহু, চরণ, স্তন, বসনপ্রান্ত, এমন কি অঞ্চলের বাতাসটুকু পর্যন্ত কত মোহময়! কড়ি ও কোমল এই আনন্দের সংবাদ চোদ্দ অক্ষরের কঠিন বন্ধনে বেঁধে রেখেছেন ব'লে তা এত সুপেয় হয়েছে।

কবির আদিযুগের অন্যতম সহৃদয় সমালোচকের বিশ্লেষণ দেখুন—

"ফিডিয়াস যে কল্পনায় সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই, রবীন্দ্রনাথ তাহাতে সাহস করিয়াছিলেন। উলঙ্গিনী রমণী বা যুবতীর স্তন চিত্র করিবার শক্তি কয়জনের আছে? চুরি ক'রে চাওয়ার মধুরতা রবীন্দ্রনাথ জানেন। অথচ যাহাতে চক্ষু ঝলসিয়া যায়, আতংকে দেবদূত পক্ষপুটে চক্ষু আবরণ করেন, সাহসে রবীন্দ্রনাথ তাহারই চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেখিয়া আমাদের মনে শক্রদমনের সিংহশিশুর দন্তদর্শনের চেষ্টা মনে পড়িয়াছিল। বুঝিয়াছিলাম, রবীন্দ্রনাথ শিশু হইলেও বীরশিশু বটে।"

(বিজয়চন্দ্র মজুমদার—নব্যভারত, ১২৯৭, চৈত্র)

'কড়ি ও কোমল' নারী ও পুরুষের প্রথম মিলন-রাত্রির কাব্য। এখানে আনন্দে উদ্দামতায় মাখামাখি হ'য়ে গেছে। সচেতন হয়েছেন, কিন্তু একটু বিলম্বে।

দাও খুলে দাও, সখী, ওই বাহুপাশ—
চুম্বন মদিরা আর করায়ো না পান।
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস,
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরাণ।
* * *
স্বাধীন করিয়া দাও, বেঁধো না আমায়—
স্বাধীন হৃদয়খানি দিব তব পায়॥

ইতিমধ্যেই যা ঘটবার, ঘ'টে গেছে। বাংলা কাব্যে নতুন মানব-পূজা, নতুন ভাষা, নতুন কাব্যের জন্ম ঘ'টে গেছে। সমালোচকেরা শংখধ্বনি ক'রে নয়, নিন্দায় বিদ্রূপে সাহিত্যমণ্ডপ কাঁপিয়ে তুল্লেন।

"আমার কাব্যলোকে যখন বর্ষার দিন ছিল তখন কেবল ভাবাবেগের বাষ্প

এবং বায়ু এবং বর্ষণ। তখন এলোমেলো ছন্দ এবং অস্পষ্ট বাণী। কিন্তু শরৎকালের কড়ি ও কোমলে কেবল মাত্র আকাশে মেঘের রঙ্গ নহে, সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে। এবং বাস্তব সংসারের সঙ্গে কারবারের ছন্দ ও ভাষা নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।"[৯]

কড়ি ও কোমলের ছন্দ ও ভাষার নানাপ্রকার রূপের কথা কবি বলেছেন। ছন্দে প্রচলিত পয়ার ত্রিপদীর পর্ব বিভাগে নানা অভিনবত্ব দেখান হয়েছে। ত্রিপদীর রূপবৈচিত্র্য প্রথমে আলোচনা করে। 'নূতন', 'পুরাতন' 'ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি', 'যোগিয়া', ও 'বনের ছায়া' কবিতায় একই বিভাগ (৮+৮+১০)। কোন কোনটিতে আছে মাত্র চরণের আধিক্য (যথা পুরাতনে ৮+৬ বিভাগের একটি চরণ)। আবার বঙ্গবাসীর প্রতি, বসন্ত আবাহন, আকাঙ্ক্ষা, বিরহ প্রত্যেকটিতেই পৃথক্ পৃথক্ চরণ বিভাগ। তন্মধ্যে আকাঙ্ক্ষা ও বিরহের পর্ব বিভাগই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে প্রথমে দুইমাত্রার একটি পর্বকে পৃথক্ ক'রে পার ৬+৬+৭ মাত্রা বিভাগ ক'রে কবি এগুলির সঙ্গীত-সুষমা বহুগুণ বাড়িয়ে ফেলেছেন। শেষোক্ত কবিতা কয়টিকে গীতিকবিতা অপেক্ষা গীতি বলাই যুক্তিসঙ্গত। পয়ারের বৈচিত্র্যও কম নয়। সনেটগুলি ৮+৬ মাত্রা প্রয়োগে সংহতির প্রসঙ্গ আর তুলবই না ; কারণ এ প্রসঙ্গ বহুবার আলোচিত হয়েছে। কিন্তু যৌবন স্বপ্ন ও ক্ষণিক মিলন কবিতাদ্বয়ের কুড়ি মাত্রার পয়ার অভিনব ; অথচ এই পয়ার সিন্ধুদূতের পংক্তিবিন্যাস কৌশল মাত্র নয়। এই প্রলম্বিত পয়ারে কবির ক্ষণিক আনন্দ ও মিলন দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। পত্র কবিতায় নানা ধরণের চরণ কবি ব্যবহার করেছেন ; এবং এখানকার এই পয়ার ছড়ার ছন্দের মধ্যে আলগোছে স্থান সংগ্রহ ক'রে নিয়েছে। যুক্তাক্ষরের বিপদ থেকে এখানে কবি বহুলাংশে উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করেছেন ; এখানে বিপদের কারণ কি সম্ভবত কবি তা প্রণিধান করেছেন। কিন্তু তার সম্মুখীন হতে এখনও পারছেন না, পরিহার ক'রে চলেছেন। ছবি ও গানের মত হঠকারিতার উদাহরণ এখানে নেই :

চারিদিকে মোর বসন্ত হসিত,
যৌবনকুসুম প্রাণে বিকশিত,
কুসুমের পরে ফেলিব চরণ,
যৌবনমাধুরীভরে।

চারিদিকে মোর মাধবীমালতী
সৌরভে আকুল করে। (জাগ্রত স্বপ্ন)

কিন্তু তা সত্ত্বেও পদস্খলনের অভাব নেই। যুক্তাক্ষর ও যুগ্মধ্বনি নিয়ে এই বিপত্তি চলেছে।

ছন্দ ব্যাপারে এ কাব্যের কুশলতা তত গভীর নয়, কিন্তু কাব্য-ভাষার ক্ষেত্রে এ কাব্যের কুশলতা অসামান্যরকমে উজ্জ্বল। এ কাব্যের ভাষায় অন্যান্য কাব্যের অকৃতার্থ ভাষার সার্থকতার প্রমাণ আছে।

সন্ধ্যাসঙ্গীত :

অনিবার হাসিতেই রহে ;
যত হাসে ততই সে দহে। —তারকার আত্মহত্যা

কড়ি ও কোমল :

ধূলাতে মাটিতে রহি হাসির কিরণে দহি
ক্ষণে ক্ষণে হতেছে মলিন। (পুরাতন)

প্রভাত সঙ্গীত :

এই বিশ্ব জগতের মাঝখানে দাঁড়াইয়া
বাজাইবি সৌন্দর্যের বাঁশি,
অনন্ত জীবন পথে খুঁজিয়া চলিব তোরে,
প্রাণমন হইবে উদাসী (প্রতিধ্বনি)

কড়ি ও কোমল

আঁখির কাছে বেড়ায় ভাসি
কে জানে গো কাহার হাসি,
দুটি ফোঁটা নয়ন-সলিল
রেখে যায় এই নয়ন কোণে।

কোন ছায়াতে কোন্ উদাসী
দূরে বাজায় অলস বাঁশি,
মনে হয় কার মনের বেদন
কেঁদে বেড়ায় বাঁশির গানে। (সারাবেলা)

শুদ্ধ ছন্দে নয়, শুধু মিলে নয়, শুধু স্তবকে নয়, শব্দেও শুধু নয়, সমগ্র সম্পদে এখানে ভাষা অনির্বচনীয় হয়েছে। ছবি ও গানের নানা অপূর্ণতাই কড়ি ও কোমলে পূর্ণ হয়েছে। যা অস্পষ্ট, তা এখানে অস্পষ্টই থেকেছে, কিন্তু ইঙ্গিতময় হয়েছে।

তবে একথাও ঠিক যে, কড়ি ও কোমলে 'ছবি ও গানে'র সমস্ত আকুলতার জবাব মেলে নি। অন্তত একটি আকুলতা এখানে পূর্ণ সদ্গতি লাভ করেনি। সেই আকুলতা দয়িতার জন্য দয়িতের।

সে যেতে যেতে চেয়ে গেল
কী যেন গেয়ে গেল—
তাই আপন মনে ব'সে আছি
কুসুম-বনেতে। (কে ?)

কড়ি ও কোমলে বিভোরতাই বেশি; কবির নবযৌবনের সমস্ত প্রত্যাশা-পূর্তির প্রথম আনন্দে সেই আকুলতা সাময়িক বিরতি লাভ করেছে। কড়ি ও কোমল সম্ভোগ ও শান্তির কাব্য; মাঝে মাঝে যে অনির্দেশ্য আকুতি আছে, সেটা এ কাব্যের প্রধান সুর নয়। তাই এ কাব্যের পটভূমিকায় শরৎ ঋতু; সম্ভবত মুখ্য প্রতীক তাই। শরৎঋতু পরিতৃপ্তির ঋতু, ফসল ফলানোর ঋতু। কবির সেই সাময়িক বিরতি পরবর্তী কাব্যে সুদে আসলে পরিশোধিত হবে।

পাদটীকা

১। রবীন্দ্রস্মৃতি—ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়—১৩৬৭ পৃঃ ১৬—১৭

২। জীবনস্মৃতি—পৃঃ ১০৬

৩। Sartor Resartus—Carlyle. Book II. Chapter IX.

৪। জীবনস্মৃতি, পৃঃ ১২০-১২১।

৫। জীবনস্মৃতি, পৃঃ ১২৫।

৬। ঐ, ১৩২।

৭। ঐ, পৃঃ ১৩৩।

৮। ঐ, পৃঃ ১২৫।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"বিশ্ব তোমা-পানে চেয়ে কথা নাহি কয়"

অথচ 'কড়ি ও কোমলে' পৌঁছুবার পূর্বেই কবি গদ্যে সম-অনুভূতিক তত্ত্বে উপনীত হয়েছিলেন। আমরা কয়েকটি উদাহরণ উৎকলিত করছি:

"কে বুঝাইয়া দিবে যে জগৎ কেবল স্তূপাকৃতি কতকগুলো বস্তু নহে, উহার মধ্যে ভাব বিরাজমান? আর কেহ নহে প্রেম। জগৎকে যে ভালবাসে সে কখনও মনে করিতে পারে না যে জগৎ জড়পিণ্ড। সে ইহার মধ্যে অসীমের ও চিরজীবনের আভাষ দেখিতে পায়।" (ডুব দেওয়া—ভারতী, ১২৯১, বৈশাখ)।

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় সৌন্দর্য ও প্রেমের মধ্যে সম্পর্ক বিচার করতে গিয়ে বললেন, "সৌন্দর্যের সামঞ্জস্য সমস্ত জগতের সঙ্গে।"

শ্রাবণ সংখ্যায় 'স্বপ্নরাজ্য' প্রবন্ধে এই সমস্ত ভাবগুলিই আরও দানা বাঁধতে লাগল, মন দিয়ে মহামনকে এবং আত্মা দিয়ে পরমাত্মাকে ধরবার উপায় বলা হ'ল। পদার্থজগৎ অপেক্ষা ভাবজগৎ এবং বুদ্ধি অপেক্ষা হৃদয়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হল।

১২৯২ সালে হৃদয়-কন্দরের বিভিন্ন গূঢ় ভাবনার রূপ বিশ্লেষণ না ক'রে নব্য কবিতার সার্থকতা তির্যকভাবে বিশ্লেষণ করলেন। "নূতনে পুরাতনে বিচ্ছেদ হইলেই জীবনের অবসান। যেদিন দেখিব পৃথিবীতে নূতন কবি আর উঠিতেছে না, সেদিন মানিব পুরাতন কবিদের মৃত্যু হইয়াছে। ** জগৎ হইতে সঙ্গীতের প্রবাহ লোপ করিতে কে চাহে? নূতন বসন্তে নূতন পাখির গান বন্ধ করিতে কে চাহে?"

প্রভাত সঙ্গীতে যার সুরু, সেই নূতন কাব্যধারার পক্ষে আন্দোলনও আরম্ভ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই আন্দোলনের নেতা। তাঁর সহযোগী হলেন কেম্ব্রিজের কুশলীছাত্র আশুতোষ চৌধুরী; যিনি 'কড়ি ও কোমলে'র কবিতাগুলি যথোচিত সাজিয়ে প্রকাশ করেছিলেন, এবং 'প্রাণ' কবিতাটি তাঁরই আগ্রহে কাব্যের শুরুতে দেওয়া হয়েছিল। 'ফরাসি কাব্যসাহিত্যের রসে তাঁর বিশেষ বিলাস ছিল'।

১২৯৩ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় ভারতীতে কাব্যজগৎ নামক প্রবন্ধে তিনি ওয়াডস্‌ওয়ার্থ, শেলি, ও হুগো প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন। এই প্রবন্ধেই গোতিয়ে থেকে তিনি একটি অনুবাদ উপহার দিলেন।

বলরে যুবতী বালা কোথা যাবি তুই ?
পাল উড়িতেছে, বায়ু বহিতেছে, চল কোথা যাবি তুই।
সোনার ডিঙ্গায় সোনার হাল, পরীর পাখায় উড়িছে পাল—
হাতির দাঁতের দাঁড়টি লয়ে, দেবতার ছেলে যাইবে বেয়ে,
বালা কেথা যাবি তুই।

এ অনুবাদ থেকে রবীন্দ্রনাথের সোনারতরীর জগৎ খুব কি দূরে ? অনুবাদ-শেষে তিনি যে কথা বললেন, তার তাৎপর্য আরও গভীরতর। 'আমার ফরাসি কবিতা পড়িতে মনে হয় যেন কোন বৈষ্ণব কবির লেখা পড়িতেছি।' দেশীয় ও বিদেশীয় ভাবনা দেশকালের সীমা পার হ'য়ে পরস্পরের হাত ধরল।

কার্তিক সংখ্যায় তিনি এডগার এ্যালেন পোর প্রসঙ্গ তুললেন; এডগার পোর একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত উদ্ধার করলেন, "পৃথিবীতে দীর্ঘ কবিতা নাই; দীর্ঘ কবিতা কথা দুইটি বিবাদী।" পোর কবিতার প্রকৃতি বিশ্লেষণে তিনি বললেন, "তাঁহার কবিতাতে গোধূলির বিষাদ আছে, অস্তের ছায়া আছে। তাহার যেখানে আলোক, তাহা রক্তসন্ধ্যার শেষ রশ্মি, যেখানে রজতরেখা, হয় যে সূর্য ডুবিয়া গিয়াছে তাহারই, কিম্বা যে চন্দ্র উঠে নাই, তাহারই।" এই উক্তিটি মানসীর অন্তঃপ্রকৃতি বিশ্লেষণকালে মনে রাখলে উপকার হবে।

আশুতোষ চৌধুরীর প্রবন্ধ প্রকাশের পাঁচ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ আপন অনুভবের দ্বারা লিখেছিলেন, "ইংলণ্ডের সাহিত্যে একটা বিশাল মহাকাব্য রচিত হইতেছে, অনেক দিন হইতে অনেক কবি তাহার একটু একটু করিয়া লিখিয়া আসিতেছেন। পাঠকেরাই এই মহাকাব্যের বেদব্যাস। ** এখানকার উপযোগী মহাকাব্য একজনে লিখিতে পারে না, একজনে লিখেও না।" পরিশেষে বললেন, "য়ুরোপের সাহিত্যে মহাকাব্য লিখিবার কাল চলিয়া গিয়াছে।" (ভারতী, ১২৮৮, শ্রাবণ)। সাহিত্যের যুগ-বাহণ প্রশ্ন আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-তত্ত্বের মূল প্রতিজ্ঞাসমূহও বিশ্লেষিত হ'ল; ১২৮৮ সালে অগ্রহায়ণ মাসে 'অদ্বৈতবাদ ও আধুনিক ইংরেজ কবি' প্রবন্ধে বর্তমান

কালে অদ্বৈতবাদের অনিবার্যতা ব্যাখাত হল; প্রভাতসঙ্গীতের সঙ্গীত-কুসুম তখনই ফুটে উঠতে চাইছে। গীতিকবিতায় সঙ্গীতধর্মের আবশ্যকতা বর্ণনা ক'রে মাঘ সংখ্যায় লিখলেন, "সুরের ভাষা ও কথার ভাষা উভয় ভাষা মিশিয়া আমাদের ভাবের ভাষা নির্মাণ করে।" রবীন্দ্র গীতিকাব্য বিচারে কথাটি আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। এছাড়া সাহিত্যের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাচ্ছলে আনন্দবাদ বিশেষ মূল্য পেল (ভারতী, ১২৯৪, বৈশাখ)। এই সময় কবি কড়ি ও কোমলের পর্ব শেষ ক'রে মানসীর যুগে সবে পা ফেলছেন।

এই নতুন কাব্যের প্রতি বিরোধিতার অন্ত নাই। নবজীবন, আর্যদর্শন, সাহিত্য (কিছু পরবর্তীকালে) এই কবিতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হ'ল।

বঙ্গদর্শন, ১২৯০ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় পশুপতি সম্বাদে লেখা হল, "তাঁহার (রবীন্দ্রবাবুর) কোন কবিতাতেই 'স্বদেশ,' 'ভারত', 'ভারতমাতা,' 'উদ্ধার', প্রভৃতি কোন শব্দই দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গে যতদিন patriot আছে, ততদিন কেহই রবীন্দ্রবাবুর কবিতাকে কবিতা বলিয়া স্বীকার করিবে না।"

বান্ধব প্রত্রিকায় ১২৮৫ সালে মাঘ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের কবিকাহিনী প্রশংসিত হয়। ১২৮৮ সালে তৃতীয় সংখ্যায় রুদ্রচণ্ডের সমালোচনায় বলা হ'ল, "কবিতাগুলি যেন আধ আধ ভাঙা গলায় নিরবচ্ছিন্ন মধু ঢালিতেছে।" এই "আধ আধ ভাঙা গলা" বিশ্লেষণের মধ্যেই ভবিষ্যত ব্যাধির বীজাঙ্কু থেকে গেল।

নবজীবন পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রকাশিত হ'ত। নব্য কাব্য ছিল তাঁদের অনুভবের অতীত। ১২৯৩ সালে অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'কাব্য সমালোচনা' নামে এক প্রবন্ধে বলা হল, "তোমরা এরূপ কুয়াসার কুহেলিকায়, নিরাশার প্রহেলিকায় বঙ্গসাহিত্য গো-ধূলি গোধূলি করিবার চেষ্টা করিতেছ কেন?" এই প্রসঙ্গে শেলিকে বায়রণের ছায়া বলা হল; এবং কবিকঙ্কণের সার্থক কবিত্বের প্রশংসা করা হ'ল। ১২৯৫ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ভারতচন্দ্র ও ভানুসিংহের পদাবলীর তুলনামূলক ·আলোচনা ক'রে ভানুসিংহকে শ্লীলতর বলা হল। কিন্তু কবিকাহিনী, রুদ্রচণ্ড বা ভানুসিংহের পদাবলীর পরে আর কেউ এগুলেন না।

রবীন্দ্রনাথ এর জবাব দিতে গিয়ে আধুনিক গীতিকবিতার মর্ম-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলেন। "প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে কবিতা কোথাও স্পষ্ট কোথাও

অস্পষ্ট, সম্পাদক ও সমালোচকেরা তাহার বিরুদ্ধে দরখাস্ত ও আন্দোলন করিলেও তাহার ব্যতিক্রম হইবার যো নাই। প্রকৃতি অতি বৃহৎ, অতি মহৎ, সর্বত্র আমাদের আয়ত্তাধীন নহে। ইহাতে নিকটের অপেক্ষা দূর, প্রত্যক্ষের অপেক্ষা অপ্রত্যক্ষ, প্রামাণ্যের অপেক্ষা অপ্রামাণ্যই অধিক। অতএব যদি কোন প্রকৃত কবির কাব্যে ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়, তবে বুদ্ধিমান সমালোচক ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে তাহা এই অসীম প্রকৃতির সৌন্দর্যময়ী রহস্যচ্ছায়া।" (ভারতী, ১২৯৩, চৈত্র) তবু সমালোচকদের আন্দোলন থামল না। কবি বর্তমান সাময়িক পত্রের সাহিত্যসমালোচনাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, "প্রেমের পরিবর্তে অহঙ্কার আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিল। **এই জড়ত্ব অবিশ্বাস ও অহঙ্কার চিরদিন থাকিবে না। তখন যে সাহিত্য জন্মিবে, তাহা মানবের সাহিত্য হইবে, এবং সে সাহিত্য উপভোগ করিবার জন্য ব্যক্তিবিশেষের ক্ষুদ্র মত ও বুদ্ধিমানের ব্যাখ্যা কৌশলের প্রয়োজন থাকিবে না।" (ভারতী, ১২৯৪, শ্রাবণ)।

রাজনারায়ণ বসুর মহান আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি! এবং এই প্রতিধ্বনি কার লেখনী থেকে জাগছে? না, যিনি তখন 'মানসী' রচনায় ব্যাপৃত। কবির স্বপক্ষে একদল সমালোচক ও সমজদার দেখা দিয়েছেন। প্রিয়নাথ সেন, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, লোকেন পালিত, আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে আরও দুই একজন নিভৃতে কবিকে পূজা করছিলেন; তাঁদের মধ্যে বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও দেবেন্দ্রনাথ সেন উল্লেখযোগ্য।

নব্যভারত পত্রিকায় ১২৯৩ সালের বৈশাখে অন্য কোন কবির এক কাব্যগ্রন্থ সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে নব্য কবিদের অগ্রণী বলা হ'ল। ১২৯৪ সালে অগ্রহায়ণ মাসে কড়ি ও কোমল সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হল, "রবীন্দ্রবাবু বাঙ্গালা সাহিত্যে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়া এযুগের অধিনায়ক হইয়া গিয়াছেন। ইঁহার আবির্ভাবের পর হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের খণ্ড কবিতার উপর যে লোকের আদর কমিয়াছে, এ কথায় আর সন্দেহ নাই।"

১২৯৭ সালে ভারতী পত্রিকায় 'আলো ও ছায়া' সমালোচনাকালে জনৈক সমালোচক লিখলেন, "বঙ্গের কাব্যকাননে মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র পুরাতন সুরের গায়ক; রবীন্দ্রনাথ বর্তমান যুগের প্রবর্তয়িতা।"

মানসী প্রকাশের পূর্বেই নব্য কাব্যের অনিবার্যতা প্রমাণিত হ'য়ে গেছে।

তবু যেটুকু সংশয়-দোদুল্যমানতা ছিল, 'মানসী' প্রকাশের পর তা সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত হল।

*　　*　　*　　*　　*

'মানসী' নব্যকাব্য আন্দোলনের মানস-বাণী। এই কাব্যে অগ্রসরশীল বাঙ্গালী সমাজের অস্থিরতা আকুলতা ও অভিসার অতুলনীয় কাব্য-রূপ লাভ করেছে। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে 'ছবি ও গান' পর্যন্ত কাব্য-সীমানার মধ্যে একটা অস্থিরতা ছিল। মাঝখানে 'কড়ি ও কোমলে' একটা বিশ্রাম। 'মানসীতে' সেই অস্থিরতা পুনরায় দেখা দিল, কিন্তু সে অস্থিরতা অসুস্থ পাণ্ডুর অস্থিরতা নয়; সুস্থ, সম্পূর্ণ সুস্থ অস্থিরতা। একটা বলিষ্ঠ জীবন-এষণা ও মর্ত্য-অনুরাগ এই কাব্যের ছত্রে ছত্রে ফুটে বেরিয়েছে। 'কড়ি ও কোমলে'র বিশিষ্টতা কিছু ছিনিয়ে নিয়ে ও আত্মস্থ ক'রে 'ছবি ও গানে'র বিশিষ্টতার জন্মান্তর ঘটেছে। "মানসী সম্বন্ধে যে লিখেছে যে, তার মধ্যে একটা despair এবং resignation-এর ভাব প্রবল, সেই কথাটা আমি ভাবছিলুম। ... ...

আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চলছে। একটা আমাকে আহ্বান করেছে, আর একটা আমাকে কিছুতে বিশ্রাম করতে দিচ্ছে না। (প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত কবির চিঠি, ২৯ জানুয়ারী, ১৮৯৮)

আমাদের মতে শেষোক্ত কথাটিই সত্য; 'মানসী'তে হতাশা বা আত্মসমর্পণেচ্ছা প্রবল নয়। "আমার ভারতবর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিতে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করছে—সেইজন্য একদিকে বেদনা, আর একদিকে বৈরাগ্য।" চাঞ্চল্যটা য়ুরোপের না হয়ে নবযুগেরও হ'তে পারে। 'মানসী'তে দুই বিপরীত শক্তির লীলা চলছে; 'মানসী'র এই স্বাতন্ত্র্য তার প্রবল মানব-অনুরাগেই প্রকাশিত। 'কড়ি ও কোমলে' প্রত্যক্ষ জগতের বিষয়বস্তুর উপর কবিতা আছে—কিন্তু সমগ্রভাবে এখানেই তার সঙ্গে প্রথম বুঝাপাড়া। 'কড়ি ও কোমল' সম্ভোগের কাব্য। প্রথম মিলন-রাত্রিতে কেউ কেউ সাহসভরে বাসর-কক্ষে উঁকি দিতে পারে; কিন্তু তার কি কোন সাক্ষ্য থাকে? তারপর সংসারে প্রতিদিনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই ত চলতে হয়; দুরূহ কর্তব্য কর্মে আত্মনিয়োগ করতে হয়। সেখানে বিশ্ব বহুধা প্রসারিত। 'মানসী'র সঙ্গে বিশ্বচরাচরের যোগ নিবিড়তর ও ব্যাপকতর। 'মানসী'র কবিতাগুলিকে বাজিয়ে দেখলেই তা থেকে নানা জাতের কবিতা বেরিয়ে আসবে; এবং

সেগুলি নানা জগৎ-অভিমুখী হ'য়ে আছে। এই কবিতাগুলিকে বিবিধ পর্য্যায়ে ভাগ করা গেল :

(১) প্রেম-ভাবনামূলক : ভুলে, ভুল-ভাঙা, বিরহানন্দ, আত্মসমর্পণ, নিষ্ফল কামনা, সংশয়ের আবেগ, বিচ্ছেদের শান্তি, তবু, আকাঙ্ক্ষা, নিষ্ফল প্রয়াস, হৃদয়ের ধন, নিভৃত আশ্রম, নারীর উক্তি, পুরুষের উক্তি, মানসিক অভিসার, ব্যক্ত প্রেম, গুপ্ত প্রেম, অপেক্ষা, সুরদাসের প্রার্থনা, ভৈরবী গান, মায়া, ধ্যান, পূর্বকালে, অনন্ত প্রেম, আশংকা, ভালো ক'রে ব'লে যাও প্রভৃতি।

(২) নিসর্গ-ভাবনামূলক : একাল ও সেকাল, প্রকৃতির প্রতি, কুহুধ্বনি, সিন্ধুতরঙ্গ, বধূ, বর্ষার দিনে, মেঘের খেলা, মেঘদূত, অহল্যার প্রতি।

(৩) প্রত্যক্ষজগৎ-ভাবনামূলক : দুরন্ত আশা, দেশের উন্নতি, বঙ্গবীর, নিন্দুকের প্রতি নিবেদন, কবির প্রতি নিবেদন, পরিত্যক্ত, ধর্মপ্রচার, নববঙ্গ-দম্পতির প্রেমালাপ।

(৪) আত্ম-ভাবনামূলক : নিষ্ঠুর সৃষ্টি, মরণস্বপ্ন, শূন্য গৃহে, জীবন-মধ্যাহ্ন, শ্রান্তি, বিচ্ছেদ, প্রকাশবেদনা। প্রেম-ভাবনামূলক কবিতাগুলির শুধু মাত্র নামকরণ বিশ্লেষণ করলেই কবির মনোভঙ্গি ধরা পড়বে। 'মানসী'তে নানা ধরণের কবিতা আছে : কোনটি নিতান্তই বিবৃতিধর্মী (narrative) ; কোনটি বর্ণনামূলক (descriptive), কোনটি নিছক তত্ত্বমূলক (didactive), কোনটি বা নাটকীয় (dramatic) ; আবার অধিকাংশ কবিতাই গীতিমূলক।

এই নানা আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে কবি ধরতে চেয়েছেন সেই অধরাকে, যিনি 'ছবি ও গানে' বসন্তের বাতাসটুকুর মতো কবির প্রাণের ওপর দিয়ে চলে গিয়েছিলেন! এবং সেই ছোঁয়ায় শত শত ফুল ফুটিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। "কিন্তু সে কোথায় গেল, বলে গেল না" ! এবং 'সে কোথায় গেল, ফিরে এল না'। 'মানসী'তে তিনি অনির্দেশ্য থেকেই নির্দেশ্য। কারণ

বাহিরে পাঠায় বিশ্ব কত গন্ধ গান দৃশ্য
সঙ্গীহারা সৌন্দর্যের বেশে,
বিরহী সে ঘুরে ঘুরে ব্যথাভরা কত সুরে
কাঁদে হৃদয়ের দ্বারে এসে।
সেই মোহমন্ত্র-গানে কবির গভীর প্রাণে
জেগে ওঠে বিরহী ভাবনা…

ছাড়ি অন্তঃপুরবাসে সলজ্জ চরণে আসে
মূর্তিমতী মর্মের কামনা।—উপহার।

কবির একটি প্রত্যয়বোধ আছে বলেই এই মর্ম-সহচরীকে নিয়ে এত মান অভিমান, বিরহ মিলন, বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন। আর তার ভাষা কখনও মিলনের আনন্দে উচ্ছল:

মৌন এক মিলন রাশি
তিমিরে সব ফেলিল গ্রাসি
প্রলয়তলে দোঁহার মাঝে
দোঁহার অবসান। (অপেক্ষা)

কখনও বিচ্ছেদের জ্বালায় করুণ:

মিছে কেন কাটে কাল ছিঁড়ে দাও স্বপ্নজাল,
চেতনার বেদনা জাগাও—
নূতন আশ্রয় ঠাঁই, দেখি পাই কি না পাই—
সেই ভালো তবে তুমি যাও।
(বিচ্ছেদের শান্তি)

কখনও পরস্পর পরস্পরের উপর অভিযোগে মুখর:

অপবিত্র ও কর পরশ
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে।
মনে কি করেছ বঁধু ও হাসি এতই মধু
প্রেম না দিলেও চলে শুধু হাসি দিলে?
(নারীর উক্তি)

কখনও উদাসীনতায় গম্ভীর:

প্রকৃতির শান্তি আজি করিতেছি পান
চিরস্রোত সান্ত্বনার ধারা
নিশীথ আকাশ-মাঝে নয়ন তুলিয়া
দেখিতেছি কোটি গ্রহ তারা—
(জীবন মধ্যাহ্ন)

মানসী নানা সুরে ঝঙ্কার তুলেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে আকুলতার ঝঙ্কার, মেঘমল্লার!

এই কারণে ঋতুর মধ্যে বর্ষাই প্রাধান্য পেয়েছে এ কাব্যে। কারণ বর্ষা ফলপ্রাপ্তির কাল নয়, বর্ষণের কাল; চরাচর লুপ্ত করা-যৌবনের কাল, অভিসারের কাল। বর্ষার উপর কবির চারিটি কবিতা আছে। কালিদাস, জয়দেব ও বৈষ্ণব পদাবলী নানা অনুষঙ্গ নিয়ে এসে কবির মানস-লোকে বর্ষা-মূর্তির রমনীয়তা বৃদ্ধি করেছে। মানসীর ভাবজগতে কিছুটা না-বুঝার ভাব আছে; এই না-বুঝার ভাবটির সঙ্গে বর্ষা ঋতুর একটা মিল আছে। তাই

এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরিষায়।
এমন মেঘস্বরে বাদল ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়।—(বর্ষার দিনে)

কারণ "মেঘেতে দিন জড়ায়ে থাকে
মিলায়ে থাকে মাঠে—"

এই যে দিন এবং না-দিন এটাই বর্ষার চরিত্র। মানসীর উৎকণ্ঠা ও আর্তির বাহ্য রূপ হ'ল এই বর্ষা। এই কিছু দৃশ্যমান, কিছু অদৃশ্য জগতই কবির মানসীর জগৎ।

এসব ছাড়া বড় কথা হল, রবীন্দ্রনাথ এই প্রথম মানসীতে তাঁর জীবনের মুল কথাগুলি স্পষ্টভাষায় বললেন। তাঁর প্রেম সমগ্র দেশকালব্যাপী; কখনও মানবীর উদ্দেশে উৎসৃর্গীকৃত; কখনও এক অনির্ণীত ও অনির্দেশ্য বিশ্বসত্তার উদ্দেশে। কখনও বা মানবীর মধ্যেই সেই অনন্তপ্রেম চরিতার্থ হয়েছে—

আজি সেই চিরদিবসের প্রেম
অবসান লভিয়াছে
রাশি রাশি হয়ে তোমার পায়ের কাছে।

আবার কখনও সেই অনির্দেশ্য নারীর জন্য শুধু কি আকুতি? অর্থহীন লক্ষ্যহীন বিষাদে কবি খিন্ন হয়েছেন। এই লক্ষ্যহীনতা ছবি ও গানে ছিল না। এই লক্ষ্যহীন আকুতিজনিত হাহাকার কড়ি ও কোমলের বিরোধী-ভাব। মানসী এই ভাবের উদ্বোধন ঘটিয়ে বাংলা কাব্যে রোম্যানটিকতার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করল।

মানসীর নারী-বন্দনা চিত্রা ও সোনার তরীতে ঘনীভূত হ'য়ে পুনরুক্ত হবে মাত্র। খেয়া থেকে নবীন পথ যাত্রা—তখন সেই সৌন্দর্য-লক্ষ্মী এক বৃহত্তর সত্তার মধ্যে বিলীন হ'য়ে যাবে। ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিকতা (নৈবেদ্যে যার শুরু) সৌন্দর্য-কৈবল্য-অনুভূতিকে গ্রাস করবে; পরে সত্তর বৎসরের তীরে এই সৌন্দর্য-লক্ষ্মী স্বমহিমায় পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে। 'পূরবী'তেই সে আবার আহ্বান জানিয়েছে—

দীপখানি তুলে ধরে, মুখে চেয়ে, ক্ষণকাল থামি
চিনেছে আমারে।
তারি সেই চাওয়া, সেই চেনার আলোকে দিয়ে আমি
চিনি আপনারে। —(আহ্বান)

সানাই, জন্মদিনে পর্যন্ত 'মানসীর' এই আহ্বান শোনা যাবে। অবশ্যই বয়সের প্রাজ্ঞতায় এ-আহ্বান অনেক শান্ত, কিন্তু বড়ই নিশ্চিত।

মানসীর কাব্য-ভাষা ও ছন্দ রবীন্দ্র কাব্য-কৃতির তুঙ্গ স্পর্শ করেছে। ভাবের পর্দার সঙ্গে মিলিত হয়েছে এ-ভাষা। তাঁর বলবার কথা আছে,—কিন্তু কথা বলবার আড়ম্বর নেই। উনবিংশ শতাব্দীর "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে!" বা "অকস্মাৎ কি অনল হৃদয়েতে জ্বলিল? অকস্মাৎ কেন মন বিষাদিত হইল?"—এর তুলনায় শুধু শব্দাড়ম্বর। অথচ শব্দের তাঁর অনটন নেই। পুরুষের পূর্বরাগের প্রথম প্রকাশের ভাষা দেখুন—

কী ললাট, কী নয়ন, কী শান্ত অধর! শুধু তিনটি 'কী'-এর সহযোগে কী অনির্বচনীয়তাই না ফুটল! অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয় 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতায়—

পবিত্র মুখ, মধুর মূর্তি
স্নিগ্ধ আনত আঁখি।

এ বর্ণনা ভাষার অধিক; এই প্রকার সুভাষিতাবলী অজস্র উৎকলিত করা যায়। কবি নানা ছন্দ ব্যবহার করেছেন—পায়ারেরই না কত রূপ আছে এখানে! অনন্তপ্রেমে পয়ারের যাদু স্পর্শগ্রাহ্য কিনা জানি না। তবু তুলে ধরি—

তোমারেই যে ভালবাসিয়াছি
শতরূপে শতবার

জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।
চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয়ে
গাঁথিয়াছে গীতহার—
কত রূপ ধ'রে পরেছ গলায়,
নিয়েছ সে উপহার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।

এ যেন দমকে দমকে হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদিত হচ্ছে। হৃদয়ের ভাষা ছন্দের অসমতায় তরঙ্গের আঘাত-ধ্বনি লুঠ করেছে। এবং সেই তরঙ্গ এক একটি ক'রে প্রণতি জানাতে চলেছে তার চিরকালের প্রেমিকার চরণে।

কড়ি ও কোমলে কবি সংহতি খুঁজেছিলেন—কারণ প্রশান্তির সঙ্গে তাই সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর এখানে খুঁজেছেন আকুলতা; কবিতার ছন্দে তাই বন্ধনমুক্তি।

যুক্তাক্ষরের মূল্য শুধু নয়, যুগ্মধ্বনির নতুন পরিচয়-উদঘাটন শুধু নয়, (যেমন বিরহানন্দে 'ছিলাম' চার মাত্রা), এক নতুন ছন্দ তিনি আবিষ্কার করলেন। ভিক্টর হুগো যেমন আলেকজান্দ্রিন-এর নিগড় ভেঙ্গে ফরাসী কাব্য-জগতে মহাবিপ্লব ঘটিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের এই ছন্দও তেমনি। সংস্কৃত অনুযায়ী মাত্রাবৃত্ত নয়, বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রতিভার উপর ভর ক'রে এই ছন্দ গঠিত হ'ল। ইংরাজীতে Iambic Pentameter, ফরাসী ভাষায় যেমন Alexandrine, বাংলা ভাষায়ও তেমনি চতুর্দশমাত্রক পয়ার জাতীয় ছন্দ। কিন্তু এই ছন্দকে কবি যখন মাত্রাবৃত্তের ধ্বনিতরঙ্গ দিয়ে অভিষিক্ত করলেন, তখন এর মধ্যে গুণগত পার্থক্য ঘটে গেল। ফরাসী ভাষায় যাকে বলে Enjambent—আঁজাঁবাঁ, বাংলা কাব্যে ও সেই আঁজাঁবাঁ সৃষ্টি হ'ল। চরণের উপর চরণ যেন আছড়ে পড়ছে, তাতেই এক অনন্য ধ্বনিতরঙ্গ উত্থিত হ'চ্ছে।

মেঘেতে দিন জড়ায়ে থাকে
মিলায়ে থাকে মাঠে—
পড়িয়া থাকে তরুর শিরে
কাঁপিতে থাকে নদীর নীরে
দাঁড়ায়ে থাকে দীর্ঘ-ছায়া
মেলিয়া ঘাটে বাটে। —(অপেক্ষা)

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "এই ছন্দ অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছন্দ। পয়ারের সহিত তুলনা করিলে বলিতে হয়, 'মাত্রাবৃত্ত' মেয়েলি ছন্দ, পয়ার যেন পুরুষালি ছন্দ।" (বাংলা ছন্দের মূল সূত্র—পৃ—১০২—১০৩) মানসীতে এই উক্তির অসারতার প্রমাণ আছে।

তুরঙ্গ সম অন্ধ নিয়তি
বন্ধন করি তায়
রশ্মি পাকড়ি আপনার করে
বিঘ্ন বিপদ লঙ্ঘন ক'রে
আপনার পথে ছুটাই তাহারে
প্রতিকূল ঘটনায়। (গুরুগোবিন্দ)

এই ছন্দ হেমচন্দ্রের ধারণার অগম্য। এই চলতা-ধর্ম রবীন্দ্রনাথের প্রথম সৃষ্টি। কত বিচিত্র স্তবক, কত বিচিত্র মিল, কত বিচিত্র অলঙ্কার ও শব্দ যে তিনি তৈরী করেছেন, তার হিসাব দিতে গেলে এক স্বতন্ত্র অধ্যায় হবে।

কড়ি ও কোমলে বাংলা গীতিকাব্য এই ভাষা প্রথম আস্বাদন করেছিল। কিন্তু সর্ব ইন্দ্রিয়ের গ্রহণ ক্ষমতার পরিচয় এখানে অধিকতর পাওয়া যাবে।

কড়ি ও কোমলে দৃষ্টি ও শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের উজ্জ্বল ব্যবহার আছে। এখানে ঘ্রাণেন্দ্রিয় পর্যন্ত ব্যবহৃত।

বনের পথে নদীর তীরে
অন্ধকারে বেড়াবে ধীরে
গন্ধটুকু সন্ধ্যাবায়ে
রেখার মত রাখি।
(—অপেক্ষা)

সর্ব-ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারে এ-কাব্যে কবি শুধু চিত্র সৃষ্টি করেন নি, স্থাপত্য রচনা করেছেন। কবি এখানে চিত্রকর নন, স্থপতি। সুন্দরকে তিনি সর্বদিক থেকে দেখেছেন—'dimension' কোনটিই বাদ যায় নি। তাই সুরদাসের প্রার্থনা থেকে শুরু ক'রে 'অহল্যার প্রতি' পর্যন্ত এত জীবন্ত মর্মর মূর্তির সমারোহ! গহন মনের প্রতি কোণেও অনুরূপ অন্বেষণ!

মানসীর ভাব ও ভাষা যেন কবির মানস-লক্ষ্মী অহল্যার মতই অনিন্দ্য কান্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে।

বিস্মৃতিসাগর-নীল নীরে
প্রথম উষার মতো উঠিয়াছ ধীরে।
তুমি বিশ্ব-পানে চেয়ে মানিছ বিস্ময় ;
বিশ্ব তোমা-পানে চেয়ে কথা নাহি কয় ;
দোঁহে মুখোমুখি। অপার রহস্যতীরে
চির পরিচয়-মাঝে নব পরিচয়।

বাংলা কাব্যের নবজন্ম সেদিন সম্পূর্ণ হ'য়ে গেল।

* * * *

ভিক্টর হুগো তাঁর 'ক্রমওয়েল' নাটকের ভূমিকায় বলেছেন, "The age of epic draws near its end. Like the society that it represents this form of poetry weaves itself out revolving upon itself."[২]

ভিক্টর হুগোর এই কথা এডগার এ্যালেন পো অধিকতর জোরের সঙ্গে বললেন, "I maintion that the phrase "a long poem" is simply a flat contradiction in terms.…If, at any time, any very long poem were popular, in reality, which I doubt, it is at least clear that no very long poem will ever be popular again."[৩]

এই নব্য কবিতার জয়যাত্রা সবার কাছে অভ্যর্থনা পায়নি। বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী পিটিরিম সোরোকিন এর মধ্যে সভ্যতার অবনতি লক্ষ্য করেছেন।[৪]

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখপরায়ণ সাহিত্য বাঙ্গালীর জাতিচরিত্রানুকারী। বঙ্কিমের পরলোক প্রাপ্তি ঘটে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ; মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্বে প্রকাশিত এই কাব্য-কীর্তি সম্বন্ধে তাঁর কি অভিমত ছিল, তা জানি না। সন্ধ্যাসঙ্গীতের মাল্যদান কাহিনী নিশ্চয়ই নতুন দৃষ্টির আত্মীয়তা।

হেমচন্দ্র[৫] বা নবীনচন্দ্র[৬] এই নবীন কাব্যের রসগ্রহণ করতে পারেন নি।

এবং গীতিকাব্যই যে এযুগের প্রধান সাহিত্য-বাহন, এ মতও তাঁরা অনুমোদন করতেন না।

রবীন্দ্রনাথের প্রসাদেই বাংলা সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যে উন্নীত হয়েছে। গীতিকাব্যই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ফসল। গীতিকাব্য এ-যুগের মুখ্য-বাহন।

পাদটীকা

১। জীবনস্মৃতি—পৃঃ ১৫১।

২। Preface to Cromwell—Victor Hugo. Harvard Classics, Vol—32, পৃঃ ৩৫৯।

৩। Complete Works of Edgar Allan Poe—পৃঃ—১০২১-১০২২।

৪। Social and Cultural Dynamics—Pitirim Sorokin—Vol. I—পৃ—৬৩৫।

৫। হেমচন্দ্র—মন্মথনাথ ঘোষ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ—৪১১-১২।

৬। আমার জীবন—নবীনচন্দ্র সেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

শতরূপা মানসী

মানসীর মূল চিন্তা

॥ ১ ॥

মানবজগৎ ও নিসর্গজগৎ—এই উভয় জগৎ মিলিয়েই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বচেতনা সম্পূর্ণ।

মানসীর অন্তর্জগতে এসে এই উভয় জগতের ঐক্য সাধিত হয়েছে।

মানসীর রূপ-কল্পনায় কবি এক অনন্য সৃষ্টিধর্মের পরিচয় দিয়েছেন।

অনাদিকাল থেকে নারী-শক্তি সৃষ্টির আদি প্রেরণারূপে কল্পিত। বাংলা সাহিত্যে এই নারীশক্তিকে ধরবার চেষ্টা অবিচ্ছিন্নভাবে চলেছে।

চর্যাপদের নৈরাত্ম দেবী 'অবাঙ্‌মানসগোচর'—'কাঅ বাকচিঅ জশু ন সমাই'। 'নিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দারী', 'সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাসুহে রাতি পোহাই।'

চর্যাপদের এই নারী-শক্তি তন্ত্রের বিকৃতির কবলে পড়েছিল। তাই সে শক্তি সাহিত্য-শুচিতা থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে সাধকের বিকৃত শব-সাধনার সঙ্গিনী হয়েছিল।

পরে বৈষ্ণব কবিদৃষ্টি তার দেহ মার্জনা করেছে। চন্দন-চর্চিত ক'রে, তিলক-সেবা ক'রে তাকে পবিত্র করেছে। এবং সে প্রেম "নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়।" মঙ্গলকাব্যে আছে শুধু ঐশ্বর্য্য, নৈকট্য নেই। উনিশ শতকে নারীজাতি সম্পর্কে নতুন ক'রে সম্ভ্রমবোধ দেখা দেয়; কিন্তু এই যুগেও শৌর্যময়ী রমণীই সর্বাধিক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। মাইকেলের তিলোত্তমাসম্ভব, বীরাঙ্গনা ও ব্রজাঙ্গনা কাব্যত্রয়ীতে মোহময়ী জীবন-চালিকা শক্তির অনুধ্যান ছিল; কিন্তু মাইকেলও নায়িকাকে 'বীরাঙ্গনা' না ব'লে তৃপ্ত হননি—যদিও 'বীরাঙ্গনা' শব্দের অর্থ বড়ই ব্যাপক। রঙ্গলালের পদ্মিনী একই গোত্রীয়া। তবে মাইকেলের সম্ভোগ-মূলক দৃষ্টির সঙ্গে রঙ্গলালের বিন্দুমাত্র

সন্ধি ছিল না। তাঁর দৃষ্টি নিতান্তই বন্দনাকারীর দৃষ্টি, পূজারীর দৃষ্টি। ঠিক একই প্রকার দৃষ্টি দেখা যায় বঙ্কিমের সংযুক্তা কবিতায়। ক্যালকাটা রিভিউএর সাহিত্য-সমালোচক এর প্রকৃতি ঠিকই অনুধাবন করেছিলেন; তিনি বলেছিলেন, "Sanjukta is the song of the representative Hindu woman—the woman that every Hindu woman might be—the woman that would gladly make a holocaust of herself at the altar of love & thus remain for countless ages the sweetest breath of ennobling inspiration to man and woman."[১]

বিহারীলাল ও সুরেন্দ্রনাথ নারী-শক্তিকে বিশ্বের মূলাধার ব'লে ধ'রে নিয়েছেন। এই প্রত্যয়ের বিশেষ মূল্য আছে সন্দেহ নেই। হেমচন্দ্রের নানা প্রেমমূলক কবিতায় নারীপ্রসঙ্গ আছে; কোথাও কোন স্বকীয় ধারণার তিনি পরিচয় দিতে পারেন নি। নবীনচন্দ্র নারীর মোহিনী রূপের বন্দনা গাইলেন, তাঁর ক্লিওপেট্রা সে-যুগের পটভূমিকায় বিশিষ্টা, সন্দেহ নেই। রোম্যানটিক নারী-বন্দনায় এ হ'ল নতুন দৃষ্টি। "Cleopatra was one of the first romantic incarnations of the type of Fatal women."[২]

কিন্তু নবীন সেন বিচলিতবোধে পীড়িত।

এই যুগের অন্যান্য কবিও নারীর এক বিশেষ রূপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র মিত্র, হরিশচন্দ্র নিয়োগী ও অধরলাল সেন নারী-রূপের এক বিশেষ দিক আলোকিত করে তুলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ একরকম সহসাই পৃথক অনুভূতিতে পদার্পণ করেছেন। কবি-কাহিনী, বনফুল, রুদ্রচণ্ড, ভগ্ন হৃদয়, শৈশব সঙ্গীতে বিপথে চলার চিহ্ন আছে।

অথচ কবির অন্বেষণ অবিচ্ছিন্নভাবে চলেছে। স্বদেশের বৈষ্ণব কবিতা, কালিদাস ও জয়দেবের কাব্য এ-ক্ষেত্রে যেমন তাঁর অন্তরকে জাগিয়ে তুলছে, তেমনি ঐ গুলির সঙ্গে বিদেশী উদাহরণও সহযোগিতা করছে। বিয়াত্রীচে ও দান্তে, পেত্রার্কা ও লরা, গ্যেটে ও তাঁর প্রণয়িনীগণ কবিকে ঐ উপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে সহায়তা করেছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ-শেলী-কীট্স্‌-টেনিসন ও ব্রাউনিং ছাড়াও গোতিয়ে, সুইনবর্ণ ও এডগার এ্যালেন পো তাঁকে এ ক্ষেত্রে পথের নিশানা দিয়েছেন। এমন কি অপেক্ষাকৃত অখ্যাত কবি আর্থার ও' শগ্‌নেসী তাঁর পথচলার সহযাত্রী হয়েছেন।[৩]

ও' শগনেসীর 'এপিক অব উইমেন'-এ পঞ্চনারী স্তুতি আছে—ইভ্,' হেফিষ্টাস-পত্নী, ক্লিওপেট্রা, স্যালোমি, হেলেন—এঁরা সবাই রহস্যময়ী। গোতিয়ে ও সুইনবর্ণ উভয়েই ক্লিওপেট্রাকে নতুন ক'রে তুলে ধরেছেন। সৌন্দর্য ও বিষাদ একত্রে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের মানসীর হৃদয়পটে এই শেষোক্ত কবিকুলের রহস্যময়তা জমাট বেঁধেছে।

এই যুগে একই সময়ে গ্যয়টের মানবীকরণ নীতি, উপনিষদ-কাণ্ট আলোচনা এবং সহবাসসম্মতি বয়সআইন (Age of Consent Act) আলোচিত ও গৃহীত হল—'মানসী'র প্রকাশনা মুহূর্তে এ-ঘটনাগুলির তাৎপর্য আছে।

॥ ২ ॥

রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা কাব্যে প্রকৃতি নিতান্ত প্রাণহীন প্রচ্ছদপট। কখনও কখনও সুদৃশ্য প্রচ্ছদপট—প্রতিমার চালচিত্রের মত। কিন্তু তার বেশী নয়। রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যাসঙ্গীত-পূর্ব কাব্যে প্রকৃতির স্বতন্ত্র সত্তা ধরা পড়েনি। বনফুল—কবিকাহিনী পর্যন্ত প্রকৃতি তাই হল শুধু সুন্দর প্রচ্ছদপট, জীবন্ত সঙ্গিনী নয়। সন্ধ্যাসঙ্গীতে এই যুগের অবসান চিহ্ন আছে; কারণ কবির "মরমের কাছে-আসা মানুষ" এখানেই প্রথম—

স্নেহময় ছায়াময় সন্ধ্যাসম আঁখি মেলি
একবার বুঝি হেসেছিলে।

ইতিপূর্বে প্রকৃতির মাঝে মানবী সত্তার অনুসন্ধান প্রয়াস থাকলেও স্বতন্ত্র তার রূপ নেই, রূপক হিসাবেই প্রকৃতি অধিকবার দেখা দিয়েছে।

প্রভাত সঙ্গীতে এই দোটানার ছেদ টানা হ'ল; এবং আকস্মিকভাবে। সত্যের আগমন সর্বদাই আকস্মিক। তার পদশব্দ শোনা যায়, পদচিহ্ন বিলুপ্ত চিরকাল।

ছবি ও গানে এবং কড়ি ও কোমলে প্রকৃতিবোধ ক্রমশই ঘণীভূত হয়েছে। পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় যত ব্যাপক ও নিবিড় হয়েছে, ততই এই বোধ স্পষ্টতর ও গভীরতর।

রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বড় ভূ-পর্যটক। পরবর্তী জীবনের প্রসঙ্গে বলছি না;

—কৈশোর ও যৌবনে তাঁর পর্যটন-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করলে এক বৃহৎ গ্রন্থ হ'য়ে পড়বে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়াও বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ তাঁর ঘটেছিল। এই সব পর্যটনের ফলে বিচিত্র পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় গভীর হয়েছে। পরিচয় ব্যতীত অন্তর-উপলব্ধি সম্ভব হয় না। মানসীর ভূমিকায় তার সাক্ষ্য আছে। "নূতন আবেষ্টনে এই কবিতাগুলি সহসা যেন নবদেহ ধারণ করল।"

বিশ্বপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববোধ। রবীন্দ্রনাথ শুধু পর্যটক নন। ভ্রমণ-কাহিনী ও বিদেশের বিবরণ পাঠেও তাঁর সমান কৌতূহল।

বিশাল বিশ্বের আয়োজন ;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণ বৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে—
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি!

॥ ৩ ॥

এখন কথা হচ্ছে এই প্রকৃতি-সচেতনতার প্রয়োজন কি?

"The longing of the modern man for nature is that of the sickman for health"—শিলারের এই উক্তিতে নবীন প্রকৃতি-প্রেমের একটা মূল কথা ব্যক্ত হয়েছে।

নব্য রোম্যানটিক আন্দোলনের শুরুতে শুধুই ছিল বিষাদ সুর। বিলেতে শিল্প বিপ্লবের প্রথম স্তরে নতুন যন্ত্রসভ্যতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে বিক্ষোভ ও বেদনা প্রকাশ পেয়েছিল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ-শেলী-কীটসের কাব্যে তার প্রতিধ্বনি আছে। ভারতে নতুন শিক্ষা-দীক্ষা-প্রাপ্ত অগ্রসরশীল সমাজ ইংরেজ শাসনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছিল না। তাই ছিল বিক্ষোভ ও হা হুতাশ। আমাদের গীতিকাব্যে তার অনুরণন উঠেছে। এই বিষাদ-ময়তা নিরাকরণের জন্য প্রকৃতির স্নেহস্পর্শের প্রয়োজন ছিল। "No movement has been so prolific of melancholy as emotional romanticism."[৪]

গ্যয়েটের 'ওয়ার্থার'-আখ্যায়িকায় এই দুঃখবাদের চরম প্রকাশ ছিল— সেখানে প্রকৃতি মানব অনুভূতির হাতে ক্রীড়নক হয়েছে। সেই উক্তি "A great soul must contain more grief than a small one"—এই দুঃখবাদের তত্ত্বগত ভিত্তি রচনা করেছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে এই দুঃখবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। পরবর্তী জীবনে গ্যয়টেই এই সাহিত্যকে 'হাসপাতালের কাব্য' ব'লে নিন্দিত করেছিলেন।

এক্ষেত্রে রুশোর জীবনবেদ ও প্রকৃতিবোধ তদানীন্তন কাব্যধারাকে রক্ষা করেছে। Cassirer বলেছেন, "Rousseau's love of Nature is not a retrospective elegy, but a prospective Prophecy."[৫]

ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নব্য রোম্যানটিক কাব্য শুধু দুঃখের মড়া-কান্নায় প্রকম্পিত নয়, আনন্দের করতালিতে প্রতিধ্বনিত। ওয়ার্ডসওয়ার্থের চোখে প্রকৃতি তাই সামঞ্জস্য ও ঐক্যের প্রতীক; শান্তি ও করুণার পীঠভূমি। শেলীর মানস-জীবনে গডুইনের প্রভাবের সঙ্গে প্লেটো ও প্লটিনাসের প্রভাবও ছিল। তাঁর 'এপিসাইকিডিয়ন' ভাববাদে উদ্বুদ্ধ।[৬] কার্লাইল-ফিক্টে-নোভালিস সবাই শুধু প্রকৃতির কল্যাণ হস্ত প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রকৃতি কল্যাণময়ী হয়েছে, কারণ সে ঐশীশক্তিসম্পন্ন। পাশ্চাত্য সাহিত্য এই উপলব্ধির পিছনে প্লেটো, প্লটিনাস, স্পিনোজা, লাইবনিজ, রুশো ও কান্টের সহযোগিতা রয়েছে।

বাংলা দেশে অন্তঃধর্মের উন্মেষে এঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন উপনিষদ ও বেদান্তের দার্শনিকগণ। ইতিপূর্বে আমরা অন্তঃধর্মের উন্মেষের ইতিহাস বর্ণনা করেছি।

॥ ৪ ॥

ইন্দ্রিয়-চেতনা

প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের এই পরিচয় ঘটে কি ক'রে? রুশো বলেছিলেন, "Our senses are our guides." (Emile- পৃ—১৬৩)

কীট্‌স এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "He describes what he sees—I describe what I imagine. Mine is the hardest task."

তাই বলে কবি আত্মজীবনীও লিখতে বসেন না; তিনি শুধু আপন

সত্তার কিয়দংশ তার মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে দেন। এখানে শুধু উপলব্ধি নয়, মননও রয়েছে; তবে মননের চিহ্ন মুছে দেওয়া।

মানসীতে কবি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বিচরণ-পথ উন্মুক্ত ও বাধাশূন্য ক'রে দিয়েছেন। মানব জগৎ ও নিসর্গ-জগতের বিবিধ সৌন্দর্য এই ইন্দ্রিয়পথে কবির মনোজগতে প্রবেশ করেছে। কবি এগুলি থেকেই তাঁর "মানসী প্রতিমা" গ'ড়ে তুলেছেন, এবং গ'ড়ে তুলেছেন আশা ভাষা এবং ভালোবাসা দিয়ে। মানসী প্রতিমা গঠনে ভাষার প্রসঙ্গ উচ্চারণ করেছেন। আমরা ভাষার সমুদ্রতীর থেকেই অজস্র বাক-প্রতিমার ঝিনুক কুড়িয়ে নিতে পারি। এবং এই বাক্-প্রতিমাগুলি ইন্দ্রিয়ের নানাপথে এসেছে। মজা হচ্ছে এই যে অনেক সময় যার যে-পথে আশা উচিত সেটি সে-পথে আসেনি। যেমন দৃষ্টি এসেছে কর্ণপথে, গন্ধ নাসিকার গলিতে না ঢুকে ত্বকের তীর্থ ঘুরে এসেছে। কবি তো ব'লে খালাস—

এই বাতাসে ফুলের বাসে
মুখখানি কার পড়ে মনে,
মনে হয় কার মনের বেদন
কেঁদে বেড়ায় বাঁশির গানে

(কড়ি ও কোমল-সারা বেলা)

অথবা

বনফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায়—
বঁধুর হাসি মধুর গানে প্রাণের পানে ভেসে যায়।

(কড়ি ও কোমল—বাঁশি)

এ তো কবির সচেতন বাসা-বদলের ঘোষণা। কবির এইরূপ সচেতন আত্ম ঘোষণার প্রশ্রয় না পেয়ে এক ইন্দ্রিয়জ ধারণা স্বতঃই অন্য ইন্দ্রিয়জ ধারণায় যখন গড়িয়ে যায়, তখন সেগুলিই গভীর বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

মনোবিজ্ঞানে কি এই ধরণের বাসা-বদলের সমর্থন আছে? স্নায়ুতন্ত্র আমাদের ইন্দ্রিয়বেদন বহন করে। এই স্নায়ুকোষ শারীরবৃত্তীয়ভাবে (Physiologically) পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, শারীরস্থানিকভাবে (Anatomically) যুক্ত নয়, বরং বিশ্লিষ্ট। তবু এই স্নায়ুকোষপ্রবাহ একে অপরের

উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। এ বিষয়ে মুলার, গালাজি, ওয়ার্থীমার, হিনশেলউড, ওয়ালডেয়ার, শেরিংটন ও ক্যাননা বহু গবেষণা চালিয়েছেন। তাঁদের গবেষণা থেকে এইটুকু তথ্য আজ বেরিয়ে এসেছে যে স্নায়ুকোষগুলি শারীরস্থানিকভাবে স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও শারীরবৃত্তীয়ভাবে দুইটি বা একাধিক কোষের মিলনকেন্দ্রে (যাকে ইংরেজিতে বলে 'Synapse') পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত।[৭]

Synapse-এর সংজ্ঞা জেমস ড্রিভার এইভাবে দিয়েছেন: "the region where processes of two neurons come into close contiguity, and the nervous impulse passes from the one to the other."[৮]

প্রখ্যাত শিক্ষামনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেমস্ এবিষয়ে বহু পর্যালোচনা ক'রে বলেছেন যে, একটি স্নায়ুকোষ অপর একটি স্নায়ুকোষের উপর প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে; তাদের পরস্পরের মধ্যে একটি সম্পর্ক, যোগসূত্র স্থাপিত হয়, এবং এই যোগসূত্রের ফলেই পরবর্তীকালে একের অভিজ্ঞতা নিয়ে অন্য ইন্দ্রিয়গ্রাম স্মৃতিচারণ করতে পারে। ইংরেজিতে এই মানসিক প্রতিক্রিয়াকে বলে 'Synaesthesia'। মস্তিষ্ক বা মননক্ষমতা এগুলির মধ্যে একটি বিশেষ pattern বা ছাঁদ তৈরি করে।

এ ত গেল বাস্তব স্থূল ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা। কল্পনার সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়বেদী অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে এই ধরণের রূপান্তর আরও বেশি। সাহিত্যের ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা শারীরনির্ভর-ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা নয়, এ হ'ল কল্পনাগম্য ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়বোধঃ।

রবীন্দ্রনাথের ইন্দ্রিয়বেদিতা কল্পনাগম্য ইন্দ্রিয়বেদিতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিত্রধর্মী; চক্ষু-পথের পদাতিক।

রূপ-জগৎ

মানসীর জগৎ নানা ইন্দ্রিয়ানুভূতির জগৎ। এমন সচেতন স্ববশ ইন্দ্রিয়-চেতনা খুব কম কাব্যেই পরিলক্ষিত হয়। রুশো চেয়েছিলেন—সর্ব ইন্দ্রিয়ের সম্যক স্ফুরণ, রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন—

তৃষিত পরাণ আজি কাঁদিছে কাতরে
তোমারে সর্বাঙ্গে দিয়ে করিতে দর্শন।

(কড়ি ও কোমল—দেহের মিলন)

যা জীবন্ত, তাকে ত তিনি সর্বাঙ্গ দিয়ে সন্দর্শন করেইছেন। যা জীবন্ত নয়, তাকেও তিনি জীবন্ত ক'রে নিয়ে অনুরূপভাবে উপভোগ করেছেন। ব্যক্তিচেতনার আরোপে বহু নতুন ইন্দ্রিয়গম্য মহল্লার হয়েছে পত্তন। এই ব্যক্তি-চেতনার আরোপ আর রূপক রচনা এক কথা নয়, Allegory হল তত্ত্ব বা তথ্য বহনের আধার মাত্র; তার স্বতন্ত্র কোন জীবন বা প্রাণ নেই, কিন্তু Personification-এর ফলে উদ্দিষ্ট অলংকার আমাদের সাহিত্যভূমির এক স্বাধীন সজীব নাগরিক হয়ে ওঠে; 'শো-কেসে'র সযত্নরক্ষিত পুত্তলিকা মাত্র থাকেনা। সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রার্থিতাকে কবি দেখতে চেয়েছেন, পঞ্চেন্দ্রিয় সেই সর্বদেহের পঞ্চদূত। এই দূতের ভাষায় যে অলংকার রচিত হয়েছে, সে শুধু অলংকার নয়। অলংকার সর্বদাই কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ সৃজন করবে, এমন কোন কথা নেই। শুধুমাত্র তথ্যও পরিবেশন করতে পারে। যেমন মাইকেল যখন লেখেন—"হৈমবতী যথা
নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে।" (মেঘনাদবধ কাব্য—৩।১২৯)
তখন একটি তথ্যই মাত্র পরিবেশিত হল—সমধর্মী ঘটনার প্রবর্তনায় মূল ঘটনা অধিকতর বাস্তব হ'ল। আর রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন—

আমা-পানে চাহিয়ে তোমার
আঁখিতে কাঁপিত প্রাণখানি। (মানসী—নারীর উক্তি)

তখন এ তো তথ্য মাত্র নয়। শুধু বিষয়ের রং চড়ানোর জন্য অবতারণা করা হয়নি। প্রথম প্রণয়ের সন্ত্রস্ত ভাব 'কাঁপা' শব্দের মধ্যে কাঁপছে, এবং আগামী কালেও কাঁপবে। মাইকেল জগতের নানা বিষয়ে কৌতূহল পোষণ করেছেন, সেখান থেকে তিনি তাঁর কাব্যের অলংকার সংগ্রহ করেছেন। সে অলংকারে তাঁর সৃষ্ট প্রতিমা সুন্দরতর হয়েছে সন্দেহ নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নতুন ভুবন তৈরি করেছেন, বাস্তব ভুবনের প্রতিদ্বন্দ্বী, যদিও বাস্তব ভুবনের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে। রবীন্দ্রনাথের অলংকার ধীরে ধীরে বিগ্রহ হ'য়ে পড়ে। বিগ্রহ বা Image ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকে উপজাত। মাইকেলের ভাষা, অলংকারবহুল, যাকে ইংরেজিতে বলে 'metaphorical', আর রবীন্দ্রনাথের ভাষা ইন্দ্রিয়বেদ্য (sensuous)।

দৃষ্টি-জগৎ

১। সন্ধ্যানত আঁখি
ধীরে আসে দিবার পশ্চাতে। (নিষ্ফল কামনা)

২। ওই নয়নের
নিবিড় তিমির তলে, কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্য-শিখা। (ঐ)

৩। বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী। (একাল ও সেকাল)

৪। বচনে পড়িতে নীল জলদের ছায় (আকাঙ্ক্ষা)

৫। দাঁড়াস্ আকাশ তলে
জ্বালাইয়া শতলক্ষ
নক্ষত্র-কিরণ (প্রকৃতির প্রতি)

৬। কোথাও বা খেলা কর বালিকার মতে
উড়ে কেশবেশ— (ঐ)

৭। কালস্রোতে যথা ভেসে যায়
অলস ভাবনাখানি আধো জাগা মনে। (মরণ স্বপ্ন)

৮। নিদ্রা পারাবার যেন স্বপ্ন চঞ্চলিত। (ঐ)

৯। বিশ্ব নিবু নিবু যেন দীপ তৈলহীন। (ঐ)

১০। ছায়ার কুটিরখানা দুধারে বিছায়ে ডানা
পক্ষীসম করিছে বিরাজ। (কুহুধ্বনি)

১১। বাহবা যে জন চায় বসে থাক চৌমাথায়
নাচুক তৃণের প্রায় পথিকের স্রোতে। (পত্র)

১২। তীক্ষ্ণ শ্বেত রুদ্র হাসি জড় প্রকৃতির। (সিন্ধুতরঙ্গ)

১৩। নীলমৃত্যু মহাক্রোশে শ্বেত হয়ে ওঠে। (ঐ)

১৪। কেবল জগৎটাকে জড়ায়ে সহস্র পাকে
গবর্মেণ্ট পড়ে থাকে বিরাট বিপুল। (শ্রাবণের পত্র)

১৫। আমা-পানে চাহিয়ে তোমার
আঁখিতে কাঁপিত প্রাণখানি। (নারীর উক্তি)

১৬। নিদ্রালস আঁখি সম ধীরে যদি মুদে আসে
এ শ্রান্ত জীবন। (শ্রান্তি)

১৭। চারিদিকে শস্যরাশি চিত্রসম স্থির,
প্রান্তে নীল নদীরেখা, দূর পরপারে
শুভ্র চর, আরো দূর বনের তিমির
দহিতেছে অগ্নিদীপ্তি দিগন্ত-মাঝারে। (বিচ্ছেদ)

১৮। অমনি চারিধারে নয়ন উঁকি মারে
শাসন ছুটে আসে ঝটিকা-তুলি (বধূ)

১৯। লুকানো প্রাণের প্রেম পবিত্র কত সে !
আঁধার হৃদয়তলে মানিকের মত জ্বলে
আলোতে দেখায় কালো কলঙ্কের মতো। (ব্যক্ত প্রেম)

২০। বনের ভালবাসা আঁধারে বসি
কুসুমে আপনারে বিকাশে।

২১। নিবিড় ঘন বনের রেখা
আকাশ শেষে যেতেছে দেখ
নিদ্রালস আঁখির পরে
ভুরুর মতো কালো। (অপেক্ষা)

২২। দুদিক হতে দুজনে যেন
বহিয়া খরধারে
আসিতেছিল দোঁহার পানে
ব্যাকুলগতি ব্যগ্রপ্রাণে,
সহসা এসে মিশিয়া গেল
নিশীথপারাবারে। (ঐ)

২৩। বিমলহৃদয়-আরশিখানিতে
চিহ্ন কিছু কি পড়েছিল এসে
নিশ্বাসরেখাছায়া। (সুরদাসের প্রার্থনা)

২৪। আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত—
প্রভাতরশ্মিসম।
লও, বিঁধে দাও বাসনাসঘন
এ কালো নয়ন মম। (ঐ)

২৫। তিমিরতুলিকা বুলাইয়া দাও
আকাশচিত্রপটে। (ঐ)

২৬। মেঘের আলোক লভিছে বিরাম
নিবিড়তিমির কেশে। (ঐ)

২৭। নয়ন কোণের চাহনি ছুরিতে
মর্মতন্তু টুটে। (নিন্দুকের প্রতি)

২৮। প্রকৃতি শান্ত মুখে ছুটায় গগন-বুকে
গ্রহতারাময় তার রথ। (কবির প্রতি নিবেদন)

২৯। দেয় চরণে বাঁধিয়া প্রেম-বাহু-ঘেরা
অশ্রুকোমল শিকলি। (ভৈরবী গান)

৩০। পথে রাক্ষসী সেই তিমিররজনী
না জানি কোথায় নিবসে। (ঐ)

৩১। উদয়শিখরে সূর্যের মতো
সমস্ত প্রাণ মম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষনিহত
একটি নয়ন সম। (ধ্যান)

৩২। অঞ্চল মাঝে ঢাকিব তোমায়
নিশীথনিবিড় চুলে। (ভালো করে বলে যাও)

৩৩। শ্রাবণে জাহ্নবী যথা যায় প্রবাহিয়া
টানি লয়ে দিশ-দিশান্তের বারিধারা
মহাসমুদ্রের মাঝে হতে দিশাহারা। (মেঘদূত)

৩৪। স্ফীত করি স্রোতোবেগ তোমার ছন্দের
বর্ষাতরঙ্গিনী সম। (ঐ)

৩৫। বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিঁড়ি মেঘভার
খরতর বক্রহাসি শূন্যে বরষিয়া। (ঐ)

৩৬। শয্যাপ্রান্তে লীনতনু ক্ষীণ শশীরেখা
পূর্বগগনের মূলে যেন অস্তপ্রায়। (ঐ)

৩৭। প্রান্তরের শেষে
কেঁদে চলিয়াছে বায়ু অকূল-উদ্দেশে। (ঐ)

৩৮। জীবন উৎসাহ
ছুটিত সহস্রপথে মরুদিগ্বিজয়ে
সহস্র আকারে। (অহল্যার প্রতি)

৩৯। যেথায় অনন্তকাল ঘুমায় নির্ভয়ে
লক্ষ জীবনের ক্লান্তি ধূলির শয্যায়। (ঐ)

৪০। যে শিশির পড়েছিল তোমার পাষাণে
রাত্রিবেলা এখন সে কাঁপিছে উল্লাসে
অজানুচুম্বিত মুক্ত কৃষ্ণ কেশপাশে। (অহল্যার প্রতি)

৪১। সারাদিন ভেসে
মেঘখণ্ড যথা রজনীর তীরে এসে
দাঁড়ায় থমকি। (বিদায়)

৪২। যে অমর অশ্রুবিন্দু সন্ধ্যাতারকার
বিষণ্ণ আকার ধরি উদিবে তোমার
নিদ্রাতুর আঁখি-'পরে। (ঐ)

৪৩। বিরহী পাখির প্রায় অজানা কানন-ছায়
উড়িয়া বেড়াক সদা হৃদয়ের কাতরতা। (মৌন ভাষা)

৪৪। লোকের প্রবাহ ফেনায়ে ফেনায়ে
গরজিছে দুই ধারে। (গুরু গোবিন্দ)

৪৫। হীরকের সূচিমুখ শতবার ঘুরি
হানিতে লাগিল শত আলোকের ছুরি। (নিষ্ফল উপহার)

৪৬। আগ্রহে যেন তার প্রাণমন কায়
একখানি বাহু হয়ে ধরিবারে যায়। (ঐ)

৪৭। কালো জল চুপে চুপে বহিল গোপন
ছলভরা সুগভীর চুরির মতন। (ঐ)

৪৮। তুমি কি করেছ মনে দেখেছ পেয়েছ তুমি
সীমারেখা মম ?
ফেলিয়া দিয়াছ মোরে আদি অন্ত শেষ ক'রে
পড়া পুঁথি-সম ? (আমার সুখ)

ঘ্রাণ-জগৎ

৪৯। গন্ধটুকু সন্ধ্যাবায়ে রেখার মত রাখি। (অপেক্ষা)

৫০। তাদের শিথিল অঙ্গ, সুষুপ্ত নিশ্বাস
বিভোর করিয়া দিত ধরণীর বুক। (অহল্যার প্রতি)

৫১। কেতকী শিহরি উঠে করে না আকুল। (শ্রাবণের পত্র)

৫২। ভ্রমর যেমন থাকে কমলশয়নে,
সৌরভসদনে, কারো পথ নাহি চায়,
পদশব্দ নাহি গণে, কথা নাহি শোনে.
তেমনি হইব মগ্ন পবিত্র মায়ায়। (নিভৃত আশ্রম)

৫৩। সুগভীর কলধ্বনিময়
এ বিশ্বের রহস্য অকূল—
মাঝে তুমি শতদল ফুটেছিল ঢল ঢল,
তীরে আমি দাঁড়াইয়া সৌরভে আকুল। (পুরুষের উক্তি)

৫৪। কুসুম কাননে বেড়াই ফিরিয়া
যেন বিভোরের মতো। (সুরদাসের প্রার্থনা)

স্বাদ-জগৎ

৫৫। কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে (বর্ষার দিনে)

৫৬। অপূর্ব অমৃত-পানে অনন্ত নবীন (সিন্ধুতরঙ্গ)

৫৭। প্রকৃতির শান্তি আজি করিতেছি পান
চিরস্রোত সান্ত্বনার ধারা। (জীবন মধ্যাহ্ন)

৫৮। শূন্য ব্যোম অপরিমাণ
মদ্যসম করিতে পান (দুরন্ত আশা)

৫৯। এক কথাগুলি চাখিয়া চাখিয়া
সুখে পাঠ করি থাকিয়া থাকিয়া
পড়ে কত হয় শেখা। (বঙ্গবীর)

শ্রুতি-জগৎ

৬০। স্বর শুনে আর উতলা হৃদয়
উথলি উঠে না সারা দেহময়। (ভুলভাঙা)

৬১। আপন গর্জনে বিশ্ব আপনারে করিছে বধির। (নিষ্ঠুর সৃষ্টি)

৬২। আপনার প্রস্ফুটিত তনুর উল্লাস। (নিষ্ফল প্রয়াস)

৬৩। আঁখিতে শুনিতে যেন হৃদয়ের কথা। (নারীর উক্তি)

৬৪। মর্মে যবে মত্ত আশা
সর্পসম ফোঁসে। (দুরন্ত আশা)

৬৫। দূর হতে যেন ফুঁসিছে সবেগে
উপেক্ষা রাশি রাশি। (নিন্দুকের প্রতি)

৬৬। মাঝে গহ্বর, তাহে পশি জলধার
ছলছল করতালি দেয় অনিবার। (নিষ্ফল উপহার)

৬৭। হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব (বর্ষার দিনে)

৬৮। মেঘমন্দ্র শ্লোক
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক
রাখিয়াছে আপন আঁধার স্তরে স্তরে
সঘন সংগীত-মাঝে পুঞ্জীভূত করে। (মেঘদূত)

৬৯। সে সবার কণ্ঠস্বর কর্ণে আসে মম
সমুদ্রের তরঙ্গের কলধ্বনি-সম
তব কাব্য হতে। (ঐ)

৭০। দুরন্ত সাধ কাতর বেদনা
ফুকারিয়া উভরায়
আঁধার হইতে আঁধারে ছুটিয়া যায়। (উচ্ছৃঙ্খল)

৭১। এই অরণ্যের তলে কানাকানি জলেস্থলে (মৌনভাষা)

৭২। নিশীথের কণ্ঠ দিয়ে কথা হবে দুজনার (ঐ)

৭৩। বনের উতলরোল আসে দূর হতে। (আকাঙ্ক্ষা)

৭৪। পরিপূর্ণসুধাস্বর
পরিস্ফুট পুষ্পটির মতো। (কুহুধ্বনি)

৭৫। লাবণ্য তরঙ্গভঙ্গ গতির উচ্ছ্বাস (নিষ্ফল প্রয়াস)

৭৬। গঞ্জনা দেয় তরবারি যেন
কোষ মাঝে ঝন্ ঝন্। (গুরুগোবিন্দ)

৭৭। সিন্ধু-মাঝারে মিশিছে যেমন
পঞ্চনদীর জল—
আহ্বান শুনে কে কারে থামায়,
ভক্তহৃদয় মিলিছে আমায়,
পঞ্জাব জুড়ি উঠিছে জাগিয়া
উন্মাদ কোলাহল। (ঐ)

স্পর্শ-জগৎ

৭৮। চাঁপা কোথা হতে এনেছে ধরিয়া
অরুণকিরণ কোমল করিয়া, (ভুলে)

৭৯। বর্ণন-অতীত যত অস্ফুট বচন—
নির্জন ফেলিত ছেয়ে মেঘের মতন। (আকাঙ্ক্ষা)

৮০। বাঁকা পথ শুষ্ক তপ্তকায়া। (কুহুধ্বনি)

৮১। তাহার সৌন্দর্য লয়ে আনন্দে মাখিয়া
পূর্ণ করিবারে চাহি মোর দেহখানি, (হৃদয়ের ধন)

৮২। নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া (ঐ)

৮৩। দেবতারে ভেঙ্গে ভেঙ্গে করেছি খেলনা (পুরুষের উক্তি)

৮৪। স্মৃতি শুধু স্নেহ বয়ে তুহুঁ করস্পর্শ লয়ে
অক্ষরের মালা হয়ে বাঁধে দুজনারে। (পত্রের প্রত্যাশা)

৮৫। সিক্তবাস লিপ্ত দেহে—
যৌবন-লাবণ্য যেন
লইতে চাহে কেড়ে। (অপেক্ষা)

৮৬। আয় না ভাই, বিরোধ ভুলি
কেনরে মিছে লাথিয়ে তুলি
পথের যত মতের ধুলি
আকাশ-পরিমাণ। (দেশের উন্নতি)

৮৭। আকাশ আমারে আকুলিয়া ধরে, (সুরদাসের প্রার্থনা)

৮৮। কেমনে না জানি জ্যোৎস্নাপ্রবাহ
সর্বশরীরে পশে। (ঐ)

৮৯। হৃদয়ের স্রোত উঠি গোপন আলয় টুটি
দূর দূর করিছে মগন। (কবির প্রতি নিবেদন)

৯০। শৈশবকুঁড়ি ছিঁড়িয়া বাহির
করি যৌবনমধু। (পরিত্যক্ত)

৯১। ধীরে সারাদেহ যেন মুদিয়া আসিছে
স্বপ্নপাখির পালকে। (ভৈরবী গান)

৯২। কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব। (বর্ষার দিনে)

৯৩। আর্দ্র করি তোমার উদার শ্লোকরাশি (মেঘদূত)

৯৪। যেদিন বহিত নব বসন্তসমীর
ধরণীর সর্বাঙ্গের পুলকপ্রবাহ
স্পর্শ কি করিত তোরে ? (অহল্যার প্রতি)

৯৫। ঘুমাত অসংখ্য জীব—জাগিত আকাশ—
তাদের শিথিল অঙ্গ, সুষুপ্ত নিশ্বাস
বিভোর করিয়া দিত ধরণীর বুক। (ঐ)

৯৬। লগ্ন হয়ে আছে তব নগ্ন গৌর দেহে
মাতৃদত্ত বস্ত্রখানি সুকোমল স্নেহে। (ঐ)

৯৭। রাখো এ কপোলে মম নিদ্রার আবেশ-সম
হিমস্নিগ্ধ করতলখানি। (সন্ধ্যায়)

৯৮। চারিদিক হতে অমর জীবন
বিন্দু বিন্দু করি আহরণ (গুরুগোবিন্দ)

৯৯। স্থির থাকো তুমি, থাকো তুমি জাগি
প্রদীপের মতো আলস তেয়াগি। (ঐ)

১০০। আমি কুন্তল দিব খুলে।
অঞ্চল মাঝে ঢাকিব তোমায়
নিশীথনিবিড় চুলে। (ভালো করে বলে যাও)

॥ ৫ ॥

রবীন্দ্রনাথের এই উপমা-উৎপ্রেক্ষা প্রচলিত অলংকার নয়; এতদিন অলংকার স্পষ্ট ক'রে বলত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাক-প্রতিমা শুধু ইঙ্গিত করে, কিছুই স্পষ্ট করে না। যুক্তির জোয়াল কাঁধে নিয়ে এই জমিতে নামা যাবে না। ব্যাকরণবিদ্ ইচ্ছা করলেই ভুল ধরতে পারেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন—

কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব।

ব্যাকরণে এ ভাষার হদিশ মিলবে না, কিন্তু পাঠকের হৃদয় নিত্যকাল ব্যাকরণ থেকে উদার। এই উদ্ধৃত অংশে দৃষ্টি স্বাদ স্পর্শ এবং কিছুটা শ্রুতি ও

এসে সখ্য করেছে; কারণ 'অনুভব' শব্দটি ধ্বনিগতভাবে বুকের টিপটিপানি ধরবার চেষ্টা করেছে। একত্রে এত বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-চেতনার সংমিশ্রণ ইতিপূর্বে লিখিত কোন কবির (মাইকেলসহ) কাব্যে ছিল না। বাংলা কাব্যে আত্ম-মুখীনতা এই ভাষার মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত হ'ল। এক ইন্দ্রিয় অন্যের রাজ্য গ্রাস করেছে। সংখ্যার দিক থেকে শ্রবণ, স্বাদ ও ধ্বনিজগৎ অনেক ক্ষুদ্র। এখানেও সেই কোন কোন ইন্দ্রিয়ের তিমিঙ্গিল-নীতি। 'কড়ি ও কোমল' অপেক্ষা 'মানসী'তে স্পর্শ-গ্রাহ্যতা কম; দেহসম্ভোগ এ-কাব্যের প্রতিপাদ্য নয়; তাই এখানে চক্ষু কর্ণ নাসিকারই প্রাধান্য, স্বাদ ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের নয়। চক্ষু কর্ণ নাসিকা হল 'distant receptors'।[৯] স্পর্শের কবলে পড়ে স্বাদের নৈপুণ্য প্রকাশের সুযোগ ঢাকা পড়ে গেছে। তেমনি শ্রবণের রাজ্যসীমা নিতান্তই সীমিত হয়েছে, তার কারণ সমগ্র কাব্যে ছন্দ ও ভাষার সঙ্গীত-মাধুরিমা এতই তোড়ে ব'য়ে চলেছে যে অলংকারের ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহার নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। ভিক্তর হুগোর সমালোচনা-প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক বলেছিলেন যে ভাষার ও ছন্দের এই অসাধারণ গীতি-সুধারসের জন্যই তাঁর কাব্যে বাক-প্রতিমার এত ছড়াছড়ি, কারণ ছন্দের এই উত্তেজিত কলরব উত্তেজিত ভাষার প্রসাদ ভিক্ষা করবেই। আবার ছন্দেরও এই ঝঙ্কার-অনন্যতা কবির মানস-জগতের প্রবল আলোড়নহেতু। মানসীকাব্যে বাক-প্রতিমার প্রাচুর্য ছন্দ-সুধারসের নিমিত্ত—একথা যদি কেউ বলেন, আমরা তার প্রতিবাদ করবার সঙ্গত কারণ আছে ব'লে মনে করি না।

দৃষ্টি-জগৎই রবীন্দ্রনাথের প্রধান জগৎ। বাক-প্রতিমার জগতে রবীন্দ্রনাথের প্রধান শিল্প চিত্র; এবং প্রধান ইন্দ্রিয় চক্ষু। (শেষ জীবনের প্রধান শিল্প তাই কি চিত্র?) এই চিত্রও নানা জাতের; কোনটি শুধুই চিত্র, এবং স্থির চিত্র।

ম্লান আলো শুয়ে আছে বালুকার তীরে; (পত্রের প্রত্যাশা)

কোনটি অতি স্থির—

দাঁড়ায়ে রয়েছে গিরি আপনার ছায়ে
পথহীন, জনহীন, শব্দবিহীন। (নিষ্ফল উপহার)

কোন কোনটি চিত্র নয়, চলচ্চিত্র—

ছায়ার মতন ভেসে যায়
দরশন পরশন (মায়া)

মোহচঞ্চল সে লালসা মম
কৃষ্ণবরণ ভ্রমরের সম
ফিরিতেছিল কি গুণগুণ কেঁদে
তোমার দৃষ্টিপথে? (সুরদাসের প্রার্থনা)

দীপশিখা সম কাঁদে ভীত ভালোবাসা। (সিন্ধুতরঙ্গ)

বরষার নির্ঝরে অঙ্কিত কায়।
দুই তীরে গিরিমালা কতদূর যায়। (নিষ্ফল উপহার)

মাঝেমাঝে শাল তাল রয়েছে দাঁড়ায়ে
মেঘেরে ডাকিছে গিরি হস্ত বাড়ায়ে। (ঐ)

দুরন্ত পবন অতি, আক্রমণে তার
অরণ্য উদ্যত বাহু করে হাহাকার। (মেঘদূত)

আর চলা ও না-চলার সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে রয়েছে,—এমনতর উদাহরণও আছে—

স্থির তারা, নিশিদিন তবু যেন চলে—
চলা যেন বাঁধা আছে, অচল শিকলে। (নিষ্ফল উপহার)

এই বাক-প্রতিমাগুলি বিশ্লেষণ করলে আরও একটি তথ্য বেরিয়ে আসে। সব কয়টি বাক-প্রতিমায় বাঙ্‌লাদেশ আসন ক'রে বসেছে। কবি সেই-যে গেয়েছিলেন—

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে
বাজায় বাঁশি॥

এই বাক-প্রতিমাগুলি যেন তাঁর সেই ভালোবাসার পাদটীকা (footnote); তবে টীকা মূলের উপর টেক্কা দিয়ে গেছে। সেই-যে চর্যাপদে বাঙলার আকাশ-মাটি-জল বাংলা কাব্যলক্ষ্মীর ললাটে প্রথম প্রেমের টিকা পরিয়ে দিয়েছিল, সে

টিকা আর কেউ মুছতে পারেনি। বরং তাই অধিকতর স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। আকাশ-মাটি-জলের মধ্যে কবির কিন্তু বিষয় বিশেষের ওপর একটু পক্ষপাতিত্ব আছে।

তাঁর বাক-প্রতিমায় জলের কল্লোল বা সজলতাই অধিক। সম্ভবতঃ প্রবহমানতা ও গতির প্রতি কবির ভালোবাসা এই জল-জগৎ থেকেই উপজাত। এই জগৎ কালক্রমে গভীরতর এবং খরতর হবে। 'বলাকা'য় এসে কবির তাই হঠাৎ-আবিষ্কৃত কোন নতুন মন্ত্রের সিদ্ধি ঘটেনি।

॥ ৬ ॥

সাধারণতঃ বাকপ্রতিমা ব্যবহারে কয়েকটি সুস্পষ্ট বিধি দেখা যায়। কথিত বিষয়কে সুন্দরতর করার জন্য অলঙ্কার ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাকপ্রতিমা যেন বিষয়ের মজ্জায় অনুপ্রবেশ ক'রে তাকে সুন্দর শুধু নয়, স্পষ্ট এবং সম্পূর্ণ ক'রে দেয়। বাক-প্রতিমাই বক্তব্যের ভিত্তিস্বরূপ।

দুই একটি কবিতা বিশ্লেষণ করলেই বক্তব্য পরিষ্কার হবে।

'গুপ্তপ্রেম' কবিতাটিতে প্রেমাস্পদের জন্য আকুতি প্রকাশিত হয়েছে। এই আকুলতার ভাবটি ফুলের ফুটে-ওঠার বিশেষ প্রবণতাকে অবলম্বন করেছে।

পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া
পূজিব তারে গিয়া কী দিয়ে!

"রুধিয়া মনোদ্বার"—এই কথাতে ফুলের সৌরভ লুকিয়ে রাখবার প্রয়াস উপমিত হয়েছে। 'ঝরে পড়া', 'শুকিয়ে যাওয়া', 'শোভা', 'ফুটতে চাওয়া', 'উদিত হওয়া',—সবই ফুলের প্রস্ফুটনের অনুসঙ্গ। কবি আর একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন, সে শব্দটি হল 'পূজা'।

মনে গোপন থাকে প্রেম, যায় না দেখা
কুসুম দেয় তায় দেবতায়।

এই 'পূজা' শব্দটি সমস্ত বাক-প্রতিমার কলেবরকে সম্পূর্ণ করল। ফুলের সার্থকতা পূজার বেদীতে। প্রেমিকা ও প্রেমাস্পদের সম্পর্ক পাঠকের কাছে

নির্মল হ'য়ে উঠল। রবীন্দ্রসাহিত্যে—"যারে বলে ভালবাসা, তারে বলে পূজা।"

'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতাতে অন্ধকার ও আলো দুই বিপরীত দ্যোতনা বহন করেছে। একদিকে রয়েছে অনন্ত বিভাবরী, অনন্ত নিশি, নীল উৎপল, কালো নয়ন, কৃষ্ণবরণ ভ্রমর, লুব্ধ নয়ন, ধরার কুয়াসা, নির্বাণহীন অঙ্গার, অকূল নয়ননীর, তিমিরতুলিকা, কলঙ্করাহু; আর একদিকে রয়েছে—সৌন্দর্য আলোক, পুণ্যজ্যোতি, আনন্দধারা, পতিতপাবনী গঙ্গা, বিমলহৃদয়-আরশিখানি, আকাশ-ঊষার কায়া, লক্ষ্মী। বুঝতে কষ্ট হয় না কবি বাসনার জগৎ থেকে, দেহের জগৎ থেকে 'এ্যাবষ্ট্রাক্ট' সৌন্দর্যের দেশে মহাপ্রস্থান করতে চান। বিবিধ বাকপ্রতিমা 'আলো' ও 'আঁধার' এই দুটি ব্যঞ্জনাকেই পুষ্ট করেছে।

'অনন্ত প্রেম' কবিতায় শাশ্বত নায়ক-নায়িকাকে কবি 'যুগলপ্রেমের স্রোতে' দেখতে পেয়েছেন।

'অনাদি কালের হৃদয়-উৎস' থেকে তারা ভেসে এসেছে। কোথায় তারা ভেসে এল? না, 'রাশি রাশি হয়ে তোমার পায়ের কাছে।'

—এখানে 'রাশি রাশি হয়ে' বাণী-ভঙ্গির মধ্যে পুষ্পগুচ্ছের ইঙ্গিত আছে। কিন্তু 'তোমার পায়ের কাছে' বলে কবি আবার সেই নদী-তরঙ্গের প্রসঙ্গই টেনে আনলেন।

'অহল্যার প্রতি' কবিতায় একদিকে রয়েছে রাত্রি, অন্ধকার, অভিশাপ, নিদ্রা, রহস্যতীর, বিস্মৃতি-সাগর নীল নীর, অনুর্বরা-অভিশাপ, চিররাত্রি সুশীতল, বিস্মৃতি আলয়; আর একদিকে রয়েছে প্রভাত, হাসি, শৈশব, প্রথম ঊষা, বিস্ময়। এখানে রাত্রি ও প্রভাত ছাড়া মরু (অনুর্বরা-অভিশাপ) ও বারি-প্রবাহের প্রসঙ্গ রয়েছে। কিন্তু প্রধান বাকপ্রতিমা গ'ড়ে উঠেছে আলো ও অন্ধকার, রাত্রি ও ঊষার উপর ভিত্তি ক'রে। ইংরেজীতে একটা কথা আছে 'Cluster of Images'—এখানেও তেমনি বাকপ্রতিমার গুচ্ছ তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু স্তবকে যেমন গোলাপই প্রধান, এখানেও তেমনি 'প্রথম ঊষার মতো' ব'লে কবি অহল্যার আবির্ভাবের হর্ষ সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পেরেছেন। রবীন্দ্রকাব্যে 'আবির্ভাবে'র অর্থ সব সময়ই প্রভাত বা ঊষা।

আনন্দময় আবির্ভাব সব সময়েই কবির কাছে উষার সঙ্গে তুলিত হয়েছে। অন্ধকার তার বিপরীত চেতনার বাহন।

নদী-তরঙ্গ চির প্রবহমানতার প্রতীক। প্রেমের অনন্তপ্রবাহ বুঝাতে তাই নদীস্রোত উপমিত হয়েছে।

ভাষা ও ছন্দ

এই কাব্যের অভিনবত্ব যেমন বাকপ্রতিমায়, তেমনি ছন্দে ও ভাষায়ও রয়েছে অভিনবত্ব। ছন্দ ভাষা ও বাকপ্রতিমা অভিন্ন; কবিতার যা কিছু শক্তি, তা এই তিন বৈশিষ্ট্যের সমন্বিত তেজ।

কবিতা-পাঠকের কাছে এগুলি পৃথকভাবে ধরা দেয় না।

কবির শব্দ-সংগ্রহের সূত্র যাই হোক, কবির শব্দ এক বিশেষ জাতের। প্রধানতঃ শব্দগুলির মধ্যে একটা স্পর্শগ্রাহ্যতা ও ব্যাপকতা আছে। দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

চক্ষুর স্থলে কবি অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'নয়ন' 'আঁখি' শব্দ দুইটি ব্যবহার করেছেন; শব্দ দুইটি শুধু কবি-প্রসিদ্ধির জন্য নয়, শব্দ দুইটি চক্ষু অপেক্ষা অনেক ধ্বনিময় এবং স্পর্শগ্রাহ্য।

অনেক শব্দ তাঁর কলমে নতুন অর্থে গর্ভিনী হয়েছে। প্রায়ই কবি 'অলস' শব্দটি ব্যবহার করেন। 'অলস' বিশেষণটির মধ্যে একটি নিন্দনীয় অভ্যাসের প্রসঙ্গ রয়েছে। অথচ রবীন্দ্রনাথের 'অলস' শব্দটি অবসরভোগী অর্থে ব্যবহৃত; আর অবসর রবীন্দ্রনাথের কাছে সৃষ্টির বিরোধী নয়; বরং সৃষ্টির মুহূর্ত হিসাবে বর্ণিত। 'অলস ভাবনাখানি' 'অলসলীলা' 'অলসমেঘ'— কোন ক্ষেত্রেই 'অলস' নিন্দাসূচক নয়। 'মানসী'র মধ্যে অনির্দেশ্যের জন্য কবির আকুলতা আছে; এইজন্য কবি 'কাহারে' ও 'একদা' শব্দ বিশেষভাবে ব্যবহার করেছেন। 'বাতাস কাহারে খুঁজিয়া বেড়ায়' বা 'একদা এলোচুলে কোন ভুলে ভুলিয়া'—এই দুই পংক্তিতে নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও মুহূর্ত আভাষিত হয়নি।

ব্যাপকতার অর্থ প্রকাশের জন্য অনন্ত, অসীম, উদার, উদাস, অপার, আকুল, অরূপ ব্যবহৃত। অরূপ ও অসীম শব্দ দুটির বিশেষ তাৎপর্য

আছে; এবং এই দুটি শব্দের বুকেই একটা বৈপরীত্য (Contradiction) আছে। অসীম ও অরূপ আদৌ সীমাশূন্য ও রূপশূন্য নয়। এই ভাবেই কবি অসীমের সীমা রচনা করেছেন এবং অরূপের রূপ বর্ণনা করেছেন।

কতকগুলি মিষ্ট শব্দ তাঁর প্রিয়—ভোর, টোটা (ক্রিয়া), মদির, মগ্ন, নিহত (নিমেষ-নিহত), স্নিগ্ধ, বুলা (বলা অর্থে), বয়ান, বিবশ, বিকচ, মায়া, বাধো-বাধো, কোমল, গহন, নয়ান, নলিন, পুট, আলস, আধেক, আবেশ, অবশ, টলমল, লাজ, লোর, দোঁহা, বিলাস, ম্লান, উভরাণ (ক্রি)।

এই মিষ্টতার পরিমাণ বাড়াবার জন্য এবং মিলের সৌষ্ঠব রক্ষার জন্য কবি নানা অভিনব শব্দ সৃজন করেছেন। মাঝে মাঝে শব্দের অযথা ভার কমিয়ে দিয়েছেন—হৃদয়-উছাস (ভুলে) লিখলে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস আদৌ কম নির্গলিত হয় না; বরং মিল ও মাত্রার চারুতায় ও যাথার্থ্যে আনন্দের পরিমাণ বাড়ে। আঁচল স্থলে আঁচোর (ভুল ভাঙ্গা) লিখেছেন; সংস্কৃতে 'র' ও 'ল'-এর অভেদ অনুমোদিত। কিন্তু এখানে অননুমোদিত হলেও আমাদের উষ্মার কারণ হত না। ঠিক একই কথার ধাঁচে তৈরি 'নিশানি' ও 'উছাসি' (বিরহানন্দ)। মাঝে মাঝে কবি শব্দকে দীর্ঘতর করেছেন। 'উদাসিয়া' ('ক্ষণিক মিলন') লিখে কবি হিয়ার সঙ্গে শুধু মিলই দিলেন না; হিয়ার ঔদাসীন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দিলেন। 'করুণা'র সঙ্গে মিল দেবার জন্য কবি লিখেছেন "আবার কবে ধরণী হবে তরুণা?" (শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা)। আবার কবে হবে জানি না, লক্ষ বছরের পুরানো ধরণীকে এত তরুণা আমরাও কখনও দেখিনি, তার তরুণী অবস্থাতেও নয়। ঐ কবিতাতেই 'বাঁধারে'র সঙ্গে 'লুকায় কোন চাঁদারে' বলে মিল দিয়েছেন। 'চাঁদারে' মানব জাতির এক বিশেষ অংশের নিত্যভাষা; সে শ্রেণীর নাম শিশু। শিশুর ভাষা অবাক-হওয়ার ভাষা, আনন্দ কাকলীর ভাষা। মানসী এ ভাষাকে বাদ দেয়নি, বা দিতে পারে না।

মাঝে মাঝে কবি শব্দকে ছোট ক'রে নিয়েছেন; ছোট করলেই সব জিনিস হেয় হয় না। চকিতের সঙ্গে মিল দিয়েছেন "একটি কণাও আর পাই না লখিতে" (মরণ স্বপ্ন)। সিন্ধু-তরঙ্গে 'লখিতে'র প্রয়োগ আছে।

মাত্রা রক্ষার জন্য কবি লেলিহান রসনাকে লেলিহা রসনা (কুহুধ্বনি)

লিখেছেন। আমরা কাষ্ঠপুত্তলিকার সঙ্গেই আশৈশব পরিচিত; কবি মাত্রা রক্ষার জন্য লিখলেন 'যেন কাষ্ঠ পুত্তল ছবি'। (কবির প্রতি নিবেদন) এতে চিত্রের অচলত্ব অটুট থেকেছে ব'লেই আমাদের ধারণা। আমাদের আর একটি ধারণাও এখানে ব্যক্ত করছি। বিহারীলাল এই প্রকারে মাত্রা ও মিল রক্ষার জন্য শব্দ-দেহের পরিবর্তন সাধন করতেন। তাঁর হাতে শূন্য-শূনো (বঙ্গসুন্দরী), অবলোকন-লোকন (বঙ্গসুন্দরী), প্রয়াণ-পয়াণ (ঐ) হয়েছে। এখানে মাত্রা ও মিল প্রাণান্তকর প্রয়াসে রক্ষিত হয়েছে। সেদিনের সেই বিকর্ণ যুগে এইটুকু ছন্দজ্ঞানও প্রশংসনীয়। রবীন্দ্রনাথের শব্দ-ঠাকুরালি শুধু মাত্রা ও মিল রক্ষার রঙ্গেই হাঁপিয়ে পড়েনি। নবীনতর কাব্য-শব্দকোষ সৃজন করল—রূপে ও অরূপে, মাত্রায় ও অতি মাত্রায় যা মনোহারী।

* * *

মানসীর ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য কতটুকু, কবি নিজেই তা ভূমিকায় ব'লে দিয়েছেন। তা ছাড়া বহু যোগ্য ব্যক্তি এ বিষয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করেছেন। আমরা তার পুনরালোচনা করতে চাই না। শুধু দুই একটি বিষয়ের প্রতি নজর দিতে চাই।

অক্ষরবৃত্তই ব্যবহার করুন, আর মাত্রাবৃত্তই ব্যবহার করুন, কবি বিভিন্ন বর্ণের (স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণ) তারগুলিকে দক্ষ-সেতারীর মত বাজিয়েছেন।

প্রথমত স্বরবর্ণের ব্যবহারে কবির দক্ষতা দেখুন।—'বর্ষার দিনে' কবিতায় মত্ত বাতাসের প্রলম্বিত অবিশ্রান্ত হা-হুতাশ কবি স্বরবর্ণের প্রাধান্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। 'অপেক্ষা' কবিতায় প্রতীক্ষমানতা স্বরবর্ণের উপর নির্ভর করেছে।

এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরিষায়।
এমন মেঘস্বরে বাদল ঝর ঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়। (বর্ষার দিনে)

এ কি শুধু অনুপ্রাসের ধ্বনিতরঙ্গ ?

কবিসঙ্গীতে স্বরবর্ণের প্রলেপ থাকত; মাইকেল এই ভাড়া-করা সাঙ্গীতিকতার দায় থেকে বাংলা কাব্যকে উদ্ধার করেছিলেন। মানসীর

এই স্বরবর্ণ-ব্যবহাররীতি কবিসঙ্গীতের সঙ্গে তুলিত হতে পারে না; এমন কি 'গীতগোবিন্দে'র স্বরবর্ণ-স্রোত এর পাশে তরলতার নামান্তর।

দ্বিতীয়তঃ শুধু স্বরবর্ণ নয়। ব্যঞ্জন বর্ণের মজ্জায় যে গীতিসুধারস আছে, তা-ও তিনি আবিষ্কার করেছেন।

শিরোপরি সপ্তঋষি যুগযুগান্তের
ইতিহাসে নিবিষ্টনয়ান,
নিদ্রাহীন পূর্ণচন্দ্র নিস্তব্ধনিশীথে
নিদ্রার সমুদ্রে ভাসমান। (জীবনমধ্যাহ্ন)

রবীন্দ্রনাথ যুক্তাক্ষরকে স্বরভক্তির সাহায্যে কোমল করার চেষ্টা করেন নি। একে শুধু পয়ারের 'শোষণশক্তি' বলে নীরব থাকা যায় না। সাহিত্য পত্রিকায় "শ্রুতিকঠোর সংস্কৃত শব্দরাশি" প্রয়োগে উষ্মা প্রকাশ করা হয়েছিল।[১০]

স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত বা অ-যুক্ত অক্ষর—সর্বত্রই তাঁর রাজ্য-সীমা বিস্তৃত। শুধু ধ্বনি-বিন্যাসের সহায়তায় তিনি নব নব ভাবমণ্ডল গঠন করেছেন। শব্দের মাত্রা বাড়িয়ে কমিয়ে, বিরতি-অর্ধ বিরতির বিভাগ ইচ্ছামত প্রয়োগ ক'রে এই ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্ট হয়েছে। ধরুন 'বধূ' কবিতাটি। এক গ্রাম্য বালিকার শহর-প্রবাসের বেদনা এখানে অভিব্যক্ত হয়েছে। গ্রাম্য বালিকার বিষাদ ভাবটি ঘিরে আছে একটা সন্ত্রস্ত সচকিত ভাব, একটা কম্পমানতা। এই সচকিত সন্ত্রস্ত ভাব ও কম্পমানতা ধ্বনি কম্পনের মধ্য দিয়ে দুলে উঠেছে।

মাঠের | পরে মাঠ | মাঠের | শেষে
সুদূর | গ্রামখানি | আকাশে | মেশে।
এ ধারে | পুরাতন শ্যামল | তালবন
সঘন | সারি দিয়ে | দাঁড়িয়ে | ঘেঁসে।
বাঁধের | জলরেখা ঝলসে | যায় দেখা,
জটলা | করে তীরে | রাখাল | এসে।
চলেছে | পথখানি কোথায় | নাহি জানি
কে জানে | কতশত | নূতন | দেশে।

দূরন্ত আশা, নিষ্ফল কামনা প্রভৃতি কবিতায়ও ঐ একই রীতিতে ভাব-মণ্ডল রচনা করা হয়েছে।

কাজেই মানসীতে তিনি মাত্রাবৃত্ত রচনা করলেন—এই সংবাদই একমাত্র সংবাদ নয়।

* * *

ব্যক্তি-নির্ভর সাহিত্য ব'লে গীতিকবিতায় ব্যক্তির নানা অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। শুধু সংখ্যার অজস্রতায় নয়, সূক্ষ্মতায়-ও এই সাহিত্যের বৈচিত্র্য অসাধারণ। মধ্যযুগীয় যে-কোন সাহিত্য অপেক্ষা ছন্দে ও গঠনকৌশলে বৈষ্ণব গীতিকবিতার বৈচিত্র্য অধিকতর। এমন কি, পরবর্তী কালের শাক্ত পদাবলীর মধ্যেও ছন্দে ও গঠনশৈলীতে এত বৈচিত্র্য নেই। কারণ শাক্ত পদাবলীতে অনুভূতির বৈচিত্র্য ও সূক্ষ্মতা অপেক্ষাকৃত কম—সেখানে অভিমান ও আত্মসমর্পণ ব্যতীত মানব-আত্মার অন্য লীলার প্রসঙ্গ নেই। ভাব-বৈচিত্র্যই বৈষ্ণব কাব্যের রূপ-বৈচিত্র্যের হেতু। বৈষ্ণব গীতি কবিতার বৈচিত্র্যকেও মানসী এক পলকে বহুগুণ ছাড়িয়ে গেল। বৈষ্ণব পদাবলীর বৈচিত্র্য সীমিত হয়েছে তার ধর্মীয় বিশেষ মতবাদের জন্য। সেখানে কবির লেখনী ধর্মনেতার অনুশাসনে বাধাগ্রস্ত। মানসীর একমাত্র অনুশাসন হৃদয়ের অনুশাসন। কারণ "ভাবজগৎ তাঁর হৃদয়ের বিহারভূমি।" তাঁর কাব্য অন্তঃপ্রকৃতির দ্বারা শাসিত। এই কারণে ছন্দ শব্দ ও গঠন-রূপ কবির পূর্বলব্ধ কোন মানসিক কোষাগার থেকে সংগৃহীত হয়নি; বিষয়বিশেষের প্রকৃতি থেকে কবিতার ছন্দ ভাষা ও দেহবল্লরী উপজাত হয়েছে। "তাহার এক একটি কথা তাহার এক একটি সন্তান।" কবির মানসী অহল্যার মতই দেখা দিয়েছে—পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়ে!

তাই ত চিরকালের কবিকুলের বিস্ময়—'এ আমি কি বল্‌লাম!'

'বিশ্ব তোমাপানে চেয়ে কথা নাহি কয়।'

* * *

মানসীতে এসেই প্রথম বুঝতে পারলাম রবীন্দ্রনাথের ভাষা কেন অনুবাদের অযোগ্য। যে ভাষা স্পষ্ট নয়, সেই ভাষার অনুবাদ নেই। মানসী স্পষ্ট হয়নি বলেই আজও বেঁচে আছে।

মানসীতে কবির বক্তব্য অন্তরে ও বাহ্যে সম্পূর্ণ। 'কড়ি ও কোমল' প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, এবার থেকে তাঁর জীবন-তরী লোকালয়ের কোল ঘেঁষে চলবে। মানসীতে সেই তরী লোকালয়ের বুকের মধ্য দিয়ে চলেছে

তাই 'বঙ্গবীরে'র পরবর্তী কবিতাই হল 'সুরদাসের প্রার্থনা'। 'কড়ি ও কোমলে'ও কবিতাকে সাজাতে-গুছাতে কবি অনেক ভেবেছেন ; এখন আর সেই ভাবনা নেই। সাধনার সিদ্ধি ঘটে গেলে লোকালয়ে নেমে আসতে বাধা নেই। তখন পর্বতচূড়া, লোকালয় ও অরণ্য সমান। তাঁর 'গুরুগোবিন্দ' প্রশ্ন করেছেন.

কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব—
'পেয়েছি আমার শেষ।'

কিন্তু 'মানসী'র কবি জানেন—

যখন ফুটিলে তুমি সুন্দর তরুণ মুখে
তখনি প্রভাত এল ; ফুরালো আমার কাল।

কারণ 'এখন বিশ্বের তুমি।'

মানব-জগৎ ও নিসর্গ-জগতের রহস্য এই প্রথম একই পর্দায় হৃদয়ধন্য ভাষায় পরিবেশিত হ'ল।

কবিসত্তা ও কবির ব্যক্তিসত্তা একই অভিজ্ঞতায় লালিত জারিত হ'য়ে কাব্য সৃজন করবে—বাংলা কাব্যে বৈষ্ণবপদাবলী রচনার বহুকাল পরে সেই ধর্ম এই প্রথম পুনরুচ্চারিত হ'ল।

কল্পনা যে সুমহৎ সত্যের আশ্রয় হ'তে পারে,—এ তথ্যও মানসীর বুক থেকে অকপটে ধ্বনিত হল। কল্পনা বাস্তবের বিরোধী নয়, বাস্তবের নবীন রূপকার। আর মহৎকাব্য যে মহৎ ও জীবন্ত গভীর সত্যদর্শন ব্যতীত লিখিত হ'তে পারে না—মানসী এ-কথা বাংলা কাব্যে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করল। এবং এই বাণী বাংলার মৃত্তিকায় প্রোথিত হওয়ার অর্থ কবিতার মাহাত্ম্য বহুগুণ বেড়ে গেল। মানসী-উত্তর বাংলা গীতিকাব্যের বাঙ্‌লার শ্রেষ্ঠ ও মুখ্য সাহিত্য হবার পথে তাই আর দ্বিতীয় কোন বাধা থাকল না। এ-যুগের মহত্তম কবি আর মহত্তম দার্শনিক বাঙ্‌লাদেশে জন্মে বিশ্বকে আলোকিত করলেন। মানসী সেই জন্মান্তরের প্রথম সঙ্গীত।

পাদটীকা

১। Calcutta Review—1878, Vol L×VII

২। Romantic Agony—Mario Praz. 1961 পৃ—২৩০

৩। Romantic Agony—Mario Praz. 1961 পৃ—৩৭৫

৪। Rousseau and Romanticism—Irving Babbit পৃ—৩০৭

৫। Rousseau, Kant and Goethe— Ernest Cassirer. পৃ—১০

৬। The Concept of Nature in the Nineteenth Century English Poetry—Joseph Warren Beach. The Macmillan Company, New York, 1926 পৃ—১২-১৩

৭। Historical Introduction to Modern Psychology—Gardner Murphy. Routledge, Kegan Paul & Co Ltd., 1949. পৃ—১৮৮

৮। A Dictionary of Psychology—James Drever. Penguin Books, 1952. পৃ—২৮৬

৯। Psychology—Robert S. Woodworth. Methuen & Co Ltd., 1949. পৃ—৪৯২

১০। সাহিত্য, ১৩০৭, চৈত্র।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নতুন যুগের কবিগোষ্ঠী

নব্যভারত পত্রিকায় লেখা হ'ল: "রবীন্দ্রবাবু যে প্রথম শ্রেণীর কবি, সে বিষয়ে একটুও সন্দেহ নাই। শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, শ্রীযুক্তবাবু অক্ষয়কুমার বড়াল, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস, ইহারাও আমাদের বিবেচনায় এক শ্রেণীর কবি, কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর নীচে।"[১]

ভারতীতে লেখা হ'ল: "বঙ্গের কাব্যকাননে মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীন যুগের গায়ক; রবীন্দ্রনাথ বর্তমান যুগের প্রবর্তয়িতা।"[২]

জনৈকা মহিলাকবি হেম নবীন প্রভৃতির প্রসঙ্গ উল্লেখান্তে বললেন, "ইহাদের পরে রবীন্দ্রবাবুর নূতন সৃষ্টি; ইনি বঙ্গ সাহিত্যের গলে পারিজাত পুষ্পের হার প্রদান করিয়া কর্ণে যেন সহকার মঞ্জরী পরাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে যেন আধ-ছায়া, আধ-স্বর্গ, আধ-মর্ত্য দেখিতেছি।"[৩]

বুঝা গেল, এ-যুগের কাব্য নবীন কাব্য ব'লে স্বীকৃত। এক নবীন কবি সম্প্রদায়ের সৃষ্টিতে বাংলা কাব্য-জগৎ পুষ্ট হচ্ছে, এ-সংবাদও স্বীকৃত হচ্ছে। মোটামুটি এঁদের অনেকের কাছে রবীন্দ্রনাথ আদর্শ ব'লে স্বীকৃত।

যে-নবীন কবিসম্প্রদায় দেখা দিয়েছেন, তাঁদের মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, গোবিন্দচন্দ্র দাস, প্রিয়নাথ সেন, প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীতে পড়েন।

দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত কবিকুল হলেন স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায়, হিরণ্ময়ী দেবী, মানকুমারী বসু, সরোজকুমারী দেবী, প্রমীলা নাগ প্রভৃতি। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়েন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি। পূর্ব পরিচ্ছেদে আমরা বলেছি যে, বাংলা কাব্যে নায়িকা-ভাবনা নারী-মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

বাংলার কবিরা তাঁদের আদর্শ-নারীর জন্য সব সময় পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নারীর স্মরণ নিতেন। তার কারণ এই অষ্টমবর্ষীয়া গৌরীদানের দেশে মুক্ত-প্রেম বা অবাধ প্রেম বলে কোন শব্দ ছিল না। অথচ এ-বিষয়ে

আগ্রহ ধীরে ধীরে বাড়ছিল ; ইংরেজি শিক্ষার আদিযুগেও এই আকাঙ্ক্ষা ছিল। কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র দ্বারকানাথ অধিকারী সেই ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে (১লা বৈশাখ, সংবাদ প্রভাকরে) একটি কবিতায় লিখেছিলেন—

নবীন যুবকগণে স্বদেশী যুবতী সনে
বিবাহের পূর্বে চাহে ভাব।

কিন্তু সে-আশার চরিতার্থতার সুযোগ ছিল না। ডিরোজিও-কাশীপ্রসাদ ঘোষ-মাইকেল-বঙ্কিমের নায়িকারা ঐতিহাসিক-পৌরাণিক যুগের পুরনারী। হেমচন্দ্রের প্রমদা-কাহিনী, এবং নবীনচন্দ্রের বিদ্যুৎ-পর্ব তারই অন্যবিধ প্রকাশ। নায়িকা-ভাবনার সঙ্গে আত্মপ্রতিষ্ঠ সাবালিকা প্রেমিকার অস্তিত্ব জড়িত। বাংলা কাব্যে নায়িকা-কল্পনা যখন সাবালক হ'ল, তার পূর্বে সামাজিক পরিবর্তনও কিছু কিছু ঘটেছে। ১৮৮৮-৮৯ খৃষ্টাব্দে Age of Consent Bill বা সহবাসসম্মতি বয়সবিল নিয়ে বেশ বিতর্ক চলছিল। ভারতী পত্রিকাসহ অন্যান্য প্রগতিশীল জনমত এই বিল সমর্থন করে ; ফলে ১৮৯১ সালে আইন রূপে গৃহীত হ'ল। এই বৎসরই 'মানসী' প্রকাশিত হয়। নাবালিকা-প্রণয়-সম্ভাষণ রবীন্দ্রকাব্যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের লক্ষ্যস্থল—মানসী কাব্যে 'নববঙ্গ দম্পতির প্রেমালাপ' এবং 'পরিত্যক্ত' কবিতায় "শৈশবকুঁড়ি ছিঁড়িয়া বাহির করি যৌবনমধু" উক্তি—সেই নিষ্ঠুর বিধিব্যবস্থার প্রতি ধিক্কার। এ-যুগের প্রেম-ভাবনায় নারীত্বের প্রতি সম্ভ্রমবোধ বড় কথা। দেবেন্দ্র সেন-অক্ষয়কুমার বড়াল-গোবিন্দ দাস আদিরসের কবি।

গোবিন্দদাস ও অক্ষয়কুমারের রচনায় অন্য কোন ভাবসমৃদ্ধ বিষয়বস্তু নেই বললেই চলে ; দু'একখানি কাব্যে দু একটি কবিতায় যে-ব্যতিক্রম আছে, তা ব্যতিক্রমই, নিয়ম নয়। এই গোষ্ঠীর অন্যান্য কবির রচনায় এই ব্যতিক্রমও অনুপস্থিত। দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিদের রচনায় এই একই কাব্য-চিন্তা প্রবল ; কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নারীসুলভ বিশেষ দৃষ্টিকোণ।

তৃতীয় শ্রেণীর কবিরা এই দুইটি শাখা থেকে পৃথক। তাঁদের কাব্য-চিন্তায় রবীন্দ্রনাথের অনির্দেশ্য বস্তুহীন জগৎ অপেক্ষা নির্দেশ্য বস্তুময় জগৎ প্রাধান্য পেয়েছে। তবে কাব্যকলার বিবিধ প্রসাধন-ক্রিয়ায় রবীন্দ্র-আদর্শ অবহেলিত হয় নি।

॥ ১ ॥

দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৫-১৯২০) এ-যুগের অন্যতম প্রধান কবি।

দেবেন্দ্র সেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ হ'ল 'ফুলবালা' (১৮৮০)। ফুলবালা কাব্যে মাইকেলী প্রভাব সুস্পষ্ট। মাইকেলের ব্রজাঙ্গনাকাব্য তাঁর আদর্শ। ব্রজাঙ্গনাকাব্যে মাইকেল নানা প্রাকৃতিক পরিবেশ উপস্থাপিত ক'রে শ্রীরাধিকার হৃদয় উদ্ঘাটন করেছিলেন। সেন কবি এখানে নানা ফুলের হৃদয় উদ্ঘাটন করেছেন। এখানে মাইকেলের ছন্দ, স্তবক-গঠন-রীতি ও ভাষা অনুকৃত হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া থাক।

কামিনী— প্রাঙ্গণে ফুটেছ তুমি কামিনী সুন্দরী,
নিশিভোর না হইতে, ভাল করে না ফুটিতে,
কি ভাব-আবেশে ফুল যাও তুমি ঝরি,
সত্য করি বল মোরে কামিনী সুন্দরী।

এই ছন্দ ও স্তবককৌশল ব্রজাঙ্গনার 'জলধর' কবিতার অনুরূপ।

ঝুমকা— নীলাম্বরে সুতনু আবরি
ধনমদে ফুল্লকায় প্রৌঢ়া গৃহিণীর প্রায়,
যবে তব ঘাড় নাড় সব তুচ্ছ করি,
দেখেই, চিনেছি তোমার ঝুমকা সুন্দরি!

এই স্তবক 'পৃথিবী' কবিতাটির অনুরূপ।

বকুল— শান্তিময়ী সন্ধ্যাসখী আসিয়া ধরায়
ধীরে ধীরে বকুল লো ছুঁইলো তোমায়,
অমনি খুলিলে মুখ, অমনি ও ক্ষুদ্র বুক
মধুর ভাণ্ডার খুলি আহ্লাদ জানায়।

এই স্তবক 'জলধর' কবিতাটির অনুরূপ।

এ-ছাড়া শেফালিকা ও কুন্দ, অশোক, রজনীগন্ধা, কদম, দোপাটি কবিতা যথাক্রমে প্রতিধ্বনি, যমুনাতটে, জলধর, ঊষা, কবিতাগুলির আদর্শে নির্মিত।

দেবেন্দ্র সেনের দ্বিতীয় প্রকাশিত কাব্য ঊর্মিলা। পরবর্তীকালে লিখিত অপূর্ব 'বীরাঙ্গনাকাব্যে'ও ঊর্মিলার প্রসঙ্গ রয়েছে। ঊর্মিলা কাব্যের ভাষা ও বিষয়-নির্বাচন-রীতিতে মাইকেল প্রভাব সুস্পষ্ট।

'ফুলবালা' কাব্যের স্তবক নির্মাণ-কৌশল ও মিলের ছাঁদ (Pattern) মাইকেলের 'ব্রজাঙ্গনাকাব্যে'র বিভিন্ন কবিতার রূপকর্মের অনুসরণ মাত্র। আর 'উর্মিলা কাব্যে'র সমগ্র কাব্য-ভাবনাতেই মাইকেল-প্রভাব রয়েছে। মেঘনাদবধ কাব্যের সীতা ও সরমার কথোপকথনের ভাষার সঙ্গে এ কাব্যভাষার মিল আছে। কিন্তু প্রধান মিল অন্যত্র।

সারা রামায়ণ-কাহিনীতে এত বড় উপেক্ষিত চরিত্র দ্বিতীয় নেই। সহানুভূতির প্রদীপ জ্বেলে মাইকেল তার লাঞ্ছনম্র আনন যদি লক্ষ্য করতেন, তবে তিনিও যে বিচলিত হতেন, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই। মাইকেল উর্মিলার সন্ধান পান নি, তা নয়; উর্মিলার সন্ধান তিনি করেন নি। মাইকেলের বীরাঙ্গনারা মুখরা; এবং তারা অপেক্ষাকৃত অনলস্বভাবা। গৃহাঙ্গনারা শুধু গৃহ উজ্জ্বল করেন না, গৃহদাহেরও নিমিত্ত হ'তে পারেন। উর্মিলার সঙ্গে শুধু তুলনা চলে তুলসীতলার পিদিমের। সে জ্বলবে; শুধু সন্ধ্যাবেলায় তার খোঁজ আমরা রাখি। সারা রাত তার অস্তিত্ব আমাদের স্মরণের বাইরে। উর্মিলাও তেমনি বিবাহ রাত্রেই শুধু স্পষ্ট—একরাত্রে চতুষ্টয় কন্যার বিবাহ যতটা স্পষ্ট হতে পারে, ততটাই। তারপরে সে জ্বলেছে, একাকীই জ্বলেছে—এবং সম্ভবত শয়নকক্ষে নয়। স্বামীসঙ্গ-বঞ্চিতার আশ্রয়স্থল শয়নকক্ষের শত স্মৃতি-ভরা চারদেয়ালের মধ্যে নয়। উর্মিলাকে দেবেন্দ্র সেন ভুলতে পারেন নি—'অপূর্ববীরাঙ্গনাকাব্যে' সে আবার ফিরে এসেছে। উর্মিলা ভাগ্যহত নারীত্বের প্রতীক।

মাইকেল-প্রভাবাধীন থেকেও এ কাব্য তাই মাইকেল-প্রভাবজাত নয়। এবং অনেকের অজ্ঞাতসারে (সম্ভবত কবিরও অজ্ঞাতসারে) কবির স্বতন্ত্র গৃহগত প্রেমিক রূপকল্পনার পুষ্টি সাধনে সহায়তা করল।

রবীন্দ্র-পরবর্তী কাব্য-ইতিহাসে মাইকেল-প্রভাব সম্পূর্ণ বিদূরিত। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশ-যুগে মাইকেল-প্রভাব সহজ ও স্বাভাবিক ঘটনা। এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সে প্রভাব হেমচন্দ্রীয় প্রভাব অপেক্ষা কল্যাণকর। হেমচন্দ্রের খণ্ড কবিতা এ যুগে সবিশেষ জনপ্রিয়। প্রথমতঃ হেমচন্দ্রের উগ্র দেশপ্রেম, দ্বিতীয়তঃ তাঁর সহজ প্রকৃতিসম্ভোগ, তৃতীয়তঃ তাঁর ছয়মাত্রার ছন্দের সাবলীল প্রবহমানতা—এ যুগের অধিকাংশ কাব্যযশঃপ্রার্থীদের অনুপ্রেরণার উৎস। কিন্তু হেমচন্দ্রের সমস্ত বক্তব্যের মধ্যে একটা গন্ধগন্ধিতা ছিল; এবং উঁচু পর্দার কাব্য ব'লে প্রচারধর্মিতার কবলে সমর্পিতপ্রাণ।

দেবেন্দ্রনাথ যে প্রথমেই মাইকেলের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, তা তাঁর কাব্য-সাধনার পক্ষে শুভ হয়েছে। কারণ হেমচন্দ্রের প্রভাব তাঁর ওপর যখন অনুভূত হবে, তখন তিনি অনেকটা পথ পরিক্রম করেছেন। কাজেই তাঁর পক্ষে সে প্রভাবের চিহ্ন ঝেড়ে ফেলা খুবই সহজ হবে। এখানে কবিবন্ধু রবীন্দ্রনাথের পথচলার সঙ্গে তাঁর পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথের উপর আদিমতম প্রভাব হ'ল হেমচন্দ্রের প্রভাব; তারপর কিয়ৎক্ষণের জন্য মাইকেল। তারপর বহুক্ষণস্থায়ী বিহারীলাল। এবং বিহারীলালের বীণা বাজাতে বাজাতেই একদা তিনি নিজের সুরে গেয়ে উঠলেন।

দেবেন সেন সহজেই হেমচন্দ্রের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন—এর জন্য হয়ত গাজিপুরের কবি বলদেব পালিতের ইসারা থাকা বিচিত্র নয়। কারণ বলদেব পালিত বাংলা কাব্যের জঙ্গী জাতীয়তাবাদী আবহাওয়া থেকে এক বিরোধী প্রকাশ। দেবেন সেন তাঁর 'নির্ঝরিণী কাব্য' (১২৮৭ বঙ্গাব্দ) উৎসর্গ করেছিলেন "বঙ্গসাহিত্য কণ্ঠহার কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু বলদেব পালিত মহাশয়কে।" তবে তাঁর এই সহজ সাফল্যের প্রধানতম কারণ রবীন্দ্রনাথ। ইতোমধ্যে প্রকাশিত রবীন্দ্র-কাব্যগ্রন্থাবলী আত্মমুখীন কাব্য-চর্চার আদর্শস্থল। 'উর্মিলাকাব্যে'র বিষয়-নির্বাচনেই আত্মমুখীন প্রবণতা স্পষ্ট। কবি ইচ্ছা ক'রেই প্রদোষালোকের অধিবাসিনী স্বামীসঙ্গবঞ্চিতা বাককুণ্ঠ এই তরুণী বধূটির অনেক গোপন ইচ্ছার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। হেমচন্দ্রের শরণাপন্ন হলে এই আত্ম-ভাষণের শান্ত মৃদুতা সর্বত্র বজায় থাকত না। পরবর্তীকালে তাঁর কাব্যে অতিভাষণ প্রবল হয়েছে; তার পিছনে তাঁর আদি যুগের হেমচন্দ্র-প্রীতি কার্যকরী কিনা প্রমাণ-সাপেক্ষ। কবি দেবেন্দ্রনাথ বিচলিত শক্তির কবি; যদিও কল্পনাশক্তির অপ্রতুলতা তাঁর ক্ষেত্রে কোনদিনই ঘটেনি। কিন্তু শক্তির কোন স্বাভাবিক বিকাশ থাকে না। শক্তি সহজাত হলেও তাকে বিকশিত করতে হয় সাধনার দ্বারা। দেবেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সাধনারও অভাব নেই। কিন্তু তবু অসংযমহেতু তাঁর শক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার থেকে বাংলা কাব্যলক্ষ্মী বঞ্চিত হলেন। আদিযুগের রচনায় শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ না ঘটলেও অসংযম নেই। মাইকেলের আদর্শই তার কারণ। উদাহরণস্বরূপ একটি অংশ উদ্ধৃত করা গেল।

সাদরে চিবুক মোর ধরি বীরবর
অধরে চুম্বিলা দেবী, হায় সে চুম্বনে—
নিচল যমুনা জলে চন্দ্রকর লেখা
পড়ে গো নিঃশব্দে যথা, অথবা যেমতি
উষার মুকুট শোভা কুসুমের শিরে
নিশির শিশির পাত ; নীরব মৃদুল।

নামধাতুর প্রয়োগে, উৎপ্রেক্ষা ও উপমা প্রয়োগ-রীতিতে, সর্বোপরি অমিত্রাক্ষরের ধ্বনি-বিন্যাসে এ-কাব্য 'বীরাঙ্গনা'র সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি।

মাইকেলতুল্য আর একটি প্রভাব দেবেন্দ্র সেনের প্রথম যুগের রচনায় দৃশ্যমান, সে প্রভাব হেমচন্দ্রের। 'ফুলবালা'তেই কোন কোন ক্ষেত্রে সেই প্রভাব দেখতে পাই ; যথা—

আ মরি কি শোভা ধরি সরসীতে ফুটেছে।
বিপুল বিশ্বের শোভা একাধারে ধরেছে। (পদ্ম-৩৩)

কিন্তু 'নির্ঝরিণী' কাব্য থেকেই এই প্রভাব প্রবলতর হ'য়ে উঠল। পরবর্তীকালে কবি দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে প্রাণের ভাষা আবিষ্কার করলেও হেমচন্দ্রের আবেদনকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারেন নি। সে আবেদন যান্ত্রিক আতিশয্যের আবেদন।

'নির্ঝরিণী' কাব্যে অবশ্য রবীন্দ্র-প্রভাবও অনুপস্থিত নয়। ভালবেস না, উদাসিনী, মায়া-উদ্যান, আমার দেবতা, উদভ্রান্ত প্রেম, পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী, শয়নমন্দিরে আদিরসাত্মক কবিতা ; ময়না, বুলবুলের প্রতি নিসর্গবিষয়ক ; আর আদিরসসহ বাৎসল্য, এবং আরও নানান রসের ছড়াছড়ি রয়েছে 'আঁখির মিলন' কবিতায়।

এই কাব্যের ভাষায় হেমচন্দ্রের প্রভাব আছে, এ কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। উদাহরণ দেওয়া গেল—

বাস করে থাকে কীট পার্থিব কুসুমে রে,
থাকে গুপ্ত বিষধর অগুরু চন্দনে রে,
যুবতী যৌবন হায়, তটিনী বুদ্বুদ-প্রায়,
চকিতে মিলায়ে যায়; ভুল না রে ভুল না,
কারে ভালবেস না রে বেস না। (ভালবেস না)

কবি নিজের ভাবা খুঁজে পাচ্ছেন—এমন উদাহরণও আছে।

আঁখির মিলন ও যে আঁখির মিলন,
আঁখির মিলন ;
লোকে না বুঝিল কিছু, লোকে না জানিল কিছু,
দম্পতির হ'ল তবু শত আলাপন ;
হ'ল মন জানাজানি, প্রাণ হ'ল টানাটানি,
আশার চিকন হাসি, মনের রোদন,
বিজয়ার কোলাকুলি
আঁধারে শ্যামার বুলি
প্রেমের বিরহ-ক্ষতে চন্দন-লেপন
ও যে আঁখির মিলন। (আঁখির মিলন)

কবি বিদেশী কাব্যের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন—এ প্রমাণ এ-কাব্যে আছে। ঈশ্বরের প্রতি কবিতায় মূর, 'বুলবুলের প্রতি' ও 'কল্পনা' কবিতায় কীট্‌সের 'ওড্ টু নাইটিংগেল' ও 'ওড্ টু ফ্যান্সি' কবিতাদ্বয় এবং 'ময়না' কবিতায় এড্‌গার এ্যালেন পো-র 'র‍্যাভেন' কবিতার অনুসরণ আছে। কাব্যের নামপত্রে পো ও লাওয়েল থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

এর পর থেকেই তাঁর কবিতায় গৃহাঙ্গনা নারী বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। তাঁকে গার্হস্থ্য রসের কবিও বলা যেতে পারে। বালিকাবধূর লাজ-নম্র মূর্তি তাঁর কাব্যে বিশেষ স্থান পেয়েছে ; তাদের গতিবিধির আওয়াজটুকুও কান পেতে তিনি শুনেছেন। আবার ভাগ্য-বিড়ম্বিত নারীর প্রতিও তাঁর কম অনুকম্পা নেই। বারবনিতা, উন্মাদিনী, বালবিধবা তাঁর অকৃত্রিম সহানুভূতিরই পাত্রী ; প্রবল হৃদয়োচ্ছ্বাসে প্রকাশিত হ'য়ে কখনও কখনও এরা কাব্যের সীমানা লঙ্ঘন করেছে। তবু দেবেন্দ্রনাথ শেষ বিচারেও শিল্পী আখ্যা পেতে পারেন।

কবির চতুর্থ এবং পরীক্ষা-উত্তীর্ণ রচনা 'অশোক গুচ্ছ' (১৯০০) ; প্রায় উনিশ বৎসর পরে প্রকাশিত হয়। তবে গ্রন্থ-ভুক্ত অনেকগুলি কবিতাই পূর্বে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতী ও নব্যভারতে প্রকাশিত কবিতাবলী থেকে তাঁর এই যুগের কাব্য-প্রকৃতির মোটামুটি একটা আলোচনা করা যায়।

১২৯৫, অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ভারতীতে প্রকাশিত 'অদ্ভুত বহুরূপী' ও 'অদ্ভুত পাগল' কবিতা দুইটি তাঁর কাব্য-বৈশিষ্ট্যের সর্বপ্রকার চিহ্ন বহন করেছে। দুটি কবিতাতেই গৃহসীমানার মধ্যে যে মাধুর্য আছে, তা আস্বাদন করা হয়েছে। পৌষে প্রকাশিত 'আমার প্রিয়তমার দশটি ভগিনী' সেই একই জীবনরস-রসিকতা। ফাল্গুন সংখ্যায় 'গোলাপ সুন্দরী' প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটি ঐ সংকীর্ণ সীমানার বাইরে চলে গেছে। ১২৯৬ সালে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি', ও 'অপূর্ব দুঃখ' প্রকাশিত হয়। দুটি কবিতাতেই মা ও শিশু-জীবনের রঙিন ছবি তুলে ধরা হয়েছে। শ্রাবণে প্রকাশিত 'নাগা সন্ন্যাসী' কবিতায় সেই বাৎসল্য রসেরই এক স্নিগ্ধ সকৌতুক চিত্র পরিবেশিত।

১২৯৬, ভাদ্র সংখ্যার 'ফুল কেন ভালবাসি' কবিতায় তাঁর শিশু-প্রেম প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় কবিতাটি 'অদ্ভুত অভিসারে' কবির প্রণয়-পদাবলী রচনার চরম কৃতিত্ব প্রদর্শিত হয়েছে। 'অদ্ভুত অভিসার' কবির অন্যতম সার্থক কবিতা ; বিশেষ ক'রে কবিতাটির শেষ দুটি পংক্তি অবিস্মরণীয়—

আগে আত্মা, পরে দেহ, যাইছে তুহার,
রাধিকা রে বলিহারি, তোর অভিসার।

'তুহার' শব্দটি বৈষ্ণব পদাবলীতে সহজলভ্য, কিন্তু এখানে তার ব্যবহার চমকপ্রদ। এ তো শব্দসন্ধান নয়, যেন শরসন্ধান! অগ্রহায়ণে প্রকাশিত 'লক্ষ্মৌর আতা' তাঁর আর একটি সার্থক রচনা। পরবর্তীকালে এই কবিতাটির শেষের চোদ্দ লাইন পরিত্যক্ত হ'য়ে শুধু একটি চোদ্দ লাইনের সনেটে পরিণত হয়েছে। যে-ভাবে তিনি রসাল আতা রসিকার ওষ্ঠোপরি ফেটে যেতে দেখিয়েছেন, তাতে কবির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। মাঘ সংখ্যায় তাঁর একগাদা কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। তন্মধ্যে 'রাধারাণী' ও 'তারপর' এবং চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'দাও দাও,' 'সিন্দূর' কবিতা-চতুষ্টয়ীতে বালবিধবার দুঃখ বেদনার কথা পরিস্ফুট হয়েছে।

দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতি-সম্ভোগ রবীন্দ্র-অনুসারী বা আধুনিক ছিল। তিনি সরাসরি বিগত যুগের প্রকৃতি-চিন্তার বিরোধিতা করেছিলেন—টোল্যাণ্ড-টিণ্ড্যালের নামোল্লেখ ক'রে তিনি 'দ্রৌপদী' কবিতায় লিখলেন,

মোরা যত কুলাঙ্গার, নির্বাক নীরবে—
সভামাঝে অধোমুখে বসে আছি সবে।

অক্ষয়কুমার বড়াল নারী-শক্তিকে একটি তত্ত্বের মধ্য দিয়ে দেখেছেন। সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বই তাঁর কাছে গ্রাহ্য হয়েছে।

'প্রদীপ' তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য (১৮৮৪)। তিনিও এই কাব্যে হেমচন্দ্রের কাব্যরীতি অনুকরণ করেছেন।

হ'ত ভালবাসা যদি
বৈশাখের ক্ষুদ্র নদী,
বাগানের পাশ দিয়া যাইত বহিয়া রে,
তরুমূলে, বিলে, খালে,
শৈবালে, বেতসী-ডালে,
দুয়েকটি বীচি লয়ে বেড়াত ঘুরিয়া রে,
ভাঙ্গা সোপানের মূলে
আলসে পড়িত ঢুলে,
একটি স্বরের মত পড়িত ঘুমাইয়া রে। (ঊষা)

প্রদীপের অধিকাংশ কবিতাই প্রেম-গীতি; নিসর্গমূলক কবিতা কয়েকটি মাত্র—ঊষা, বউ-কথা-কও, শোভা, বর্ষা—সন্ধ্যা, ঊষা ও সন্ধ্যা। আনুষ্ঠানিক কবিতা দু-একটি আছে, যেমন—'কোন সমালোচকের প্রতি'।

কবির দ্বিতীয় কাব্য 'কনকাঞ্জলি' (১৮৮৫) এক বৎসর পরেই প্রকাশিত হয়। কাব্য হিসাবে কনকাঞ্জলির বড় বিশেষ স্বাতন্ত্র্য নেই। প্রদীপ কাব্যের বিষয়-বস্তু, ছন্দ ও ভাষা এখানে প্রতিধ্বনি তুলেছে।

তৃতীয় কাব্য হ'ল 'ভুল' (১২৯৪)। এর পরে 'শংখ' (১৩১৭) ও 'এষা' (১৩১৯) কাব্যদ্বয় প্রকাশিত হয়। 'ভুল' কাব্যের সঙ্গে এই দুইখানির প্রায় বিশ বৎসরের ব্যবধান। কবি এই বিশ বৎসর নীরব ছিলেন না। 'প্রদীপ' ও 'কনকাঞ্জলি'র দ্বিতীয় সংস্করণ যথাক্রমে ১৩০০ এবং ১৩০৪ সালে প্রকাশিত হয়। বস্তুত শুধু সংস্করণ ভেদ নয়, কাব্য দুখানি প্রায় পুনর্লিখিত। 'ভুল' কাব্যে নবীন কাব্য-জিজ্ঞাসা প্রতিবিম্বিত। কবি নামপত্রে গ্যয়টের উদ্ধৃতি দিয়েছেন,

All good lyrics must be reasonable as a whole, and in details a little unreasonable.

'ভুল' কাব্যে কবির রোম্যানটিক আকুলতা 'প্রদীপ' ও 'কনকাঞ্জলি' অপেক্ষা তীব্রতর রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

যাও, যাও, যাও।
আমি জগতের দূরে তুমি জগতের পুরে,
তোমায় আমায় হবে কেমনে মিলন?
আমার অস্তিত্ব খেলা, যা কিছু ভাঙ্গিয়া ফেলা!
তোমার আমার চেয়ে কেবল ক্রন্দন।
তোমায় আমায় হবে কেমনে মিলন? (যাই—যাও)

উপহার, উষা, নিশীথে, চুম্বন, দম্পতির নিদ্রা, রমণী হৃদয়, যাই-যাও, শেষ প্রভৃতি কবিতায় কবির প্রণয়-আকুতি প্রকাশ পেয়েছে।

গোপাল, শিশু-হারা কবিতাদ্বয়ে অন্য প্রসঙ্গ রয়েছে।

ব্যক্তি-প্রশস্তিমূলক কবিতা তিনটি আছে—অধরলাল সেন, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ। এই তিন কবিই নারী-ভাবনার ক্ষেত্রে উগ্র রোম্যানটিক চেতনার স্ফুরণ ঘটিয়েছিলেন,—সার্থকতার বিচার আপাতত করছি না। রবীন্দ্রনাথের উপর লিখিত কবিতাটি অনবদ্য।

'ভুল', 'প্রদীপ' ও 'কনকাঞ্জলি'র সমালোচনাপ্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক লিখেছিলেন, "ভাষায় যাহা ফুটাইতে না পারিয়াছেন, আকুলতায় তাহা ফুটাইয়াছেন।"[৪]

'ভুল' কাব্যে ভাষার ক্ষেত্রে কিছুটা সক্ষমতা দেখা দিয়েছে; যথা—

চুম্বন থামিয়া গেছে; কাঁপিছে অন্তর,
যোগের পরেতে যেন সমাধিতে বাস। (দম্পতির নিদ্রা)

এত ভাষে, এত শ্বাসে, এতেক ক্রন্দনে,
এত স্পর্শে, এত বর্ষে, এতেক বন্ধনে,
জগতের কতো রাজ্য হ'তো যে বিলয়। (রমণী হৃদয়)

এ ভাষায় রবীন্দ্র-কাব্য-ভাষার ছিটাফোঁটা লাগে নি, একথা জোর ক'রে বলা যায় না। রবীন্দ্র-প্রশস্তি নিতান্ত প্রতিভা প্রশস্তি নয়, ঋণ-স্বীকৃতি-জনিতও বটে।

কবির 'প্রদীপ' ও 'কনকাঞ্জলি'র দ্বিতীয় সংস্করণে যে পরিমার্জন দেখা যায়, তা শুধু ব্যক্তিগত বিকাশ-লক্ষণ নয়, রবীন্দ্র-কাব্য প্রভাবজনিতও বটে। কবির কাব্যদ্বয়ের সংস্করণভেদে এই পাঠভেদ প্রসঙ্গ ডাঃ সুশীলকুমার দে মহাশয়ের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি; কিন্তু তিনি এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন নি।[৪ক] সাহিত্য পরিষৎ অক্ষয়কুমারের যে-রচনাসংগ্রহ প্রকাশ করেছেন—তাতে এ-বিষয়ে আশ্চর্য নীরবতা (সন্দেহজনকও বটে) দেখা যায়।

অক্ষয়কুমারের ভাষার মধ্যে মোহিতলাল বাঙ্গালীর নিজস্ব ভাষার, খাঁটি বাঙ্গালী বুলির হদিশ পেয়েছেন! বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের ভাষার মধ্যে খাঁটি বাঙ্গালী বুলির সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন;—প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে মোহিতলাল অক্ষয়কুমারের মধ্যে তার নজির পেলেন!

আমরা পুরাতন ও নতুন উভয় সংস্করণ থেকে দুইটি অংশ তুলছি।

একবার তোমারে দেখিয়া
আরবার তাহারে দেখিয়া
মনে হয় দুইজনে দুইটি মেঘের মত
যাইতেছে একটি হইয়া।
আমি বুঝি আমি যেন একটি বিদ্যুৎ মত
তোমাদের মাঝখানে ছুটেছি লুটিয়া।
মিশাইয়া-মিলাইয়া-মিশিয়া মিলিয়া।

(পুরাতন সংস্করণ—৪৮)

একবার, নারী, তব প্রেম-মুখ হেরি,
আরবার প্রকৃতির শ্যাম-বুক হেরি,
মনে হয়, দুইজনে দু খানি মেঘের মত
রহিয়াছে জগতেরে ঘেরি'।
আমি তোমাদের মাঝে একটি বিদ্যুৎ সম
চকিতে জ্বলিয়া
মিশায়ে-মিলায়ে, যাই মিশিয়া-মিলিয়া!

(নূতন সংস্করণ—৬)

এই দুইটি নিদর্শনের মধ্যে কোনটিতে খাঁটি বাঙ্গালী বুলির প্রকাশ ঘটেছে? "যে ভাষায় ভারতচন্দ্র হইতে ঈশ্বরগুপ্ত পর্যন্ত সকল কবির বুলি নূতন করিয়া

প্রাণ পাইয়াছে",[৫] তার নিদর্শন কি প্রথম সংস্করণে অধিকতর ? মোহিতলাল অক্ষয়কুমারের কাব্য-ভাষার অমসৃণতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, অথচ তাঁর রবীন্দ্র-বিদ্বেষ (পরবর্তী যুগের) তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বী কাব্য-ভাষার অস্তিত্ব আবিষ্কারে উৎসাহিত করেছে। অক্ষয়কুমারের রুগ্‌ণ উদাহরণগুলিকে তিনি আঁকড়ে ধরেছেন। এবং একবার যখন আঁকড়ে ধরেছেন, তখন তাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বিস্তৃত করতে হবে। ইংরেজীতে যাকে বলে 'lionise' করা, এ তাই।

বস্তুত 'প্রদীপ' ও 'কনকাঞ্জলি'তে সংস্করণান্তরের ফলে যে-ভাষার বিকাশ ঘটেছে, তা সন্ধ্যা-সঙ্গীত পরবর্তী রবীন্দ্র-কাব্য-ভাষা। অক্ষয়কুমারের অসন্তোষ, অতৃপ্তি ও দুঃখ-বিলাসের মধ্যে সন্ধ্যাসঙ্গীতের মেজাজই দীপ্যমান, যদিও ভাষার ক্ষেত্রে তিনি এই স্তর উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছেন।

কবি অক্ষয়কুমারের প্রথম সংস্করণে ব্যবহৃত ত্রিপদীতে ছয়মাত্রা ও আট-মাত্রার মধ্যে অবিরত দ্বন্দ্ব লেগেছে; কবি এখনও মনস্থির করতে পারেন নি বা তাঁর নিজস্ব বাহনটি খুঁজে নিতে পারেন নি। দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে কবি এই বিপদ উতরে গেছেন; আর বাংলা কাব্যে তখন এই দ্বিধা অবসানের উপযুক্ত নজির ছিল। মানসী কাব্য ১২৯৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়ে গেছে।

শুধু ছয়মাত্রা ও আটমাত্রার দ্বন্দ্ব নিরসন নয়, উপ-পর্ব বিভাগেও একটা শৃঙ্খলা বা নিয়ম দেখা যায়—নতুন সংস্করণে উপ-পর্ব বিভাগে প্রধানত ৩ : ৩ ॥ ২ মাত্রাবিন্যাস দেখা যায়। মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম সত্ত্বেও এখানে একটা সাধারণ সূত্র বা নিয়ম দেখা যায়। প্রথম সংস্করণে এই নিয়ম ছিল না—ফলে বহু কবিতা অধিকাংশস্থলে শ্রুতিকটু ঠেকেছে।

পুরাতন সংস্করণ—

জলন্ত নয়নান্তরে করিত কি গরজন
রুদ্ধ তরঙ্গিনী ?
শ্মশান-হৃদয় মাঝে দাপটে বেড়াত ছুটে
আশা উন্মাদিনী ?
ফুলময়ী স্নিগ্ধ স্মৃতি জ্বালাময়ী উল্কালতা
আজি কি হইত ?
প্রেম-নদী মন্দাকিনী বরষার পদ্মারূপে
আজি কি বহিত ? (পৃ-২১-২২)

নতুন সংস্করণ—

জ্বলন্ত নয়ন-প্রান্তে করিত কি গরজন
রুদ্ধ তরঙ্গিনী ?
হৃদয়-শ্মশান মাঝে বেড়াত কি কেঁদে কেঁদে
আশা পাগলিনী ?
কুসুম-কোমলা-স্মৃতি ছুটি কি উল্কাসম
জ্বালায়ে আপনা ?
পূততোয়া প্রেম-গঙ্গা বরষার পদ্মা সম
হত কি ভীষণা। (পৃ—২৬)

এখানে যুক্তাক্ষরের মূল্য সম্পর্কে যে সচেতনতা আছে, তা প্রথম সংস্করণে অনুপস্থিত! নতুন সংস্করণে কবি যুক্তাক্ষর বহুল পরিমাণে পরিহার করেছেন। এবং অন্তত একটি ক্ষেত্রে যুক্তাক্ষরকে তিনি মূল্য দিয়েছেন; তাকে যুগ্মধ্বনি ধরেছেন। "ছুটি কি উল্কাসম"—আটমাত্রার চরণ; এখানে 'উল্কা' শব্দটি নিঃসন্দেহে তিন মাত্রামূলক। এই যুগ্মধ্বনিবোধ মানসী-পূর্ব কাব্য-সাহিত্যে অনুপস্থিত। পর্ব-বিভাগেও কবির কুশলতার রয়েছে প্রমাণ। প্রথম সংস্করণের 'জ্বলন্ত নয়নান্তরে'—এখানে হয়েছে "জ্বলন্ত নয়ন-প্রান্তে"। এর ফলে ৩ : ৩ : ২ মাত্রাবিন্যাস সম্পূর্ণ রক্ষিত হয়েছে। এবং এই সমস্ত সংশোধনের ফলে প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা দ্বিতীয় সংস্করণে সঙ্গীতমাধুর্য বহুগুণ বেড়ে গেছে। কিন্তু তারপর তিনি আর এগুতে পারেন নি; সম্ভবতঃ ভিন্নতর কাব্যবোধ ও কাব্যাদর্শ তাঁর কাছে অনুসরণীয় ব'লে মনে হয়েছিল। মোহিতলাল বলেছেন, "অতিরিক্ত সংযমের ফলে ভাষার একপ্রকার রুক্ষতা ঘটিয়াছে, ছন্দের গতি ও কল্পনার রসাবেশ মন্দীভূত হইয়াছে।"[৬] অতিরিক্ত সংযমের ফলে কিনা জানি না। সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর স্তুতি নিছক সংযমহেতু ব'লে মনে হয় না। কারণ "He belongs to the transcendental sensuous school but he has not caught the vices." রবীন্দ্র-পথে যতটুকু তিনি এগুতে পেরেছেন, ততটুকুই তিনি সার্থক। কিন্তু সে-যুগের রবীন্দ্র-বিরোধী সমালোচকেরা তাঁর এই স্বাতন্ত্র্যকে "he has not caught the vices" ব'লে স্তুতি গেয়েছেন। অথচ 'এষা'র কবি আবেগ-বিহ্বলতায় বেপথু নন,এ কথাও স্বীকার করা কঠিন।

দেবেন্দ্র সেন অক্ষয়কুমার বড়াল ও গোবিন্দ দাস—এই তিন জনেই একটি বিশেষ বৃত্তের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছেন। এই তিনজনের রচনায় নারীর গৃহগত রূপের প্রশস্তি আছে। প্রেমের বিবিধ রূপ তাঁদের কাব্যে দেখা দেয় নি—পূর্বরাগ প্রায় অনুপস্থিত। দাম্পত্য-প্রেম দিয়েই তাঁরা শুরু করেছেন; এবং শেষও করেছেন দাম্পত্য-প্রেমে। দেবেন্দ্র সেনে এই দাম্পত্য-প্রেম তৃপ্তির সস্মিত ভাষনে উদ্বেল; আর সেই দাম্পত্য-প্রেম আশানুরূপ তৃপ্তি সাধনে ব্যর্থ ব'লে অক্ষয়কুমারের কণ্ঠে শুধু হাহাকার আর অতৃপ্তির সঙ্গীত। এই দাম্পত্য-লীলার মধ্যে যেটুকু উদ্দাম দেহবিলাসের সুযোগ আছে, গোবিন্দ দাস তার উলঙ্গ সদ্ব্যবহার করেছেন। তাঁর এই নগ্নতার মধ্যে অবশ্য একটা আদিম অসচেতন নির্ভীকতা আছে; যে নির্ভীকতার জন্য আদিম নরনারী বুকের বসন অপ্রয়োজনীয় মনে করে; যৌন অভিজ্ঞতাকে স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা ব'লে মনে করে। সমালোচকেরা বলেছেন যে, গোবিন্দ দাস বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন না। সম্ভবতঃ এই কারণেই নানাজনের নানবিধ তর্জনী-সংকেত তাঁর মুখ বন্ধ করতে পারে নি।

গোবিন্দ দাস (১৮৫৫-১৯১৮) একেবারে অশিক্ষিত ছিলেন, একথা ঠিক নয়। তাঁর জীবনীকার স্বীকার করেছেন যে, তিনি রবীন্দ্র-কাব্যের উৎসাহী পাঠক ছিলেন। আমাদের মনে হয়, তিনি 'কড়ি ও কোমলে'র নারী-দেহ-অভিজ্ঞতার উপর ভোগস্পৃহার রঙ্ চড়িয়ে আসরে নেমেছিলেন। হয়ত তাঁর এই উগ্রতা তাঁর ব্যক্তিজীবনের বহু বঞ্চনার হেতু। চাকুরীজীবনে ও দাম্পত্য-জীবনে তাঁকে নানা আঘাত সইতে হয়েছিল, সেই আঘাতগুলিই তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন কবিতার মধ্য দিয়ে। তাতে কাব্যলক্ষ্মীর আননে কালসিটে পড়েনি, শুধু প্রেম-আলাপনের উদ্দাম নিলাজ চিহ্নই অঙ্কিত হয়েছে।

১২৮৯ বঙ্গাব্দে রাজকৃষ্ণ রায় সম্পাদিত বীণা পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হয়। তারপর ১২৯৪ বঙ্গাব্দে তাঁর 'প্রসূন,' 'প্রেম ও ফুল' প্রকাশিত হয়। 'কুঙ্কুম' প্রকাশিত হয় ১২৯৮ বঙ্গাব্দে।

গোবিন্দদাসে প্রেমের নানারূপ আছে—অল্পপরিমাণে পূর্বরাগও বর্ণিত। তা-ও অনেকক্ষেত্রেই নাবালিকা স্ত্রীর সহিত বালক স্বামীর ভাবাতিশয্য।

বহুদিন হল, ভাল নাহি পড়ে মনে,
খেলেছি শৈশবে এক বালিকার সনে।

বাগানে লইয়া তারে পরায়েছি ফুল,
খোঁপায় গুঁজিয়া দিছি মঞ্জরী মুকুল।

(বহুদিনের পর দেখা)

কিন্তু এই প্রসঙ্গ গৌণ, মুখ্য হল—

সেই মূর্তি ছিন্নমস্তা উন্মাদিনী খড়্গহস্তা
শোণিতে তর্পন কর প্রেমপিপাসার
সেই মূর্তি শক্তি মন্ত্রে হৃদয় শোণিতযন্ত্রে
পূজিতেছি প্রাণময়ি চরণ তোমার।

(দুঃখিনী)

সারা কাব্যে এই সুরেরই প্রাবল্য ঃ

প্রকৃতি দেখেনি আর যুগান্তে কখন,
এত দূরে এত গাঢ় দৃঢ় আলিঙ্গন !
ভেঙ্গে যায় বুক যেন ভেঙ্গে যায় হাড়
রেণু রেণু হয়ে যায় প্রাণ দু'জনার !
চুম্বিতে দোঁহারে দোঁহে করিতেছি পান,
কি আকাংক্ষা অগ্নিময় শিখা লেলিহান !
দেখিতে দোঁহারে দোঁহে করে ভস্মময়,
কি ভস্মলোচন প্রেম কাম ভস্ম হয় ! (ছবি)

এই উদগ্রতা ছাড়াও একটি স্নিগ্ধতার চিত্রও তাঁর কাব্যে অনুপস্থিত নয়।

ক্ষুদ্র এ কুটীর দ্বারে ক্ষুদ্র আঙ্গিনায়
সোনার সমুদ্র হেসে উছলিয়া যায় !
সোনার যৌবন ফোটে সোনার কমল,
কোলে যে সোনার শিশু হাসে খলখল।
সোনা মুখে চুম্বে শিশু এক পয়োধর,
সোনা হাতে চুচুকাগ্র খুঁটিছে অপর। (ছবি)

* * *

যুগল নয়ন দুটি
রহিয়াছে আধ ফুটি,
শরত-প্রভাত পদ্ম ডাগর ডাগর (সারদাসুন্দরী)

গোবিন্দদাস 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর 'নিও রিয়্যলিষ্ট' সাহিত্যিকদের গুরু হ'তে পারতেন, কিন্তু পারেন নি—কারণ কল্লোল-গোষ্ঠীর সাহিত্যিকরা সচেতনভাবে নগ্নতার প্রশ্রয় দিয়েছেন ; আর গোবিন্দদাসে আদিম অজ্ঞ নগ্নতা। উপমায়-উৎপ্রেক্ষায়ও কবির স্বাতন্ত্র্য আছে ; 'বাঙাল' কবি 'বাঙাল' দেশের প্রকৃতি থেকে উপমার উপকরণ সংগ্রহ করেছেন—তাতে বাংলা কাব্যের বৈচিত্র্য বেড়েছে। শব্দ-নির্বাচনেও এই আঞ্চলিকতার পরিমাণ কম নয়।

* * *

প্রিয়নাথ সেন (১৮৫৪-১৯১৬) রবীন্দ্র-বন্ধু রূপে সর্বজনপরিচিত। কবিহিসাবে তাঁর পরিচয়-ও এই বৃত্তের মধ্যেই পরিসমাপ্ত। তবু সে-যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর শব্দ-চয়নে ধ্বনিমাধুর্যের প্রতি সযত্ন অনুরাগ লক্ষ্যণীয়। তাঁর সনেট-গঠন-নৈপুণ্যও প্রশংসনীয়। এ-ক্ষেত্রে তিনি 'কড়ি ও কোমলে'র কবি অপেক্ষা দক্ষতর কারিগর। কারণ তাঁর অষ্টক-ষটক্ বিভাগ নিয়মানুগ।

অচিরে হায় বসন্ত এল—গেল চলে—
নিভে গেল কোকিলের দীপক-পঞ্চম,
ভঙ্গুর কুসুম-শোভা ভেঙ্গে পড়ে ঢলে,
প্রভঞ্জনে পরিণত—উৎপাত বিষম—
অলস—পরশ-মধু মলয়ার বায় !
যায় যদি যাক চলে ক্ষণিকের স্নেহ।
অফুরাণ ফুলবীথি কোথা তাহা হায় !
এ শুধু ছলনার মরীচিকা গেহ।
যে মদিরা পান তরে প্রাণ তৃষাতুর
কোথা তাহা ?—কোথা জ্বলন্ত যৌবনা তব
শোভনা প্রকৃতি কবি ? বিশাল চিকুর
আবরে প্রকাশে যার তনুর বিভব—
নগ্ন দেহ—কম্প্র বক্ষ—মদির নয়ন
ঢালুক অশেষ নেশা—পুলক দহন।

* * *

বলেন্দ্রনাথ, শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও বেণোয়ারীলাল গোস্বামী মোটামুটি সে-যুগের সুপরিচিত কবি।

॥ ২ ॥

মহিলা-কবিদের রচনায় নারী-জীবনের রহস্য সর্বদা ধরা পড়েনি, কিন্তু সংবাদ ধরা পড়েছে। এই সংবাদ নানা চিত্রের মধ্যে দেখা দিয়েছে ; এই চিত্র ঘরোয়া চিত্র হয়েছে তাঁদের বিশিষ্ট আবেষ্টনীর গুণে। সরোজকুমারী, কামিনী রায় ও পরবর্তীকালের কবি কাদম্বরী দেবীর কাব্যে নারী-জীবন-রহস্যের কিছু কিছু কুয়াশা দানা বেঁধেছিল—কিন্তু কোন সময়ই তা এমন নিবিড় ও অকৃত্রিম হয়নি, যার ফলে তাকে মিসেস ব্রাউনিং বা স্যাফোর সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

স্বর্ণকুমারী দেবী এঁদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত পুরুষালি বিশিষ্টতার অধিকারিণী ; তাঁর রচনায় নারী-বৈশিষ্ট্যের সর্বাধিক অভাব। তাঁর গাথা, বা জাতীয়-সঙ্গীত, বা ধর্ম-সঙ্গীত—কোন রচনাতেই তাঁর ব্যক্তি-ভাবনার ছোঁয়া বেশি লাগেনি, আর লাগেনি বলেই নারী-গুণের বিকাশ ঘটেনি।

স্বর্ণকুমারী দেবী বাংলা সাহিত্যের প্রথম সাহিত্যিক, যিনি পুরুষের তুল্য সম্মানের অধিকারিণী—সম্ভবতঃ এই সম্মানই তাঁকে স্বধর্মচ্যুত করেছিল। পরবর্তীকালে শ্রীমতী অনুরূপা দেবীও অনুরূপ শ্রদ্ধার পাত্রী ; সম্ভবতঃ অনুরূপ স্বধর্ম-বিরোধিতা তাঁর রচনাতেও দুর্লক্ষ্য নয়।

স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী পত্রিকায় আধুনিক গীতিকবিতার উদ্ভবে প্রচুর উৎসাহ দিয়েছিলেন। নিজের লেখা ছাড়াও এই কারণটির জন্যও তিনি বাংলা গীতিকাব্যের আধুনিক ইতিহাসে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

স্বর্ণকুমারীর 'গাথা' (১২৯১)-রচনায় অক্ষয় চৌধুরী ও বালক রবীন্দ্রনাথ, 'সঙ্গীত'-রচনায় বিহারীলালের প্রভাব দেখতে পাওয়া কঠিন নয়। এ-ছাড়া গীতিনাট্য ও কাব্যনাট্যও তিনি রচনা করেছিলেন। এখানে সম্ভবতঃ শুধুমাত্র কনিষ্ঠভ্রাতার দৃষ্টান্তই তাঁর মনোহরণ করেছিল।

বসন্ত উৎসব (১৮৮০), অতৃপ্তি (কাব্যনাট্য)—এই গ্রন্থদ্বয়ে তাঁর ছন্দ-কুশলতা ও শব্দ-প্রয়োগ-নৈপুণ্যের ছাপ আছে। এ ছাড়া যুগান্ত কাব্যনাট্য, প্রেমপারিজাত কাব্য প্রভৃতিতেও তাঁর কবিত্বের প্রমাণ আছে।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪) নারী-জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীকে আশ্রয় করেছেন, সম্ভবত অকাল বৈধব্য তার কারণ। প্রথম জীবনের কবিতায় জীবনের রসোচ্ছলতার দিকও তাঁর চোখকে ফাঁকি দিতে পারে নি। স্বর্ণ-

কুমারী দেবীর সখী এই মহিলাকবি ভারতী পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর কবিতাহার (১৮৭৩), ভারতকুসুম (১৮৮২), অশ্রুকণা (১৮৮৭) ও আভাষ (১২৯৭) ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়।

তাঁর 'কবিতাহার' কাব্যে বিহারী-প্রভাব সুস্পষ্ট ; ছন্দটুকু পর্যন্ত।

হাসিতেছে বসি কুসুম দশনে,
ছুটেছে সুবাস পবন মুখে।
শুনি অলিকুল ধাইছে সঘনে,
লুটিবারে মধু মনের সুখে। (ঊষা-বর্ণন)

'কবিতাহার' কাব্যে 'বঙ্গ মহিলাগণের হীনাবস্থা,' 'সঙ্গিনীর বৈধব্য' শীর্ষক দুইটি কবিতা আছে। এ ছাড়া একটি কবিতায় লর্ড মেয়োর মৃত্যুতে শোকোচ্ছ্বাস আছে। ভারতকুসুম কাব্যে আছে প্রকৃতি-বর্ণনা, পতি-বন্দনা এবং দেশ-মাতৃকা-বন্দনা। 'আভাস' কাব্যই তাঁর অনেকটা সার্থক রচনা। এ কাব্য থেকে অংশবিশেষ তুলছি—

হৃদয় কৌটায় আমি জনম ভরিয়া,
প্রেম-হলাহল সখী করেছি সঞ্চয়।
করিব তা পান এবে পরাণ পুরিয়া,
আত্মহত্যা করিবার এই যে সময়। (আত্মহত্যা)

শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা ছেড়ে গিরীন্দ্রমোহিনী প্রকৃতি-বর্ণনাতেই বেশী ব্যাপৃত থেকেছেন। সম্ভবতঃ তাঁর ব্যক্তিগত জীবন এক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ ছিল। তাঁর লেখার শুভ্রতা ও চারুতা আজও পাঠকের প্রশস্তি আকর্ষণ করে।

হিরন্ময়ী দেবী ও সরোজকুমারী দেবী (১৮৭৫-১৯২৬) 'ভারতী'র কবি।

হিরন্ময়ী দেবী (১৮৭০-১৯২৫) ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন ভারতী সম্পাদিকার কন্যা। কিন্তু তাঁর রচনায় মাতৃ-স্নেহের রেখাপাত ঘটেনি। ভারতীতে প্রেমফোটা (অগ্রহায়ণ ১২৯৩), কিরণের মৃত্যু (ফাল্গুন, ১২৯৩) বসন্তের পাখী (আষাঢ়, ১২৯৪) প্রভৃতি কবিতা প্রকাশিত হয়।

শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ ল'য়ে ধীরে ধীরে ঢ'লে,
পড়েছে অলস রবি পশ্চিমের কোলে,

না পেয়ে দেখিতে তারে, কিরণ তাহার,
আকুল ব্যাকুল হ'য়ে খোঁজে চারিধার।
হেথায় হোথায় ক'রে ফেরে সোনামুখী,
বকুলের কোলে গিয়ে মারে উঁকিঝুঁকি।

*　　　　*　　　　*

বিষন্ন কিরণগুলি ধীরে অতি ধীরে—
সরে যায়—ডুবে যায়—নয়নের নীরে।
প্রকৃতি তাহার শোকে রজনীর পাশে
মূরছি পড়িয়া যায় অন্ধকার বাসে। —(কিরণের মৃত্যু)

এর মধ্যে যে মগ্নচারিতা আছে, তার মূল্য কম নয়। এবং যে-প্রকৃতি সম্ভোগ, তথা মর্ত্য-আসক্তি আছে, তার মূল্যও কম নয়। পরে কবি ধীরেধীরে অধ্যাত্ম-জীবনের প্রসঙ্গে বেশি মেতেছেন। 'নতুন জীবন' কবিতাটি তার সাক্ষ্য।

দেখ চেয়ে একবার　　অসীম রহস্যময়
　　অনন্ত এ বিশ্ব ;
দেখ সেথা কিবা গায়　　কোন্ কথা বলে তোর
　　প্রতি নব দৃশ্য।　　—(নতুন জীবন)

এই অযথা বিস্ময়বোধ সম্ভোগবোধ থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত। কবি হিরণ্ময়ী দেবী সংসার-আশ্রম থেকে অন্য আশ্রমের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন।

সরোজকুমারী দেবী বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন ; বিশেষ ক'রে রোম্যানটিক কাব্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল নিবিড়। উপরন্তু রবীন্দ্র-কাব্যের ফুটন্ত মদিরা তিনি আকণ্ঠ পান করেছিলেন।

তাঁর বার্ণসের অনুবাদ ১২৯৫ সালে অগ্রহায়ণ মাসের ভারতীতে বেরিয়েছিল। ক্রমশঃ তাঁর বহু কবিতা ভারতীতে প্রকাশিত হয়। এগুলি পরে তাঁর 'হাসি ও অশ্রু' কাব্যে সংকলিত হয়েছে। তাঁর কবিতায় আন্তরিকতা আছে।

চিরদিন অতৃপ্ত এ হৃদয়ের মাঝে,
একই বাসনা জাগে একই তিয়াস ;
পরাণের উপকূলে ধীরে ধীরে আসি,
আকুল মরম হতে উঠিছে নিঃশ্বাস।　　—(বাসনা)

মানকুমারী বসু, প্রমীলা নাগ, বিনয়কুমারী বসু, নগেন্দ্রবালা মুস্তফী—সবাই এ-যুগে নারীজীবনের নানা প্রসঙ্গ কাব্যের ক্ষেত্রে আমদানী করেছেন। ইতিপূর্বে পুরুষের কণ্ঠে আমরা সহানুভূতিসূচক কথাবার্তা অজস্র শুনতাম, এখন তার পরিবর্তে সুস্পষ্ট স্বতন্ত্র দাবীদাওয়া শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু ভারতীয় জীবনের স্থবিরত্ব এমনই নিশ্চিত যে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-কেশব সেনের আন্দোলন সত্ত্বেও নারীর কেবল একটি রূপের সঙ্গেই আমরা পরিচিত—সে-রূপ গৃহগত রূপ—গার্হস্থ্য রূপ। এই রূপ বিশিষ্ট হ'তে পারে, কিন্তু সংকীর্ণ—এ বিষয়ে সন্দেহ কি ?

এই সংকীর্ণ অঙ্গনে যতটুকু সৌগন্ধ্য বৈচিত্র্য এবং জীবনের তরঙ্গাভিঘাত আমন্ত্রণ সম্ভব, ততটুকুই তাঁরা আমন্ত্রণ করেছিলেন। এবং তার এক শিল্পসম্মত প্রকাশ ঘটেছিল কামিনী রায়ের কাব্যে। তাঁর 'আলো ও ছায়া' ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়েছিল।

'আলো ও ছায়া'র কাব্য-কলাকৌশলে নিজস্বতা ফোটে নি, কিন্তু বক্তব্যে ফুটেছিল। অধিকাংশ কবিতাই কবির ব্যক্তিগত অন্তর্বেদনাকে সম্বল ক'রে লেখা। সুখ, বর্ষসঙ্গীত, নিয়তি, মুগ্ধপ্রণয়, সে কি, এতটুকু, চাহি না প্রভৃতি কবিতায় কবির নারী-মনের অনেক গূঢ় খবর আছে। কবির প্রেম-সঙ্গীত বিবাহ-উত্তর প্রেম-সঙ্গীত নয়, বিবাহ-পূর্ব প্রেম-সঙ্গীত ; অর্থাৎ পূর্বরাগের গান।

কবির রচনায় নানা কবির কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত। 'আশার স্বপন' কবিতায় হেমচন্দ্র দেখা দিয়েছেন—

আর দেখিনু যতেক ভারত সন্তান
একতায় বলী, জ্ঞানে গরীয়ান,
আসিছে যেন গো তেজো মূর্তিমান,
অতীত সুদিনে আসিত যথা।

'চাহি না' কবিতায়—

প্রকৃতি জননী, প্রকৃতি ভগিনী
নিসর্গ আমার প্রাণের সখা,
আমারে তুষিতে ফুল মৃদু হাসে,
নাচে জলে রবি কিরণ লেখা।

এই কাব্য-রীতি সম্পূর্ণই বিহারীলাল-অনুগত। আবার 'বৈশম্পায়ন' কবিতায় অন্য ভঙ্গি প্রবল—

অচ্ছোদ-সরসী তীরে বিচরিছে ধীরে ধীরে
পাগল পরাণ ;
প্রতি তরু, প্রতি লতা কি যেন কহিছে কথা
উন্মাদিয়া কান।
সরসীর স্বচ্ছ জল, রবি করে ঝলমল,
কত কথা বলে ;
কি ও ভাষা মনে নাই, শুনে শুধু চারি ঠাঁই,
সঙ্গীত উথলে।

এ রীতি রবীন্দ্র-রীতি।

অবশ্য পরানুকরণ ছাড়া মৌলিক প্রয়াসও দেখা যায়,—

"প্রণয় ?"
"ছিঃ !"
"ভালবাসা-প্রেম ?"
"তাও নয় !"
"সে কি তবে ?"
"দিও নাম-দিই পরিচয়।"
"আসক্তিবিহীন শুদ্ধ ঘন অনুরাগ,
আনন্দ সে, নাহি তাহে পৃথিবীর দাগ।" —(সে কি-১০৮)

কবির এই কাব্যে আত্ম-কথনই প্রবল। তবে ইতিহাস ও সংস্কৃত সাহিত্য-আশ্রিত কবিতা আছে। কৃষ্ণকুমারীর পরিণয়, চন্দ্রাপীড়ের জাগরণ, পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতা কবিতা আত্ম-কথন মূলক কবিতা নয় ; তবু এ-গুলিতে আত্ম-ভাবনার ছায়াপাত আছে। কারণ বেদনাই এগুলির মূল রস। এ-কাব্যে বাৎসল্য রসের কবিতা আছে—অনাহূত, চিন্ময় প্রতি, নববর্ষে কোন বালিকার প্রতি। এ-কবিতাগুলিতেও অকৃতার্থ মাতৃত্বেরবেদনাই প্রধান। অর্থাৎ ব্যর্থতাজনিত বেদনাবোধই তাঁর প্রধান উপজীব্য।

আত্ম-কথন-ইচ্ছা প্রবলতর হ'য়ে ওঠায় পরবর্তী কাব্যে তিনি অধিকতর পরিমাণে রবীন্দ্রনাথের সমীপবর্তী হয়েছেন। কারণ এই সামীপ্য তাঁর দ্বিধা,

সঙ্কোচ, ভীরুতা ও ঔদাসীন্যবোধকে হৃদয়ের ভাষা,—বুকের বাণী খুঁজে নিতে সহায়তা করেছে। তাঁর সঙ্কোচের ভাষা উদ্ধৃত করা গেল—

আমি চেয়েছিনু থাকিতে দূরে,
আপন গোপন স্বপন পুরে,
তুমি কোন পথে কত যে ঘুরে,
সহসা আসিয়া দাঁড়ালে কাছে ? (বিস্মিতা—পৃ-৭)

যেখানে অনুনয়, সেখানেও ভাষা শালীন ও চাপা :

দাঁড়াও, এ হাতখানি ছুঁয়ো নাকো হাতে
আপনার হিয়া পানে চাও,
ভেবে দেখ, কোথা ছিলে জীবন-প্রভাতে,
মধ্যাহ্ন এ, মনে রেখ তাও।
তুমি ভালবাসা পেয়ে, দাও ভালবাসা,
ভাসিবারে চাহ স্বপ্নস্রোতে ;
আমার প্রেমের সাথে অনন্ত পিপাসা,
মিটিবে কি তাহা তোমা হতে ! (দাঁড়াও—১৬)

যেখানে আকুলতার প্রকাশ, সেখানে উৎকণ্ঠা আছে হয়ত, কিন্তু উদগ্রতা নেই ;

চারিদিকে বাজে পদধ্বনি,
বারবার চমকে হৃদয়,
কখন বা আবরি নয়ন,
প্রত্যাশার কি জানি কি হয়।
মুখে বলি, "সে তো আসে নাই।"
মন বলে, "বুঝি আসিয়াছে।"
পুনঃ ভাবি আশা রাখিব না,
নিরাশ হইতে হয় পাছে।

* * *

যেথা পদধ্বনি নাই, কোথা সেই স্থান ?
সেথায় বাঁধব আমি ঘর,
সৃষ্টির আরম্ভ হতে প্রলয় অবধি
পশে নাই, পশিবে না নর।

শব্দহীন, জনহীন, সন্ধ্যাহীন দেশে
ভুলি যাব এক চিন্তা—'ঐ আসিছে সে।"

(—পদধ্বনি—পৃ-২২)

দুই একটি কথিকাধর্মী (Tale) কবিতা আছে—ইন্দু ও যামিনী, তিনকন্যা, পরীক্ষা। কবি কামিনী রায় ছিলেন শান্তরসের কবি। দাহ, দীপ্তি প্রচণ্ডতা ও উদ্দামতা তাঁর চরিত্রধাতুর সঙ্গে খাপ খায় না। তাঁর বক্তব্যের নম্রতা ভাষা ও ছন্দের মধ্যেও লক্ষ্যণীয়। তাঁর ছন্দ পয়ার; কখনও দশ মাত্রার, কখনও চোদ্দ মাত্রার, কখনও বা দশ ও চোদ্দ মাত্রা মিশিয়ে। এই ছন্দে তাঁর অস্ফুট আত্মভাষণের ধর্ম রক্ষিত হয়েছে; দ্বিতীয়তঃ শব্দ-চয়নে তিনি সর্বদাই তদ্ভব শব্দের উপরে বেশি নজর দিয়েছেন। এতে বক্তব্যের ঘরোয়া ও আটপৌরে রূপ পুরোপুরি বজায় থেকেছে। এবং সে-যুগের পেশাদারী কাব্য-ভাষা থেকে তিনি স্বেচ্ছায় নির্বাসনদণ্ড নিয়েছেন—তাঁর নায়িকা মহাশ্বেতার মত।

॥ ৩ ॥

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ও বন্ধু। এঁরা তিনজনই তৎকালীন কাব্য-আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছিলেন;—বিহারীলাল ও হেমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রধানত বিহারী-শিষ্য; এবং শেষ পর্যন্তও বিহারীলালের কাব্যের ঘোর কাটাতে পারেন নি। ভারতীতে তিনি সারদামঙ্গলের একটি রসগ্রাহী সমালোচনা লিখেছিলেন।

বিহারী-আনুগত্যের পরিমাণ দেখুন—

উছলিছে রূপরাশি লাবণ্য-সাগরে,
কূলে কূলে উছলিছে যৌবনের জল;
তনুতে তরঙ্গমালা সাজে থরে থরে,
অঞ্চল পূর্ণরূপ হয়েছে চঞ্চল।
কপোলে তরঙ্গ দোলে চিবুকে খেলায়,
সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে নয়নে ঠেকিয়ে,
উচ্ছ্বসিয়ে ওঠে যেন হৃদয়-দোলায়
শব্দহীন কলস্বর ঘিরিয়ে ঘিরিয়ে;

উদ্বেলিয়া দেহসীমা ভেঙ্গে ফেলে কূল
ব্যাপ্ত হতে চাহে যেন বিশ্ব চরাচরে ;
ত্রিজগতে আছে যত অস্ফুট মুকুল
ফুটাবারে চাহে সবে চাপিয়া অধরে ;
যাচিয়া জগতে দিবে প্রেম-আলিঙ্গন,
রূপের শীতল জলে জুড়াবে যতন ! (—রূপ)

নগেন্দ্রনাথ একে চোদ্দ লাইনের মধ্যে পদচারণা করাতে চেয়েছেন, কিন্তু এ বক্তব্য চোদ্দ পংক্তির মধ্যেও যদি না থামত, তাহলেও আশ্চর্য হবার থাকত না। বিহারীলালের কবিতার মত তাঁর বলা কখনও বচনে শেষ হয় না। প্রেমের সঙ্গীত ব্যতীত বাৎসল্য রসের সঙ্গীতও তাঁর কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়েছে।

ধীরে ধীরে পড়ে পা, টলমল করে গা,
খসে খসে পড়ে হাসিরাশি,
উড়ে উড়ে পড়ে চুল, মুঠিতে ফুটন্ত ফুল,
ঝরে পড়ে চরণে উদাসী ;
চলে যেতে হেসে চায়, মার পানে ধেয়ে যায়,
থমকিয়া দাঁড়ায় আবার ;
নিবিড় নয়নে কিবা উজল পুলক বিভা,
কিবা শোভা রূপের ছটার। (—ছবি)

নগেন্দ্রনাথের কাব্য 'স্বপন-সঙ্গীত' ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

নগেন্দ্রনাথের সমবয়সী ছিলেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৫২)। কিন্তু তাঁর আদিযুগের কবিতায় বিহারীলাল ব্যতীত অন্য প্রভাব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর নয়। তাঁর 'কবিতা' (১২৯৬) ও 'যুগপূজা' (১৮৯২) কাব্যদ্বয়ে নানা প্রভাবের স্বাক্ষর আছে।

সম্ভবত যৌবনের ব্রাহ্ম-উৎসাহ তাঁকে রূপকধর্মী রচনায় প্ররোচিত করেছিল—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শিবনাথ শাস্ত্রীর রূপকধর্মী রচনা এক্ষেত্রে আদর্শ। হেমচন্দ্রের রূপক রচনাও তাঁর আদর্শ হতে পারে। তাঁর 'যুগপূজা' রূপকধর্মী রচনা। কবি অনুক্রমণিকা অংশে বলেছেন, "বর্বরের প্রেতপূজা হইতে কোমতের সমাজ-পূজা পর্যন্ত সর্বত্র এই একটি ভাব বিশেষ রূপে

পরিলক্ষিত হয় যে পূজা করিবার প্রবৃত্তি মানুষের মনে স্বাভাবিক। জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে "পূজা" যে বিভিন্ন আকার ধারণ করিবে, তাহার আর আশ্চর্য কি? বরং বিকাশ বলিতে গেলে এইরূপই বুঝিতে হয়।" সভ্যতার ইতিহাসকে তিনি চারি যুগে ভাগ করেছেন:

বাল্যযুগ—(ক) প্রকৃতি-পূজা, অগ্নি, বায়ু, সূর্য, উষা, বরুণ, আকাশ পূজা।
(খ) বহু দেবতা পূজা।

কৈশোর যুগ—নরহরি পূজা, অদ্বৈত পূজা।

যৌবন যুগ—নর পূজা, অজ্ঞেয় শক্তি পূজা,

প্রবীণ যুগ—ব্রহ্ম পূজা।

ব্রাহ্ম কবি শেষ পর্যন্ত নিজ কুলায়ে এইভাবে ফিরে এসেছেন।

বিজয়চন্দ্র পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন; নানা ভাষাবিদ্ ও দর্শন-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত এই ব্যক্তি বিশ্বের সর্বোত্তম সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর 'কবিতা' কাব্যগ্রন্থে তাঁর মনীষার প্রমাণ আছে। "গ্রন্থে যেমন পরে পরে বসাইয়াছি কবিতাগুলি সেরূপ পরে পরে লিখিত হইয়াছিল তাহা নহে; তবে এবারে কবি Browning-এর অনুকরণে একগাছি কাল্পনিক ভাবের সূত্র লইয়া কবিতাগুলি পরস্পর সাজাইয়া দিয়াছি মাত্র।"—ভূমিকা।

এ কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই আত্ম-ভাবনামূলক—কল্পনামিলন, মিলন, আগ্রহ, অতৃপ্তি, উত্তর, হতাশ কামনা, শাস্তি, কেঁদো না, আশঙ্কা, কে তুমি, বিচ্ছেদ, প্রবাসে, আত্মহত্যা। প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাও কয়েকটি আছে—শোভা, নলিনী, মলয়শিশু, অন্ধকার, ভুঁইচাপা। ব্যক্তি-বন্দনামূলক একটি কবিতা আছে—কেশবচন্দ্র সেন।

অধিকাংশ কবিতাতেই বিহারীলাল ছায়াপাত করেছেন—কল্পনামিলনে, শাস্তি প্রভৃতি কবিতায় সেটা খুব স্পষ্ট।

একি মোহময়, তোমার হৃদয়
একি প্রেমভরা ললিত গান!
শিথিল বেদনা, শিথিল চেতনা,
শিথিল হৃদয়, শিথিল প্রাণ! (—শাস্তি)

উদাহরণ আরও সংগ্রহ করা যেতে পারে। কবি নানা বিদেশী কবিতায় অনুবাদ করেছেন—কীটসের এণ্ডিমিয়ন থেকে কিয়দংশ, শেলীর স্মৃতি,

বর্ণসের সুখী বিপত্নী, হাইনের সঙ্গীত-সূচনা, ব্রাউনিং-এর ছায়া নিয়ে প্রেম-পরীক্ষা, জর্জ ইলিয়টের 'টু লাভার্স' অবলম্বনে প্রণয়ী-যুগল রচিত।

বিজয়চন্দ্রের আদিযুগের রচনায় সংশয় ও সন্দেহবাদই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। সে-যুগের কাব্য-জগতের মূল সুরের সঙ্গে তাই সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিজয়চন্দ্র সন্ধ্যাসঙ্গীত থেকে প্রভাতসঙ্গীতে আসতে পারেন নি।

তাঁর রচনায় বিহারীলালের ভাববিলাস এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের চিৎপ্রকর্ষ যুগপৎ চলেছিল। পরবর্তী জীবনে ভাববিলাস শুকিয়ে গিয়ে বুদ্ধির চড়াতেই তাঁর কাব্যের নৌকা আটকে যাবে। তখন প্রধানত ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও রঙ্গরস। কিন্তু সে হ'ল ভিন্ন যুগের সাহিত্য; আমাদের আলোচনার সীমানা-বহির্ভূত।

*   *   *   *

এই যুগে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একখানি কবিতার বই বেরিয়েছিল :—নাম আর্যগাথা (১৮৮২)। এ-কাব্য রচনার উদ্দেশ্য হ'ল :—

গাইব প্রমত্ত হয়ে আইস সঙ্গীত মোর,
ঘুমাইয়েছে আর্যজাতি ভাঙ্গিব সে ঘুম ঘোর। (—উদ্বোধন-পৃ-৷৷০)

উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ, কাব্য তদনুরূপ নয়। দেশপ্রেম ও ভগবৎ-প্রেম এই কাব্যের মূল উপজীব্য। আর্য-বীণা অংশ হেমচন্দ্রীয় কাব্য-কৃতির চর্বিত-চর্বণ। প্রণয়মূলক কবিতাও আছে। তবে তার ভিতর একটা বিষাদভাব আছে—সে-যুগের কাব্যে যে রকম শৌখীন বিষাদভাব বিরাজ করত, সেইরকম। এ হ'ল আনন্দচন্দ্র মিত্র, হরিশ নিয়োগী এবং নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষাদভাব। তাঁর 'নিশীথে গান শুনিয়া' কবিতাটির সঙ্গে তুলনা করুন হেমচন্দ্রের 'যমুনাতটে' ও 'হতাশের আক্ষেপ' কবিতা দুটিকে। সেখানে প্রকৃতি কবির আত্মভাবনার প্রচ্ছদপট শুধু নয়, উত্তেজিকা শক্তি হিসাবে কাজ করেছে।

'আর্যগাথা'র আর্যবীণা কবিতায় প্রধানতঃ হেমচন্দ্রের প্রাধান্য।

রেখে দেও রেখে দেও প্রেমগীতি স্বরে রে।
কেন ও কুহক আর ভারত ভিতরে রে।
যাও চলি পরভৃত, চাই না ও মৃদুগীত,
গাও রে পাপিয়া তবে ভাসায়ে অম্বরে রে। (—আর্যবীণা)

* * * *

এই নবীন কবিগোষ্ঠীর প্রত্যেকের বক্তব্যই যে পুরোপুরি রবীন্দ্র-অনুগত বা রবীন্দ্র-অনুসারী তা নয়। কিন্তু তাঁরা সকলেই মোটামুটি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অনুপ্রাণিত, কেউ ভাবনায়, কেউ ভাষায়, কেউ ভাবনা ও ভাষা উভয়ত। ভাবনার ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেছেন রবীন্দ্রনাথ এক নবীন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা আমদানী ক'রে। অতীতের সাধারণ নির্বিশেষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার স্থলে ব্যক্তিগত বিশেষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা কবি সৃষ্টি করলেন। বিহারীলাল সে-চেষ্টা করেছিলেন ; কিন্তু সর্বোতো-ভাবে নতুন ভাষা উদ্ভাবনে সমর্থ হননি। পুরাতন ভাষায় নতুন চেতনা সঞ্চারিত হয় না। আর রবীন্দ্রনাথের পর অনেক সাধারণ সামান্য কবিও এই নতুন ভাষায় কথা বলতে পেরে সার্থক হয়েছেন। বঙ্কিম প্রভৃতি এই নবীন চেতনা উপলব্ধি করতে পারেন নি ; তাই এ-কাব্যভাষার বিকৃতিকে বড় ক'রে দেখেছেন।

"এখনকার বাঙ্গালা কবিতার ভাষা কিছু বিকৃত হইয়াছে ; ইংরাজী যে না-জানে, সে বোধ হয় সকল সময়ে বুঝিতে পারে না।" (কনকাঞ্জলি—মানকুমারী বসু ; বিজ্ঞাপন—তারাকুমার কবিরত্নকে লিখিত পত্রাংশ—পৃ—১)

"এখনকার বাংলা কবিতা প্রায়ই চিনি না, সেজন্য বড়ই কাতর।" (চন্দ্রনাথ বসু, ঐ)

নতুন যুগের কাব্য-প্রকৃতি অনুধাবন করতে পারেন নি ব'লে এই ভাষা তাঁদের বিরূপতার ভাগী হয়েছে। এ ভাষা পরের মুখে শেখা নয়, বুকের মধ্যে অনুভূত।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-ভাবনার যাঁরা অংশীদার নন, তাঁরাও তাঁর ভাষার নবীনত্ব, শক্তি ও প্রচণ্ডতা অনুভব করেছিলেন। 'কড়ি ও কোমল'এর সেই নিন্দিত সমালোচক লিখেছিলেন—

> গ্রাম্যকথা শুদ্ধকথা
> একত্রে মিলায়ে ধরে,
> শকটচড়া গাড়্যারোহণ,
> গড়িব সমাস করে। (মিঠেকড়া,৬ষ্ঠ সং, ১৩২২,পৃ—৪)

পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলাল বা বিজয়চন্দ্র তাঁদের 'হাসির গানে' বা

'সিরিয়াস' কবিতায় যখন এই নবীন "শবপোড়া মড়াদাহের" ভাষাকে অনুসরণ করেছেন, তখন তাঁরা রবীন্দ্রনাথেরই জয়-ঘোষণা করেছেন। "এই সব নবীন কবিদের রচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রথমেই নজরে পড়ে যে, এসকল রচনা ভাষার পারিপাট্যে এবং আকারের পরিচ্ছন্নতায় পূর্বযুগের কবিতা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।...

নবীন কবিদের রচনার সহিত হেমচন্দ্রের কবিতাবলীর কিংবা নবীনচন্দ্রের অবকাশ-রঞ্জিনীর তুলনা করলে নবযুগের কবিতা পূর্বযুগের অপেক্ষা আর্ট অংশে যে কত শ্রেষ্ঠ তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে।" (প্রমথ চৌধুরী,—সবুজপত্র, কার্তিক ১৩২২) অথচ রবীন্দ্রনাথের এ কীর্তি প্রবল প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে অর্জিত।

* * * *

রবীন্দ্র-বক্তব্য আর্যদর্শন, বান্ধব এবং সাধারণী সম্পাদকের বক্তব্যের বিরোধী।

"আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া কতকগুলি সংকীর্ণদৃষ্টি সমালোচক কবিদিগকে কবিত্ব শিখাইয়া আসিতেছেন, এবং অবশিষ্ট আটটি রসের মধ্যে কোন একটি রসের ছিটেফোঁটা দেখিবামাত্র ননীর পুতুলি বঙ্গসমাজের স্বাস্থ্য-ভঙ্গের ভয়ে শশব্যস্ত হইয়া উঠিতেছেন। তাহার কতকটা ফল ফলিয়াছে, বীররসটা ফ্যাসান হইয়া পড়িয়াছে। গদ্যলেখক-পদ্যলেখকগণ পালোয়ান সমালোচকদিগের চীৎকার বন্ধ করিয়া দিবার জন্য তাহাদের মুখে বীররসের টুকরা ফেলিয়া দিতেছেন। সকলেই বলিতেছে, উঠ, জাগ, বাঙ্গালায় ইংরাজিতে, গদ্যে, পদ্যে, মিত্রাক্ষরে, অমিত্রাক্ষরে, হাটে ঘাটে, নাট্যশালায়, সভায়, ছেলেমেয়ে বুড়ো সকলেই বলিতেছে, উঠ, জাগ! সকলেই যে অকপট হৃদয়ে বলিতেছে বা কেহই যে বুঝিয়া বলিতেছে তাহা নহে।...

কৃত্রিমতা মাত্রেই মন্দ, তথাপি মতের কৃত্রিমতা সহ্য করা যায়, কিন্তু হৃদয়ের অনুভবের কৃত্রিমতা একেবারে অসহ্য।" (—জিহ্বা আস্ফালন, ভারতী, ১২৯০, শ্রাবণ)

"রাস্তায় যত লোক চলিতেছে তাহা অপেক্ষা ঢের বেশি লোক পথ দেখাইয়া দিতেছে। অনবরত ভাণ চলিতেছে—গদ্যে ভাণ, পদ্যে ভাণ, খবরের কাগজে ভাণ, মাসিকপত্রে ভাণ।

আমাদের এ সাহিত্য প্রতিধ্বনির রাজ্য হইয়া উঠিয়াছে। সত্য ঘরে না জন্মাইলে সত্যকে 'পুষ্য' করিয়া লইলে ভাল কাজ হয় না।"

(অকাল কুষ্মাণ্ড—ভারতী ১২৯০, মাঘ)

নব্য-কাব্যের পথ এ-পথ নয়। "নিজের প্রাণের মধ্যে, পরের প্রাণের মধ্যে প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতাকেই বলে কবিত্ব। যাহারা প্রকৃতির বহির্দ্বারে বসিয়া কবি হইতে চায় তাহারা কতকগুলা বড় বড় কথা, টানাবোনা তুলনা ও কাল্পনিক ভাব লইয়া ছন্দ রচনা করে। মর্মের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য যে-কল্পনা আবশ্যক করে, তাহাই কবির কল্পনা।... ..... যিনি প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কবি হইয়াছেন, তিনি সহজ কথার কবি, সহজ ভাবের কবি।" (চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি—ভারতী, ১২৮৮, ফাল্গুন)

"বিষয় বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রাণ নহে। মানুষের সর্বাঙ্গে প্রাণের বিকাশ।... বিশুদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে উদ্দেশ্য বলিয়া যাহা হাতে ঠেকে তাহা আনুষঙ্গিক। এবং তাহাই ক্ষণস্থায়ী। সৃষ্টির উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না, নির্মাণের উদ্দেশ্য পাওয়া যায়। উদ্দেশ্য না থাকায় সাহিত্যে সহস্র উদ্দেশ্য সাধিত হয়।"

(সাহিত্যের উদ্দেশ্য—ভারতী ও বালক, ১২৯৪, বৈশাখ)

এইভাবে তত্ত্বে ও দৃষ্টান্তে বাংলা কাব্যের নবজন্ম সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত হ'ল।

পাদটীকা

১। নব্য ভারত, ১২৯৪, অগ্রহায়ণ।

২। ভারতী, ১২৯৭, অগ্রহায়ণ।

৩। সাহিত্য, ১২৯৮, বৈশাখ—মানসী ও রাজা ও রানী—গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

৪। ভারতী, ১২৯৩, বৈশাখ।

৪ক। নানা নিবন্ধ—সুশীলকুমার দে—অক্ষয়কুমার বড়াল প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৫। আধুনিক সাহিত্য—মোহিতলাল মজুমদার। পৃ—১৯০।

৬। ঐ, পৃ-১৮৪।

পরিশিষ্ট—১

আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী, ১৮৫৮-১৮৯১

	রাজনীতিক	সাংস্কৃতিক
১৮৫৯		ভিক্টর হুগো : 'La legende Siecles'
		ডারউইন : 'অরিজিন অব স্পিসিজ'
১৮৬০		জন ষ্টুয়ার্ট মিল : 'অন লিবার্টি'
১৮৬১	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধ শুরু	টুর্গেনিফ : 'ফাদার্স এণ্ড সন্স'
	রাশিয়ায় দাসপ্রথার বিলোপ	হার্বার্ট স্পেন্সার : 'অন এডুকেশন'
১৮৬২	—	হার্বার্ট স্পেন্সার: 'ফাষ্ট প্রিন্‌সিপিল্‌স'
১৮৬৩	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাস-প্রথার বিলোপ	ভিগ্‌নীর মৃত্যু
		হাক্সলি : 'ম্যানস্‌ প্লেস ইন্‌ নেচার'
১৮৬৪	কার্ল মার্ক্সের 'ফাষ্ট ইণ্টার' ন্যাশন্যাল' প্রতিষ্ঠা	জন ষ্টুয়ার্ট মিল : 'ইউটিলিটেরিয়া-নিজ্‌ম'
১৮৬৫	লাসালের নেতৃত্বে সমাজবাদী দল প্রতিষ্ঠা	মিল : কঁৎ এণ্ড পজিটিভিজম্‌
১৮৬৬	—	ডষ্টয়ভস্কী : ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট
১৮৬৭	দ্বিতীয় বৃটিশ রিফর্ম এ্যাক্ট	কার্ল মার্ক্স : ক্যাপিটাল ;
১৮৬৯	—	সক্লীম্যান কর্তৃক প্রাচীন ট্রয় নগরী খনন ; লামার্টিনের মৃত্যু ; বোদেলেয়ারের মৃত্যু ; টলষ্টয় : ওয়ার এণ্ড পীস ; মিল : সাবজেকশন্‌ অব উইমেন
১৮৭০	জার্মানীর হস্তে ফ্রান্সের পরাজয়—বিসমার্কের সাফল্য	ভার্লেন : Romances sans Paroles

	রাজনৈতিক	সাংস্কৃতিক
১৮৭১	জার্মানী ও ইতালী কর্তৃক জাতীয় ঐক্য সাধন ; ফ্রান্সে শ্রমজীবী-বিদ্রোহ ; 'প্যারি কমিউন' প্রতিষ্ঠা ; তৃতীয় ফরাসী প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব।	সুইন্‌বর্ণ : সঙস্ বিফোর সানরাইজ ডারউইন : ডিসেন্ট অব ম্যান
১৮৭২	—	হার্বার্ট স্পেন্সার : প্রিন্সিপলস্ অব সাইকোলজি
১৮৭৩	—	ম্যাক্সওয়েল : ইলেকট্রিসিটি এণ্ড ম্যাগ্‌নেটিজম
১৮৭৬	—	ম্যালার্মে : LaApris-medi d'un faune
	—	হার্বার্টস্পেন্সার : প্রিন্সিপলস্ অব সোসিওলজি-১ম
১৮৭৯	—	হার্বার্ট স্পেন্সার : ডেটা অব এথিকস
১৮৮৫	—	লাফার্গ : Complaintes ; ভিক্টর হুগোর মৃত্যু।
১৮৮৭	—	লাফার্গের মৃত্যু
১৮৮৯	—	ব্রাউনিং-এর মৃত্যু
	—	হার্ডি : টেস অব দি উর্বরের ভিলা
১৮৯২	—	লর্ড টেনিসনের মৃত্যু

পরিশিষ্ট—২

জাতীয় ঘটনাবলী ১৮৫৮-১৮৯১

	রাজনৈতিক	সাংস্কৃতিক
১৮৫৮	সিপাহী বিদ্রোহের অবসান ; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অবলুপ্তি।	রঙ্গলাল : পদ্মিনী উপাখ্যান সোমপ্রকাশ পত্রের আবির্ভাব
১৮৫৯	নীল বিদ্রোহ শুরু ; হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবাদ ঘোষণা	মাইকেল : শর্মিষ্ঠা নাটক

	রাজনৈতিক	সাংস্কৃতিক
১৮৬০	—	দীনবন্ধু মিত্র : 'নীলদর্পণ' নাটক মাইকেল : তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য
১৮৬১	ভারতে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ ; বৃটিশ পার্লামেণ্টের 'ইণ্ডিয়া কাউন্সিল এ্যাক্ট' পাশ ; মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসুর 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' প্রতিষ্ঠা ; 'নীলদর্পণ' অনুবাদে লং-এর কারাদণ্ড	**মাইকেল : মেঘনাদবধ কাব্য** 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' প্রকাশ **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম**
১৮৬৩		বেথুন সোসাইটিতে কাণ্ট-দর্শনের বিরুদ্ধে মন্তব্য
১৮৬৫		'দুর্গেশ নন্দিনী' উপন্যাস প্রকাশ
১৮৬৬	উড়িষ্যায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ : বাঙলাদেশে সেবাকার্য	জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভার কর্মসূচী রচনা ; চতুর্দশপদী কবিতাবলী প্রকাশ
১৮৬৭	হিন্দু মেলার প্রতিষ্ঠা	—
১৮৭০	সাঁওতাল বিদ্রোহ	ভূদেব-সম্পাদিত এডুকেশন গেজেটে হেমচন্দ্রের 'ভারত-সঙ্গীত' প্রকাশ ; বিহারীলাল : বঙ্গসুন্দরী
১৮৭১	ওয়াহাবী আন্দোলন	বিদ্যাসাগর : 'বহুবিবাহ' গ্রন্থ প্রকাশ
১৮৭২	'সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্ট' পাশ	ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা ; 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ ; বঙ্গদর্শনে 'মানস বিকাশ' কাব্য সমালোচনা : কঁৎ আলোচনা

	রাজনৈতিক	সাংস্কৃতিক
১৮৭৪	সিভিল সার্ভিস থেকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় খারিজ ; বিহারে দুর্ভিক্ষ	— কোঁৎ-আলোচনার প্রসার
১৮৭৫	সুরেন্দ্রনাথের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ; ইণ্ডিয়া লীগের প্রতিষ্ঠা	'বৃত্রসংহার' প্রকাশ 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রকাশ
১৮৭৬	রঙ্গমঞ্চ শাসনে অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ ; 'ভারত-সভা' গঠন ; ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার কর্তৃক 'ভারতীয় বিজ্ঞানসভা' স্থাপন ; দিল্লী দরবার	
১৮৭৮	'ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্ট' পাশ দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ	'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রকাশ রবীন্দ্রনাথ : 'কবিকাহিনী'
১৮৭৯	ভারতে ব্যাপক নিরস্ত্রীকরণের উদ্দেশ্যে 'আর্মস এ্যাক্ট' পাশ	'আনন্দমঠ' রচনা শুরু ; 'সারদামঙ্গল' প্রকাশ
১৮৮১	লর্ড রিপন কর্তৃক প্রেস আইন প্রত্যাহার ; ভারত সভা কর্তৃক স্বায়ত্তশাসন দাবী	'আনন্দমঠ' গ্রন্থাকারে প্রকাশ রবীন্দ্রনাথ : 'বনফুল'
১৮৮২	হাণ্টার কমিশন (শিক্ষা-বিষয়ক)	নবীন সেন : 'পলাশীর যুদ্ধ' ; 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' প্রকাশ ; হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বঙ্কিম- হেষ্টি সাহেব বিতর্ক
১৮৮৩	আদালত অবমাননার দায়ে সুরেন্দ্রনাথের দুইমাস কারাদণ্ড ; নেশানেল কনফারেন্স আহ্বান ; ইলবার্ট বিল	'প্রভাত সঙ্গীত' প্রকাশ
১৮৮৪	—	'প্রচার' ও 'নব জীবন' পত্রিকা প্রচার : 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সহিত বঙ্কিমের মতবিরোধ

	রাজনৈতিক	সাংস্কৃতিক
১৮৮৫	নিখিল ভারত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা	শশধর তর্কচূড়ামণির কলিকাতায় আগমন ;
	বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন পাশ	'পজিটিভিজম' নিয়ে কৃষ্ণকমল-দ্বিজেন্দ্র বিরোধ ;
১৮৮৬	কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন	'কড়ি ও কোমল' প্রকাশ
১৮৮৭	সহবাস-সম্মতিবয়স বিল নিয়ে বিতর্ক	'ভারতী'তে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ বিতর্ক ; কাণ্ট ও বেদান্তের মধ্যে সাদৃশ্য আলোচনা
১৮৮৯	প্রিন্স অব ওয়েলসের দ্বিতীয়বার ভারত সফর	—
১৮৯১	ফ্যাক্টরী আইন পাশ ; 'সহবাস-সম্মতিবয়স আইন' পাশ ;	**'মানসী' কাব্যের প্রকাশ**

পরিশিষ্ট—৩

১৮৫৮-১৮৯১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বাংলা কাব্যগ্রন্থ

১৮৫৮	পদ্মিনী উপাখ্যান	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
	যোজনগন্ধা	বনওয়ারিলাল রায়
	কুমারসম্ভব (অনু)	হরিমোহন কর্মকার
১৮৫৯	সন্ন্যাসীর উপাখ্যান (অনু)	হরিমোহন গুপ্ত
১৮৬০	তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
	মেঘদূত (অনু)	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৬১	**মেঘনাদবধ কাব্য**	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
	ব্রজাঙ্গনা কাব্য	ঐ
	কোকিলদূত	বনওয়ারিলাল রায়
	চিন্তাতরঙ্গিনী	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	সদ্ভাবশতক	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
	কুসুমমালা	রামদাস সেন
১৮৬২	বীরাঙ্গনা কাব্য	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
	সঙ্গীতশতক	বিহারীলাল চক্রবর্তী
	প্রকৃতিপ্রেম	দ্বারকানাথ রায়
	পদ্মপুণ্ডরীক	কাঙাল হরিনাথ মজুমদার
	মন্মথকাব্য	তারাচরণ দাস
	কর্মদেবী	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৬৩	স্ত্রীলোকের দর্পচূর্ণ	রাধামাধব মিত্র
	বসন্তে কুলকামিনীর খেদ	ঐ
	চিত্তসন্তোষিণী	গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	প্রকৃত সুখ	দ্বারকানাথ রায়
	বিধবাবঙ্গাঙ্গনা	হরিশচন্দ্র মিত্র
	কবিতাকৌমুদী	ঐ
১৮৬৪	ঋতুদর্পণ	গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	ছন্দঃ কুসুম	ভুবনমোহন রায়চৌধুরী
	বিলাপতরঙ্গ	রামদাস সেন
	বীরবাহু কাব্য	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৬৫	কৃষ্ণবিলাস	গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	জয়াবতী	বনওয়ারিলাল রায়
১৮৬৬	চতুর্দশপদী কবিতাবলী	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
	কীচকবধ কাব্য	হরিশচন্দ্র মিত্র
	তপতীবধ কাব্য	জগদ্বন্ধু ভদ্র
	কালিদাসের বিদ্যালাভ	নবীনচন্দ্র দাস

১৮৬৭	চিত্তচৈতন্যোদয়	রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়
	কবিতা কৌমুদী—২য় ভাগ	হরিশচন্দ্র মিত্র
	কবিতালহরী	রামদাস সেন
	চতুর্দশপদী কবিতামালা	ঐ
১৮৬৮	নির্বাসিতের বিলাপ	শিবনাথ শাস্ত্রী
	যৌবনোদ্যান	রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
	মেঘদূত (অনুবাদ)	ঐ
	পদ্যপাঠ	যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়
	কবিতাবলী	রাধামাধব মিত্র
	কাব্যমঞ্জরী	বলদেব পালিত
	বঙ্গবালা	হরিশচন্দ্র মিত্র
	কংসবিনাশ কাব্য	দীননাথ ধর
	ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য	জগদ্বন্ধু ভদ্র
	শূরসুন্দরী	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৬৯	মিত্রবিলাপ ও অন্যান্য	
	কবিতাবলী	রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
	জীবনতারা	রসিকচন্দ্র রায়
	কাদম্বরীকাব্য	ব্রজলাল মিত্র
	সম্বরণবিজয় কাব্য	প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	নিবাতকবচবধ কাব্য	মহেশচন্দ্র শর্মা
	কবিকাহিনী	দীনেশচরণ বসু
১৮৭০	কাব্যকলাপ	রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
	কবিতাবলী	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	কবিতাকদম্ব	মদনমোহন মিত্র
	পদ্যমালা	মনোমোহন বসু
	ললিত কবিতাবলী	বলদেব পালিত
	কাব্যমালা	ঐ
	সবিতা সুদর্শন	সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার
	আধ আধ ভাষিণী	প্রসন্নময়ী দেবী

	গিরিসন্দর্শন	রাজকৃষ্ণ রায়
	বঙ্গসুন্দরী	বিহারীলাল চক্রবর্তী
	নিসর্গ সন্দর্শন	ঐ
	বন্ধুবিয়োগ	ঐ
	প্রেম প্রবাহিনী	ঐ
১৮৭১	অবকাশরঞ্জিনী	নবীনচন্দ্র সেন
	সুরধুনী কাব্য	দীনবন্ধু মিত্র
	মোহভোগ	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
	নির্বাসিতা সীতা	হরিশচন্দ্র মিত্র
১৮৭২	কবিতাবলী	হরিশচন্দ্র মিত্র
	ভর্তৃহরি কাব্য	বলদেব পালিত
	বর্ষবর্তন	সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার
	কুমারসম্ভব (অ)	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
	দ্বাদশ কবিতা	দীনবন্ধু মিত্র
	ভার্গববিজয় কাব্য	গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী
১৮৭৩	মানসবিকাশ	দীনেশচরণ বসু
	বঙ্গভূষণ	রাজকৃষ্ণ রায়
	বিশ্বেশ্বর বিলাপ	দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ
	কবিতাবলী	রাধামাধব মিত্র
	গোরাই ব্রিজ বা গৌরী সেতু	মীর মশাররফ হোসেন
১৮৭৪	উদাসিনী কাব্য	অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী
	উত্তরাবিলাপ	রুক্মিণীকান্ত ঠাকুর
	ঋতুবর্ণন	গঙ্গা চরণ সরকার
	শিক্ষানবিশের পদ্য	অক্ষয়চন্দ্র সরকার
	গোচারণের মাঠ	ঐ
	মিত্রকাব্য	আনন্দচন্দ্র মিত্র
	বিলাপসিন্ধু	বিজয়কৃষ্ণ বসু
	ললিতাসুন্দরী ও কবিতাবলী	অধরলাল সেন

১৮৭৫	স্বপ্নপ্রয়াণ	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
	পলাশির যুদ্ধ	নবীনচন্দ্র সেন
	ভারতউচ্ছ্বাস	ঐ
	বৃত্রসংহার কাব্য	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	ভারতভিক্ষা	ঐ
	ভুবনমোহিনীপ্রতিভা	নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
	কর্ণার্জুন কাব্য	বলদেব পালিত
	ভারতে সুখ	হরিশচন্দ্র নিয়োগী
	অবকাশগাথা	বিজয়কৃষ্ণ বসু
	পুষ্পমালা	শিবনাথ শাস্ত্রী
	অবসর সরোজিনী	রাজকৃষ্ণ রায়
	নীতিকুসুমাঞ্জলি	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৭৬	বনফুল	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	কবিকাহিনী	দীনেশচরণ বসু
	রূপজালাল	ফৈজুন্নিসা চৌধুরাণী
	হেলেনা কাব্য	আনন্দচন্দ্র মিত্র
	ভারতউদ্ধার কাব্য	ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
	আশাকানন	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	দুঃখসঙ্গিনী	হরিশচন্দ্র নিয়োগী
	পরী ও স্বর্গ (অনু)	অজ্ঞাত
১৮৭৭	বৃত্রসংহার কাব্য, ২য় ভাগ	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	ভার্গববিজয় কাব্য	গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী
	বনকুসুম	শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়
	নলিনী	অধরলাল সেন
	কুসুমকানন	ঐ
	কবিতামালা	রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
১৮৭৮	কবিকাহিনী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	নিভৃতনিবাস	রাজকৃষ্ণ রায়
	কবিতাপুস্তক	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

	চিত্তমুকুর	ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৭৯	সারদামঙ্গল	বিহারীলাল চক্রবর্তী
	ফুলবালা	দেবেন্দ্রনাথ সেন
	নির্ঝরিণী	ঐ
	বিনোদমালা	হরিশচন্দ্র নিয়োগী
	বনলতা	প্রসন্নময়ী দেবী
	লুক্রেশিয়া	কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ
	কাঞ্চীকাবেরী	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৮০	• শৈশবসঙ্গীত	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	রঙ্গমতী	নবীনচন্দ্র সেন
	গাথা	স্বর্ণকুমারী দেবী
	মাধবমালতী	অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী
	ছায়াময়ী	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	বাসন্তী	ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	অবকাশরঞ্জন	হারাণচন্দ্র রাহা
	মহিলা	সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার
১৮৮১	মায়াদেবী	বিহারীলাল চক্রবর্তী
	ধূমকেতু, দেবরাণী, বাউলবিংশতি	ঐ
	যোগেশ	ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	কাব্যহার	বেনোয়ারীলাল গোস্বামী
	কবিতালহরী	রামদাস সেন
	• ভগ্নহৃদয়	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	• রুদ্রচণ্ড	ঐ
১৮৮২	• সন্ধ্যাসঙ্গীত	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	দশমহাবিদ্যা	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	সাধের আসন	বিহারীলাল চক্রবর্তী
	আর্যগাথা	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
	স্বপনসঙ্গীত	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

	গীতিকবিতা	গোবিন্দচন্দ্র রায়
	মেঘদূত (অনু)	রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
১৮৮৩	প্রভাতসঙ্গীত	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	ছবি ও গান	ঐ
	প্রদীপ	অক্ষয়কুমার বড়াল
	সিন্ধুদূত	নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
	আকাশকুসুম	নবীনচন্দ্র দাস
১৮৮৪	শৈশবসঙ্গীত	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী	ঐ
১৮৮৫	হুতোম প্যাঁচার গান	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৮৬	কড়ি ও কোমল	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	আমি ভালবাসি	অমৃতলাল বসু
	জীবনময় কাব্য	মদনমোহন মিত্র
১৮৮৭	চিন্তা	ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	হিমাদ্রিকুসুম	শিবনাথ শাস্ত্রী
	রৈবতক	নবীনচন্দ্র সেন
	মহাপ্রস্থান	দীনেশচরণ বসু
১৮৮৮	পুষ্পাঞ্জলি	শিবনাথ শাস্ত্রী
১৮৮৯	ছায়াময়ী পরিণয়	শিবনাথ শাস্ত্রী
	কবিতা	বিজয়চন্দ্র মজুমদার
	আলো ও ছায়া	কামিনী রায়
	মার্কণ্ডেয় চণ্ডী (অ)	নবীনচন্দ্র সেন
	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (অ)	ঐ
১৮৯০	বিষাদসঙ্গীত	বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৯১	মানসী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	খৃষ্ট	নবীনচন্দ্র সেন
	মালতীমালা	হরিশচন্দ্র নিয়োগী

নির্দেশিকা

অ

অঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—৪৪০
অক্ষয়কুমার দত্ত—৬৫, ১২০, ১২২, ১৩৪, ১৫১, ২০৭, ২১৩, ২১৪, ৩১৫
অক্ষয়কুমার বড়াল—৪২৪, ৪৪৪, ৫৪০-৪২
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—৩১৯,
অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী—৪৩৯, ৪৪৪, ৪৫৫, ৪৬০-৬১, ৪৭৫
অক্ষয়চন্দ্র সরকার—৪, ৫, ৪৪৫
অক্ষয়নারায়ণ দাস—১২৪
অটলবিহারী বসু—৪৪৪
অদৃষ্ট-বিজয়—৪৪০
অধরলাল সেন—৪১৯, ৪৩২-৩৪, ৫৪০
অনঙ্গমোহন—১২০, ১২২
অপ্সরী—১০৭, ১৭৯
অবকাশরঞ্জিনী—৩৬০-৩৬৪
অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী—৩৭৮, ৪৪৪
অবিনাশচন্দ্র গুহ—৪৪৪
অবসর সরোজিনী—৪২৪, ৪৬৫
অবোধবন্ধু—৩৩৭, ৩৮৮
অভিমন্যুবধ কাব্য—৪৪০
অমিতাভ—৩৭১
অমৃতবাজার পত্রিকা—৩১৪, ৩২৪
অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়—৫০৯
অমৃতাভ—৩৭১

আ

আইরিশ মেলোডিজ—৪৭৬, ৪৮১
আগমবাগীশ—২১
আগষ্টা ওয়েবষ্টার—৪৮১
আধুনিক সাহিত্য—৩৯১
আনন্দচন্দ্র গুহ—১২৩
আনন্দচন্দ্র মিত্র—৪১৯, ৪৩০-৪৩২
আনন্দ মঠ—৩৩৪
আনন্দমোহন ঘোষ—৪৪৪
আনন্দলহরী—৩৮৬
আমার জীবন—১৬৬, ৩৬১-৩৬২
আর্ণেষ্ট মায়ার্স—৪৮১
আর্থার ও' শগনেশী ৪৮১, ৫১৩-১৪
আর্যদর্শন—৩৩৩, ৩৩৫, ৩৫০, ৪২৬
আলাষ্টর—৪৬৯, ৪৮৩
আশাকানন—৩৫১
আশুতোষ চৌধুরী—৪৯৯-৫০০

ই

ইতিহাস—৪৩
ইণ্ডিয়ান মিরর্—৩৩৭, ৩৬৭, ৪৩১
ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী—২৯২
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—৪৪০-৪৪২

ঈ

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—৪৩৪-৩৮

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—২, ৫, ৬৪, ১০৯-১৩২, ২০০, ৩৫৬
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—৯৮, ১৩৪, ২০৭

উ

উইনডেলব্যাণ্ড—৩৩৯
উইলকিন্স চার্লস—৫২
উইলিয়াম কেরী—৫২
উদাসিনী—৪৩৯, ৪৫৪

ঋ

ঋতুদর্পণ—৩১৩
ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর—৪৪৪

এ

একেই কি বলে সভ্যতা—১৭৭, ১৮৩
এজ অব রিজন—১৩২
এডওয়ার্ড টমসন—৪৮২
এডগার এ্যালেন পো—৫০০
এডুকেশন গেজেট—৩৬০
এ্যাডিসন জোসেপ—৮৭, ২৭২, ৩০১
এ্যারিওষ্টো—২২৯
এমার্সন র‍্যালফ ওয়ালডো—৩৩৭
এলিয়ট টি. এস.—১২৭
এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল—৪৮, ৫১

ও

ওথেলো—২১০,
ওবিদ—২৬৬, ২৭৭,
ওয়ার্ডসওয়ার্থ উইলিয়াম—৯৮, ১৬৮, ২৯৬-২৯৯, ৩২৮, ৪৫৩, ৪৮৪, ৪৮৯
ওয়ালার এড্‌মাণ্ড—১২৭
ওয়াট স্যার টমাস—১৬৪

ক

কপালকুণ্ডলা—৩০২, ৪৬২
কবিকঙ্কন—২, ২১
কবিকাহিনী—৪৩৪, ৪৬৪-৪৭০
কবিচরিত—২
কবিগান—৩৫
কমপারেটিভ গ্রামার—১১২
কবিতাকদম্ব—৩১৮
কবিতাকুসুমাবলী—৩১৪
কবিতাকৌমুদী—৩১৪, ৪২৪
কবিতাপাঠ—৩০৯
কবিতাবলী—১২৬, ৩১৩, ৩১৪, ৩৪৪, ৩৫১, ৪৩২
কবিতামালা—৪১২
কবিতালহরী—৩২৮
কমলাকান্তের দপ্তর—৩৩৪
কলিঙ্গ—২১৩
কংসবিনাশ কাব্য—৩২৮, ৪৪০
কড়িও কোমল—৪৩৪, ৪৯১-৯৮
কাউপার—১৩৩, ১৬৪, ১৬৮, ৪১৯
কাঙাল হরিনাথ—৩১৮, ৩২০
কাদম্বরী—৩২৮, ৪৪০
কাণ্ট—৬৬, ৯৮, ২৯৭, ২৯৮, ৩৩৬, ৩৮৮-৮৯, ৪৫২-৪৫৩

কাব্যকলাপ—৪২২
কাব্যপ্রকাশ—৩৩৪
কাব্যমঞ্জরী—৪৪০
কাব্যমালা—৪৪০, ৪৪২
কামিনীকুমার—৪২, ১২২
কামিনীরায়—৫, ৫৬০-৬৩
কার্লাইল—১৭৪, ৩৩৭, ৪৮৫
কাশীদাসের বিদ্যালাভ—৪৪০
কাশীদাস—১৯৬, ২৪৭, ২৬৬, ২৯৪
কালীকুমার দাস—৩৩৯
কালীপ্রসাদ কবিরাজ—১১৯
কাশীপ্রসাদ ঘোষ—১. ১০১-১০৪
কিং পোরাস—১০৭
কীটস—৯৮, ৩০৯, ৪২১, ৪৩৩
কীচকবধ কাব্য—৩১৪
কীথ—১৯
কুইন সীতা—১০৭
কুরুক্ষেত্র—২১২, ৩৬৯
কুসুমমালা—৪৩২
কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য—৩৩৬, ৩৩৮, ৩৮৬
কৃষ্ণচরিত্র—৯
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—৩০৯, ৩১৪-৩১৭
কৃষ্ণদাস শূর—১২৪
কৃষ্ণবিলাস—৩১৩
কেশব সেন—১৪৯, ১৬৯, ৪০২, ৪৫৫
কৈলাসচন্দ্র ঘোষ—৩০
কোমৎ—কঁৎ—৬, ৬৬, ৩৩৩, ৩৩৫, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৫২, ৩৮৫-৮৭
কোলরীজ এস. টি.—১২৭, ১৬৮
ক্রমওয়েল—৫১০
ক্র্যাব জর্জ—১৬৮
ক্যাম্পবেল টমাস—৫৮, ৯৮, ১৩৩
ক্যালকাটা মন্থলি গেজেট—৪৯
ক্লিওপেট্রা—৩৬৯

খ

খৃষ্ট—৩৭১

গ

গঙ্গাচরণ সরকার—৩, ৪৪৩
গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—৩০৯, ৩১৩
গান্ধারীবিলাপ—৩২৮
গিবন এডওয়ার্ড—৮৭, ৩৩৭
গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী—৮
গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী—৪৪৯, ৫৫৬-৫৫৭
গিরীশচন্দ্র ঘোষ—২৭৭, ৩৬৭
গীতগোবিন্দ—১০, ১৩
গীতমালা—১১৯
গুম্ফ-আক্রমণ কাব্য—৩২৪, ৪৪২
গোপালচন্দ্র সেন—১২৩
গোবিন্দচন্দ্র দত্ত—১০৪-১০৫
গোল্ডস্মিথ—১০
গ্যয়টে—৪৯, ২০৯, ২৯৭-৯৯, ৩৬৬, ৪৫৩, ৪৮২, ৪৮৫, ৫৪৮
গ্রামবার্তা প্রকাশিকা—৩১৯, ৩২৮
গ্রে টমাস—৮৭, ১২৭, ১৩৩, ৩৪৫

চ

চণ্ডীদাস—৫, ৪৬৭

চতুর্দশপদী কবিতাবলী—১০৭, ২৮০-২৯০, ৩২৮
চতুর্দশপদী কবিতামালা—৩২৮
চন্দ্রকান্ত—৪১
চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী—৪৪৩
চন্দ্রকান্ত সেন—৪৪৩
চন্দ্রনাথ বসু—৩৪৭, ৫৬৬
চর্যাপদ—১০-১২
চারুপাঠ—১২৮
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়—৪৪৪
চিত্তচৈতন্যোদয়—৩২১
চিত্ততোষিণী কাব্য—১২৬
চিত্তবিকাশ—৩৪১
চিত্তমুকুর—৪৩৪
চিত্তরঞ্জন দাস—৪৪৪
চিত্তসন্তোষিণী কাব্য—৩১৩
চিত্রাঙ্গদা—২৩০
চিন্তা—৪৩৪
চিন্তাতরঙ্গিনী—৩৪১
চুনীলাল গুপ্ত—৪৪৪
চ্যাটারটন—৪৮০

ছ

ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য—৩২৪-৩২৭
ছন্দঃকুসুম—৩২১-৩২৪
ছবি ও গান—৪৩৪, ৪৮৮-৯১
ছায়াময়ী—৩৫১
ছায়াময়ী পরিণয়—৪১৪

জ

জগদ্বন্ধু ভদ্র—৫, ৩১৮, ৩২৪-২৬
জন ইগনেটিয়াস—৯৭
জনসন ডাঃ—৪৯, ৩০৯
জনা—২৭৭
জয়দেব—৩
জয়াবতী—৩১২
জলধর সেন—৩১৯
জীবনতারা—১২২, ১২৯, ৩১১
জীবনস্মৃতি—৪০২, ৪২৮, ৪৮৪
জোন্‌স উইলিয়াম—৪৮
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—৪৫৮
জ্ঞানান্বেষণ—১৬৯
জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়—৪৪৪

ট

টমাস ক্যাম্পবেল জিপি—৯৭
টিণ্ড্যাল—২১৩
টেনিসন আলফ্রেড—৪৫২, ৪৫৫, ৪৮১
টেম্‌পেষ্ট—২০০, ৩৪৪
টোল্যাণ্ড জন—২১৩
ট্যাসো—২২৯, ২৬৭, ২৯৪
ট্রিভেলিয়ান—২১৪,

ড

ডন জুয়ান—১৭২, ৩৪৭
ডাটস্ ফ্যামিলি এ্যালবাম—১০৬
ডাফ (রেভরেণ্ড)—৩৩৬
ডারউইন—৩৩৫, ৩৩৭, ৩৫২
ডিভাইন কমেডিয়া—৩৫১
ডিরোজিও—৮৮-৯৫, ১৫৩, ২৯০
ড্রাইডেন—৮৭, ১২৭, ২৬২, ৩৪৫

ত

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—২৮, ৩১৫, ৪৪৩
তন্ত্রসার—২১
তারাচরণ দাস—১১৯, ৩১২
তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য—১৭৭, ১৮২, ১৮৪-২০৭

থ

থিওক্রিটাস—২৮৬

দ

দময়ন্তীবিলাপ—৩২৮,৪৪০
দশমহাবিদ্যা—৩৫১-৫৩
দানবদলন কাব্য—৪৪০
দান্তে—২১০,২২৯, ২৬৬, ২৯৪, ৩৫১, ৪৮০, ৪৮২
দিগ্দর্শন—৫২, ১৪৭
দীননাথ ধর—৩২৮, ৪৪০
দীনবন্ধু মিত্র—১২১, ১২২
দীনেশচরণ বসু—৪১৯, ৪৩৪, ৪৪৫
দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—২১৩
দুর্গেশনন্দিনী—৩০২
দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথাভ্রমণ—৩৮৮
দুঃখসঙ্গিনী—৪২৬, ৪৬৫
দেকার্তে—৩৩৬, ৪৫১
দেবশিশু—৪২৪
দেবীচৌধুরাণী—৩৩৭
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মহর্ষি)—৬৩, ৬৯, ৩১৫, ৩১৯, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৮৭, ৪৫১-৫৪
দেবেন্দ্রবিজয় বসু—৪৪৪
দেবেন্দ্রনাথ সেন—৪৪৪, ৫৪২-৫৪৮
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস—৮
দ্বারকাকেলিবিলাস—৩১২
দ্বারকানাথ অধিকারী—১২৩
দ্বারকানাথ মিত্র—৩৩৮
দ্বারকানাথ রায়—৩০৯, ৩১০
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—৩২৪, ৩৩৬, ৩৮৭, ৪১৫, ৪৪২, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৫৫
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—৫৬৫-৬৬

ধ

ধ্বন্যালোক—৩৮৯
ধর্মনীতি—১২৯
ধর্মতত্ত্ব—৩৩৫

ন

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—৪৪৪-৪৫, ৫৬২-৬৩
নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য—৪৪৪
নবজীবন—৪, ৫০১
নবযুগের বাংলা—৯
নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—৪১৯, ৪২৮, ৪৩০, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৫৫
নবীনচন্দ্র সেন—১৪২, ১৬৩, ৩৬০-৩৭৪, ৩৭৬-৭৭, ৩৯৯, ৫১০
নবরসাঙ্কুর কাব্য—৩৬৬
নব্যভারত—৩৩৭, ৪৪৩, ৪৯৫, ৫০২
নরোত্তমবিলাস—২১

নলিনী—৪৩২
নলিনী বসন্ত—৩৪৪
নিউটন—২১৪, ২৯৮
নিউম্যান—৪১৪, ৪৫৩
নিত্যকৃষ্ণ বসু—৪৪৩
নিধুবাবু—২, ৩৭, ১৩৫, ২৭২
নিবাতকবচবধ কাব্য—৩২৮, ৪৪০
নিভৃতনিবাস—৪২৪
নির্বাসিতা সীতা—৩১৪
নির্বাসিতের বিলাপ—৪১৩
নিশীথচিন্তা—৪২৪
নিসর্গ সন্দর্শন—১৪১, ৩৮১
নীতিকুসুমাঞ্জলি—৩১০
নোভাম অর্‌গানম্‌—৫৮

প

পদাঙ্কদূত—৩১০
পদার্থবিদ্যা—১১৯
পদ্মাবতী—১৭৭-১৮৩
পদ্মিনী উপাখ্যান—১৪১, ১৪৪-১৬০, ১৮৫, ৩৮৫
পদ্যপাঠ—৩২১
পদ্যপুণ্ডরীক—৩১৯
পদ্যসূত্র—৩১১
পদ্যসোপান—৩১৮
পবনদূত—১০
পলাশির যুদ্ধ—৩৬১, ৩৬৪-৬৬
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—৮
পার্নেল—৪৩৯, ৪৬২
পিশাচোদ্ধার—৪৪০
পুরাতন প্রসঙ্গ—৬৫, ৩৩৮
পুষ্পমালা—৪১৩
পুষ্পাঞ্জলি—৪১৩
পেইন টমাস—৬৪, ১৩২, ২১৩, ২৯৮, ৩৩৩, ৩৩৭
পেত্রার্কা—২৮৮, ২৯০
পৃথ্বীরাজ কাব্য—২১১
পোপ—৮১, ৮৭, ১২৭, ১৩৩, ২১৪ ৩৪৫, ৪৩৯
পৌল ও ভর্জিনী—৪৩৯, ৪৮৪
প্রকৃত সুখ—৩০৯
প্রকৃতিপ্রেম—৩০৯
প্রকৃতির প্রতিশোধ—৪৯১
প্রচার—৯
প্রতিবিম্ব পত্রিকা—৪৫৮
প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—৪৪০
প্রবোধ প্রভাকর—১০৯
প্রভাতসঙ্গীত—৪৮৫-৪৮৮
প্রভাস—২১২, ৩৭০-৩৭১
প্রমথ চৌধুরী—৫০৩, ৫৬৭
প্রমথনাথ বিশী—২৮৪
প্রসন্নকুমার সেন—৩১৫
প্রসন্নময়ী দেবী—৪৪৩
প্রমীলা বসু—৪৪৪
প্রলাপকবিতাগুচ্ছ—৪৬৫, ৪৬৯-৭০
প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ—৫
প্রিয়নাথ সেন—৪৪৪, ৫৫৫
প্রিয়বালা রায়—৪৪৪

প্রিয়রঞ্জন সেন—৩৩৯, ৪৫১
প্রেমদাস বৈরাগী—৪৪৪
প্রেমপ্রবাহিনী কাব্য—১০১, ৩৮১
প্রেমবিলাস—২১
প্রেমানন্দ কাব্য—৪৩০
প্যারীচাঁদ মিত্র—২৩৫
প্যারীশঙ্কর দাশগুপ্ত—৪৪৪

ফ

ফিকির চাঁদ—৩১৯
ফেয়ারী কুইন—৩৫১
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ—৫১-৫২

ব

বউঠাকুরাণীর হাট—৪৭৯
বঙ্কিমচন্দ্র—১, ৩, ৪-৯, ১২২, ১৪২, ৩০২-৩০৪, ৩১৭, ৩৩৩, ৩৩৮, ৪২২ ৪৪৫, ৫১০
বঙ্গদর্শন—৩, ৯, ১৬৪, ৩৩৫, ৪১১, ৪১২, ৪৩৩, ৪৪৩, ৪৪৫, ৪৪৬
বঙ্গভাষার ইতিহাস—২
বঙ্গবালা—৩১৪
বঙ্গভূষণ—৪২৪
বঙ্গসুন্দরী—১৪১, ৩৫৮, ৩৮১, ৪৬৩
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—৪
বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা—৩
বনওয়ারিলাল রায়—৩০৯, ৩১২-১৩
বত্রিশ সিংহাসন—১১৯
বন্ধুবিয়োগ—১৪১, ৩৭৮
বনফুল—৪৬০
বরদাচরণ মিত্র—৪৪৪
বলদেব পালিত—৩৫১, ৩৫৯, ৪১৪-৪২৩
বলেন্দ্র নাথ ঠাকুর—৪৪৪
বাইরন—৯৮, ১৭৪, ২৯৩, ২৯৬, ৩৪২, ৩৪৪, ৪১৯, ৪৩৩, ৪৮৪, ৪৮৫
বাউল বিংশতি—৩৮৪
বাকৃল—৬-৭
বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব—২
বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস—৯
বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব—২
বাংলা কাব্য পরিচয়—২৯৫
বাংলা ছন্দের মূলসূত্র—৫০৯
বান্ধব—৩৩৩, ৩৩৭, ৪২৬, ৪৩১, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৫, ৫৪১
বাল্মীকি-প্রতিভা—৪২৫
বার্ণস—৯৮
বার্কলে—৯৮
বাসন্তী—৪৩৪
বাসবদত্তা—১২০
বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার—১২৮
বিজয়চন্দ্র মজুমদার—৪৪৪, ৪৫৯, ৫৬৩-৫৬৫
বিদ্যাপতি—৩, ১৪-১৬
বিনয়কুমারী বসু—৪৪৪
বিদ্যোন্নতিসাধনী পত্রিকা—৩২৮
বিধবাবিবাহ নাটক—২৭৫

বিধবাবঙ্গাঙ্গনা—৩১৪
বিপিনবিহারী সেন—৪৪৪
বিরাজমোহিনী দেবী—১২৪
বিবিধার্থ সংগ্রহ—২, ১৫৭, ৪৪৩
বিশ্বম্ভর দাস—১২৩
বিশ্বপতি চৌধুরী—২৯৩
বিশ্বমনোরঞ্জন—৩২৮
বিষবৃক্ষ—৩০৪, ৩৩৭, ৪৪০
বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়—৪৪৪
বিহারীলাল চক্রবর্তী—১৪১-৪২, ২৩৬, ৩৩৮, ৩৫৮-৫৯, ৩৭৬-৪০৩
বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—৪৪০
বীটন সোসাইটি—১, ২৭৫, ৩৩৯,
বীরবাক্যাবলী—৩১৪
বীরবাহু কাব্য—৩৪২-৪৪
বীরাঙ্গনা কাব্য—১৮২, ২৭৫-৮০
বীরেশ্বর চক্রবর্তী—৪৪৪
বুদ্ধদেব বসু—২৯৯-৩০১
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ—১৭৭, ১৮৫
বৃত্রসংহার কাব্য—২১২, ৩৪৭-৫১
বেকন—৬৩-৬৬, ৮৭, ৯৮, ৬৬৬
বেকারষ্টীথ—৯৭
বেঙ্গল ম্যাগাজিন—৪৩১
বেতালপঞ্চবিংশতি—১১৯
বেস্থাম—৬২
বেন্টলিস্ মিসলনি—১৬৯
বেনোওয়ারীলাল গোস্বামী—৪৪৪, ৫৬
বোধেন্দুবিকাশ—১১৮
ব্রজনাথ মিত্র—৩২৮, ৪৪০
ব্রজাঙ্গনা কাব্য—১৫, ২৭২-৭৫
ব্রাউনিং—৫৬৪
ব্রাউনিং (শ্রীমতী)—৪৮১
ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থ—৪৫৩
ব্রুক্স এইচ. পি.—৯৭
ব্লাকউড্ ম্যাগাজিন—১৬৯
ব্লেক—৩৮৯

ভ

ভগ্নহৃদয়—৪৬৫, ৪৭০-৪৭২
ভদ্রোদ্বাহ কাব্য—৪৪০
ভর্জিল—২২৯, ২৬৬, ২৭১-৭২, ২৯৪
ভর্তৃহরিকাব্য—৪৪০
ভলটেয়ার—৪৫৩
ভানুমতীর উপন্যাস—১১৯
ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী—৪৬৫, ৪৭২-৭৪, ৫০১
ভারতউচ্ছ্বাস—৩৬৪
ভারত-উদ্ধার কাব্য—৩২৪, ৪৪০-৪২
ভারতচন্দ্র—২, ২০, ৩০, ১৪৮, ২৩৪, ২৪০, ২৪১, ৩০৩, ৩১২, ৩৫০,
ভারতমঙ্গলকাব্য—৪৩০
ভারতী—৩৩৭, ৪২৬, ৪৩২, ৪৪৩, ৪৪৬, ৪৯২-৫০২, ৬৬৭-৬৬৮
ভারতে যুবরাজ—৪২৪
ভারতে সুখ—৪২৬
ভিক্টর হুগো—৪৮১, ৫০৮, ৫১০
ভিক্টোরিয়া-গীতিকা—৪৩০
ভিস্নস্ অব দি পাষ্ট—১০৭, ১৬৯

ভুবনমোহন দত্ত—১২০
ভুবনমোহন রায়চৌধুরী—৩২১
ভুবনমোহিনীপ্রতিভা—৪২৮, ৪৬৫
ভূদেব মুখোপাধ্যায়—৩৫২

ম

মঙ্গল কাব্য—১৯
মদনমোহন তর্কালংকার—১১৯-২০
মদনমোহন মিত্র—৩১৮, ৩২৪
মধুসূদন সরকার—৪৪৪
মধুসূদন সেন—১২৪
মনোমোহন বসু—১২১
মনোমোহন সেন—৪৪৪
মন্মথ কাব্য—১১৯
মন্মথনাথ ঘোষ—১৬৬
মর্লি হেনরি (অধ্যাপক)—৪৮০
মহন্তবিলাপ—৪২৪
মহাজন পদাবলী—৫
মহাপ্রস্থান কাব্য—৪৩৪
মহাভারত—৪২৪
মহিলা—৪০৫
মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—২
মহেশচন্দ্র শর্মা—৩২৮
মাইকেল মধুসূদন দত্ত—১০৬-১০৮, ১৪১, ১৬০, ১৬৮-৩০৪, ৩২৭, ৩৭৭, ৪৬৩
মাতৃমঙ্গল—৪৩০
মাথ্যু আর্ণল্ড—৪৫২, ৪৮১
মাধবমালতী—৪৩৯
মানস বিকাশ—৪৩৪, ৪৪৫
মানসী—১৫, ১৬৪, ৩৩৭, ৫০৩-৫৩৯
মালতীমালা—৩২৬
মায়াকানন—৩৮১
মারস্টন পি. বি.—৪৮১
মিত্রকাব্য—৪৩০
মিডল্‌টন্ মারে—৩০১, ৩০২
মিত্রবিলাপ ও অন্যান্য কবিতাবলী—৪১২
মিড্‌সামার নাইট্‌স ড্রিম—২০০
মিল জন স্টুয়ার্ট—২৯৬-৯৮, ৩৩৩, ৩৩৫, ৩৩৭-৩৮
মিল জেমস—২৪, ৬৬
মিলটন—৮৭, ১৬৪, ১৮৪, ২০২, ২১০, ২৬৭, ২৬৮, ২৯০-২৯৫
মিশন চার্লস—৯৭
মুখার্জিস ম্যাগাজিন—৩৩৭
মুকুটউদ্ধার—৪৪০
মূর—৮৭, ৯৮, ১৪৯, ১৭৪, ২৯৩, ২৯৬, ৪১৯, ৪৩৩, ৪৭৬, ৪৮৪
মৃণালিনী—৫, ৩০৪
মেকলে—৮৭
মেঘনাদবধ কাব্য—৬, ৪০-৪১, ২০৭ ২৭২
মেটামর্‌ফোসিস—২৬৬
মেনকা—৪৩২
মেরি উইলষ্টনক্র্যাফ্‌ট—২৭৬
মোহনবিহারী আঢ্য—৪৪৪
মোহভোগ—৩১৫-১৭

মোহিতচন্দ্র সেন—৪৬৫
মোহিতলাল মজুমদার—৩২-৩৩,১৩৩, ২৬৪, ২৬৮, ২৮৯, ৫৫০-৫৫১
মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়—৩৩৬, ৪৪৪

য

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর—১৮২
যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়—১২০, ৩২১
যদুনাথ ঘটক—৪৪৪
যোগীন্দ্রনাথ বসু—২১১
যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ—৩৩৫
যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—৩৩৫
যোগেশকাব্য—৪৩৪, ৪৬২
যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—৪৪৪
যোজনগন্ধা—১৯২, ৩১২
যৌবনোদ্যান—৪১১

র

রক্তকরবী—২১৪, ২২১
রঘুনন্দন গোস্বামী—২১৮, ১১৯
রঙ্গমতী—৩৬৪, ৩৬৬-৬৮, ৪৫৫
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—১, ১১১-২২ ১৪৬- ৬৭, ২৬৮, ২৯৬, ৩১২
রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়—৩১৮, ৩২১
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—৫, ৩৬, ১১৩, ২১১, ২৩০, ২৪১, ২৯৫, ৩০০, ৩২৪, ৩৫৪, ৪৪০-৫৩৯ ৫৬৬-৬৮
রবীন্দ্রস্মৃতি—২৯২
রসিককৃষ্ণ মল্লিক—২১৩
রসিকচন্দ্র রায়—৩০৯, ৩১১-১২
রসিকলাল দত্ত—৪৪৩
রসেটি—৪৮১
রহস্যসন্দর্ভ—১৬৪, ৩২২, ৪৪৩
রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—৬৬, ৪১১-১৩
রাজনারায়ণ বসু—৬৩, ২০৯, ২১০, ৩২৭, ৩২৭, ৩৩৪, ৫০২
রাজেন্দ্রলাল মিত্র—২
রাজকৃষ্ণ রায়—৪১৫, ৩২৪-২৬, ৪৪৩
রাধামাধব মিত্র—১২৪, ৩০৯, ৩১৩
রাধাবিলাপ লহরী—৩২৮
রাধামাধব সেন—২, ১০৯
রামকৃষ্ণ দেব—২৯৯, ৩৩৮, ৪৫৫-৫৬
রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—৪৪০
রামতনু লাহিড়ী—২৯৭, ৩৩৮
রামদাস সেন—৩২৮, ৩৩৮
রামনারায়ণ তর্করত্ন—৩২১
রামরসায়ন—১১৯
রাধামাধবোদয়—১১৯
রাম বসু—২, ২৭২
রামমোহন রায়—২১, ৪৯,৫৯, ৬১, ২০৭ ২১৩, ২৭৫
রাসেলাস—৩৮৮, ৪৮৫, ৪৫০
রাসু নৃসিংহ—২৫০
রিচার্ডস আই. এ.—৩৫৭
রিচার্ডসন ডি. এল. (ক্যাপটেন)—৫৮, :৯৫,-৯৬, ৯৮-১০০, ১৬৯, ২৯০, ২৩৯

রিজিয়া—১০৭
রৌড—২৯৯, ৩৩৮, ৪৫২
রুশো—২৯৭, ৩৩৫, ৪৫৩, ৪৫৪,
রুদ্রচণ্ড—৪৬৫, ৪৭২
রেবতীমোহন রায়—৪৪০
রৈবতক—২১২, ৩৬৯-৭০
রেভরেণ্ড লং—৬৬
র‍্যাশন্যাল এনালিসিজ অব গস্‌পেল—১৩২

ল

লক্—৬২, ৯৮, ২১৩, ২১৪, ২৯৮, ৩৩৩, ৩৩৮
লংফেলো—৩৩৭, ৩৪৫, ৪৬৯
ললিত কবিতাবলী—৪৪০
ললিতসুন্দরী—৪৩২
লাইবনীজ—৩৩৬
লাওয়েল—৫৪৬
লাফঁতেন—২৪২, ২৯১-৯২
লালন শাহ—৩১৯
লাল্লারুখ—৪৩২, ৪৩৯
লিটরারী গেজেট—১, ১৬৯
লেব্‌ডেফ—৩৬
লিট্‌রারী গ্লিনার—১৬৯
লেকি—৩৩৭

শ

শক্তিসম্ভব কাব্য—৪৪০
শর্মিষ্ঠা—১৭৩-৭৭
শশধর তর্কচূড়ামণি—৩৩৩
শশাংকমোহন সেন—২২০
শশীচন্দ্র দত্ত—১০৫-১০৬
শান্তানন্দ তরঙ্গিনী—৩৮৬
শাদী—৩১৫, ৪৫৫
শিবাজী কাব্য—২১১
শিশুকবিতা—৪২৪,
শিবনাথ শাস্ত্রী—৩৩৮, ৩৬০, ৪১১, ৪১৩,-১৪, ৪৪৫,
শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়—৪৪৪, ৪৪৫
শেলী—৩৪৫, ৪২১, ৪৩৩, ৪৫২, ৪৬৯, ১৮৪, ৪৮৪
শৈলেন মজুমদার—৪৪৪
শৈশব সঙ্গীত—৪৭৪-৪৭৯
শ্মশান ও জীবন—৪২৪
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়—১৩২
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমাঙ্কুর—৩৬১
শ্রীচৈতন্যদেব—১৬, ৪৫৫
শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়—৪৪৪
শ্রীরামপুর মিশন—৫২
শ্রীশগোবিন্দ সেন—৪৪৪
শ্রীশচন্দ্র মজুমদার—৪৪৩
শ্যামাচরণ শ্রীমাণী—৪৪০
শ্লেগেল—৪৯

স

সক্রেটিস—১৯৫
সঙ্গীতশতক—৩৭৮-৩৮১

সদ্ভাবশতক—৩১৫
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—৩৩৭
সন্ধ্যামণি—৪২৬
সন্ধ্যাসঙ্গীত—১৪২, ৪৭৪-৪৮০, ৪৮৪
সংবাদপত্রে সেকালের কথা—২৬
সংবাদপ্রভাকর—১২, ১০৯, ১৬৪, ২৪০, ৩১৫, ৩২৮
সবুজপত্র—৫৬৭
সমাচারদর্পণ—১
সরল কবিতা—৪২৪
সরোজকুমারী দেবী—৪৪৪, ৪৪৫, ৫৫৮
সরোজিনী নাটক—৪৫৮
সরোজকান্তি মুখোপাধ্যায়—৪৪৪
সাধারণী—৪২৮, ৪৪৩, ৪৪৬
সাধের আসন—৩৯০
সারদামঙ্গল—৩৮২-৩৮৩
সারদাচরণ মিত্র—৪৪৩
সাহিত্যসাধক চরিতমালা—১২৮
সাব্‌জেকসন অব উইমেন—৩৩৭
সিন্ধুদূত—৪২৮, ৪৮২
সিংহলবিজয়—১২১,৪৪০
সীতার বনবাস—৩০৩
সীতাহরণ কাব্য—৩০৯
সীলি (অধ্যাপক)—৩৩৭
সুকুমার সেন—২, ২৬৩, ৩১৩, ৪২৩
সুবন্ধু—১১৯
সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত—২৩৩
সূর্যকুমার সেনগুপ্ত—১২৩
সুশীলকুমার দে—২৬৪, ৫৫০
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—৯
সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার—৪০০, ৪০৩-৪০৮
সুরেন্দ্র গোস্বামী—৪৪৪
সেক্সপিয়ার—৮৭, ২০০, ৩০০, ৩৪৪, ৪৬২
সেনেকা—২৩৬, ২৪৩
সেন্টালুপে (লর্ড)—৪৮১
সোমপ্রকাশ—৩২৮
সোরোকিন পিটিরিম—৫১০
সোপেনহাওয়ার—২৯৭
স্কট ওয়ালটার—৮৭, ১৪৯, ২৯৩, ২৯৬
স্টিফেন—৩৩৭
স্বর্ণকুমারী দেবী—৪৪৪, ৫৫৬
স্বপ্নদর্শন—৩৭৮
স্বপ্নপ্রয়াণ—৪১৫, ৪৫৫
স্পিনোজা—২৯৯
স্পেনসার হার্বার্ট—৩৩৭, ৩৩৮
স্তবমালা—৪২৪
স্পেনসার (কবি)—৮৭, ৩৫১, ৪১১

হ

হরচন্দ্র দত্ত—১, ১৭৪
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—৯, ১৮৪, ২৪৮, ৪৪৫
হরিচরণ চক্রবর্তী—৪৪০
হরিশচন্দ্র মিত্র—৩০৯, ৩১৪-১৫
হরিমোহন মুখোপাধ্যায়—২,৪৪০,৪৪৩

হরিশচন্দ্র নিয়োগী—৪১৯, ৪২৬-২৮, ৪৪৩
হরু ঠাকুর—২৭২
হার্টলি ডেভিড—২১৩, ২৯৬
হাফেজ—৩১৫, ৪৫৫
হারাণচন্দ্র রক্ষিত—৪৪৫
হাক্সলি টমাস হেনরি—৩৩৫, ৩৩৬
হার্টন—৯৭
হার্মিট—৪৩৯, ৪৬০
হিউম ডেভিড্—৬৫, ২৯৮, ৩৩৮
হিতপ্রভাকর—১০৯
হিমাদ্রিকুসুম—৪১৩
হিরন্ময়ী দেবী—৪৪৪, ৫৫৭-৫৫৮
হিন্দুহিতৈষিনী—৩১৪
হীরালাল হালদার—৩৩৬
হুতোম প্যাঁচার গান—৩৫১
হেক্‌টরবধ—২৮১
হেরোয়াইদ—২৭৭
হেলেনা কাব্য—৪৩০
হেমচন্দ্র—৩৪১-৩৬০, ৩৭৬-৭৭, ৩৯৮-৯৯, ৪৫৮-৫৯, ৪৬৪, ৪৭৫, ৫৫৯
হ্যামিলটন স্যার উইলিয়াম—২৯৯,৩৩৭, ৩৩৮, ৪৫৪